কারবালার ঘটনাঃ ঐতিহাসিক পুনঃমূল্যায়ন

এম. ফিল. ডিগ্রীলাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোহাম্মদ মুনীরুজ্জামান
নিবন্ধন নম্বর ১৪২/ ১৯৯৪-৯৫
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

384671

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ডিসেম্বর - ২০০০ ঈসায়ী

Dhaka University Institutional Repository

কারবালার ঘটনা ঃ ঐতিহাসিক পুনঃমূল্যায়ন

এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ

মোহাম্মদ মুনীরুজ্জামান

384671

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

ডিসেম্বর - ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ ঃ

আমার পরম শ্রদ্ধেয়

আব্বা আম্মা

দাদা-দাদী, নানা-নানী

ও

পরম স্নেহের ছোট ভাই

মরহুম মোঃ বাবুল আখতারকে

মহান আল্লাহ তাঁদের জান্নাতুল ফেরদাউসের

হকদার করুন! আমিন ॥

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, "কারবালার ঘটনাঃ ঐতিহাসিক পূনঃমূল্যায়ন" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ন ভাবে আমার নিজস্ব রচনা। এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম.ফল ডিগ্রীর জন্য লিখিত হয়েছে এবং এটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

মোহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ২১/১২/২০

(মোহাম্মদ মুনীরুজ্জামান)
এম. ফিল. গবেষক
নিবন্ধন নম্বর ১৪২/১৯৯৮
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ মুনীরুজ্জামান কৃত 'কারবালার ঘটনা ঃ ঐতিহাসিক পুনঃমূল্যায়ন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর আবশ্যকীয় দিকগুলোর আংশিক পরিপূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ গবেষণা প্রকল্পটি পূর্বাপর তদারক করেছেন। প্রার্থীকে এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদান করার অনুকূলে এটিকে বিবেচনা করার জন্য এতদ্বারা সুপারিশ করা গেল।

১৩.১২.২০০০

(ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম)
তত্ত্বাবধায়ক
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের জন্য; যিনি মানব জাতিকে জ্ঞান সম্পদ দ্বারা বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ ও সম্মানিত করেছেন। দরুদ ও সালাম বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি; যিনি জ্ঞানার্জনকে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় বলে ঘোষনা করেছেন। আল্লাহর নিকট দয়া, ক্ষমা এবং পুরষ্কার কামনা করছি সে সকল মহান ব্যক্তির জন্য; যাঁরা জ্ঞান চর্চা এবং জ্ঞানের সাধনা করে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। "কারবালার ঘটনার ঐতিহাসিক পূনঃ মূল্যায়ন" শিরোনামে যে গবেষণা পত্রটি আমি প্রণয়ন করেছি আমার একার পক্ষে একাজ সম্পন্ন করা কোন ক্রমেই সম্ভব হতোনা; যে সকল মহৎ প্রাণের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় আমি এ পর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছি তন্মধ্যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে প্রথমেই আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণ, উপাত্ত সংগ্রহের নির্দেশনা ও সহাযোগিতা, অধ্যায় পরিকল্পনা এবং অভিসন্দর্ভের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় সঠিক ভাবে সাজাবার ক্ষেত্রে তাঁর অকৃতিম সহযোগীতা ও উপদেশ প্রদানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হলো। আমার অভিসন্দর্ভটির প্রতিটি অধ্যায় তিনি অতি যত্নে ও গুরুত্বের সাথে বারবার দেখে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনে কখনো পত্র যোগাযোগ ও টেলিফোনের মাধ্যমে আমাকে উপদেশ প্রদান করেছেন। তাঁর অপরিসীম স্নেহ, নিরন্তর উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা আমার চলার পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। তাঁকে শুধু কৃতজ্ঞতা জানালে তা হবে অতি সামান্য; বিশাল হৃদয়ের মহান শিক্ষকের নিকট আমি চিরঋণী; আল্লাহ যেন তাঁকে উভয় জগতে পূর্ণ জাযায়ে খায়ের দান করেন।

গবেষণা কর্মটি প্রণয়নে আরো যাঁদের উপদেশ ও সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার প্রফেসর ডঃ পি.আই.এস. মুস্তাফিজুর রহমান, জনাব মোঃ জাফারিয়া খান, প্রফেসর ডঃ হাবীবা খাতুন, প্রফেসর ডঃ আয়শা বেগম, জনাব মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, জনাব মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়া, জনাব মোঃ তৌফিকুল হায়দার, ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান, আমার শ্রেণীবন্ধু ও বিভাগীয় প্রভাষক মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান খান সহ আমার বিভাগীয় শিক্ষক মন্ডলী; আরবী বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটরস ডঃ মোঃ সিরাজুল

Dhaka University Institutional Repository

হক, স্নেহাস্পদ ও এম.ফিল. গবেষক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মোঃ শাঃ আলম। তাঁরা আমার গবেষণা কর্মের উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন এবং কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সার্বক্ষনিক খোঁজ খবর নিয়েছেন। অভিসন্দর্ভের চুড়ান্ত খসড়া দেখেছেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সিস্টেম এনালিষ্ট, আমার মেজ ভাই ইঞ্জিনিয়ার (বুয়েট) মোঃ এনামুল কবির। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা ও উপদেশ প্রদান করেছেন আমার সাবেক সহকর্মী ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর বিশ্বকোষ বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা আ.ফ.ম. আঃ জলিল, প্রকাশনা কর্মকর্তা মুহাম্মদ মূসা, সহকারী পরিচালক, পরিকল্পনা বিভাগ মোছাঃ হাজেরা খাতুন, বন্ধু ও দীর্ঘ ছাত্র জীবনের সহপাঠি পাবনা জেলা স্কুলের সহকারি শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও শেরে বাংলা নগর গভঃ গার্লস স্কুলের সহকারী শিক্ষক মোঃ সাইফুল ইসলাম খান প্রমুখ। তাঁদের অবদানের কথা আজীবন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবো।

এ সুযোগে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা মোঃ আঃ শুকুর ও মা মোছাঃ জামিরন নেছা, শ্বশুর সাবেক উপ-পরিচালক বস্ত্র অধিদপ্তর রাজশাহী, আলহাজ্ব মোঃ মাহেরুল হক ও শ্বাশুড়ী মিসেস মাবিয়া খাতুন, ভায়রা ভাই, প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান ভূগোল বিভাগ, রাজশাহী সরকারী কলেজ, জনাব আলহাজ্ব মোঃ নজরুল ইসলাম ও জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট এন্ড ইন্সপেকশন বিভাগ, ঢাকা, জি.এম.এ. হান্নান, বড় ভাই ডাঃ মোঃ এনামুল হাফিজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ছোট ভাই মোঃ এনামুল বশির, কর্মকর্তা, আমদানী বিভাগ, জনতা ব্যাংক, লোকাল অফিস, ঢাকা, প্রমুখকে। যাঁদের অপরিসীম ত্যাগ, অপরিমেয় স্নেহ আন্তরিক সহযোগিতা ও আশীর্বাদের ফসল আমার এ গবেষণা কর্ম। সর্বোপরি আমার প্রিয়তমা সহধর্মিনী বেগম শওকত শাবানা এম.এ. ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এ গবেষণা কর্মের জন্য সার্বক্ষণিক ভাবে যে ঐকান্তিক সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান করেছেন এবং অনুপ্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছেন তা সত্যই অবিস্মরণীয়। তাঁর এ আন্তরিক ও অকৃপণ সহযোগিতা না থাকলে হয়তো এ কাজ শেষ করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব হতোনা।

গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহকালিন প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য আমি বিশেষভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, ঢাকা, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা, গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, কেন্দ্রিয় পাবলিক লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ লাইব্রেরী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ শরিয়া কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, হোসেনী দালান লাইব্রেরী,

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকাস্থ ইরানীয়ান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী, বংশাল আহলে হাদিস মসজিদ লাইব্রেরী, সিলেটস্থ মুসলিম ঐতিহ্য সংসদ লাইব্রেরীতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ ছাড়াও দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক ইত্তেফাক মাসিক অগ্রপথিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকাসহ ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা সমুহের সংগ্রহশালা ব্যবহার করেছি। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় লাইব্রেরী বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, লাইব্রেরী, ইতিহাস বিভাগ, লাইব্রেরী, বাংলা বিভাগ, লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। প্রতিষ্ঠান সমূহের সংশ্লিষ্ট সকলেই আমাকে উপাত্ত সংগ্রহে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং ঋনী। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মোঃ মাহাতাব উদ্দিন ও হারিনা ইয়াসমিন আন্তরিক সহযোগিতা দিয়ে অভিসন্দর্ভটি অতিযত্ন সহকারে কম্পোজ করেছেন। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে এম.ফিল গবেষণার সুযোগ প্রদান করায় আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের এ সহযোগিতার ফলেই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হলো।

মহান আল্লাহ আমার পরিশ্রমকে সার্থক ও সফলতাদান করুন ! আমিন !!

তারিখ ঃ ২৯/১২/২০০০

মোহাম্মদ মুনীরুজ্জামান

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ

কারবালা ইরাকের এক প্রসিদ্ধ শহর যা বিশেষত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাত স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ। কারবালার ঘটনা বলতে মূলতঃ ইমাম হুসায়ন (রাঃ) এর ক্ষুদ্র কাফেলার সাথে যুদ্ধ [illegible] সজ্জিত বিপুল সংখ্যক ইয়াযীদের কুফা বসরা তৎকালিন গভর্নর আব্দুল্লাহ/উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বাহিনীর অসম যুদ্ধকেই বুঝানো হয়। মূলতঃ এ ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ঘটলেও এর প্রভাব সামান্য নয়। এর যেমন সুদুর প্রসারী পরবর্তী প্রভাব রয়েছে অনুরূপ এর সংঘটনের পিছনেও ছিল নানা ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল। হযরত আলী (রাঃ) এর শাহাদত বরণ হাসান (রাঃ) এর খিলাফত ত্যাগ ইত্যাদি একই সুত্রে গাঁথা। কিন্তু এ ব্যাপার আজ পর্যন্ত গবেষণা ধর্মী কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়নি। [illegible] গবেষণায় মূলত এ অভাব পূরণের তথা সঠিক কারণ বিশ্লেষণ করে প্রকৃত ঘটনা উপস্থাপন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য প্রথমে রাজনৈতিক কার্যকারণ বিশ্লেষণ, হাশেমী বংশের সাথে উমাইয়া বংশের আর্থ সামাজিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস 'কারবালার ঘটনা সংঘটনের পিছনে হুসায়ন (রাঃ) সহ সংশ্লিষ্ট সকলের ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গি কি ছিল নিরপক্ষ ধর্মীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর বিচার ফয়সালা করার চেষ্টা, [illegible] ঘটনার সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ ও পরবর্তী প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহারে [illegible] ঘটনা আমাদের কি শিক্ষাদেয় তাই দেখানো হয়েছে। সর্বোপরি পরিশিষ্টের কয়েকটি অধ্যায়ে [illegible] রাজি ও গ্রন্থ কারদের সম্পর্কে, বাংলা ভাষায় কারবালা নিয়ে যা কিছু রচিত ও আলোচিত হয়েছে [illegible] হয় সে সম্পর্কে, আহলে বায়েতের সাজরা শরীফ এবং কুফা, বসরার আঞ্চলিক ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

আবেনে	=	আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া
আআ	=	আল আমালী
আইওয়াসি	=	আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসিয়অহ
আতাতাউমু	=	আত-তাবারী-তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক
আতারিনা	=	আত-তাবারী আর বিয়াযুন নায়েরা
আরিনাফি মাআ	=	আর রিয়াজুন নায়েরা ফি মানাকিবিল আশরা
আবাওয়াতা	=	আল বায়ান ওয়াত তাবায়ান
আইফ	=	আল ইকদুল ফ রীদ
আকু	=	আহকামুল কুরআন
আইফিতাসা	=	আল ইসাবা ফি তামইয়াযিস সাহাবা
আকাফিতা	=	আল কামিল ফিত তারীখ
আতো	=	আখবারুত তোয়াল
আয	=	শারহিল ফিকহিল আযহার
আতা	=	আত-তাবারী
ইআ	=	ইবনুল আছীর
ইস্তিয়াব	=	আল ইস্তিআব লি মা রিফাতিল আসহাব
ইখি	=	ইজালাতুল খিফা
ইমা	=	ইবনে মাজা
ইসাবা	=	আল ইসাবা ফি তামইয়াযীস সাহাবা
ইহা	=	ইজহারুল হক
ইখি	=	ইজালাতুন খিফা
ইবি	=	ইসলামী বিশ্বকোষ
ইমা	=	ইন্তিদাতুল মামালিক
ইসি	=	ইমামত ওয়া সিয়ামাত
ইইমু	=	ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া
উগাফিমাসা	=	উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা
উকা	=	উমদাতুল কারী
এঅই	=	এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম
কুক	=	কুরআনুল করিম

Dhaka University Institutional Repository

কাউ	=	কানযুল উম্মাল
কামিল	=	আল কামিল ফি তারিখ
কিফু	=	কিতাবুল ফুতুহ
কিসুকু	=	কিতাবুস সুনানুল কুবরা
কার	=	কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত
খিই	=	খিলাফতের ইতিহাস
খিমুই	=	খিলাফতে মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদ
খাকা	=	খাওয়াতীনে কারবালা
গাউ	=	গাইয়্যাতুল উসুল
জাতি	=	জামে তিরমিজি
তারামু	=	তারীখুর রসুল ওয়াল মুলুক
তাইসা	=	তাবাকাতে ইবনে সা'দ
তাইখা	=	তারীখে ইবনে খালদুন
তসু	=	তরজমানুস সুন্নাহ
তাতা	=	তাহযীবুত তাহজীব
তরারা	=	তরজুমাতু রায়হানাতু রাসুলুল্লাহ
তাতাই	=	তারীখে তামাদ্দনুল ইসলামী
তা	=	আততাজ
তাদা	=	তারিখে দামেস্ক, লি ইবনে আসাকির
ফুবু	=	ফুতুহুল বুলদান
ফবা	=	ফতহুল বারী
ফইআ	=	ফতুহু ইবন আছম
ফিআআ	=	ফিহরিস্ত আল আগানী
মনা	=	মহররম নামা
মিসু	=	মিনহাজুস সুন্নাহ
মুজামাজা	=	মুরুজুজ জাহাব ওয়ামাআদিনুল জাওহার
মাআ	=	মাসনাদে আহমদ
মুকা	=	মুকাদ্দমা
মীমা	=	মীর মানস
মুবাসা	=	মুসলিম বাংলা সাহিত্য
মশ	=	মহরম শরীফ বা আত্ম বিসর্জন কাব্য

Dhaka University Institutional Repository

মীমগর	=	মীর মশাররফের গদ্য রচনা
মুযা	=	মুরুযুয যাহাব
মরস	=	মশাররফ রচনা সম্ভার
মুমান	=	মুসলিম মা নববী
মুমাবাসা	=	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য
মিশ	=	মিশকাত শরীফ
মীমোহোশববিসি	=	মীর মশাররফ, হোসেন শত বর্ষে বিসাদ সিন্ধু
মিমুশবিসি	=	মীর মুশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদ সিন্ধু
রথেঅ	=	রত্নবতী থেকে অগ্নিবীনা
ববা	=	বঙ্গ বাসী
বিসি	=	বিসাদ সিন্ধু
বেলাক্যা	=	বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ
ভাফাচৈ	=	ভারতী, ফাল্গুন ও চৈত্র
শ্বাব	=	শ্বাশত বঙ্গ
শফিআ	=	শরহে ফিক্‌হে আকবার
সবু	=	সহীহ বুখারী
সুআদা	=	সুনানে আবু দাউদ
সমু	=	সহীহ মুসলিম
সাসাচমা	=	সাহিত্য সাধক চরিত মালা
হাহা	=	হায়ওয়াতুল হায়ওয়ান
১৯শ বা মুচি চেধা	=	১৯ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা
AKIF	=	Arab Kingdom and its fall
ASHS	=	A Short History of the Saraccnse
HA	=	History of the Arabs
IHNI	=	Islamic History A New Interpritation
IITHPR	=	Imam Ibn Taimiya and His Projects of Reform
LHA	=	A Litarary History of the Arabs
MCB	=	Muslim Community in Bengal
SHS	=	A short History of the Saraccns
TKFL	=	The tragedy of Karbala Facts and Legends
TC	=	The Caliphat

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয় বস্তু পৃষ্ঠা নং

ঘোষণা পত্র i

প্রত্যয়ন পত্র ii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii

সারসংক্ষেপ vi

শব্দ সংক্ষেপ vii

সূচীপত্র ১

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমনিকা

১.১ ভূমিকা ১

১.২ ইতিহাসের গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা ৪

১.৩ যৌক্তিকতা ৭

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ৮

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৯

১.৬ অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক কার্যকারণ বিশ্লেষণ

২.১ খিলাফতের উৎস ও তাৎপর্য ১৩

২.২ শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন ২১

২.৩ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর অনুকূলে হাসান (রাঃ) এর খিলাফত ত্যাগ ৩৭

২.৪ শাসন ক্ষমতায় ইয়াযীদ ৪২

২.৫ হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতি কুফাবাসীদের আমন্ত্রণ ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ কুফার উদ্দেশ্যে হুসায়ন (রাঃ) ও ঘটনার পরম্পরা ৬১

২.৭ হুসায়ন (রাঃ) এর ভাষণ ৭৫

২.৮ সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা ৭৬

২.৯ একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ৮৮

২.১০ হুসায়ন (রাঃ) এর স্বয়ং অস্ত্রধারণ ও শাহাদৎ বরণ ৯৫

২.১১ কারবালা ঘটনার পরবর্তী ঘটনাবলী ১০১

২.১২ হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাতের ক্ষেত্রে ইয়াযীদের ভূমিকা ১১৫

২.১৩ হুসায়ন (রাঃ) এর ছিন্ন মস্তকের সর্বশেষ অবস্থা ১২১

২.১৪ তাঁর দেহ ও তাঁর সাথে শাহাদত প্রাপ্তদের অবস্থা ১২৪

২.১৫ ইয়াযীদ পক্ষীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচয় ও কার্যকলাপ ১২৭

তৃতীয় অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব

৩.১ বংশ পরিচয় ১৪৫

৩.২ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ১৪৭

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীগত বিশ্লেষণ

৪.১ খিলাফতের উত্তরাধিকার নির্বাচন ১৫৮

৪.২ অত্যাচারী শাসকের সাথে গৃহীত নীতি ১৬১

৪.৩ ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া সম্বন্ধে দুটি চরমপন্থী দল ১৬৮

৪.৪ ইসলামের দৃষ্টিতে বিপদে ধৈর্য্যধারন ১৬৯

৪.৫ হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদত সম্পর্কে নানা মত ও অনাচার ১৭১

৪.৬ হুসায়ন (রাঃ) কর্তৃক বিদ্রোহ প্রসঙ্গ ১৭৮

৪.৭ ইয়াযীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ১৮৬

৪.৮ ইয়াযীদের উপর অভিসম্পাৎ বর্ষণ ১৯০

৪.৯ ইয়াযীদের সাহাবীয়ত প্রসঙ্গ ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০ হুসায়ন (রাঃ) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ২০০

৪.১১ হুসায়ন (রাঃ) এর সাহাবীয়ত প্রসঙ্গ ২০৮

৪.১২ কারবালার ঘটনা প্রসঙ্গে রাসুলের ভবিষ্যৎ বানী ২১৩

৪.১৩ হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাতের যৌক্তিকতা ও সার্থকতা ২২২

পঞ্চম অধ্যায়

কারবালার ঘটনার সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ ও পরবর্তী প্রভাব

৫.১ সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ ২৩৬

৫.২ ইসলামী বিপ্লবের চিরন্তন উৎস ২৪৫

৫.৩ কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার সংঘটকদের পরিণতি ২৫২

উপসংহার ২৫৬

পরিশিষ্ট

১. আকর গ্রন্থরাজির পর্যালোচনা ২৬৫

২. বাংলা সাহিত্যে কারবালা ঘটনার ব্যবহার ২৭২

৩. আহলে বায়েতের সাজরা শরীফ ৩০৫

৪. কুফা বসরার আঞ্চলিক ভৌগোলিক অবস্থান পর্যালোচনা ৩১৪

৫. আঞ্চলিক মানচিত্র ৩২৮

গ্রন্থপঞ্জি ৩২৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমনিকা

১.১ ভূমিকা

প্রত্যেক মু'মিন তার জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে আল্লাহর দরবারে মাথানত করবে। বিপদ, আপদ, বালা মুসিবত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, মাল-দৌলত, মান-ইজ্জত, সন্তান-সন্তুতি, মোট কথা সর্ববিষয়ে সে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করে চলবে। এটাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পছন্দ করে থাকেন। "আল্লাহর নিকট গ্রহন যোগ্য দ্বীন হলো একমাত্র ইসলাম।"[১] মানুষ কি কি বিষয়কে সত্য বলে মেনে নেবে কোন কোন কথা বা ধারনাকে মিথ্যা বলে জানবে এবং কি কি আমল তাদের জন্য উপকারী আর কোন কোন কাজ তাদের জন্য ক্ষতি কারক -এ সমস্ত জেনে নেয়া একান্ত কর্তব্য। তাই আল্লাহ তাআ'লা মানুষের জন্য কতগুলো আইন কানুন তৈরী করে দিয়েছেন। এ আইন-কানুন রয়েছে আল্লাহর কি তার কুরআন পাকে এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে হাদীস শরীফে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের এ আইন কানুনকেই বলা হয় আল্লাহর দ্বীন বা ইসলাম। এটাই আল্লাহর দেয়া শান্তির পথ- এটাই নাজাতের রাস্তা। এ দ্বীন ইসলামকে ত্যাগ করে যদি কেউ নিজের ইচ্ছা মত চলে কিংবা ইসলাম সমর্থন করেনা এমন কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী চলে তাহলে কষ্মিন কালেও তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন ঃ

"আর যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চায় তা তার থেকে কষ্মিন কালেও গ্রহন করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।"[২]

হক আর বাতিলের কখনো আপোস হতে পারে না। এজন্য খিলাফতও হতে হবে আলামিনহাজে রাসুলুল্লাহ (সঃ), কিন্তু কোন বিচারেই ইয়াযীদের শাসনকালকে তথা তার শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়ার প্রক্রিয়াকে ইসলামী পদ্ধতি বলা যায়না। হুসায়ন (রাঃ) মুসলিম মিল্লাতের কথা চিন্তা করে তার সাথে আপোষ করতে পারেননি। তারই চরম পরিনতি ১০ই মহররমের কারবালার ঘটনা। যদিও এ ঘটনা কোন একক ব্যক্তির চক্রান্তের ফসল নয়। ইহুদী চক্র রসুলের প্রাণনাশের জন্য যেমন হুমকি স্বরূপ ছিল- এ ক্ষেত্রে ও ইহুদী সাবাহ চক্রের হাত ছিল।

হক ও বাতিলের চিরন্তন সংঘাতের বহু ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত ১০ই মহররম। এ দিনের সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার সাথে মুসলিম জীবন ও চিন্তের নিবিড়তম সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে এ দিনে সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে কারবালায় সংঘটিত বিয়োগান্ত ঘটনাটির স্মৃতি প্রতিবছর মুসলিম জীবনে বয়ে আনে এক নতুন চেতনা। মুসলিম চিন্তকে কারবালার স্মৃতি অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রেরনায় উজ্জিবিত করে তোলে। শাসক গোষ্ঠীর অন্যায় অবিচারের খড়গ হস্ত যে সব মানুষের মাথার উপর সদা ঝুলন্ত থাকে, যারা থাকে হতাশায় জড়ো সড়ো, এ দিনের ত্যাগের স্মৃতি চির কাল সে সব মানুষের মনে শক্তি, সাহস ও আশার সঞ্চার করে আসছে। জাতীয় বহু বিপর্যয়ে এ ত্যাগের স্মৃতি মুসলমানদেরকে বলীয়ান করেছে, শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রানপ্রিয় দৌহিত্র হুসায়ন (রাঃ) খেলাফতি শাসন ব্যবস্থা ও ক্ষমতা হস্তান্তর পদ্ধতির বিকৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াতেই ইয়াযীদ বাহিনীর হাতে তাঁকে জীবন দিতে হয়েছে। স্বল্প সংখ্যক সাহাবী ও পরিবারের নারী শিশুসহ ৭২ জন লোকদ্বারা একটি রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করলে তার পরিনতি কি হবে তা ভালো করেই তিনি জানতেন। তারপরও ন্যায় ও সত্যের মর্যাদাকে চির উন্নত রাখার জন্যে বাতিলের সাথে তিনি আপোস করেননি। সে সময় শুধু একটি কথা "ইয়াযীদের আনুগত্য করি" একথা বললেই তার ও পরিবারের আরাম আয়েশের জীবন নিশ্চিত হয়ে যেতো। কিন্তু এ সবের চাইতে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন নীতিকে সমুন্নত রাখার বিষয়টি। কারণ, হুসায়ন (রাঃ) তাঁর দুরদৃষ্টি দ্বারা এটা প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তিনি যদি আজ ক্ষমতা হস্তান্তরের রাজতান্ত্রিক পদ্ধতিকে মেনে নেন এবং ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার বিকৃতির প্রতি স্বীকৃত জানান, তাহলে ভবিষ্যতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার কেউ থাকবেনা। আর যার ধমনীতে নবী (সঃ) এর রক্ত ধারা প্রবাহিত সেই হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। যিনি ইসলামী খেলাফতের মসনদে বসবেন, তাকে জনগনের সমর্থন-পুষ্ট হয়ে বসতে হবে। এবং তাকে হতে হবে ঈমান আকীদা ও নৈতিকতায় অগ্রগামী। কিন্তু সেখানে পূর্ববর্তী শাসক কর্তৃক জনমতের বিরুদ্ধে নৈতিকতায় অনগ্রসর পুত্রকে জোর পূর্বক শাসক নিয়োগ দ্বারা খেলাফতের বদলে গোত্রীয় শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলা বাহুল্য রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় সম্পদ ব্যক্তি মালিকানা বলে গণ্য হয়, জনগণের কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি থাকেনা; সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অন্তর থেকে খোদা ভীতি লোপ পায়, প্রতিষ্ঠিত হয় স্বৈরশাসন। ইয়াযীদের শাসন ব্যবস্থা পরবর্তী পর্যায়ে খেলাফত আলামিনহাজিন্নবুওয়াত-এর পরিবর্তে মুসলিম জাহানের শাসন পদ্ধতিতে যেই কুপ্রভাব ফেলে যায় যার মধ্য দিয়ে শহীদে কারবালা ইমাম হুসায়ন (রাঃ) এর আশংকিত প্রত্যেকটি বিষয়ই বাস্তব বলে প্রমানিত হয়েছে। এ কারনেই, আমাদের কাছে হক ও বাতিলের সংঘাত মুহূর্তে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার সংগ্রামে প্রথম শাহাদত বরণ কারী হুসায়ন (রাঃ) চিরকাল এক মস্তবড়

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরনার উৎস, আর সেই শাহাদাতের স্মৃতি বিজড়িত ১০ই মহররম এই উম্মাহর জন্যে বিভিন্ন দুর্যোগ মুহূর্তে জাতীয় চেতনা সৃষ্টির এক বিরাট অনুপ্রেরক।

প্রতি বছর মহররমের সময় শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে কোটি কোটি মুসলমান হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাতে আন্তরিক দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তিনি শুধু তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করেই ক্ষন্ত হননি, ছোট ছোট কোলের শিশুদেরকেও কোরবান করেছিলেন, এ সব ব্যথা পীড়িতদের মধ্যে খুব কম লোকই সেদিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে। মজলুমের শাহাদাত প্রাপ্তির পর তার পরিবারবর্গ ও তাদের সাথে প্রেমও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিই দুঃখ প্রকাশ করবেন এ একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এ দুঃখ ও বেদনা দুনিয়ার প্রত্যেক খান্দান এবং তার সাথে সম্পর্ক যুক্ত ব্যক্তি মাত্রই প্রকাশ করে থাকে। এর নৈতিক মূল্য খুবই সীমিত। কেননা এ দৃষ্টি কোন থেকে বিচার করলে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে, এটি শাহাদাত লাভকারীর ব্যক্তিত্বের সাথে তার খান্দান এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি শীল ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির একটা স্বাভাবিক পরিনতি। কিন্তু প্রশ্ন হলো হুসায়ন (রাঃ) এর এমনকি বিশেষত্ব ছিল যার কারণে সাড়ে তেরশো বছর অতিবাহিত হবার পরও প্রতি বছর তাঁর জন্য মুসলমানদের হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। তাঁর শাহাদাতের পিছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিলনা বলে যদি ধরেই নেয়া হয়, তাহলে নিছক ব্যক্তিগত প্রীতি ও সম্পর্কের ভিত্তিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করার কোন অর্থ থাকতে পারেনা এবং খোদ হুসায়ন (রাঃ) এর দৃষ্টিতেও এই নিছক ব্যক্তিগত প্রীতির কতটুকুই বা মূল্য হতে পারে? তার উদ্দেশ্যের চাইতে ব্যক্তিত্বকে যদি বড় মনে করতেন তাহলে তিনি নিজেকে কুরবান করলেন কেন? তার কুরবানীই তো একথা প্রমান করে যে উদ্দেশ্যকে তিনি ব্যক্তিত্বের উপর স্থান দিয়েছিলেন? তাহলে তার উদ্দেশ্যের জন্য যখন আমরা কিছু করলাম না বরং তার বিপরীত কাজই করে যেতে লাগলাম, তখন নিছক তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য শোক প্রকাশ এবং তাঁর হত্যাকারীদেরকে গালি গালাজ করে কিয়ামতের দিন আমরা হুসায়ন (রাঃ) এর নিকট থেকে কোনো বাহবা লাভেরও আশা করতে পারিনা। উপরন্তু আমরা এও আশা করতে পারিনা যে, তার আল্লাহও আমাদের এ কাজের মূল্য দেবেন। তাহলে এখন সেই উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া উচিৎ। হুসায়ন (রাঃ) কি রাজ্য ও সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন এবং এ জন্যেই কি তিনি প্রাণোৎসর্গ করে গেছেন? তাঁর খান্দানের উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে যে ব্যক্তি কিছু মাত্র ওয়াকিফহাল আছেন তিনি কখনো এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারেন না যে, তাঁর মত লোক ব্যাক্তিগত কর্তৃত্ব হাছিলের জন্যে কখনো মুসলমানদের মধ্যে খুন খারাবী করতে পারেন। যারা মনে করে, তাঁর খান্দান মুসলমানদের উপর রাজত্ব ও কর্তৃত্বের দাবীদার ছিল, কিছুক্ষণের জন্য তাদের মতবাদ

নির্ভুল বলে মেনে নিলেও হযরত আবুবকর থেকে হযরত আমীর মুয়াবিয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস এ কথা প্রমান করবে যে কর্তৃত্ব লাভের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ এবং খুন খারাবী করা কখনো এ পরিবারের নীতি ছিলনা। কাজেই একথা মেনে নিতেই হবে যে তৎকালে হুসায়ন (রাঃ) এর দৃষ্টি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি, প্রাণশক্তি এবং ব্যবস্থার মধ্যে কোন বিরাট পরিবর্তনের পূর্বাভাস লক্ষ্য করছিল এবং এর গতিরোধের জন্যে সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া তাঁর নিকট অত্যাধিক প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। এমনকি এজন্যে প্রয়োজন বোধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াকেও তিনি শুধু বৈধ নয়, অবশ্য করনীয় বলে মনে করতেন।

মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুঃশাসনের স্টীম রোলার দ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে। তারা দেশে বিদেশে বহুমুখী চক্রান্ত ও দুঃশাসনের যন্ত্রনার শিকার। এ জাতিকে উক্ত ষড়যন্ত্র ও জুলুমের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে বাতিলের সাথে সহাবস্থান ও মিতালীর ভাব পরিহার করতে হবে। হুসায়নী ত্যাগ ও সংগ্রামী চেতনা দ্বারাই উড্ডীন রাখতে হবে সত্য ও ন্যায়ের ঝান্ডাকে। মহানবী (সঃ) বলেছেন "অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায় এবং সত্য কথা বলাই উত্তম জেহাদ।" শহীদে কারবালা হুসায়ন (রাঃ) তাঁর এই অমোঘ বাণীর মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়েই ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। ইয়াযীদি মানসিকতা প্রসূত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অনুরূপ জুলুম অত্যাচারে আজ মুসলিম জনগন জর্জ্জরিত। নিজেদেরকে এই অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সুবিধাবাদী নীতি নয়, হুসায়নী চেতনা দ্বারাই তা সম্ভব। সুতরাং সকল মুসলিম চিত্ত অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে দুর্জয় ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হোক এটাই কাম্য।

১.২ ইতিহাসের গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা ঃ

ইসলামের স্বর্ণযুগ খিলাফতে রাশিদার অকালপতনকালে গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে অনৈক্য, বিশৃংখলা ও গৃহযুদ্ধ দানা বেঁধে ওঠে তার মূলে সুদূর প্রসারী ইন্ধন যোগায় ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিক সম্মিলিত চক্র। সমূলে ইসলামের বিনাস সাধনের জন্য এই ত্রিচক্র ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আবির্ভাবের দিন থেকেই তাদের সংঘবদ্ধ তৎপরতা অব্যাহত থাকে সুপরিকল্পিতভাবে। সম্মিলিত সর্বশক্তি নিয়োগ করেও সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত করতে না পেরে পর্দার আড়ালে বসে তারা ইসলামরূপ বৃক্ষের গোড়া কেটে দেয়ার প্রয়াস পায়। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল মুনাফিকী, গাদ্দারী ও গোপন ষড়যন্ত্র। রাসুল্লাহ (সঃ) এর মদীনা জীবনে অভিশপ্ত ইহুদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে মুনাফিকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় তাদের অনুসৃত দুশমনীই পরবর্তীকালে খেলাফতের বিপর্যয় ত্বরান্বিত করে। অবশ্য ইহুদী বংশোদ্ভূত মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সলুল বার বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রেক্ষিতে। হযরত আবুবকার (রাঃ) ও

Dhaka University Institutional Repository

হজরত উমর (রাঃ) এর আমলেও এই মুনাফিক গোষ্ঠীর কোন চক্রান্তই ফলপ্রসু হয়ে উঠেনি ঐ একই কারণে। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) এর খিলাফতের শেষদিকে ওদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সীসাঢালা প্রাচীরের মত মজবুত ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজ বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম জাতির অভ্যন্তরীন সাম্য ও ঐক্যতে স্থায়ী ফাটলের সূত্রপাত ঘটে। বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টিতে আব্দুল্লাহ ইবন উবায় এর উত্তরসূরী ইহুদী বংশোদ্ভূত কুখ্যাত আব্দুল্লাহ ইবন সাবা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মুসলিম সমাজে ঘাপটি মেরে থাকা ঈর্ষাকাতর ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক চক্র এই সুযোগকে হাতিয়ে নেয় তাদের চিরাচরিত দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের জঘন্য কাজে। হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মধ্যকার উষ্ট্রের যুদ্ধ, হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর মধ্যকার সিফফীনের যুদ্ধ, খরিজী ও রাফিজীর সম্প্রদায়ের উদ্ভব, হজরত হুসায়ন ও ইয়াযীদের মধ্যকার কারবালার যুদ্ধ প্রভৃতি সকল দূর্ঘটনা ও গৃহযুদ্ধই ইবন সাবার পরিকল্পিত নীলনকশার ধারাবাহিক বহিঃপ্রকাশ। ইবন সাবাহ্ ইয়ামনের সানআ নগরের ইহুদী বংশোদ্ভূত ইহুদী জাতির একজন এজেন্ট ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমলে সে বাহ্যত ইসলাম গ্রহন করে। মুসলিম সমাজে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির জন্য সে মদীনাকে উপযুক্ত মনে না করে বসরায় পাড়ি জমায়। বসরায় সে আলী (রাঃ) এর পক্ষে বিপুল প্রচারনা চালায়। তার আলী ভক্তি এত দূর গড়ায় যে, হযরত আলীর ভিতরে সে খোদার অস্তিত্ব খুঁজে পায়। তার পর সে কুফায় কিছুদিন প্রচার কার্য চালিয়ে মিসরে উপনীত হয়। এসব প্রদেশের গভর্ণরদের বিরুদ্ধে সে সাধারণ জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। হযরত উসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে মিসর ও কুফাবাসী যে বিদ্রোহ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তার মূল ইন্ধন যুগিয়েছিল এই ইবন সাবা। হযরত উসমানের সরলতা, কোমলতা ও বার্ধ্যক্যের সুযোগে ইবনে সাবার পরিকল্পিত বিদ্রোহ সার্থক হয় হযরত ওসমানের হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে।

ইবন সাবার ষড়যন্ত্রের শিকার যেসব বিদ্রোহী ও সন্ত্রাসী হযরত ওসমানের হত্যাকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত ছিল, তারা সাবাই হযরত আলী (রাঃ) কে খলীফা নির্বাচনের পক্ষে সরাসরি অংশগ্রহণ করে এবং হযরত আলী (রাঃ) এর সমর্থক ও সৈন্যদের সঙ্গে একিভূত হয়ে যায়। এদেরই গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষে উসমান (রাঃ) এর হত্যাকান্ডের বিচার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে ইবন সাবাহ্র অন্য এক অনুচর গোষ্ঠী এমনটি প্রচার করে সফল হয় যে, নতুন খলিফা হযরত আলী (রাঃ) উসমান হত্যায় প্রত্যক্ষ জড়িত না থাকলেও হত্যাকারীদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। এই প্রচার এতো ব্যাপকতা লাভ করে যে, তা কেউ বিশ্বাস করতে না চাইলে তাকেও উসমান হত্যায় জড়িত বলে সন্দেহ করা হত। এরই অবশ্যম্ভাবী

পরিনতিতে হযরত আয়শাও হযরত আলী (রাঃ) এর মধ্যে উষ্ট্রীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আশ্য়া ও হযরত আলী (রাঃ) এর মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝির যখন নিরসনের চূড়ান্ত পর্যায় উপনীত এবং যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা আলোচনার মাধ্যমে যখন মিল হয়ে আসছিল ঠিক তখনই রাতের অন্ধকারে ইবন সাবার অনুচরবাহিনী এই উষ্ট্রীয় যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সক্ষম হয়। দশহাজার তাজা মুসলিম প্রাণের বিনিময়ে এই উষ্ট্রীর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলেও কিছু সময়ের ব্যবধানে তা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কে সিফফীনে টেনে নিয়ে যায়। এই সিফফীনের যুদ্ধের মূলেও ইন্ধন যুগিয়েছে এই ইবন সাবার অনুচর বাহিনী। হযরত আলী (রাঃ) এর চূড়ান্ত বিজয় মুহূর্তে ইবন সাবার লোকেরাই তাকে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সঙ্গে সন্ধির জন্য বাধ্য করে। হযরত আলী (রাঃ) এর ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ মুলতবি করতে বাধ্য হন। আবার এই যুদ্ধ মুলতবি করার অপরাধে ইবন সাবার অনুচরই হযরত আলী (রাঃ) কে শহীদ করে। উপরিউক্ত সবকটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত করার জন্য যেমন ইবন সাবাহ্‌র অনুচর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল তেমনি তারা সমঝোতার পূর্ব মূহূর্তে সংঘর্ষ জিইয়ে রাখার জন্য পরস্পর বিপরীত মেরুতে যুগপৎ তৎপর ছিল।

পর্দার অন্তরালের এ ধরনের গভীর ষড়যন্ত্রের শেষ পরিনতি হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও ইয়াযীদের মধ্যকার কারবালার নির্মম ঘটনা। এক কথায় ৩০ হিজরী থেকে ৬১ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর মুসলমানদের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় তার প্রতিটির সঙ্গেই প্রত্যক্ষ রা পরোক্ষভাবে ইবন সাবাহ্‌ও ইবন সাবার অনুচর বাহিনী জড়িত। এখানেই শেষ নয় ইবন সাবার অনুচর বাহিনীর তৎপরতা কারবালার লোমহর্ষক ঘটনার পরেও ব্যাহত থাকেনি। হযরত হুসায়নের শাহাদাতকে পুঁজি করে তারা আরেকটি ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। এ পর্যায়ে সরাসরি ময়দানে নামে ইসলামের আরেক দুশমন মুখতার ইবন উবায়দা আসসাকাফী। সে হযরত হুসায়নের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার শপথে কথা প্রচার করে একটি অনুগত বাহিনী গড়ে তোলে এবং কুফার শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়। এরপর সে সরূপে প্রকাশিত হয়। আলী (রাঃ) এর নামে একটি কুরসী সৃষ্টি করে উক্ত কুরসীতে চুমু খাওয়ার জন্য ও সেজদা দেয়ার জন্য লোকদের নির্দেশ দেয়। এক পর্যায় সে নিজেকে নবী বলে দাবী করে। ৬৭ হিজরীতে তার নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে তার ফেৎনার অবসান ঘটে। তবে একথা ঠিক ইহুদী, খৃষ্টান, মুসরিক ও মুনাফিকদের কোন ষড়যন্ত্রই সফল হয়নি মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছাড়া আবার মুসলমানরাও তেমন কোন আত্মঘাতী ও অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেয়নি পিছনে কাফির, ইহুদী, খৃষ্টান ও মুনাফিকদের গোপন হাত সক্রিয় না ছিল।

১.৩ যৌক্তিকতা

কোন গবেষণা কর্ম পাঠক সমাজে উপস্থাপন করতে গেলে তার কারণ পাঠক সমাজকে জানানো প্রয়োজন। আমার এ গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ১৯৯৪-৯৫ সনের এম.ফিল গবেষণার অভিসন্দর্ভ হিসেবে প্রণীত।

আমার গবেষণা কর্মটি ইসলামের ইতিহাস তথা সমগ্র বিশ্বের করুন যুগান্তকারী এবং ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী কারবালার বিষাদময় ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপন করার প্রয়াসে রচিত। এ অভিসন্দর্ভটির বিষয় শিরোনাম "কারবালার ঘটনাঃ ঐতিহাসিক পুনঃমূল্যায়ন।"

ইতিহাসের কালজয়ী ও যুগান্তকারী এ ঘটনার উপর এখন পর্যন্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা ও গবেষণা হয়নি অথচ তা হওয়া প্রয়াজন। বিভিন্ন খন্ড চিত্র এবং মূল উৎস ব্যাতিরেকে এ বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ ও মর্সিয়া সাহিত্য রচিত হয়েছে কিন্তু মূল কারণ ও ঘটনা মানুষের জানার বাইরেই থেকে গেছে। তাই এ বিষয়টিই আমাকে এ সম্পর্কে গবেষনায় উদ্যোগী করে তোলে। আমি এতে মূল উৎস গ্রন্থ তথা আরবী গ্রন্থকে প্রাধান্য দিয়েছি। এ ছাড়া ইংরেজী, বাংলা, উর্দু ইত্যাদি ভাষার গ্রন্থ সমূহেরও সহায়তা নিয়েছি। বিভিন্ন ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার ভিতর দিয়েও আমি কাজটি ভাল করে করার চেষ্টা করেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ মুনীরুজ্জামান

ডিসেম্বর- ২০০০

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি মূলতঃ একটি তথ্য উদঘাটনকারী এবং সত্যে উপনীত হবার প্রক্রিয়া। যদিও গবেষণার জন্য সরেজমিন গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু ঘটনা সুদুর অতীত কালের হওয়ার কারনে এ পদ্ধতি এক্ষেত্রে তেমন কার্যকর নয়, তাই নিজে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সরে জমিনে গবেষণা না করে বরং যারা সে এলাকা গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিদর্শন করেছেন তাদের লেখা থেকে কিছু উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। মূলত আমার এ কাজে ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতিটিই ব্যবহৃত হয়েছে।

ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতিঃ কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসাবে এ ব্যাপারে অনেক লেখা লেখি হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনা করে আরবী, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। কারবালার ঘটনাটি সরাসরি মুসলিম সমাজের হৃদয় বিদারক হওয়ার কারণে বিভিন্ন মুসলিম দেশের বিশেষ করে এদেশের পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখিত হয়েছে। যাতে এ বিষয়ে বিশ্ব মুসলিমের বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানের দৃষ্টি ভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। ঘটনাটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘটলেও, এর কারণ বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক পূনঃ মূল্যায়নের জন্য ইসলামী শাসনামলের পূর্বকাল থেকে এ ঘটনা পর্যন্ত, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবী এবং তাবেয়ীদের কর্মকান্ড আলোচনা করতে হয়েছে, ধর্মীয় দৃষ্টিতে যা খুবই স্পর্শকাতর। তাই এ ব্যাপারে বেশ সর্তকতা অবলোম্বন করতে হয়েছে। দলিল প্রমানের ভিত্তিতে বিশেষ করে এজন্য তাফসীর, হাদীস, ও হাদীছের তাফসীর গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গবেষণা পত্র পত্রিকা এবং প্রণীত গ্রন্থ সমূহ হতে ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অতঃপর তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কারবালার ঘটনার প্রকৃত কারণ ও ঐতিহাসিক পূনঃমূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্লেখ্যঃ এ গবেষণায় প্রাথমিক (Primary) ও গৌন (Secondary) উভয় ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস বলতে প্রায়-সমসাময়িক কালের আরবী ইতিহাস গ্রন্থ সমূহকে বুঝানো হচ্ছে।

গৌন উৎস বলতে পরবর্তী কালের বাংলা ইংরেজী উর্দু ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ সমূহ এবং বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহকে বুঝানো হচ্ছে।

সর্বোপরি সংগৃহীত উপাত্ত এবং তার সমর্থিত তথ্যাবলী দিয়ে ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তন্মধ্যে উৎস এবং গবেষণা পদ্ধতিগত কিছু সীমাবদ্ধতা উল্লেখ যোগ্য।

প্রথমতঃ এ অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের জন্য মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আকীদা, বিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘটনাটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মূল্যায়ন করেছেন। যাতে নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ ও মতামতের অভাব দারুন ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে নিরপেক্ষ ও প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করতে বেশী শ্রম দিতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা থেকেই যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ গবেষণা শিরোনাম "কারবালার ঘটনাঃ ঐতিহাসিক পূণঃমূল্যায়ন" ঘটনাটি সংঘটিত হয় ৬১ হিজরীর মহররম মাসের দশ তারিখে কিন্ত তা সত্ত্বেও প্রকৃত তথ্য ও ইতিহাস উদ্ধারের জন্য হাশেমী উমাইয়া বংশের পূর্ব ইতিহাস থেকে শুরু করে এ ঘটনা পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৬ অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রণীত অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস নিম্নরূপঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ 'উপক্রমনিকা'-যাতে ভূমিকা, ইতিহাসের গভীর ষড়যন্ত্রের ফসলরূপে কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা সম্পর্কিত আলোচনা, গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, এবং প্রণীত অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাসের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ "রাজনৈতিক কার্যকারণ বিশ্লেষণ'-এতে খিলাফতের উৎস ও তাৎপর্য, শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন, মুয়াবিয়া (রাঃ) এর অনুকুলে হাসান (রাঃ) এর খেলাফত ত্যাগ, শাসন ক্ষমতায় ইয়াযীদ, হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতি কুফাবাসীদের আমন্ত্রন, কুফার উদ্দেশ্যে হুসায়ন (রাঃ) ও ঘটনার পরম্পরা, হুসায়ন (রাঃ) এর ভাষণ, হুসায়ন (রাঃ) কর্তৃক সন্ধি স্থাপননের চেষ্টা, একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, হুসায়ন (রাঃ) এর স্বয়ং অস্ত্রধারণ ও শাহাদত বরণ এবং সাথীদের আত্ম-ত্যাগ, কারবালার ঘটনার পরবর্তী কার্যকলাপ, হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদতের ক্ষেত্রে ইয়াযীদের ভূমিকা, হুসায়ন (রাঃ) এর দেহ বিছিন্ন মাথামুবারকের সর্বশেষ অবস্থা, তাঁর দেহ ও তাঁর সাথে শাহাদত প্রাপ্তদের অবস্থা, ইয়াযীদ পক্ষীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচয় ও কার্য কলাপ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ 'অর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব' এতে বংশ পরিচয় ও দ্বন্দ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ 'ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গীগত বিশ্লেষণ' -এতে খিলাফতের উত্তরাধিকার নির্বাচন, অত্যাচারী শাসকের সাথে গৃহীত নীতি, ইয়াযীদ সম্বন্ধে দু'টি চরম পন্থীদল, ইসলামের দৃষ্টিতে বিপদে ধৈয্য ধারণ, হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাত সম্পর্কে নানা মত ও অনাচার, হুসায়ন (রাঃ) কর্তৃক বিদ্রোহ প্রসঙ্গ, ইয়াযীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট, ইয়াযীদের উপর অভিসম্পাৎ বর্ষণ, ইয়াযীদের সাহাবীরত প্রসঙ্গ, হুসায়ন (রাঃ) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, হুসায়ন (রাঃ) এর সাহাবীয়ত প্রসঙ্গ, কারবালার ঘটনা প্রসঙ্গে রাসুলের ভবিষ্যৎবানী, হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাতের সার্থকতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ 'কারবালার ঘটনার সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ ও পরবর্তী প্রভাব'- এতে সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ, ইসলামী বিপ্লবের চিরন্তন উৎস, কারবালার সংঘটকদের পরিনতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ মূলতঃ এতে প্রাপ্ত উপদেশ ও আমাদের করনীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পরিশিষ্ট ঃ এতে আকর গ্রন্থরাজীর পর্যালোচনা, বাংলা সাহিত্যে কারবালা ঘটনার ব্যবহার, আহলে বায়েতের সাজরা শরীফ ও তাদের সম্পর্কে সামান্য আলোচনা এবং কুফা-বসরার আঞ্চলিক ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ও আঞ্চলিক মানচিত্র স্থাপন করা হয়েছে।

সর্বশেষ গবেষণার উপান্ত সংগ্রহে ব্যবহৃত উৎস গ্রন্থরাজীর একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ের উদ্ধৃতি সূচী

১ কু ক ৩/১৯
২ প্রাগুক্ত, ৩/৮৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক কার্যকারণ বিশ্লেষণ

২.১ খিলাফতের উৎস ও তাৎপর্য

খিলাফত শব্দের আভিধানিক অর্থ স্থলাভিষিক্ত হওয়া অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তি লোকান্তরিত হলে অপর কারো তার দায়িত্বভার গ্রহণ করা। শব্দটি যে ভাবার্থ প্রকাশ করে তা হচ্ছে ছায়া, প্রতিচ্ছবি এবং প্রকৃত দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্য কেউ দায়িত্ব পালন করা। খলীফাকে ইমামও বলা হয়ে থাকে এবং খলীফা ও ইমাম একই পদের পৃথক রূপ প্রকাশ করে মাত্র। সাবেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য যাঁকে খলীফা বলা হয় তিনিই তাঁর শাসনামলে জনগনের ইমাম বা নেতা। পয়গম্বরের ওফাতের পর খলীফাগন পয়গম্বরেরই প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং নিজনিজ যুগে উম্মতের কর্তৃত্ব দান করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত (সাঃ) ইরশাদ করেছেন "তোমাদের আগে বনী ইসরাইলের নবী ও পয়গম্বরগণ রাজ্য পরিচালনা করতেন। এক পয়গম্বরের ইন্তেকালের পর অন্য পয়গম্বর তার শুন্য স্থান পূরন করতেন। কিন্তু এখন থেকে আর কোন পয়গম্বর আসবেন না। তাই আমার পরে খলীফাগণ তোমাদের নেতৃত্বদান করবেন।"

এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, পয়গম্বরের প্রতিনিধিত্ব ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়াই খিলাফত। ইসলামী সমাজে নবুওয়াতের পর খিলাফতেরই হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা। তাই যে সব বিষয়ে পয়গম্বরের নিকট ওহী মারফত সুস্পষ্ঠ বিধি নিষেধ নাজিল হয়েছে অথবা পয়গম্বর আল্লাহর দেয়া প্রজ্ঞা দ্বারা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে গেছেন; সে সব বিষয় ছাড়া অপর সকল বিষয়ে খলীফার আনুগত্য ফরজ। রাসুল (সঃ) বলেছেন "আমার পরে আমার নিকট থেকে হিদায়ত প্রাপ্ত খলীফাদের আনুগত্য করো।"

তাই খলীফা নির্বাচন কালে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির রাজনৈতিক জ্ঞান, শাসন পরিচালনার যোগ্যতার সাথে সাথে তাঁর আধ্যাতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। খুলাফায়ে

Dhaka University Institutional Repository

রাশেদীনের চার জন সর্বজন মান্য ব্যক্তিকে একের পর এক এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন করার ভিতর দিয়েই এ পদের যোগ্যতা যাচাইয়ের মানদন্ড সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ লাভ করেছে।

ইসলামে খিলাফতের দায়িত্ব এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ই এর আওতাধীন, সংক্ষেপে এরূপ বলা যায় যে, পয়গম্বরের আরব্ধ কাজ স্থায়ী ও সচল রাখা এবং ভ্রান্ত মতবাদের সংমিশ্রণ থেকে এর পবিত্রতা সংরক্ষণ করাই খিলাফতের দায়িত্ব। এক কথায় একে বলা হয় "ইক্বামাতে দ্বীন"। এ কথাটিও এত ব্যাপক যে, দ্বীন ও দুনিয়ার সকল উদ্দেশ্যই এর মধ্যে শামিল হয়ে যায়। আরকানে ইসলাম যথা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাতা আমর বিন মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার, জিহাদ, বিচার ব্যবস্থা, ফৌজদারী আইন ও দ্বীন প্রচার ইত্যকার সকল বিষয়ই এ দায়িত্বের আওতাধীন।

খুলাফায়ে রাশেদুনের সময়, এমনকি স্বয়ং রাসুলে (সঃ) যুগেও বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিয়োজিত ছিলেন। নামাজের ইমামতি ও সদকা -যাকাত আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট লোকদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। অসৎকাজের প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ করার জন্য পৃথক পৃথক লোক নিযুক্ত হয়েছিলেন। মামলা মোকদ্দমার বিচারের জন্য বিচারকদের নিয়োগ করা হয়েছিল। কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান শিক্ষা দানের জন্যও আলাদা বিভাগ ছিল। এ সব কাজের সমষ্টিই খিলাফত। তাই খলীফাকে কার্য পরিচালনার জন্য এক দিকে মানবীয় গুনাবলী ও যোগ্যতার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন, তেমনি আধ্যাতিক দিক থেকে ও তাঁকে পয়গম্বরের যথাযথ নায়েবের স্তরে উন্নীত হতে হয়।

পয়গম্বর (সঃ) যাদের মধ্যে এসব যোগ্যতা ও গুণ দেখতে পান তাদেরকেই ইশারা ইঙ্গিতের মারফতে খলীফা নিযুক্ত করে যান।

জামানার পরিবর্তন ও অবসানের অধোগতির দরুন ৪০ বছর পর ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য বদলে ফেলা হয় এবং খিলাফতের দায়িত্ব যে সব লোকদের হস্তগত হয় তারা মন মেজাজ, চরিত্র ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে এ পদের যোগ্য ছিল না। অর্থাৎ প্রকাশ্য চাল চলন, বাহ্যিক পবিত্রতা, দৃশ্যত ইসলামের বিধিনিষেধ অনুসরণ কারী এবং কিতাব ও সুন্নাহর জাহেরী ইলেম দেখেই তাদের খলীফা

Dhaka University Institutional Repository

মেনে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু একজন পয়গম্বর এ সব বাহ্যিক গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীন যোগ্যতা ও রুহানী শ্রেষ্টত্বের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে শুধু মাত্র ধর্মই নয় ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। একটি অনন্য জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম বিশ্বকে উপহার দিয়েছে একটি দর্শন, একটি সংস্কৃতি, একটি সভ্যতা, একটি সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা, একটি নৈতিক মানদন্ড, বৈচিত্রময় ইতিহাস সমৃদ্ধ জাতি এবং সর্বপরি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনা-উজ্জল অসংখ্য মহৎ ব্যক্তিত্ব। সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের এই অবদান কাল-জয়ী।

কুরআনের বিধান মতে মানবীয় শাসনের সত্যিকার রূপ হচ্ছে, রাষ্ট্র আল্লাহ্ এবং রাসূলের আইনগত কর্তৃত্ব স্বীকার করে তাঁর সপক্ষে সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ত্যাগ করবে এবং আসল শাসকের অধীনে খিলাফত এর ভূমিকা গ্রহন করবে। এক্ষেত্রে তার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আইনগত; প্রশাসনিক বা বিচার সম্বন্ধীয় যাই হোক না কেন উপরে আল্লাহর আইনের সার্বভৌমত্ব, রাসূলের মর্যাদা ও উর্ধতন আইন শিরোনামায় বর্ণিত চৌহদ্দীর মধ্যে অবশ্যি সীমিত থাকবে (হে নবী!) আমি তোমার প্রতি এ কিতাব সত্য সঠিকভাবে নাযিল করেছি। তা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করে এবং তার হেফাযত করে। সুতরাং আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী লোকদের মধ্যে তুমি ফায়সালা করো। আর মানুষের খাহেশের অনুবর্তন করতে গিয়ে তোমার নিকট আগত সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না ।[১]

কুরআনে এ খিলাফতের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে আল্লার দান ও অনুগ্রহে। আল্লাহ মানুষকে এমন মর্যাদা দান করেছেন, যারফলে মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি সামর্থ তাঁরই দেয়া স্বাধীন ক্ষমতা বলে তাঁর যমীন ব্যবহার করে। এজন্য দুনিয়ার বুকে মানুষের স্বাধীন মালিকানা নেই। বরং সে প্রকৃত মালিকের খলীফা বা প্রতিনিধি মাত্র ঃ

- এবং স্মরন করো, তোমার রব যখন ফিরিশতাদের বলেছিলেন, আমি যমীনে একজন খলীফা বানাবো।[২]

Dhaka University Institutional Repository

- (মানবমন্ডলী) আমি তোমাদেরকে যমীনের বুকে স্বাধীন কর্মক্ষমতা দিয়ে সংস্থাপন করেছি এবং তোমাদের জন্য তার অভ্যন্তরে জীবিকার উপায় উপকরন সরবরাহ করেছি।[৩]

- তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিজিত করে দিয়েছেন ?[৪]

যমীনের কোন অংশে যে জাতী ক্ষমতা লাভ করে মূলতঃ সে জাতী সেখানে আল্লাহর খলীফা।

-(হে আ'দ কওম)! যমীনে আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে নূহের কওমের পরে খলীফা করেছিলেন, তখনকার কথা স্মরন করো।[৫]

-(হে সামুদ কওম)! স্মরণ কর তখনকার কথা, যখন তিনি আদ কওমের পরে তোমাদেরকে খলীফা করেছিলেন।[৬]

- (হে বনী ঈসরাইল) ! সে সময় নিকটবর্তী যখন তোমাদের রব তোমাদের দুশমন (ফেরাউন) কে ধ্বংস করে তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন। এবং তিনি দেখবেন, তোমরা কেমন কার্য কর।[৭]

- অতঃপর তাদের পরে আমি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করেছি, তোমরা কেমন কাজ কর, তা দেখার জন্য।[৮]

কিন্তু এ খিলাফত কেবলমাত্র তখন সঠিক এবং বৈধ হতে পারে, যখন তা হবে সত্যিকার মালিকের (আল্লাহ্ তায়ালার) নির্দেশের অনুসারী। তা থেকে বিমুখ হয়ে যে স্বেচ্ছাচার মূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তা খিলাফত হবে না। বরং খিলাফতের পরিবর্তে তা হবে 'বাগওয়াত' তথা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঃ

-তিনি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করেছেন। অতঃপর যে কুফরী করবে তার কুফরী তার ওপর শাস্তি স্বরূপ আপতিত হবে। আর কাফেরদের কুফরী তাদের রব এর কাছে তাঁর গযব ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

অন্য কোন বিষয় বৃদ্ধি করতে পারেনা। কাফেরদের জন্য তাদের কুফরী কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করতে পারে।[৯]

- তুমি কি দেখনি, তোমার রব আদ - এর সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন ? .... এবং সামুদের সাথে; যারা উপত্যকায় পাথর কেটেছিলে। (গৃহ নির্মানের জন্য) এবং খুঁটি তাঁবুর অধিকারী ফেরাউনের সাথেও যারা দেশে অবাধ্যতা সৃষ্টি করেছিল ?[১০]

- (হে মুসা!) ফেরাউনের কাছে যাও! কারণ সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। .... ফেরাউন লোকদের বলেছিল, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব-পালনকর্তা, পারওয়ারদেগার।[১১]

- তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন, যেমন তিনি খলীফা করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তারা আমার বন্দেগী করবে, আমার সাথে অন্য কিছুর শরীক করবে না।[১২]

কোন ব্যক্তি গোষ্ঠী বা দল এ বৈধ এবং সত্য সঠিক ধরনের খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব) এর একক ধারক বাহক নয়। বরং যে দল উপরোক্ত মূলনীতিগুলো স্বীকার করে সমষ্টিগত ভাবে রাষ্ট্র সরকার প্রতিষ্ঠা করে, সে দলই হয় এ খিলাফতের ধারক বাহক। সুরা নূর ৫৫নং আয়াতের তিনি তাঁদেরকে যমীনে খলীফা করবেন - বাক্যাংশে এ ব্যাপারে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন। এ বাক্যাংশের আলোকে ঈমানদারদের জামায়াতের প্রতিটি ব্যক্তিই খিলাফতের সমান অংশীদার। সাধারণ মুমিনদের খিলাফতের অধিকার হরণ করে তা নিজের কুক্ষিগত করার অধিকার কোন ব্যক্তি গোষ্ঠীর নেই। কোন ব্যক্তি বা দল নিজের স্বপক্ষে আল্লাহ্র বিশেষ খিলাফতের দাবীও করতে পারেনা। এ বিষয়টিই ইসলামী খিলাফতকে মুলুকিয়্যাত (একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র) গোষ্ঠীতন্ত্র এবং ধর্মীয় যাজক সম্প্রদায়ের শাসন থেকে পৃথক করে তাকে গণতন্ত্রাভিমুখী করে। কিন্তু ইসলামী গনতন্ত্র এবং পাশ্চাত্য গনতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য গনতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্ব এর মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ইসলামী গনতন্ত্র (ইসলামের জমহুরী খিলাফত) জনগণ স্বয়ং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে নিজেদের ক্ষমতা ইখতিয়ারকে আল্লাহ্র বিধানের সীমার মধ্যেই সীমিত করে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ খিলাফতব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সে রাষ্ট্র সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, জনগণ শুধু ভাল কাজে তার আনুগত্য করতে বাধ্য থাকবে মাসিয়াত (আইনের বিরুদ্ধাচারন, পাপ অন্যায়) - এ কোন আনুগত্য নেই; নেই কোন সহযোগিতা ঃ

- নেকী এবং পরহেযগারী ভাল কাজ এবং তাকওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করো, পাপ এবং ঔদ্ধত্যে সহযোগিতা করো না। আল্লাকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।[১৩]

- তাদের মধ্য হতে কোন পাপাচারী এবং অকৃতজ্ঞের আনুগত্য করো না।[১৪]

যে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যাবলী প্রতিষ্ঠা-সংগঠন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান এবং উলিল আমর এর নির্বাচন, শাসনতান্ত্রিক এবং প্রশাসনিক কার্যাবলী পর্যন্ত সমস্ত কিছুই ঈমানদারদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হওয়া উচিত; এ পরামর্শ কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি হউক বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ঃ

- এবং মুসলমানদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়।[১৫]

এ রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য উলিল আমর এর নির্বাচনে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার তা এই ঃ

(ক) যেসব মূলনীতির ভিত্তিতে খিলাফতব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত হচ্ছে তাকে সে সব মূলনীতি মেনে চলতে হবে। কারণ যে ব্যক্তি নীতিগতভাবে একটি ব্যবস্থার বিরোধী, তার ওপর সে ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায় না ঃ

-হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসুলের আর তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে উলিল আমর।[১৬]

(খ) যে যালেম ফাসেক-ফাজের, আল্লাহবিমুখ এবং সীমালংঘনকারী হবে না। বরং ঈমানদার, আল্লাহ্‌ভীরু এবং নেককার হতে হবে তাকে। কোন যালেম বা ফাসেক ব্যক্তি যদি এমারত বা ইমামের পদ অধিকার করে বসে, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তার এমারত (নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব) বাতেলঃ

Dhaka University Institutional Repository

- এমন কোন লোকের আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমার স্মরন থেকে গাফেল করে দিয়েছি। যে তার নফসের কামনা বাসনা (খাহেসে-নফস) -এর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং যার কার্যধারা সীমাতিক্রম করেছে।[১৭]

-যে সব সীমালংঘনকারীর আনুগত্য করোনা, যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে-সংস্কার-সংশোধন করে না।[১৮]

(গ) সে অজ্ঞ-মূর্খ হবেনা ; বরং তাকে হতে হবে বিজ্ঞ-জ্ঞানী; প্রয়োজনীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ। খিলাফতের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য তাকে পর্যাপ্ত শারীরিক-মানসিক যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে ঃ

-যে ধন সম্পদকে আল্লাহ্ তোমদের জীবন জীবিকার অবলম্বন করেছেন, তা নির্বোধ ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিও না।[১৯]

(ঘ) তাকে এমন আমানতদার হতে হবে, যাতে আস্থার সাথে তার ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারে ঃ

-আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত সমূহ তার যোগ্য ব্যক্তির কাছে ফেরত দেয়ার জন্য।[২০]

দায়িত্বপূর্ণ পদ তাদেরকেই দান করা উচিত, যারা তার যোগ্য অধিকারী -এ অর্থও এতে শামিল রয়েছে।[২১]

কুরআন মজিদে বিভিন্ন দফায় রাষ্ট্রের যে চিত্র ফুটে উঠে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র। এই আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তিই হলো আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহ্। এবং কোরআন মজীদে যে রাজনৈতিক শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে তা বাস্তবে রূপায়িত করাই ছিল রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর কাজ। ইসলামের যে শাসননীতি বিবৃত হয়েছে, নবী (সঃ) সেই সব মূলনীতির ওপর খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। হযরত (সঃ) এর প্রত্যক্ষ শিক্ষা দীক্ষা ও কার্যকর নেতৃত্বের ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রত্যেক সদস্যই জানতো, ইসলামের বিধি বিধান ও প্রাণসত্তা অনুযায়ী কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া

Dhaka University Institutional Repository

উচিত। নিজের স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারে হযরত (সঃ) কোন ফায়সালা না দিয়ে গেলেও ইসলাম একটি শুরাভিত্তিক খিলাফতদাবী করে- মুসলিম সমাজের সদস্যরা এ কথা অবগত ছিলেন। তাই সেখানে কোন বংশানুক্রমিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বল প্রয়োগে কোন ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি, খিলাফতলাভ করার জন্য কেউ নিজের তরফ থেকে চেষ্টা তদবীর করেনি বা নামমাত্র প্রচেষ্টাও চালায়নি। বরং জনগণ তাদের স্বাধীন মর্জি মতো পর পর চারজন সাহাবীকে তাদের খলীফা নির্বাচিত করে। মুসলিম মিল্লাত এ খিলাফতকে খেলাফতে রাশেদা (সত্যাশ্রয়ী খিলাফত) বলে গ্রহণ করেছে। এ থেকে আপনা আপনিই প্রকাশ পায় যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটিই ছিল খিলাফতের সত্যিকার পদ্ধতি, যা শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাতের উৎস থেকে উৎসারিত।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন

খিলাফতে রাশেদা কেবল একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাই ছিল না, বরং তা ছিল নবুয়াতের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল একটি ব্যবস্থা অথ্যাৎ দেশের শাসন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, শান্তি স্থাপন করা ও সীমান্ত রক্ষা করাই কেবল তাঁর দায়িত্ব ছিল না; বরং তা মুসলমানদের সামাজিক জীবনে শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং পথ প্রদর্শকের এমন সব দায়িত্ব পালন করেছে, যা নবী (সঃ) তাঁর জীবনে পালন করেছেন। দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্রে সত্য সনাতন দ্বীনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাকে তার সত্যিকার আকার আঙ্গিক এবং প্রাণ ধারায় সঞ্জীবিত করে পরিচালনা করা এবং বিশ্বে মুসলমানদের গোটা সামাজিক শক্তি নিচয়কে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার কাজে নিয়োজিত করাই ছিল তার দায়িত্ব। এ কারণে তাকে কেবল খেলাফতে রাশেদা না বলে বরং এ সঙ্গে খেলাফতে মুরশেদা সত্য-পথ প্রদর্শক খিলাফত বলাই যুক্তিযুক্ত হবে। খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত-নবুয়াতের পদাংক অনুসারী খিলাফত কথাটিতে এ উভয় বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এ ধরনের রাষ্ট্রই ইসলামের অভিপ্রেত, নিছক রাজনৈতিক শাসন কর্তৃত নয় দ্বীনের সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই এ সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেনা। সুনানের গ্রন্থসমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহর (সঃ) মহা প্রয়ানের পর মাত্র ৩০ বৎসর কাল নবুওতের আদর্শ অনুসারে চলতে থাকবে, তারপর খিলাফত রাজতন্ত্রে পরিনত হবে।[২২] বিভিন্ন পর্যায় খিলাফত অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত এ খিলাফত রাজতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও বটে। সাম্রাজ্যবাদের কাঠামো তাতে ছিলনা। মহানবী ছিলেন একাধারে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সব বিষয়ে সবার ব্যবস্থাপক, শাসক, ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রগুরু। যেখানে চলত প্রাত্যাহিক উপাসনা এবং ওয়াজ, সেখানেই বসত শাস্ত্র সমাজ ও যুদ্ধ বিগ্রহ বিষয়ক দরবার। হযরতের কাছে যারা কৌতুহলী হয়ে ধর্ম কথা শুনত তারাই প্রয়োজনে রণক্ষেত্রে দুর্বার সৈন্য বাহিনী পরিচালনা করতো। আর তাদের নব জাগ্রত ঈমানই ছিল ন্যায়নীতির পক্ষে প্রধান পুলিশ প্রহরী। এই অবস্থায় মাত্র ৬৩ বছর বয়সে হযরত যখন তাঁর স্বহস্তে লালিত শিশু রাষ্ট্র এবং এই ইহ-জগৎ থেকে চিরবিদায় নিলেন। তখন স্বভাবতই এর অভিভাবকত্ব নিয়ে সবার মধ্যে প্রবল উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। খিলাফত একটা নির্বাচন ভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। সেকারণে নবীজী তার কোন প্রতিনিধি নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

করে যান নাই। নবী করীম (সঃ) এর স্থলাভিসিক্তের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) এর নাম প্রস্তাব করেন। মদীনার সবাই (বস্তুত তখন তারা কার্যত সারা দেশের প্রতিনিধির মর্যাদায় অবিষিক্ত ছিল) কোন প্রকার চাপ প্রভাব এবং প্রলোভন ব্যতীত নিজেরা সুন্তুষ্ট চিত্তে তাঁকে পছন্দ করে তাঁর হাতে বায়আ'ত (আনুগত্যের শপথ) করে। মদীনায় যখন আবুবকরের বায়আ'ত অনুষ্ঠিত হয়, তখন গোত্রবাদের ভিত্তিতে আবু সুফিয়ান হযরত আলীর কাছে গিয়ে বলেন 'কুরাইশের সবচেয়ে ছোট গোত্রের লোক কি করে খলীফা হয়ে গেল? তুমি নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাতে প্রস্তুত হলে আমি পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে সমগ্র উপত্যকা ভরে ফেলবো। কিন্তু ইসলামে বংশ, গোত্র এবং পক্ষপাতের কোন স্থান নাই। ফলে হযরত আলী (রাঃ) এক মোক্ষম জবাব দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিলেন। তিনি বলেনঃ তোমার এ কথা ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা প্রমান করে। তুমি কোন পদাতিক বাহিনী বা অশ্বরোহী বাহিনী আনো, আমি তা কখনো চাই না। মুসলমানরা পরস্পরের কল্যানকামী। তারা একে অপরকে ভালবাসে। তাদের আবাস ও দৈহিক সত্তার মধ্যে যতোই ব্যবধান থাক না কেন। অবশ্য মুনাফিক একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী। আমরা আবুবকরকে এ পদের যোগ্য মনে করি। তিনি এ পদের যোগ্য না হলে আমরা কখনো তাঁকে এ পদে নিয়োজিত হতে দিতাম না।[২৩]

বৃদ্ধ আবুবকর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দুই বৎসর চার মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর ওফাত কালে হযরত ওমর (রাঃ) এর সম্পর্কে ওসিয়াত লিখান অতঃপর জনগনকে মসজিদে নববীতে সমবেত করে বলেনঃ "আমি যাকে স্থলাভিসিক্ত করছি তোমরা কি তার উপর সন্তুষ্ট ? আল্লার শপথ ! সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বুদ্ধি বিবেক প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্রও ক্রটি করিনি। আমার কোন আত্মীয় স্বজনকে নয়, বরং ওমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার স্থলাভিসিক্ত করেছি। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং আনুগত্য করবে।" সবাই সমস্বরে বলে ওঠেঃ আমরা তাঁর নির্দেশ শুনবো এবং মানবো।[২৪]

ওমর খিলাফতকে কঠোর দায়িত্ব রূপেই গ্রহন করেছিলেন। ওমর (রাঃ) এক সময় হযরত সালমান ফারসীকে জীজ্ঞাসা করেন ঃ "আমি বাদশাহ্ না খলীফা ?" তিনি তৎক্ষনাৎ জবাব দেনঃ "মুসলমানদের ভূমি থেকে আপনি যদি এক দেরহামও অন্যায়ভাবে উসুল এবং অন্যায় ভাবে ব্যয় করেন তাহলে আপনি খলীফা নন, বাদশাহ।" অপর এক প্রসঙ্গে একদা হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় মজলিসে বলেন ঃ "আল্লাহর কসম, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছিনা যে, আমি বাদশা, না খলীফা আমি যদি বাদশাহ্ হয়ে গিয়ে থাকি! তবে তা তো এক সাংঘাতিক কথা।" এতে জনৈক ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

বললোঃ "আমীরুল মুমিনীন! এতদোভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।" হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি পার্থক্য ? তিনি বললেনঃ "খলীফা অন্যায় ভাবে কিছুই গ্রহণ করেন না, অন্যায় ভাবে কিছুই ব্যয়ও করেন না। আল্লাহর মেহের বাণীতে আপনিও অনুরূপ। আর বাদশাহ্ তো মানুষের ওপর যুলুম করে, অন্যায়ভাবে একজনের কাছ থেকে উসুল করে, আর অন্যায় ভাবে অপরজনকে দান করে।"[২৫] দশ বছর পাঁচ মাস খিলাফতের কঠোর দায়িত্ব পালন করে ওমর (রাঃ) নামাজরত অবস্থায় এক গুপ্তঘাতকের তরবারির আঘাতে আহত হয়ে তিনদিন পর মৃত্যু বরন করেন। হযরত ওমর (রাঃ) এর জীবনের শেষ বছর হজ্জের সময় এক ব্যক্তি বললোঃ ওমর (রাঃ) মারা গেলে আমি ওমুক ব্যক্তির হাতে বায়আ'ত করবো। কারন, আবুবকর (রাঃ) এর বায়আ'তও তো হঠাৎই হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হয়েছেন।* হযরত ওমর (রাঃ) এ সম্পর্কে জানতে পেরে বললেনঃ এ ব্যাপারে আমি এক ভাষন দেবো। জনগনের ওপর যারা জোরপূর্বক নিজেদেরকে চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষন করছে, তাদের সম্পর্কে আমি জনগণকে সতর্ক করে দেবো। মদীনায় পৌঁছে তাঁর প্রথম ভাষনেই তিনি এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সাকীফায়ে বনী সায়েদার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে বলেন যে, তখন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে হঠাৎ হযরত আবুবকর (রাঃ) এর নাম প্রস্তাব করে আমি তাঁর হাতে বায়আ'ত করেছিলাম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ তখন যদি এরকম না করতাম এবং খিলাফতের মীমাংসা না করেই আমরা মজলিস ছেড়ে উঠে আসতাম, তবে রাতারাতি লোকদের কোন ভুল সিদ্ধান্ত করে বসার আশংকা ছিল। আর সে ফায়সালা মেনে নেয়া এবং পরিবর্তন করা উভয়ই আমাদের জন্য কঠিন হতো। এ পদক্ষেপটি সাফল্য মন্ডিত হলেও ভবিষ্যতের জন্য একে নযীর হিসেবে গ্রহন করা যেতে পারে না আবুবকরের মতো উন্নত মানের এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তোমাদের মধ্যে আর কে আছে? এখন কোন ব্যক্তি যদি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কারো হাতে বায়আ'ত করে তহলে সে এবং যার হাতে বায়আ'ত করা হবে - উভয়েই নিজেকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করবে।**

---

* তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, সকীফায়ে বনী সায়েদার মজলিসে হযরত ওমর (রাঃ) হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) এর নাম প্রস্তাব করেছেন এবং হাত বাড়িয়ে তখনই তাঁর হাতে বায়াআত করেছেন। তাঁকে খলীফা করার ব্যাপারে পূর্বাহ্নে কোন পরামর্শ করেননি।

** বুখারী, কিতাবুল মোহারেবীন, অধ্যায়-১৬। মুসনাদে আহমাদ, ১ম খন্ড, হাদীস নম্বর-৩৯১। তৃতীয় সংস্করন, দারুল মা আরেফ, মিসর ১৯৪৯। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় হযরত ওমর (রাঃ) এর শব্দগুলো ছিল এইঃ মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি কোন আমীরের হাতে বায়আত করে, তার কোন বায়আত নেই; এবং যার হাতে বায়আত করে, তারও কোন বায়আত নেই]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর নিজের ব্যাখ্যা করা এ পদ্ধতি অনুযায়ী হযরত ওমর (রাঃ) খিলাফতের ফায়সালা করার জন্য তাঁর ওফাত কালে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করে বলেনঃ মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি জোর করে আমীর হওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করো। খিলাফত যাতে বংশানুক্রমিক পদাধিকারে পরিনত না হয়, সে জন্য তিনি খিলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নিজের ছেলের নাম সুস্পষ্টভাবে বাদ দিয়ে দেন।[২৬] ছ'ব্যক্তিকে নিযে এ নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়। হযরত ওমর (রাঃ) এর মতে এর ছিলেন কওমের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয়।

কমিটির সদস্য আবদুর রহমান (রাঃ) ইবনে আওফকে কমিটি শেষ পর্যন্ত খলীফার নাম প্রস্তাব করার ইখতিয়ার দান করে। সাধারণ লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে তিনি জানতে [অপর এক বর্ণনায় হযরত ওমর (রাঃ) এর বাক্যেও দেখা যায় - "পরামর্শ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে এমারত দেয়া হলে তা কবুল করা তার জন্য হালাল নন।"][২৭] চেষ্টা করেন, কে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। হজ্জ শেষ করে যেসব কাফেলা বিভিন্ন এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল, তিনি তাদের সাথেও আলোচনা করেন। এ জনমত যাচাইয়ের ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ লোকই হযরত উসমান (রাঃ) এর পক্ষে।[২৮] তাই তাঁকেই খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ জনসমাবেশে তাঁর বায়আ'ত হয়।

হযরত ওমর ছয় সদস্যের নির্বাচনী শুরার জন্য যে হেদায়াত দিয়ে যান, তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়টিও ছিলঃ নির্বাচিত খলীফারা এ কথাটি মেনে চলবেন যে, তাঁরা আপন গোত্রের সাথে কোন ব্যতিক্রমধর্মী আচরন করবেন না।[২৯] কিন্তু দূর্ভাগ্য বশত হযরত উসমান (রাঃ) খলীফা হিসাবে একটা আদর্শ চরিত্র ছিলেন অথচ এ ক্ষেত্রে ঈপ্সিত মানদন্ড বজায় রাখতে সক্ষম হননি। তাঁর শাসনামলে বনী উমাইয়াকে ব্যাপকভাবে বিরাট বিরাট পদ এবং বায়তুল মাল থেকে দান দক্ষিনা দেয়া হয়। অন্যান্য গোত্র তিক্ততার সাথে তা অনুধাবন করতে থাকে।[৩০] তাঁর কাছে এটা ছিল আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদাচারের দাবী। তিনি বলতেনঃ ওমর (রাঃ) আল্লার জন্য নিকট আত্মীয়দের বঞ্চিত করতেন। আর আমি আল্লার জন্য নিকট আত্মীয়দের দান করছি।[৩১] একবার তিনি বলেনঃ বায়তুলমালের ব্যাপারে আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) নিজেও অসচ্ছল অবস্থায় থাকা পছন্দ করতেন এবং নিজের আত্মীয় স্বজনকে সেভাবে রাখতে ভালবাসতেন। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদাচার পছন্দ করি।[৩২] অবশেষে এর ফল তাই হয়েছে হযরত ওমর যা আশংকা

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা মদীনায় প্রবেশ করে হযরত উসমান (রাঃ) এর গৃহ অবরোধ করে। শেষ পর্যন্ত তারা মারাত্মক হাঙ্গামা সৃষ্টি করে একান্ত নির্মম ভাবে হযরত উসমান (রাঃ)কে শহীদ করে ফেলে।

হযরত উসমান (রাঃ) এর শাহদাতের পর মদীনায় নৈরাজ্য বিস্তার লাভ করে। কারণ উম্মতের তখন কোন নেতা নেই, রাষ্ট্রের নেই কোন কর্নধার বহিরাগত সন্ত্রাসীদের ভয়ে মদীনার মোহাজের আনসার এবং বড় বড় তাবেয়ীরা সবাই অস্থির। এই মারাত্মক পরিস্থিতিতে উম্মতকে সংগঠিত করার জন্য, রাষ্ট্রকে বিশৃংখলার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তৎক্ষনাৎ কোন যোগ্যতর ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করা অপরিহার্য ছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর ওফাতকালে যে ৬ জন সাহাবীকে উম্মাতের সবচেয়ে অগ্রগন্য ব্যক্তি বলে অভিহিত করে গিয়েছিলেন, তখন তাদের মধ্যে ৪জন হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যোবায়ের (রাঃ), হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) জীবিত ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) সব দিক থেকে প্রথম সারিতে ছিলেন। শুরা উপলক্ষে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) উম্মাতের জনমত যাচাই করে এ ফায়সালা দেন যে, হযরত উসমান (রাঃ) এর পরে যিনি উম্মাতের সবচেয়ে বেশী আস্থাভাজন ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন হযরত আলী (রাঃ)।[৩৩] কেবল মদীনায়ই নয়, বরং গোটা মুসলিম জাহানে তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিই ছিলেন না, যিনি এ উদ্দেশ্যে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারতেন। এমনকি বর্তমান কালের প্রচলিত পন্থায় নির্বচন অনুষ্ঠিত হলেও তিনি অবশ্যই বিপুল ভোটে জয়লাভ করতেন।* তাইতো সব নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) এর সাহাবী এবং মদীনার অন্যান্য লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে বলেনঃ কোন আমীর ছাড়া এ ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারেনা। জনগণের জন্য একজন ইমাম অপরিহার্য। আজ এ পদের জন্য আপনার চেয়ে অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি আমরা দেখছি না। তিনি অস্বীকৃতি জানান। লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকে। অবশেষে তিনি বলেন, গৃহে বসে গোপনে আমার বায়আ'ত হতে পারে না। সাধারণ মুসলমানদের সন্তষ্টি ব্যতীত এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। অতঃপর মসজিদে নববীতে সাধারণ অধিবেশন বসে এবং সব মোহাজের আনসার তাঁর হাতে

---

* ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল বলেন, তখন হযরত আলী (রাঃ) এর চেয়ে খিলাফতের যোগ্যতর অন্য কোন ব্যক্তি ছিল না - ঐ, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

বায়আ'ত করে। সাহাবীদের মধ্যে ১৭ জন বা ২০ জন এমনও ছিলেন, যাঁরা তাঁর হতে বায়আ'ত করেননি।*

হযরত সাআদ ইবনে ওবাদার বায়আ'ত না করায় যদি হযরত আবুবকর এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর খিলাফতসন্ধিগ্ধ না হয়, তাহলে ১৭ জন বা ২০ জন সাহাবীর বায়আ'ত না করায় হযরত আলী (রাঃ) এর খিলাফত কি করে সন্ধিগ্ধ সাব্যস্ত হতে পারে। তিনি জোর করে ক্ষমতা দখল করেননি। খিলাফত লাভের জন্য তিনি সামান্যতম চেষ্টা তদবীরও করেননি। জনগন নিজেরা স্বাধীন পরামর্শক্রমে তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করে। সাহাবীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁর হাতে বায়আ'ত করেন। পরে কেবল মাত্র শাম প্রদেশ ব্যতিত গোটা মুসলিম জাহান তাঁকে খলীফা বলে স্বীকার করে।

যে সব নীতির ভিত্তিতে খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হযরত আলী (রাঃ) এর খিলাফত যে সব মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের কালে ফিলাফতে রাশেদার ব্যবস্থায় যে মারাত্মক ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল হযরত আলী (রাঃ) তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনটি বিষয় এমন ছিল, যা সে ফাটল পুরণের সুযোগ দেয়নি। বরং তা ফাটলকে আরও বৃদ্ধি করে উম্মাতকে রাজতন্ত্রে বা মুলুকিয়্যাতের মুখে ঠেলে দেয়ার ব্যাপারে এক ধাপ অগ্রসর হয়।

একঃ হযরত উসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, যারা কার্যত হত্যাকান্ডে অংশ নিয়েছিল, হত্যায় প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং তাতে সহায়তা করেছিল, এমনি করে সামগ্রিকভাবে এ মহাবিপর্যয়ের দায়িত্ব যাদের ওপর পড়ে তারা সবাই হযরত আলী (রাঃ) কে খলীফা করার ব্যাপারে অংশ নেয়। খিলাফতকার্যে তাদের অংশগ্রহন এক বিরাট বিপর্যয়ের কারণ হয়ে পড়ে।

দুইঃ হযরত আলী (রাঃ) এর বায়আ'ত থেকে কোন কোন বড় বড় সাহাবীর বিরত থাকা। তাঁদের বিরত থাকার ফলে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থা নব পর্যায়ে বহাল

* আততাবারী, ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪৫০, ৪৫২, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা-২২৫-২২৬। ইবনে আবদুল বার এর বর্ণনা মতে সিফফিন যুদ্ধে এমন ৮ শত সাহাবী হযরত আলীর সঙ্গে ছিলেন, যারা বায়আতুর রেযওয়ানের সময় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে ছিলেন। আল ইস্তীআব, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-৪২৩।

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য যে একাগ্রতার সাথে হযরত আলী (রাঃ) এর সহযোগিতা করা উম্মতের উচিত ছিল - যা ছাড়া তিনি এ কাজ আঞ্জাম দিতে পারতেন না দূর্ভাগ্যবশত তা অর্জিত হতে পারেনি।

তিনঃ হযরত উসমান (রাঃ) এর রক্তের দাবী। দু পক্ষ থেকে দুটি দল এ দাবী নিয়ে এগিয়ে আসে। একদিকে হযরত আয়েশা এবং হযরত তালহা ও যোবায়ের এবং অপর পক্ষে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ)।

খিলাফতে রাশেদার মধ্যে এ ৩টি ফাটল সৃষ্টি হবার পর হযরত আলী (রাঃ) এর দায়িত্বভার গ্রহন করে কাজ শুরু করেন। তিনি সবেমাত্র কাজ শুরু করেছেন, দু হাজার সন্ত্রাসবাদী তনখও মদীনায় উপস্থিত, এমন সময় তালহা (রাঃ) এবং যুবায়ের (রাঃ) অন্যান্য কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলেন শরীয়াতের দন্ডবিধি কায়েম করার শর্তে আমরা আপনার হাতে বায়আ'ত করেছি। যারা হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যায় শরীক ছিল, এবার আপনি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুণ। হযরত আলী (রাঃ) জবাবে বলেনঃ ভাইয়েরা আপনারা যতটুকু জানেন, আমিও তা অনবগত নই। কিন্তু আমি তাদেরকে কি করে পাকড়াও করবো, যারা এখন আমাদের ওপর প্রতিপত্তি বিস্তার করে আছে, যাদের ওপর এখন আমাদের কোন প্রভাব ও প্রতিপত্তি নেই। আপনারা এখন যা করতে চান, তার কি কোথাও কোন অবকাশ আছে ?

তারা সবাই জবাব দেন, না! হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ আল্লার কসম! আপনারা যা চিন্তা করেন আমিও তাই চিন্তা করি। পরিস্থিতি একটু শান্ত হতে দিন, গনমনে স্বস্তি ফিরে আসুক। চিন্তার বিভ্রান্তি দূরিভূত হোক, অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হোক।[৩৪]

এরপর তাঁরা মক্কা গিয়ে আয়েশা (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, হযরত উসমান (রাঃ) এর খুনের প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য কুফা ও বসরা থেকে সৈন্য বাহিনীর সাহায্য গ্রহন করা হবে। এভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) এর সৈন্য বাহিনী বসরার অদূরে পরস্পর মুখোমুখী হলে দ্বীনের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণকামী ব্যক্তিদের এক বিরাট গ্রুপ ঈমানদারদের দুটি দলকে সংঘর্ষ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। এদিকে হযরত আলী (রাঃ) এর সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যাকারীরা তারা মনে করতো এদের মধ্যে সমঝোতা হলে আমাদের রেহাই নেই। অন্য পক্ষে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও ছিল, যারা

Dhaka University Institutional Repository

উভয়কে সংঘর্ষে লিপ্ত করে দূর্বল করে ফেলার আকাংখা পোষণ করছিল। তাই তারা নিয়ম বহির্ভূত পদ্ধতিতে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। অবশেষে উভয় পক্ষের কল্যান কামীদের যুদ্ধ ঠেকাবার শত প্রচেষ্টা সত্তেও উল্টে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৩৫]

এরপর সিফফীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে উভয় পক্ষের ১০ হাজার লোক শহীদ হয়। হযরত উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের পরে এটা ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম দূর্ঘটনা। এ ঘটনা উম্মতকে স্বৈরাচারের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেয়। হযরত আলী খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহন করার পর সর্ব প্রথম যে সমস্ত কাজ করেন তার মধ্যে একটা ছিল ৩৬ হিজরীর মহররম মাসে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কে শাম থেকে বরখাস্ত করা। কিন্তু হযরত মুআবিয়া কেবল আনুগত্য স্বীকার করতে চান না, তাই নয়, বরং আপন প্রদেশের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত করতে চান। এসব কিছুই ছিল হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর একাধারে ১৬/১৭ বছর ধরে এমন একটি প্রদেশের গভর্ণরের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার ফল।

হযরত আলী হিজরী ৩৬ সালের জমাদিউস সানী মাসেস জামাল যুদ্ধ শেষ করে শাম এর দিকে মনোনিবেশ করেন এবং হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আলবাজালীকে একটা পত্র দিয়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে পাঠান। এর মাধ্যমে তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয় যে উম্মত যে খিলাফতের ব্যাপারে একমত হয়েছে তাঁর উচিত তার আনুগত্য করা, দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভেদ সৃষ্টি না করা। হযরত মুআবিয়া হযরত আমর ইবনুল আস এর পরামর্শ ক্রমে ফায়সালা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) কে হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যার জন্য দায়ী করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

এরপর হযরত আলী (রাঃ) ইরাক থেকে এবং হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) শাম থেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হন।

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দিকে যথারীতিযুদ্ধ শুরু করার আগে হযরত আলী (রাঃ) হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি জবাব দেনঃ আমার নিকট থেকে চলে যাও, আমার এবং তোমাদের মধ্যে তরবারী ব্যাতীত কিছুই নেই।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে হযরত আলী (রাঃ) বিভিন্ন পর্যায়ে হযরত হযরত মুআবিয়ার কাছে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেও সমস্যার সমাধানে ব্যার্থ হন। ফলে মহরম মাস শেষ হওয়ার পর হিজরী ৩৭ সালের সফর মাস থেকে চুড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে হযরত আম্মার (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন। তাঁর শাহাদত বরণের দ্বিতীয় দিনে ১০ই সফর তুমুল যুদ্ধ হয় হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সেনাবাহিনী পরাজয়ের দ্বারপ্রান্ত উপনীত হয়। এ সময় হযরত ইবনুল আ'সের পরামর্শ অনুযায়ী হযরত মুআবিয়া বর্শার অগ্রভাগে কুরআন তুলে ধরার আদেশ দেন। শেষ পর্যন্ত এ পরিস্তিতিতে হযরত আলী (রাঃ) যুদ্ধ বন্ধ করে হযরত হযরত মুআবিয়ার সাথে হযরত আলী (রাঃ) তাহকীম চুক্তি করতে বাধ্য হন। এতে হযরত হযরত মুআবিয়ার পক্ষে আমর ইবনুল আ'স এবং হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষে হযরত আবু মুসা আশআরী হেকাম নিযুক্ত হন।

এখন খিলাফাতকে রাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখার সর্বশেষ সুযোগটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তা ছিল এই যে চুক্তি অনুযায়ী সালিশ দ্বয়কে ফায়সালা করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল তারা যথাযথ ফায়সালা করবেন। চুক্তির যে বিবরণী ঐতিহাসিকরা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে ফায়সালার ভিত্তি ছিল এইঃ-

উভয় সালিশ আল্লাহর কিতাব অনুসারে কাজ করবেন আর আল্লাহর কিতাবে যে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবেনা সে ব্যাপারে সত্যাশ্রয়ী এবং ঐক্য সংহতকারী সুন্নাহ্ অনুযায়ী কাজ করবে।[৩৭]

কিন্তু এটা ছিল হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর দলের নিছক একটি সামারিক কৌশল। কুরআনকে ফায়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করা আদৌ এর লক্ষ্য ছিল না।

এই সালিশে আমর ইবনুল আ'স আলী (রাঃ) কে খিলাফত থেকে বরখাস্ত করে। হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কে খলীফা বলে ঘোষনা দেন। যা ছিল স্থিরকৃত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ন পরিপন্থী।

হযরত আলী তাঁদের ফয়সালা প্রত্যাখান করেন এবং পূনরায় শাম আক্রমনের প্রস্তুতি শুরু করেন।

কিন্তু ইরাকের লোকেরা মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল এবং অন্যদিকে খারেজীদের বিপর্যয় হযরত আলী (রাঃ) এর জন্য এক নতুন মাথা ব্যাথার সৃষ্টি করে। এছাড়া হযরত হযরত মুআবিয়া

Dhaka University Institutional Repository

(রাঃ) এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) এমন কৌশল অবলম্বন করেন, যার ফলে মিশর এবং উত্তর আফ্রিকার আধিকাংশ অঞ্চলও তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলিম জাহান কার্যত দুটি সংঘর্ষশীল সরকারে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ) এর শাহাদাত (৪০ হিজরী) রমযান মাসের এবং হযরত হাসান (রাঃ) এর সমঝোতা (৪১ হিজরী) ময়দানকে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেয়।

ক্ষমতার চাবিকাঠি হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর হস্তগত হওয়াই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের খিলাফতথেকে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের দিকে প্রত্যাবর্তনের অন্তবর্তী কালীন পর্যায়। দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এ পর্যায়েই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এখন তারা রাজতন্ত্রের স্বৈরাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্মুখীন। তাই দেখি হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর বায়আতের পর হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজা! আপনার প্রতি সালাম বলে সম্বোধন করেন। হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেনঃ আপনি আমীরুল মুমিনীন বললে কি অসুবিধা ছিল ? জবাবে তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র কসম, যে পন্থায় আপনি ক্ষমতা লাভ করেছেন, আমি সে পন্থায় কিছুতেই তা গ্রহন করতাম না।* হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) নিজেও এ কথা জানতেন। একবার তিনি নিজেই বলেছিলেনঃ আমি মুসলামানদের মধ্যে প্রথম রাজা।[৩৮] বরং হাফেজ ইবনে কাসীরে এর উক্তি অনুযায়ী তাঁকে খলীফা না বলে বাদশাহ বলাই সুন্নত। কারণ, মহানবী (সঃ) ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেনঃ আমার পর খিলাফত৩০ বৎসর থাকবে; অতঃপর বাদশাহীর আগমন হবে। হিজরী ৪১ সালের রবিউল আউয়াল মাসে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পক্ষে হাসান (রাঃ) এর খিলাফতত্যাগের মাধ্যমে এ মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে।[৩৯]

এখন খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত (মহানবী প্রদর্শিত পক্ষে খিলাফত) বহাল করার একটি মাত্র উপায়ই অবশিষ্ট ছিল। তা ছিল হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর অবর্তমানে কাউকে এপদে নিয়োগ করার ভার মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের ওপর ছেড়ে দিতেন; অথবা বিরোধ

---

* এ ব্যাপারে হযরত সা'আদ (রাঃ) এর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল, একটি ঘটনা থেকে তার ওপর আলোকপাত হয়। বিপর্যয় কালে একদা তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র হাশেম ইবনে ওতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস তাঁকে বলেনঃ আপনি খিলাফতের জন্য দাঁড়ালে অসংখ্য তরবারী আপনার সমর্থনে প্রস্তুত। জবাবে তিনি বলেনঃ এসব লক্ষ তরবারীর মধ্যে আমি কেবল একখানা তরবারী চাই, যা কাফেরের ওপর চলবে, চলবে না কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে (আলবেদায়া, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭২)

Dhaka University Institutional Repository

নিরসনের উদ্দেশ্যে তাঁর জীবদ্দশায়ই স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারটি চুড়ান্ত করা প্রয়োজনীয় মনে করলে মুসলমানদের সৎ ও ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমবেত করে উম্মতের মধ্য থেকে যোগ্যতম ব্যক্তিকে বাছাই করার স্বাধীন ক্ষমতা দান করতেন। কিন্তু স্বীয় পুত্র ইয়াযীদের স্বপক্ষে ভয়ভীতি ও লোভলালসা দেখিয়ে বায়আ'ত গ্রহণ করে তিনি এ সম্ভাবনারও সমাপ্তি ঘটালেন।

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) এ প্রস্তাবের উদ্ভাবক। হযরত মুআবিয়া তাঁকে কুফার গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করার কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি এ বিষয়ে অবহিত হলেন তৎক্ষনাৎ কুফা থেকে দামেশকে পৌঁছে ইয়াযীদের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেনঃ শীর্ষ স্থানীয় সাহাবী এবং কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছিনা আমীরুল মুমিনীন তোমার পক্ষে বায়আ'ত করতে কেন বিলম্ব করছেন। ইয়াযীদ তাঁর পিতার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি হযরত মুগীরা (রাঃ) কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ইয়াযীদকে কি বলেছো? হযরত মুগীরা (রাঃ) জবাব দেনঃ আমিরুল মুমিনীন! হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যার পর যতো মতবিরোধ এবং খুন খারাবী হয়েছে, তা আপনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। কাজেই এখন আপনার জীবদ্দশায়ই ইয়াযীদকে স্থলাভিষিক্ত করে বায়আ'ত গ্রহণ করাই আপনার জন্য উত্তম। ফলে আল্লাহ না করুন যদি আপনার কখনও কিছু হয়ে যায়, তাহলে অন্তত মতবিরোধ দেখা দেবেনা। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ এ কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব কে নেবে? জবাবে তিনি বললেনঃ আমি কুফাবাসীদের সামলাবো; আর যিয়াদ বসরাবাসীদেরকে। এরপর বিরোধীতা করার আর কেউ থাকবে না। এ কথা বলে হযরত মুগীরা (রাঃ) কুফা গমন করেন এবং দশজন লোককে ৩০ হাজার দিরহাম দিয়ে একটি প্রতিনিধি দলের আকারে হযরত হযরত মুআবিয়ার নিকট গমন করে ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তের জন্য তাঁকে বলতে সম্মত করেন। হযরত মুগীরা (রাঃ) এর পুত্র মূসা ইবনে মুগীরার নেতৃত্বে এ প্রতিনিধি দল দামেস্কে গমন করে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে। পরে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মুসাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমর পিতা এদের কাছ থেকে কত মূল্যে এদের ধর্ম ক্রয় করেছেন? তিনি বললেন ৩০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেনঃ তাহলে তো এদের ধর্ম এদের দৃষ্টিতে নিতান্ত নগন্য।[৪০]

অতঃপর হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বসরার গভর্নর যিয়াদকে লিখেন এ ব্যাপারে তোমার মত কি? তিনি ওবায়েদ ইবনে কা আব আন নুমাইরকে ডেকে বলেন, আমিরুল মুমিনীন এ ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে লিখেছেন। আমার মতে ইয়াযীদের মধ্যে অনেকগুলো দূর্বলতা আছে। তিনি দূর্বলতা গুলো উল্লেখ করেন। অতঃপর বলেন, তুমি আমীরুল মুমিনীনের কাছে গিয়ে বলো যে, এ ব্যাপারে যেন তাড়াহুড়ো না করা হয়। ওবায়েদ বলেন, আপনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর মতামত নষ্ট করবেন না। আমি গিয়ে ইয়াযীদকে বলবো যে, আমীরুল মুমিনীন এ ব্যাপারে আমীর যিয়াদের পরামর্শ চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, জনগন এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করবেন। কারণ, তোমার কোন কোন আচরন জনগণ পছন্দ করেনা। তাই আমীর যিয়াদের পরামর্শ এই যে, তুমি এ সব বিষয় সংশোধন করে নাও, যাতে কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হতে পারে। যিয়াদ এ মত পছন্দ করেন। ওবায়েদ দামেস্ক গমন করে একদিকে ইয়াযীদকে তাঁর ব্যক্তিগত আচার আচরন সংশোধনের পরামর্শ দেন আর অপর দিকে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কে বলেন, আপনি এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না।[৪১] ঐতিহাসিকরা বলেন এরপর ইয়াযীদ তাঁর বহু আচরন সংশোধন করে নেন, যা লোকেরা আপত্তিকর মনে করতো। কিন্তু এ বিবরণ থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়।

একঃ ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তের প্রাথমিক আন্দোলন কোন সুষ্ঠ ভাবধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বরং একজন বুযুর্গ ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে অপর বুযুর্গের স্বার্থকে চাঙ্গা করে এ প্রস্তাবের জন্ম দিয়েছিলেন। এভাবে তাঁরা উম্মতে মুহাম্মাদীকে কোন পথে ঠেলে দিচ্ছেন, তা কোন বুযুর্গই চিন্তা করেননি।

দুইঃ ইয়াযীদ নিজে এমন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না যে মুআবিয়া (রাঃ) এর পুত্র হওয়ার বিষয়টি বাদ দিলে কেউ এ কথা বলতে পারেন যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) পরে উম্মতের নেতৃত্বের জন্য তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন।

যিয়াদের মৃত্যুর (৫০ হিজরী) পর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ইয়াযীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রভাবশালী লোকদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর কাছে এক লক্ষ দেরহাম পাঠিয়ে ইয়াযীদের বায়আতের জন্য তাঁকে সম্মত করবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেনঃ ওহো, এ উদ্দেশ্যে আমার জন্য এ টাকা পাঠান হয়েছে। তা হলে তো আমার দ্বীন আমার জন্য খুবই সস্তা। এ বলে তিনি টাকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকামকে লিখেনঃ আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার জীবদ্দশায়ই কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চাই। .... স্থলাভিষিক্ত মনোনয়নের ব্যাপারে জনগণের মতামত জিজ্ঞেস করো। মারওয়ান বিষয়টি মদীনাবাসীদের সামনে উত্থাপন করেন। সবাই বলেন, এটা একান্ত সমীচীন। এরপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) আবার মারওয়ানকে লিখেন, "আমি স্থলাভিষিক্তের জন্য ইয়াযীদকে মনোনীত করেছি।" মারওয়ান পুনরায় বিষয়টি মদীনাবাসীদের সামনে উত্থাপন করে মসজিদে নববীতে ভাষন দান করেন। তিনি বলেনঃ "আমীরুল মুমিনীন তোমাদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি সন্ধান করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেননি। এটা একটা চমৎকার সিদ্ধান্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি নিজ পুত্রকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন, এটা কোন নতুন কথা নয়। আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) ও স্থলাভিসিক্ত মনোনীত করেছিলেন" এতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর উঠে দাঁড়িয়ে বলেনঃ "মরওয়ান! তুমি মিথ্যা বলেছো। আর মিথ্যা বলেছে মুআবিয়াও। তোমরা কখনো উম্মাতে মুহাম্মদীয়ার কল্যানের কথা চিন্তা করোনি। তোমরা একে কায়সারতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে চাও। একজন মারা গেলে তার পুত্র তার স্থান দখল করে। এটা আবুবকর ও ওমরের নীতি নয়। তাঁরা আপন সন্তানকে স্থলাভিষিক্ত করেননি। মারওয়ান বলেনঃ "ধরো একে। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই তো কুরআনে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি তার মাতা পিতাকে বলেছেঃ দুঃখ তোমাদের জন্য।

হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) পলায়ন করে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হুজরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) চীৎকার করে বলেনঃ মিথ্যা বলেছে মারওয়ান। আমাদের খান্দানের কারো প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ন হয়নি। বরং যার প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ন হয়েছে, আমি ইচ্ছা করলে তার নাম বলতে পারি। অবশ্য মারওয়ান যখন পিতার ঔরসে, তখন রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর পিতার ওপর লানৎ বর্ষন করেন। মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবুবকর (রাঃ) এর মতো হযরত হুসায়ন ইবনে আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ও ইয়াযীদের স্থলাভিসিক্ততা মেনে নিতে অস্বীকার করেন।*

* বুখারী শরীফ সুরায়ে আহকাফের তাফসীরে এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার ফতহুল বারীতে নাসায়ী, ইসমাঈলী, ইবনুল মুনযের, আবু ইয়ালা এবং ইবনে আবী হাতেম হতে এ ঘটনার' বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। হাফেয ইবনে কাসীরও তাঁর তফসীরে ইবনে আবী হাতেম এবং নাসায়ীর উদ্ধৃতি দিয়ে এর আনুসাঙ্গিক বিবরণ উল্লেখ করেছেন। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আল ইস্তীআব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৩। আলবেদায়া, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৯ এবং ইবনুল আসীর লিখেছেনঃ কোন কোন বর্ণনা মতে হিজরী ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের তলব করে বিষয়টি তাদের সামনে উত্থাপন করেন। জবাবে সবাই তোষামোদ মূলক বক্তব্য পেশ করে। কিন্তু হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস নীরব থাকেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ হে আবু বাহর, তোমার কি মত? তিনি বলেনঃ সত্য বললে আপনার ভয়, আর মিথ্যা বললে আল্লার ভয়। আমীরুল মুমিনীন, আপনি ইয়াযীদের দিন রাত্রির চলাফেরা ওঠা বসা, তার ভিতর বাহির সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন। আল্লাহ এবং এ উম্মতের জন্য সত্যিই তাকে পছন্দ করে থাকলে এ ব্যাপারে আর কারো পরামর্শ নেবেন না। আর যদি তাকে এর বিপরীত মনে করে থাকেন, তাহলে আখেরাতের পথে পাড়ি দেবার আগে দুনিয়া তার হাতে দিয়ে যাবেন না। আর বাকী রইলো আমাদের ব্যাপার; যা কিছু নির্দেশ দেয়া হয়, তা শোনা এবং মেনে নেয়াইতো আমাদের কাজ।[৪৩]

ইরাক, শাম এবং অন্যান্য এলাকা থেকে বায়আ'ত গ্রহণ করে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হেজায গমন করেন। কারণ, হেজাযের ব্যাপারটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ। মুসিলিম জাহানের যে সব প্রভাবশালী ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিরোধিতার আশংকা ছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন সেখানে। মদীনার বাইরে থেকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ), হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবুবকর (রাঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁদের সাথে এমন কঠোর আচরন করেন যে, তাঁরা শহর ত্যাগ করে মক্কা চলে যান। এভাবে মদীনার ব্যাপারটি সহজ হয়ে যায়। এরপর তিনি মক্কা গমন করে ব্যক্তি চতুষ্টয়কে শহরের বাইরে ডেকে এনে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। মদীনার অদূরে তাঁদের সাথে যে আচরন করেছিলেন এবারের আচরন ছিল তা থেকে ভিন্ন। তাঁদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেন, তাঁদেরকে সাথে করে শহরে প্রবেশ করেন। অতঃপর তাঁদেরকে একান্তে ডেকে ইয়াযীদের বায়আ'তে তাঁদেরকে রাজী করাবার চেষ্টা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) জবাবে বলেনঃ আপনি ৩টি কাজের যে কোন একটি করুন, হয় নবীকরীম (সঃ) এর মতো কাউকে স্থলাভিষিক্ত-ই করবেন না জনগন নিজেরাই কাউকে খলীফা বানাবে, যেমন বানিয়েছিল হযরত আবুবকর (রাঃ)কে। অথবা আবুবকর (রাঃ) যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সে পন্থা অবলম্বন করুন। তিনি স্থলাভিষিক্তের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) এর মতো

সালে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর ইন্তেকাল করেন। এটা সত্য হলে তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা এর বিপক্ষে। হাফেয ইবনে কাসীর আল বেদায়ায় লিখেছেন, হিজরী ৫৮ সালে তার ইন্তেকাল হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন, যাঁর সাথে তাঁর দূরতম কোন আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল না। অথবা হযরত ওমর (রাঃ) এর পন্থা অবলম্বন করুন। তিনি ৬ ব্যক্তির পরামর্শ সভার প্রস্তাব দেন। এ পরামর্শ সভায় তাঁর সন্তানদের কেউ ছিলেন না। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) অবশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ আপনারা কি বলেন? "তাঁরা বলেনঃ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) যা বলেছেন, আমাদের বক্তব্যও তাই।" এরপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেনঃ এতক্ষনা পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে এসেছি। এবার আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার কথার জাববে তোমাদের কেউ যদি একটা কথাও বলে, তবে তার মুখ থেকে পরবর্তী শব্দটি প্রকাশ করার অবকাশ দেয়া হবেনা। সবার আগে তার মাথায় তরবারী পড়বে। অতঃপর তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তাকে ডেকে নির্দেশ দেনঃ এদের প্রত্যেকের জন্য এক একজন লোক নিয়োগ করে তাকে বলে দাও যে, এদের কেউ আমার মতের পক্ষে বা বিপক্ষে মুখ খুললে তার মস্তক যেন উড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর তিনি তাঁদেরকে নিয়ে মসজিদে গমন করে ঘোষনা করেনঃ এরা মুসলমানদের সরদার এবং সর্বোত্তম ব্যক্তি। এঁদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজই করা হয় না। এঁরা ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তে সন্তুষ্ট এবং এঁরা বায়আ'ত করেছেন। সুতরাং তোমরাও বায়আ'ত করো। এক্ষেত্রে লোকদের পক্ষে অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ছিলনা। কাজেই মক্কাবাসীরাও সবাই বায়আ'ত করো।[৪৪]

এমনি করে ইয়াযীদের ক্ষমতা লাভের মধ্য দিয়ে খেলাফতে রাশেদার চুড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়যে খিলাফত একটা নির্বাচন ভিত্তিক পদমর্যাদা। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃত ও নেতৃত্ব খিলাফত নয়, বরং তা বাদশাহী-রাজতন্ত্র। খিলাফতএবং রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারনা সাহাবায়ে কেরাম গণ পোষণ করতেন, হযরত মুসা আশআরী (রাঃ) তা ব্যক্ত করেন নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ- এমারত অথ্যাৎ খিলাফতহচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে, আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।[৪৫]

হযরত আলী (রাঃ) এর ওফাতকালে লোকেরা জিজ্ঞেস করেন, আমরা আপনার পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) এর হাতে বায়আ'ত করবো? জবাবে তিনি বলেনঃ "আমি তোমাদেরকে নির্দেশও দিচ্ছিনা, নিষেধও করছি না। তোমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে ভালোবাবে বিবেচনা করতে পারো।"[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যখন আপন পুত্রদেরকে শেষ ওসিয়াত করছিলেন, ঠিক সে সময় জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, আমীরুল মুমিনীন। আপনি আপনার উত্তরসূরী মনোনয়ন করছেন না কেন? জবাবে তিনি বলেনঃ "আমি মুসলমানদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে যেতে চায়, যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম।[৪৭]

মহানবী (সঃ) প্রবর্তিত খিলাফতে রাশেদার নেতৃত্ব একই সঙ্গে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয়ই হতো এবং এর রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজের সমস্ত উপায় উপকরন কেবল মাত্র দ্বীনের উদ্দেশ্য সার্থক করার কাজে ব্যয়িত হতো না, বরং এ ক্ষমতার মূল লক্ষ্যই হতো দ্বীনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। দেড় দুশো বছর পর্যন্ত যদি ইসলামী খিলাফত এ অবস্থা টিকিয়ে রাখতে পারতো তাহলে দুনিয়ার বুকে সম্ভবত কুফরীর চিহ্নই থাকতো না, আর থাকলেও তার মাথা তুলে দাঁড়াবার সামর্থ থাকতো না।

তবে একথাও সত্য যে খিলাফতে রাশেদার মতো অতুলণীয় আদর্শ শাসন ব্যবস্থা থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত হওয়া কোন আকস্মিক দূর্ঘটনা ছিল না। আকস্মাত বিনা কারণেও তা সংঘটিত হয়নি। বরং এ ব্যবস্থার পরিবর্তনের পিছনে বেশ কিছু কারণ ও ছিল; যে গুলো ধীরে ধীরে উম্মাতকে খিলাফতথেকে রাজতন্ত্রের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ মর্মবিদারী পরিবর্তনকালে যে সব পর্যায় সামনে এসেছে, তার প্রতিটি পর্যায়েই তাকে রোধ করার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু উম্মাতের তথা সমস্ত মানব জাতিরই দুর্ভাগ্য যে, পরিবর্তনের কার্যকারণ অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমানিত হয়েছে। যার ফলে সে সব সম্ভাবনার একটিও কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ হযরত মুআবিয়ার অনুকূলে হাসান (রাঃ) এর খিলাফত ত্যাগ

ইতি পূর্বে খিলাফত কিভাবে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এই রাজতান্ত্রিক শাসন আমলের সূচনা কালে মুসলিম জাহানে এমন সব ঘটনা ঘটে যা মুসলিম জাহানকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে দেয়। এর মধ্যে প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে সাইয়্যেদেনা হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদতের ঘটনা। যা কারবালার ঘটনা নামে পরিচিত।

এই কারবালার ঘটনা কিভাবে সংঘটিত হলো তা পর্যায়ক্রমিক ভাবে আলোচনা করা হলোঃ-

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে সিফফিনের যুদ্ধে প্রহসন মূলক আচরনের মাধ্যমে মুআবিয়া মুসলিম জাহানের খলীফা হন। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকে মুসলিম জাহানে দুইজন খলীফা হলেন হযরত আলী (রাঃ) ইরাক ও জাযিয়াতুল আরবে এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সিরিয়ায়। সিফফিনের যুদ্ধের পর পাছে সমগ্র উত্তরাঞ্চল হস্তচ্যুত হয় এই আশঙ্কায় হযরত আলী (রাঃ) মদীনা থেকে রাজধানী কুফায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু চক্রান্ত কারীদের হাত থেকে তিনি নিস্তার পেলেন না। ৬৫৯ খৃষ্টাব্দে হযরত আলী (রাঃ) খারিজী দলকে নাহ্‌রোয়ান নামক স্থানে পরাজিত করেন। এই খারিজীদের মতে মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ ঘটানোর অপরাধে আলী ও হযরত মুআবিয়া উভয়েই দোষী এবং এ দুই এর কারও খলীফা থাকা উচিত নয়। তারা উভয়কে হত্যাকরার ফতোয়া দিল। অবশেষে এক অশুভ প্রভাতে খারিজীদের এক আততায়ীর বিষাক্ত খঞ্জরের আঘাতে কুফার মসজিদে হযরত আলী (রাঃ) ফজরের নামাজরত অবস্থায় শহীদ হন।

এই সংবাদ পেয়ে মুআবিয়া দামেস্কে বসে নিজকে সমগ্র জাহানের খলীফা বলে ঘোষনা করেন।

৪০ হিজরীর রমযান মাসে ইবনে মুলজিম আলী (রাঃ) কে মরন আঘাত হানলে, তিনি তিন দিন জীবিত ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) এর কাফন দাফনের পর কুফার জামে মসজিদে মনুষেরা হযরত হাসান (রাঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহন করে। (মাসউদীর মতে হযরত আলী (রাঃ) এর ইন্তিকালের দুদিন পর)। বায়াত গ্রহনকারী লোকের সংখ্যা বিশ হাজারের উপর ছিল।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

বাইয়াত গ্রহনের মাত্র চার মাস পরে হযরত হাসান (রাঃ) এর সাথে মুআবিয়া (রাঃ) এর সংঘর্ষ বাঁধে। হযরত হাসান (রাঃ) ইরাকবাসীদের সাথে নিয়ে এবং মুআবিয়া (রাঃ) শামবাসীদের সাথে নিয়ে মাসকান নামক স্থানে মুখোমুখি হন। এটা একটা জেলার নাম যা আনবার নামক স্থানের নিকটবর্তী, এটা দজলা থেকে ফুরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত যেখানে পরবর্তীতে বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জেলাকে দুজাইলও বলা হয়।[৪৯] এ সময় হযরত হাসান (রাঃ) মনে করলেন দুপক্ষের সৈন্যগনেরই এমন প্রস্তুতি যে, এক পক্ষ পুরোপুরি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ থামবার নয়। এ জন্য তিনি অযথা রক্তারক্তির পথ পরিহার করে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন।[৫০] এ জন্য তিনি আমর ইবনে সালমা আর হাবীকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে পাঠালেন। অপর পক্ষে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) আবদুর রহমান ইবনে সামরা এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমীরকে হযরত হাসান (রাঃ) এর কাছে পাঠালেন। দুজনই হযরত হাসান (রাঃ) এর শর্তসমূহ মেনে নিলেন। এরপর হযরত হাসান (রাঃ) কুফার কসর নামক স্থানে আর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) নুখায়লা নাকম স্থানে অবস্থান নিলেন। সহীহ বুখারীর এক বর্ণনা এই যে, হযরত হাসান (রাঃ) এর সৈন্যগণকে হযরত মুআবিয়ার নিকট পাহাড়ের মতো বিশাল ও ভয়ানক মনে হচ্ছিল। তখন আমর ইবনে আস হযরত হযরত মুআবিয়াকে বললেন, আমার কাছে ঐ সৈন্যগণকে এমন মনে হচ্ছে যে, তারা আপনার সকল সৈন্য কতল না করা পর্যন্ত থামবে না। তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, যদি এমনই হয় তাহলে এ সমস্ত লোকের স্ত্রী ও সন্তানদের জিম্মাদার কে হবে? আর তখনই তিনি আব্দুর রহমান ইবনে সামরা এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে আমিরকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হযরত হাসান (রাঃ) এর কাছে প্রেরন করলেন।[৫১] "আখবরুত তোওয়ালে" সন্ধির এ শর্ত সমূহ বর্ণিত আছেঃ

১. শুধুমাত্র হিংসা বিদ্বেষের কারণে কোন ইরাকীকে পাকড়াও করা যাবে না।

২. সকলকে বিনা শর্তে নিরাপত্তা দিতে হবে।

৩. সুবা আহওয়াজ এর সমস্ত রাজস্ব হযরত হাসান (রাঃ) এর জন্য নির্ধারন করতে হবে।

৪. আলাদা ভাবে হযরত হাসান (রাঃ) এর জন্য বাৎসরিক দুলক্ষ দিরহাম দিতে হবে।

৫. আনুগত্য এবং দান দক্ষিনার ক্ষেত্রে বনি হাশিমকে বনি উমাইয়াদের থেকে প্রাধান্য দিতে হবে।

হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) পরবর্তী খলীফা হযরত হাসান (রাঃ) কে করার প্রস্তাব করলেও হযরত হাসান (রাঃ) তাঁর প্রস্তাবকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত

Dhaka University Institutional Repository

হবে শুরার (পরামর্শের) মাধ্যমে। হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) একক ভাবে কোন খলীফা নিযুক্ত করতে পারবেন না।[৫২]

আখবারুত তোওয়ালে বর্ণিত আছে-হযরত হাসান (রাঃ) এ শর্তসমূহ আব্দুল্লাহ ইবনে আমির এর মারফত পেশ করেন। হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে তাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর গ্রহন পূর্বক হযরত হাসান (রাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন। ইবনে আসীর এর মতে ঘটনার বিবরণ এরূপঃ এদিকে হযরত হাসান (রাঃ) শর্তনামা হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, অপরপক্ষের হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সা'দা কাগজে সীল লাগিয়ে বাহকের কাছে বলে দেন হযরত হাসান (রাঃ) যে শর্ত ইচ্ছা লিখে নিতে পারেন, আমি সব মেনে নিব। তাবারী গ্রন্থেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইস্তিয়াব এ বর্ণিত আছে - যখন হযরত (রাঃ) এর শর্ত সমূহ হযরত মুআবিয়ার কাছে পৌছে তখন তিনি সাথে সাথে লাব্বায়েক বলে স্বাগত জানান, কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেন যে, দশ ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দিব না। হযরত হাসান (রাঃ) এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি কসম করেছি যে, কায়েস ইবন সা'দকে হাতের মুঠোয় পেলে তার হাত এবং জিহবা কেটে দিব। তখন হযরত হাসান (রাঃ) বললেন, আমি এ অবস্থায় কখনও সন্ধি করব না। তাই বাধ্য হয়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) এর শর্ত মেনে নিলেন।

অতপর কুফায় প্রবেশ করে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর বাইয়াত হলেন। এ সময় আমর ইবন আস (রাঃ) হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কে বললেন, আমার পরামর্শ হলো আপনি জনসম্মুখে হযরত হাসান (রাঃ) কে বাইয়াতের ব্যাপারে ইলান করতে বলুন যাতে মানুষ এটা বুঝে এবং কোন প্রকার ভুল বুঝাবুঝি না থাকে। হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হাসান (রাঃ) এর কাছে এ জন্য আবেদন করলে তিনি কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন-"ভাইসব আল্লাহ তা'আলা আমাদের পূর্ববর্তীদের উসিলায় তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, আর পরবর্তীদের উসিলায় তোমাদের খুন খারাবী বন্ধ করলেন। হে মানুষ! সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে যে মুত্তাকী, আর গন্ডমূর্খ সে যে পাপাচারী। খিলাফতের দায়িত্ব আমি স্বইচ্ছায় হযরত মুআবিয়ার প্রতি ন্যস্ত করেছি। বাস্তবে তিনি এর হকদার হয়ে থাকলে তাঁর হক তাঁকে দেয়া হয়েছে। আর আমার হক হয়ে থাকলে মুসলিম উম্মার কল্যান এবং নিরাপত্তার জন্য এবং রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে এবং আল্লাহ পাকের রেজামন্দির উদ্দেশ্যে আমার হককে ছেড়ে দিয়েছি।[৫৩] অতঃপর হাসান (রাঃ) ইরাকের মাদাইন মসজিদে গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ইরাকবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বললেন, "ভাইসব, তোমরা আমার হাতে এ কথার উপর বাইয়াত হয়েছিলে যে আমি যার সাথে সন্ধি করব, তোমরাও করবে, আর যার সাথে লড়ব, তোমারও লড়বে। আমি হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর বাইয়াত গ্রহন করেছি, তোমরাও তাঁর অনুগত হও এবং তাঁর আদেশাবলী মেনে নাও।[৫৪] এ উদ্দেশ্যে বনু হাসিমীদের সাথেও পরামর্শ জরুরী ছিল। তাই তিনি সবচেয়ে প্রভাবশালী হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন আবু তালিবের নিকট বললেন, আমি সিদ্ধান্ত করেছিঃ আমি মদীনায় গিয়ে অবস্থান করব আর খিলাফত হযরত মুআবিয়াকে দিয়ে দিব। এজন্য যে ফিতনা অনেক হয়েছে, রক্তপাত ঘটানোর চেয়ে এ পথ বন্ধ হওয়া দরকার। তখন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উম্মতে মুহাম্মাদির পক্ষ থেকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর স্বভাব ছিল বিপরীত ধর্মী, তাঁর কাছে এ প্রস্তাব পেশ করলে, তিনি বললেন, আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনি এরূপ করবেন না। কিন্তু হাসান (রাঃ) তাঁকেও রাজি করালেন।

আর এভাবে রাসুল (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হলো যে, আমার এ সন্তান (হাসান) সর্দার হবে আর তার উসিলায় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের বড় দুটি দলের মধ্যে সন্ধি করাবেন। এ বছর মুসলমানদের নিকট "আমুল জামাআত" নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। কারণ মুসলমানগন পার্থক্য ভুলে গিয়ে এ বছর এক জামায়াতে পরিনত ভুলে গিয়ে এ বছর এক জামায়াতে পরিনত হল।

সন্ধি করার কারণে কুফাবাসীদের কিছু লোক তাঁর প্রতি দোষারোপ করলেও তিনি ধৈর্য্য ধারন করেন এবং নিজের সিদ্ধান্তের উপর কায়েম থাকেন।

তাঁর খিলাফতের সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কারও মতে চার মাস আবার কারও মতে আট মাসের কিছু উপরে। সঠিক কথা হলো এই তাঁর বাইয়াত গ্রহণ হয় ৪০ হিজরীর বিশে রমযানে এবং খিলাফত ত্যাগ ৪১ হিজরীর ১৫ই জুমাদিউল আউয়ালে। এতে ৭মাস ২৬ দিন হয়।

সন্ধি স্থাপনের পর হাসান (রাঃ) মদীনা চলে যান এবং বাকী জীবন রাসুল (সাঃ) এর রওজা মুবারকের পার্শ্বে অতিবাহিত করেন। সেখানে লোকেরা হাসান (রাঃ) কে খলীফা রূপে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। অগত্যা সবাই তাঁকে ধর্মের দিক দিয়ে রাসূলের প্রতিনিধি অর্থাৎ ইমাম হিসাবে গ্রহণ করেন। এই ইমাম হলেন ধর্ম জগতের গুরু বা পথ প্রদর্শক।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু দুনিয়ায় নবী আর পয়দা হবে না। তাই ইমাম তাঁর স্থলে রুহানী এলাকার নেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

৫০ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। এ ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য থাকলেও হাফেজ ইবনে হাজার এটাকেই বেশি সঠিক বলে মনে করেন। এ হিসাবে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। কারো কারো মতে তাঁর ইন্তিকাল বিষ পানের কারণে হয়েছিল। এ ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য আছে। কারো বর্ণনায় বিষদাতা হলেন ইমামের কনিষ্ট পত্নী যায়েদা। একমাত্র মায়মুনা কুটনীর যবানবন্দী ছাড়া দুনিয়ায় তার কোনও প্রমান নাই।

কিন্তু অধিকাংশের মতেই হযরত মুআবিয়ার ইঙ্গিতে স্বীয় পত্নী যায়েদার মাধ্যমে বিষ প্রয়োগে তাঁর মৃত্যু হতে পারে না। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর বিষ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিলনা। কারণ হাসান (রাঃ) এর খিলাফত ত্যাগ করে দশ বছর অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সাথে এমন কোন তিক্ত সম্পর্ক হয়নি। যার ফলে তিনি এরূপ কাজ করতে পারেন। আসাবা এবং আখবার গ্রন্থ মুতাবিক হাসান (রাঃ) এর মৃত্যু বিশের কারণে নয় বরং কোন রোগের কারণে হয়েছে।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ শাসন ক্ষমতায় ইয়াযীদ

ইমাম হাসান (রাঃ) এর মৃত্যুর পর মুআবিয়া কয়েক বছর উচ্চবাচ্য করেননি। পরে তিনি কিভাবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ইয়াযীদকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

৬০ হিজরীর রজব মাসে মুআবিয়া পীড়িত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ইয়াযীদ মুসলিম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসলেন। এ সময় ইয়াযীদের বয়স ছিল ৩৪ বছর। ইয়াযীদ সম্পর্কে আমীর আলী বলেন -

Yeazid was cruel and treacherous; his depraved nature knew no pity nor Justice. His pleasures were as degrading as his companions were low and vicious. He insulted the ministers of religion by dressing up a monkey as a learned devine and carring the animal mounted on a beautifully caparisoned Syrian donkey where ever he went. Drunken riotousness prevailed at court and was naturally imitated in the streets of the capital.[৫৬]

কোন সাম্রাজ্যের পরিচালকের পক্ষে মৃত্যুকালে স্বীয় প্রতিনিধি মনোনীত করে যাওয়া দূষনীয় কাজ নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তা মঙ্গলজনক হয়ে থাকে। সুতরাং আমীর হযরত মুআবিয়া স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তিনি গুরুতর অন্যায় করেছেন -এরকম বলা ঠিক হবে না। কিন্তু তাঁর মনোনয়ন দুইটি কারণে মুসলিম জগতে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথমত কারণ ইয়াযীদের মধ্যে এমন কিছু দূর্বলতা ছিল যার জন্য লোকজন তাঁকে পছন্দ করতো না। ফলে তাঁকে ঈমানদার মুসলমান গনের আমীর হিসাবে কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ-রাসূল (সাঃ) এর গণতান্ত্রিক ধারা বিসর্জন দিয়ে রাজতন্ত্র কায়েম করা।

Dhaka University Institutional Repository

আমীর হযরত মুআবিয়ার জীবদ্দশায় যারা ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য বায়আ'ত করেননি। তাঁরা তাঁর মৃত্যুর পরও বায়আ'ত করা অস্বীকার করলেন। তাঁদের প্রবল দাবী ছিল যে, মুসলমানদের খলীফা নির্বাচিত ব্যক্তি হতে হবে। কোন সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি কোন অনাচারী অযোগ্য ব্যক্তিকে স্বীয় আনুগত্য দান করতে পারে না। আনুগত্য প্রদর্শনের এরকম অস্বীকৃতিকে সাধারণভাবে রাজনৈতিক বিদ্রোহ বলাযায় না। আমীর মুআবিয়াকে শেষ পর্যন্ত সবাই বরদাস্ত করে নিয়েছিলেন এই কারণে যে, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলিন এবং স্বীয় বিরুদ্ধ পক্ষের লোকদের প্রতি তিনি প্রকাশ্য ভাবে অসংযত আচরণ করতেন না। বরং কৌশলে নিজের পথকে কাঁটাশূন্য করতেন। কিন্তু ইয়াযীদ সর্বক্ষেত্রে ছিলেন অসংযত।

ইয়াযীদ শাসন গ্রহণকালে মদীনার গভর্ণর ছিলেন ওলিদ ইবনে ওতবা ইবনে আবি সুফিয়ান কুফার গভর্ণর ছিলেন নো'মান ইবনে বশীর, বসরার গভর্ণর ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ, এবং মক্কার গর্ভর্ণর ছিলেন আমর ইবনু সাইদ ইবনুল আস। ইয়াযীদ মদীনার গভর্ণর ওলিদ ইবনে ওতবার কাছে একটা পত্রলিখেন-

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম"

আমিরুল মুমিনীন ইয়াযীদের পক্ষ হইতে ওলিদ ইবনে ওতবার নিকট, অতঃপর হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এমন একজন বান্দা যাঁকে আল্লাহ্ সম্মানিত করেছিলেন, খিলাফতদান করেছিলেন এবং রাজ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন যাপন করে পরলোক গমন করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করেছেন। তাঁর জীবন ছিল প্রশংসনীয়। আর তিনি পূণ্যবান এবং খোদাভীরু ছিলেন। আর শান্তির সাথে ইন্তেকাল করেছেন।[৫৭]

তিনি ছোট একটা পত্রের মধ্যে এ কথাও লিখলেন যতক্ষন পর্যন্ত হুসায়ন (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর স্বইচ্ছায় আমার বায়আ'ত গ্রহন না করবে ততক্ষন পর্যন্ত তাঁদেরকে শক্ত করে ধরবে ঢিল দিবে না। ওলিদ মারওয়ানের পরামর্শ চাইলেন। মারওয়ান পরামর্শ দিলেন যে, যদি এ সব ব্যক্তি বায়আ'ত করতে রাজীনা হয়। তবে তাঁদের শিরচ্ছেদ করা হোক। ইতিপূর্বে মৃত্যুকালে মুআবিয়া ইয়াযীদকে বলে যান -চারি ব্যক্তি রইল যারা তোমার নামে আজ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

বায়াত স্বীকার করে নাই। তারা হ'ল, হযরত হুসায়ন (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর। এদের ভিতর হুসায়ন (রাঃ) এর সঙ্গে খুব সম্ভব তোমার যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ হলে তাকে প্রাণে মেরো না। কারণ সে হযরত রাসুল (সাঃ) এর ঘনিষ্টতম আত্মীয় এবং রাসুল (সাঃ) এর শোনিত তাঁর দেহে প্রবাহিত, তাঁকে হত্যা করলে সমস্ত মুসলিম জাহান আলোড়িত হয়ে উঠবে। এদের ভিতর সর্বাপেক্ষা দুষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে মক্কার যুবায়েরের পুত্র আব্দুল্লাহ। যে সিংহের ন্যায় ক্রুর এবং শৃগালের ন্যায় ধুর্ত্ত। বিনা যুদ্ধে সেও হয়ত অধীনতা স্বীকার করবে না। সম্ভবতঃ সে খিলাফতের অভিলাষী। এই ধড়িবাজ কুরায়েশ শৃগালটাকে হাতে পেলে টুকরা টুকরা করে কাটবে। অপর দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে তেমন ভাবনার কারণ নাই। আব্দুর রহমান বৃদ্ধ হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর নিরীহ এবং ধর্ম কর্মে আসক্ত। তারা বিশেষ কিছু করতে পারবে না। সহজেই বশে আসবে। এরপরও ইয়াযীদ খলীফা হয়েই এ ৪ জনের কাছ থেকে বশ্যতা আদায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

মারওয়ান যখন ওলিদকে বায়আ'ত না করলে ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার কথা বললো। বিশেষ করে হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যাকরার কথা শুনে ওলিদ বললো 'হে মারওয়ান হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যার বিনিময়ে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা পেতে আমি ভালবাসি না। কি আশ্চর্য! হুসায়ন (রাঃ) বায়আ'ত না করলে আমি তাঁকে হত্যা করবো? আল্লাহ্র কসম আমি জানি যে হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাঁর মিজানের পাল্লা পাতলা হয়ে যাবে' অতঃপর ওলিদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরের কাছে কিছু লোক পাঠালো তাঁরাও বায়আ'ত করতে অস্বীকার করলো। ওলিদ হুসায়ন (রাঃ) বায়আ'ত করার জন্য আহ্বান করলেন, তখন হুসায়ন (রাঃ) বললেন আমার মত মানুষেরা গোপনে বায়আ'ত করে না এবং আমি জানি এটা আমার জন্য যায়েজ না। কিন্তু সব মানুষ যদি আমাকে তোমাদের দিকে আহ্বার করে তখন সেটা সতন্ত্র কথা।[৫৮] এটা যে একটা নীতিগত প্রশ্ন, কোনও প্রকার বিদ্বেষ মূলক নয়, তা তিনি বুঝিয়ে বললেন। ওলীদ মহা ফাঁপরে পড়লেন। তিনি হুসায়ন (রাঃ) কে আরও বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখতে অনুরোধ জানিয়ে বিদায় করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াযীদকে খলীফা বলে অস্বীকার করার পরিনাম যে কি তিনি তা ভাল ভাবেই বুঝতেন। এর পর তিনি মদীনায় অবস্থান করলে ইয়াযীদের সৈন্য সামন্ত তাঁকে ধরতে আসবে এবং মদীনা শহরে রক্তস্রোত বহাবে। এটা নিশ্চিত জেনে হুসায়ন (রাঃ) মদীনা ছেড়ে মক্কায় যেতে মনস্থ করলেন।

যাত্রার আগে তিনি হযরতের রওজা ও জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে গুরুজনদের কবর জিয়ারত করলেন। কোন কোন বর্ণনাতে পাওয়া যায় হযরত (সাঃ) এর মাজারে বসে তিনি সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করেন এবং এই মহা সঙ্কটে কর্তব্যের নির্দেশ চান। এই অবস্তায় তিনি রওজার পাশে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের ভিতর প্রিয় নানাকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি তার মাথা কোলে নিয়ে বললেন, যত কঠিন বিপদই আসুক তাতে ভেঙ্গে পড়িও না। মনে রেখো তুমি বেশী দিন দুনিয়ায় থাকবে না। এই অস্থায়ী জীবনের সুখ ও আরামের জন্য দুর্নীতি ও অধর্মের কাছে মাথা নত করবা না।[৫৯]

এই স্বপ্ন দেখার পর হুসায়ন (রাঃ) আত্মীয় পরিজনের কাছে বিদায় নিয়ে স্বপরিবারে মক্কা রওনা হন।

ইবনে কাসীরের আলবেদায়াওয়ান নেহায়া থেকে জানা যায় হুসায়ন (রাঃ) স্বপ্নের কথা পুরোপুরি উল্লেখ করেন নি। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরও তাঁর সাথে মক্কায় চলে যান।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর মক্কায় পৌছেই ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিলেন এবং মক্কা থোকে ইয়াযীদের গভর্ণরকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের ভাই ওমরকে সেখানকার গভর্ণর নিযুক্ত করেরেন। মক্কা ও আশেপাশের বিস্তৃত এলাকায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের পূর্ণ আধিপত্য কায়েম হ'ল সবাই তার হাতে বায়আ'ত নিল। কিন্তু হযরত হুসায়ন (রাঃ) বায়আ'ত নিলেন না। ৬০ হিজরীর জিলহজ্জ মাসেই গোটা মক্কা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকার লোকেরা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের হাতে বায়আ'ত নিল।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে মক্কার লোকের সা'দরে অভ্যর্থনা জানালেও সেখানে তিনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারলেন না। তিনি জানতে পারলেন সেখানেও তার জীবন নাশের গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। ফলে পুনরায় তিনি সেখানে নিজেকে নিতান্ত অসহায় ও বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন।[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিলেন এবং মক্কা থেকে ইয়াযীদের গভর্ণরকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানকার গভর্ণর নিযুক্ত করলেন তাঁর ভাই ওমরকে। মক্কা ও তার আশেপাশের বিস্তৃত এলাকায় আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরের পূর্ণ আধিপত্য কায়েম হল। সবাই তাঁর হাতে বায়আ'ত নিতে থাকলো কিন্তুহযরত হুসায়ন (রাঃ) বায়আ'ত নিলেন না। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের প্রভাব হেজায বাসীদের মনে বৃদ্ধি পেতে লাগলেও হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর প্রভাব ও মর্যাদা সবার কাছে বেশী ছিল। কেননা তিনি হলেন বড় সাইয়্যেদ এবং রাসূল (সঃ) এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) এর পুত্র।

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতি কুফাবাসীদের আমন্ত্রণ

ইতিমধ্যে একের পর এক ইরাক থেকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে আমন্ত্রণ পত্র আসতে থাকে। তাঁরা জানতে পারে যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) আয়াযীদের কারনে মদীনা হতে মক্কায় গমন করেছেন। কুফা থেকে সর্বপ্রথমে হোসেন (রাঃ) এর কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাযা আল হামদানি এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াল পত্র নিয়ে আসে। তাতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতি সালাম এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর মৃত্যুতে স্বস্তির বিষয় লিখা থাকে।

তারা সে বছরের রমজান মাসের দশ তারিখে হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে পৌছেন। তারপর একের পর এক কায়েস বিন মাসহুর সা'দাই, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল কাওয়া প্রমূখ ব্যক্তিরা সহ প্রায় ১৫০ জন লোক পত্র দিয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়। অতঃপর হানী ইবনে সাবারী এবং সাঈদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল হানাফী পত্র নিয়ে শীঘ্রই হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে তাঁদের কাছে আগমনের আহবান জানায়। এছাড়াও হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে আরো অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তিরা পত্র লিখে আমন্ত্রণ জানান। দূত মারফত কুফাবাসীরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে ইরাক গমনের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে এবং তারা ইয়াযীদ ইবনে হযরত মুআবিয়ার পরিবর্তে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হাতে বায়আ'ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তারা এটাও বলে যে, হযরত মুআবিয়ার মৃত্যুতে তারা খুশী। তাঁরা আরো বলে যে ইরাকবাসীদের কেউ এখনো ইয়াযীদের হাতে বায়আ'ত করেনি, তাঁরা শুধু আপনার অপেক্ষায় আছে।

এই কুফাবাসীরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পিতা আলীকে প্রবঞ্চিত করে এবং তাঁর ভাই হাসানের সাথে শত্রুতা করে। কুফাবাসীদের এই অস্থিরমতি ও হটকারিতা সম্বন্ধে ইমাম হুসায়ন অবগত ছিলেন। কাজেই তাদের আমন্ত্রণ পত্র বার বার পাওয়ার পরও তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁর আত্মীয় স্বজনদের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। হুসায়ন (রাঃ) এর পিতৃকুলের ভিতর সবচেয়ে প্রবীন ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। তিনি বললেন কুফাবসীদের মতের কোন স্থিরতা নাই। তারা তোমার পিতা আলীকে প্রবঞ্চিত করেছে; তোমার ভাই হাসানের সাথে শত্রুতা করছে; তুমিও হয়ত সেখানে গিয়ে দেখবা ইতিমধ্যে তারা

Dhaka University Institutional Repository

আবার মত পরিবর্তন করেছে। হয়ত অন্য কোন শক্তিধর ব্যক্তির প্রভুত্ব মেনে নিয়ে তারা তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করতে প্রস্তুত হচ্ছে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) বললেন তাঁরা দেশশুদ্ধ লোক একতা বদ্ধ হয়ে আমাকে চায়। শতশতচিঠি লিখছে এবং দলে দলে প্রতিনিধিরা এসে আমাকে সেখানে যাওয়ার জন্য আহ্বান করছেন। এ পরিস্থিতিতে আমার কি সেখানে যাওয়া উচিত না? ইবনে আব্বাস পরামর্শ দেন একান্তই যদি যেতে চাও তবে আগে একজন বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা জেনে যাও।

এসময় আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের পরামর্শ দেন যে নিশ্চুপ অবস্থায় মক্কায় বসে থেকে বিপদ ডেকে আনার চেয়ে কুফায় গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে বীরের মত লড়াই করাই হবে গৌরব জনক।[৬১] ইবনে যুবায়ের অগাধ ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন এবং শক্তি সাহস ও কূটনৈতিক বুদ্ধিও তাঁর যথেষ্ট ছিল। হযরত মুআবিয়া এর সম্বন্ধে ইয়াযীদের কাছে সতর্কবানী উচ্চারণ করেছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) মক্কায় বসতি করলে ইবনে যুবায়েরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে তাঁর মনে এ জাতীয় আশঙ্কা হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আমীর আলী -ঐতিহাসিক মাসুদীর বক্তব্য উল্লেখ করেনঃ-

[Masudi states that during the caliphat of Osman the companions of the prophet built for themselves magnificent mansions The house built by Zubair son of Awwam was in existance in the year 352 of the Hegira when Masudi wrote and was used by the merchants and bankers for business purpose Zubair also built several masions at kufa, Fostat and Alexandria and these house with their gardens existed in good order in Masudis time.[৬২]

ইয়াযীদের সাথে রসুলুল্লাহ (রাঃ) এর ফুফাত ভাই যুবাইরের পুত্র আব্দুল্লাহ বিরোধ করেছিলেন আর মক্কাও মদীনার অধিবাসীরা তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ এ ঐতিহাসিক সত্যও উড়িয়ে দেওয়া চলবে না যে তিনি ইয়াযীদের জীবদ্দশা পর্যন্ত খিলাফতের দাবীদার হননি, তাঁর দাবী ইয়াযীদের মৃত্যুর পর শুরু হয়েছিল। আর একথাও

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক সত্য যে, বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রথম প্রথম ইয়াযীদের হাতে বায়আ'ত করতে সম্মতি দিয়েছিলেন কিন্তু ইয়াযীদ শর্ত করেছিল যে, ইবনুযুবায়ের কে বন্দী অবস্থায় তার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। ইবনু যুবায়ের এ শর্ত মেনে নিতে রাজী না হওয়ায় শপথ গ্রহণের ব্যাপার স্থগিত থাকে আর উভয় পক্ষে লড়াই শুরু হয়ে যায়।[৬৩]

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এসব কথা বিবেচনা করে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য তার চাচাত ভাই মুসরিম বিন আকিলকে একটা পত্র সহ ইরাকে প্রেরণ করেন।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর অনুরোধে মুসলিম বিন আকিল কুফায় গমন করেন। সেখানে তিনি আওসাজা আল আসীরের বাড়ীতে উঠলেন। কারো মতে মুখতার ইবনে আবি উবাইদ আস সাকাফীর বাড়ীতে উঠলেন। হুসায়ন (রাঃ) এর ভক্তদের কাছে মুসলিম বিন আকীল এর আগমনের সংবাদ পৌছা মাত্র কুফাবাসীরা দলে দলে এসে তাঁর হাতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর নামে বায়আ'ত হতে থাকে। তারা শপথ করে বলে যে আমরা হুসায়ন (রাঃ) কে আমাদের জানও মাল দ্বারা সাহায্য করবো। এভাবে ১২ হাজার লোক তার হাতে বায়াত হলো। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৮ হাজারে উন্নীত হলো।[৬৪] মুসলিম বিন আকিল কুফাবাসীদের উৎসাহ ভক্তি ও দৃঢ়তা অবলোকনে সন্তুষ্ট হয়ে হুসায়ন (রাঃ) কে কুফায় আগমন করার জন্য সংবাদ প্রেরণ করলেন।

এ সময় নো'মান ইবনে বশীর ছিলেন কুফার গভর্ণর, মুসলিম বিন আকিল এর আগমন এবং পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে নো'মান অবগত হলেন। তখন তিনি কুফার জনগণদের বললেন তোমরা শান্ত হও। আমার সাথে কেউ যুদ্ধ না করলে আমিও করব না। আমাকে কেহ গালি না দিলে আমিও দিব না। এ সময় তার সামনে উপস্থিত ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে শোক আল হাজরামি তাবারী ও আলকামেল গ্রন্থে বলা হয়েছে এ ব্যক্তির নাম ছিল সায়িদ।

এই ব্যক্তি বললেন যুদ্ধ ছাড়া এ ব্যাপারে কোন মীমাংসা হবে না। খলীফাতো আপনাকে দূর্বল মানুষদের রক্ষা করার জন্য আমীর নিযুক্ত করেছেন। উত্তরে নো'মান বিন বশীর বলেন আল্লাহ্র নাফরমানী করে দূর্বল লোকদের পক্ষ আমি নিতে পারিনা।

মুসলিমের কার্যকলাপ ও নোমানের শৈথিল্যের সংবাদ অতি দ্রুত ইবনে সায়াদ ইবনে আমি ওয়াক্কাস এর মাধ্যমে ইয়াযীদের কাছে পৌছে গেল। ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে কাজেই ইয়াযীদ

Dhaka University Institutional Repository

কালবিলম্ব না করে নো'মান ইবনে বশীরকে বরখাস্ত করে বসরার গভর্ণর আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে* বসরা এবং কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। মুসলিম ইবনে আমর আল বাহেল এর মাধ্যমে ইয়াযীদ আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কঠোর আদেশ দিলেন- তুমি কুফায় পৌছে মুসলিম ইবন আকীলকে খোঁজ করবে এবং তাঁকে ধরতে পারলে সাথে সাথে হত্যা করবে[৬৫] ইবনে যিয়াদ পত্র পেয়ে কুফায় গমনের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে দ্রুত কুফার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি কিমাবেন নামবা স্থানে উপনীত হয়ে তাঁর সৈন্যদলকে নগরীর পেছন দিক দিয়ে কুফায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দিয়ে, নিজে অল্প সংখ্যক অনুচর নিয়ে সম্মূখ দিয়ে কুফা নগরীতে প্রবেশ করলেন। নগরীতে প্রবেশকালে তিনি হেজাযী পোষাক পরিধান করলেন। ইবনে যিয়াদ কালো পাগড়ী পরে সাওয়ারিতে রওনা হলেন। তাঁর আশে পাশে যে সমস্ত লোকজন উপস্থিত ছিলো তিনি তাঁদেরকে সালাম দিতে থাকলেন। আর প্রতিপার্শ্বের লোকেরও তাঁকে বলতে লাগলেন ওয়ালাইকুম আস-সালাম; স্বাগতম হে নবী দৌহিত্র। ইবনে যিয়াদ এর পোশাক দর্শনে কুফাবাসীরা ধারণা করেছিলেন ইনিই হযরত হুসায়ন (রাঃ) এবং অহর্নিশ এই মহান ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষাই তাঁরা করছিলেন।

ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ রাজপ্রাসাদের সামনে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে নো'মান ইবনে বশীর জানতে পেরেছিলেন কুফা নগরীতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর আগমন ঘটেছে নো'মান দ্রুত প্রাসাদের দরজা বন্ধ করে বলতে লাগলেন 'হে রসুল তনয় এখান থেকে চলে যান, ইয়যীদ আপনাকে এই শহর কখনই ছেড়ে দিবেন না। আমি এটা চায় না যে আমার রাজধানীতে আপনি নিহত হন। কুফাবাসী ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে ঘিরে অগ্রসর হতে লাগলো এবং তাঁরা নো'মানকে দরজা খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। পরক্ষণেই ১৭ জন অশ্বারোহী সৈন্য এসে সেখানে প্রবেশ করলে মুসলিম ইবনে আমর বললেন-

---

* ওবাইদুল্লাহ এর পিতা যিয়াদ হলেন সেই ব্যক্তি যাকে মুয়াবিয়া (রাঃ) ভাই বলে স্বীকার করতেন না। পরবর্তীতে নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তিনি যিয়াদকে ভাই এবং আপন পরিবারের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করে। লোকে বলে জাহেলী যমানায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর পিতা জনাবআবু সুফিয়ান সুমাইয়্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। তার ফলে সে অন্তসত্তা হয়। হযরত আবু সুফিয়ানও একবার এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন যে তাঁর বীর্যে যিয়াদের জন্ম। আল্লাহর রাসুলের স্পষ্ট নির্দেশঃ শিশু যার বিছানায় ভূমিষ্ঠ হয় তার, আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে প্রস্তর খন্ড। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা এ জন্য তাকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তার সাথে পর্দা করেন।- আল হস্তী আর, ১ম খন্ড পৃ.-১৯৬, ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ২২০-২২১।

Dhaka University Institutional Repository

হে লোকেরা দাঁড়াও ইনি হচ্ছেন তোমাদের আমীর ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ। এটা জানতে পেরে উপস্থিত সবাই বিমর্ষ হয়ে গেলো এবং চিন্তিত হয়ে পড়লো। ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ এসব বিষয় অবলোকন করলেন এবং প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

মুলিম ইবনে আকিলও ইবনে যিয়াদের আগমন সংবাদ লোকমুখে অবগত হলেন। এ সময় তিনি হানী ইবনে হানী নামক এক বিশ্বাসী মুসলমানের গৃহে অবস্থান করছিলেন।

ইবনে যিয়াদ কুফার গভর্ণরের দায়িত্ব গ্রহন করার পর নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের ডেকে একটা সভা আহ্বান করলেন এবং সবাইকে সম্বোধন করে বললেন দেখ তোমাদের কীর্তিকলাপ আমি সমস্তই জানতে পেরেছি। কে কে মুসলিমের কাছে হযরত হুসায়নের নামে বায়আ'ত করেছো সেটাও আমার জানতে বাকী নাই। আমি তাঁদের নাম জানি। তাঁদের চেহারাও আমি চিনি কিন্তু সবাইকে আমি প্রথমবারের মত ক্ষমা করছি। তবে আমি চাই, তোমরা সবাই এই মূহুর্তে হযরত হুসায়ন বায়াত ভঙ্গ করবে এবং পুনরায় ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকার করবে। আমার কথা যাঁরা অমান্য করবে তাঁদের সবাইকে পিষে মারা হবে এবং তাঁদের আত্মীয়, পরিজন, গৃহসমূহের কোন চিহ্নও রাখা হবে না। ভীরু অস্থিরমতি কুফাবাসীগণ এই এক ধমকেই কম্পিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী জনগন ইয়াযীদের দিকে ঘুরে গেল। আর এভাবেই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ভবিষ্যত বানী সত্যে পরিনত হলো।

ইবনে যিয়াদের কাছে মুসলিমের অবস্থান ছিল অজ্ঞাত। মুসলিমের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ প্রমান জুটলে অত্যধিক রক্তপাত ছাড়াই তাঁকে হত্যা করা সহজ হবে। ইবনে যিয়াদ একজন বিশ্বস্ত গোলামকে তিন হাজার দেরহাম সহ মুসলিমের অনুসন্ধানে প্রেরণ করলেন। তাঁকে বলে দেওয়া হল যে, সে নিজেকে হিমস এর একজন দূত বলে পরিচয় দিয়ে বলবে যে, বসরাবাসীদের পক্ষ হতে আমি এই সামান্য উপঢৌকন নিয়ে এসেছিলাম মুসলিমের কাছে বায়াত হবার জন্য। সেখানে হাজার হাজার জনগন হযরত হুসায়ন সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। আমি তাদের বার্ত্তা নিয়ে আগে এসেছি। এই কথামত গোলাম যেখানে দশ পাঁচ জন লোক একত্রে দেখল সেখানেই যে গভীর আকুলতার সাথে নিজের আবেদন প্রকাশ করল। অজ্ঞ লোকেরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে তাঁকে হানীর বাড়ী নিয়ে গেল। সে হানীর মারফৎ মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং রাত্রির মধ্যেই এসে ইবনে যিয়াদকে মুসলিমের অবস্থান ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে সংবাদ জানালো।

Dhaka University Institutional Repository

পরদিন হানী দরবারে আসল না। ইবনে যিয়াদ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। হানী আসলে ইবনে যিয়াদ তাঁকে বললেন-নির্বোধ বৃদ্ধ, নিজের বিপদ নিজেই টেনে এনেছো। তুমি না এতদিন আমাদের অনুগৃহীত ছিলে, এই বুঝি তার প্রতিদান, তুমি এখন ইয়াযীদের বিরুদ্ধাচারন করে নিজ গৃহে তাঁর শত্রুকে পুষছো? হানী ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ অস্বীকার করল। তখন ইবনে যিয়াদ পূর্ব দিনের সেই গুপ্তচরকে ডেকে তাঁর সামনে উপস্থিত করলেন এবং তাঁর দ্বারাই রাত্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন।

এতে হানী লজ্জিত হল এবং বললো, আমার গৃহে মুসলিম আছে সত্য কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় এসেছেন। অতিথিকে তাড়িয়ে দেয়া আরবের রীতি বিরুদ্ধ। ইবনে যিয়াদ বললেন আচ্ছা বেশ; এই বার তবে বাড়ী যেয়ে মুসলিমকে নিয়ে আসো। হানী এতে অস্বীকৃতি জানালো। ইবলে যিয়াদ তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গোর্জ্জ তুলে বৃদ্ধের মাথায় আঘাত করতেই মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো। তখন তাঁকে বন্দী করা হলো।

মূহুর্তে এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো যে, হানী নিহত হয়েছে। হানীর আত্মীয় পরিজন তখন তলোয়ার নিয়ে ইবনে যিয়াদের কাছে আসলেন তাঁর সাথে বুঝা পড়া করতে। মুসলিমও এ সংবাদ শুনেছিলেন। তিনিও তরবারী কোষমুক্ত করে তাঁদেরকে অনুসরন করলেন। হাজার হাজার লোক সেখানে সমবেত হয়ে হানীর ব্যাপারে হল্লা করতে লাগল। উত্তেজিত জনতা দেখে ইবনে যিয়াদ আদেশ করলেন রক্ষীদেরকে প্রসাদের দরজা বন্ধ করে উপর থেকে তীর নিক্ষেপ করো।

এই হট্রোগোলের ভিতর দিয়ে দিন কেটে গেল। সন্ধ্যা সমাগত হলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার বাড়ী চলে যেতে লাগল। কিন্তু মুসলিম বিন আকিলের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা রইলোনা। কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসাও করল না। সন্ধ্যায় অন্ধকারে পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুসলিম ভাবতে লাগলেন হানীর বাড়ীতে আর যাওয়া চলে না। অনির্দিষ্টভাবে রাজপথ দিয়ে চলতে চলতে তিনি নগরীর শেষ প্রান্তে চলে আসলেন এর পর আর কোন লোকালয় নাই।

নগরীর শেষ প্রান্তে ছিল একটা বাড়ী সেখানে একজন বৃদ্ধা রমনীকে দেখে মুসলিম তাঁর কাছে পানি খেতে চাইলেন। এই বৃদ্ধা মহিলা পানি পান করিয়ে মুসলিমকে বললেন আপনি আপনার পরিবারের কাছে চলে যান এখানে অবস্থান করা আপনার জন্য শুভ হবে না। মুসলিম বিন আকিল

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধা রমনীকে জানালেন এই শহরে তাঁর কোন ঘর বাড়ী বা আত্মীয় পরিজন নাই। মুসলিম মহিলার বাড়ীতে শুধুমাত্র ১টা রাত্রি যাপন করতে চাইলে মহিলা তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। মহিলা মুসলিমের পরিচয় সম্পর্কে অবগত হয়ে রাত্রের জন্য মুসলিমকে আশ্রয় দিতে রাজী হলেন। বৃদ্ধা মহিলা মুসলিমকে তাঁদের একটি অব্যবহৃত ঘরে থাকতে দিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি শান্তিতে থাকতে পারলেন না লোকজনদের আনাগোনা চলতেই থাকলো।

রাত্রে বৃদ্ধা মহিলার পুত্র বাড়ী এসে লোকজনদের আনাগোনা দেখে বিস্মিত হল। বৃদ্ধা বললেন তুমি এ সম্পর্কে কাউকে কিছু জানিও না, ইনিই হলেন মুসলিম বিন আকিল।

ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদ সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মুসলিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ জামে মসজিদে নামাজ আদায় করেন। সেই উপস্থিত জনমন্ডলীকে মুসলিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারাও কোন তথ্য জানাতে পারলো না। এমতাবস্থায় ইবনে যিয়াদ ঘোষনা দিলেন যে ব্যক্তি মুসলিম বিন আকিলকে ধরে আনতে পারবে তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে। ইবনে আছমে বলা হয়েছে তাঁকে দশ সহস্র দেরহাম পুরস্কার, ইয়াযীদ বিন হযরত মুআবিয়ার নিকট তাঁর উচ্চ সম্মান এবং তাঁর প্রতিদিনের প্রয়োজন পূরনের অঙ্গীকার করা হয়।

পরবর্তী সকালে ঐ বৃদ্ধার পুত্র আব্দুর রহমান ইবনে মুহম্মদ ইবনে আশ আছের কাছে গিয়ে তাঁদের বাড়ীতে মুসলিম ইবনে আকিলের অবস্থানের কথা জানালো। আব্দুর রহমান খুশীতে তাঁর পিতার কাছে এ সংবাদ প্রকাশ করলো। আব্দুর রহমানের পিতা ঐ সময় ইবনে যিয়াদের কাছেই অবস্থান করছিলেন। ইবনে যিয়াদ আব্দুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার খুশীর কারণ কি? তৎক্ষণাৎ আব্দুর রহমান তাঁকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দিলেন। সেই মুহূর্তে ইবনে যিয়াদ বললেন যাও অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে আমার সামনে হাজির কর। ইবনে যিয়াদ তাঁর সাথে আমর ইবনে হুরায়েছ আল মাখযুমীকেও পাঠালেন। তিনি ছিলেন পুলিশ বিভাগের প্রধান। তিনি আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনুল আশ আছ ৭০/৮০ জন ঘোড় সাওয়ারী সহ রওয়ানা হলেন।*

---

* তাবারী এবং কামিল গ্রন্থে বলা হয়েছে ওবায়দুল্লাহ, আমর ইবন হুবায়েছকে আদেশ করলেন, ইবনে আশ আছের সাথে কায়েস গোত্রের ৬০/৭০ জন লোককে পাঠানোর জন্য তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সালামীর নেতৃত্বে কায়েস গোত্রের ৬০/৭০ জন লোককে পাঠিয়ে দিলেন। মরুজ যাহাব গ্রন্থে ৩/৭২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে তার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সালামী। ইবনুল আছম গ্রন্থে ৫/৯২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-আল আছের নেতৃত্বে তিনশত বীরপুরুষ পাঠানো হয়েছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে যিয়াদ বাহিনী মুসলিমকে তার ঘরের চতুর্দিকে ঘিরে ফেললেও তিনি তা বুঝতে পারেননি। যিয়াদ বাহিনীর লোকেরা তরবারী কোষমুক্ত করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। তিনি তাঁদেরকে ঘর থেকে বাহির করে দেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তাঁদের আক্রমনে তাঁর দুটি ঠোট জখম হয়ে যায়। অতঃপর লোকেরা তার দিকে পাথর ও আগুনের বর্ষা নিক্ষেপ করতে শুরু করে এতে করে উভয়পক্ষের লোক ক্ষয় হয়। শেষ পর্যন্ত আব্দুর রহমানের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়ে মুসলিম তাঁর কাছে আসলেন। অতঃপর মুসলিম বিন আকিলের তরবারী কেড়ে নিয়ে তাঁকে একটা খচ্চরের পিঠে সওয়ার করানো হলো এখন তাঁর জীবন রক্ষাকারী আর কোন কিছুই বাকী রইলো না। মুসলিম যিয়াদ বাহিনীর মতলব বুঝতে পেরে কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি আফসোস করে বললেন ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন অর্থাৎ আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই এবং আল্লাহ্‌র দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। মুসলিমকে কান্নারত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁর পার্শ্ববর্তী এক ব্যক্তি বললেন এই হক পথের যারা পথিক তারাতো এরকম বিপদে কখনও কাঁদেনা। উত্তরে মুসলিম বললেন আল্লাহ্‌র শপথ আমি নিজের জন্য কাঁদছি না। বরং আমি হযরত হুসায়ন (রাঃ) এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পরিবারের জন্য কাঁদছি। কারণ তিনিতো তোমাদের উদ্দেশ্যে আজ অথবা আগামী কালই মক্কা হতে বের হয়ে পড়বেন। মুসলিম মুহাম্মদ ইবনুল আশ আছকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন দয়া করে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে মুসলিম বিন আকিলের অবস্থা সবিস্তারে বর্ণানা করে তাঁকে ফিরে যেতে বলেন। মুহাম্মদ আশ আছ সম্মতি প্রকাশ করে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর নিকট গমন করে তাঁকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন।*

এদিকে মুসলিম ইবনে আকিল রাজপ্রাসাদের সামনে আনীত হলে সেখানে তিনি দেখলেন সাহাবা কেরাম গণের অনেক সন্তান সন্ততি যারা উচ্চ উচ্চ পদে আসীন। এদেরকে মুসলিম চিনতে পারলেন এবং তারাও মুসলিমকে চিনতে পারলেন। সবাই মুসলিম এর ব্যাপারে ইবনে যিয়াদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। অথচ এ সময় মুসলিমের মুখমন্ডল ও কাপড় জখমের কারনে রক্তাত্ব হয়ে পড়েছিল। এই মূহুর্তে মুসলিম ছিলেন অত্যন্ত পিপাসার্ত। মুসলিম একটা ঠান্ডা পানির পাত্র দর্শনে পানি খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে উপস্থিত এক ব্যক্তি বলেন আল্লাহ্‌র কসম তুমি

* ইমামত ওয়া সিয়ামাত গ্রন্থে ৬/২পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-মুসলিমের অবস্থা জানিয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ)কে আমর ইবনু সাঈদ একটা চিঠি লেখেন। কিন্তু হযরত হুসায়ন (রাঃ) দূতের এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না এবং বললেন যা ঘটার তাতো ঘটবেই।

Dhaka University Institutional Repository

ঠান্ডা পানি পাবেনা, যতক্ষণ না তুমি দোযখের গরম পানি পান করো। জবাবে মুসলিম বলেন তোমার ধ্বংস হোক হে ইবনে নাহেলা। তুমিই গরম পানির বেশী উপযুক্ত এবং আমার চেয়ে তুমিই দোযখের উপযুক্ত। এমতাবস্থায় অবসন্ন ও পিপাশার্ত মুসলিমকে দেয়ালের এক পার্শ্বে বসিয়ে, ঐ বাড়ীর গোলাম ইমারত ইবনে উকবা ইবনে আবি মুয়িতকে পানি আনার জন্য বলা হল। সে একটা পাত্রে পানি, একটা রুমাল ও পানি পানের গ্লাস নিয়ে আসলো কিন্তু তিনি দুই তিনবার পানি পান করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন মুখ দিয়ে রক্ত ঝরার কারণে। পরক্ষনেই তিনি পানি পান করতে গেলে তখন পানির মধ্যে তাঁর উপরের একটি দাঁত পড়ে গেল। তখন মুসলিম বললেন আলহামদুলিল্লাহ যিনি আমার জন্য কিছু পানি বরাদ্ধ করেছিলেন।

ক্ষণকাল পরেই মুসলিম ইবনে যিয়াদের সামনে আনীত হলে তিনি তাঁকে সালাম দিলেন না। হারাসী গোত্রের এক লোক এই দৃশ্য দেখে মুসলিমকে বললেন তুমি গভর্ণরকে সালাম দিলে না কেন? উত্তরে মুসলিম বলেন সে যদি আমাকে হত্যাই করতে চায় তাহলে তাকে আমর সালাম দেয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি সে আমাকে হত্যা না করতে চায় তাহলে তাঁকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক সালম। অতঃপর ইবনে যিয়াদ মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করলেন হে ইবনে আকিল তুমি কি কুফাতে মানুষদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে একে অপরের মধ্যে যুদ্ধ বাধানোর জন্য আসনি? মুসলিম জবাব দিলেন আল্লাহর শপথ আমি এ উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি। এই কুফাবাসীদের বক্তব্য হলো তোমার পিতা এখানকার ভালো লোকদের হত্যা করেছে। তাঁদের রক্ত ঝরিয়েছেন। তাদের সাথে কেসরা এবং কায়সারের মত আচরণ করেছেন। অথচ আমি এখানে এসেছি তাঁদেরকে সৎকাজের আদেশ ও আল্লাহ্র কিতাবের দিকে আহ্বান করার জন্য। যিয়াদ বললেন হে ফাসেক তুমি এরূপ আদেশ করার কে? তুমি কি একজন ফাসেক নও, তুমি কি মদীনায় থাকতে শরাব পান করতে না। উত্তরে মুসলিম বলেন আল্লাহ্র শপথ নিশ্চয় আল্লাহ ভালোই জানেন তুমি মিথ্যা বলছো তুমি নাজেনেই এসব বলছো। আর এ ব্যাপারে আমার চেয়ে তুমি বেশী উপযুক্ত। অথচ তুমি যা বললে আমি তা নই। তুমিই মানুষের রক্ত প্রবাহিত করাতে পারদর্শী তুমিই নিস্পাপ লোকদের হত্যা করে থাক। তুমি রাগ ও ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষকে হত্যা করো। আর এরকম করার পরও তুমি দিব্যি হাঁসি তামাসায় লিপ্ত থাক। মনে হয় যেন তুমি কিছুই করনি। ইবনে যিয়াদ তাঁকে বলে হে ফাসেক আল্লাহ্ যা ফয়সালা করেছেন তার বিপরীত কাজ করতে তোমার আত্মাই তোমাকে বারন করছে অথচ এ সময় তার পরিবার পরিজনও তোমাকে দেখাতে পাচ্ছেনা। মুসলিম জীজ্ঞাসা করেন কার পরিবার

Dhaka University Institutional Repository

পরিজন ইবনে যিয়াদ বলেন আমিরুল মুমীনীন ইয়াযীদের পরিবার পরিজন। তিনি বলেন সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যকার সকল ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট আছি। যিয়াদ বলেন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে তোমাদের পৃথক কোন সিদ্ধান্ত রয়েছে। মুসলিম বললেন এটা তোমর ধারনা নয় বরং পূর্ণ বিশ্বাস। তখন ইবনে যিয়াদ বলেন আমি যদি তোমাকে হত্যা না করি তবে আমাকে এমনভাবে নিহত হতে হবে যেভাবে ইসলামের মধ্যে আর কাউকে নিহত করা হয়নি। মুসলিম বললেন তুমিই বরং এমন ব্যক্তি যে ইসলামের ব্যাপারে এমন কথা বল, যেমন কথা আর কেহ। কখনও এভাবে বলেনি। তুমি কি অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে মানুষ হত্যা করে তার অঙ্গ বিকৃত করনা? এতক্ষণ কথোপকথনের পর ইবনে যিয়াদ রাগতস্বরে তার দিকে এগিয়ে তাকে ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে গালি দিলেন। মুসলিম কোন প্রতিউত্তর করলেন না।

ইবনে জারীর আবি মাখনাফ থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্যরা শাইআ থেকে বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপে ইবনে যিয়াদ আমি তোকে হত্যা করবো। মুসলিম - যথার্থ কারণ ছাড়াই? ইবনে যিয়াদ - হ্যাঁ।

মুসলিম- আমার কিছু লোকদের সাথে একটু কথা বলার সুযোগ দিন।

ইবনে যিয়াদ - বলো।

মুসলিম দেখলেন তাঁর পার্শ্বেই তাঁর অনুসারীদের একজন। ইবনে যিয়াদের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি তাঁকে বললেন হে আমর, আমর এবং তোমার মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তোমার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। এটা গোপন বিষয় কাজেই তুমি দেয়ালের এক পার্শ্বে আস যাতে আমি সে গোপন বিষয় তোমাকে অবগত করতে পারি। কিন্তু সে মুসলিমের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানালো। অবশ্য ইবনে যিয়াদ অনুমতি দিলে সে সম্মত হয়ে মুসলিমের সাথে গেল। মুসলিম তাঁকে বললেন কুফাবাসীর কাছে আমি ৭০০ দিরহাম ঋনী আছি তুমি আমার পক্ষ থেকে এক্ষণ পরিশোধ করবে। এবং ইবনে যিয়াদের কাছ থেকে আমার মৃত দেহ চেয়ে নিয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে পৌছে দিও। কেননা আমি তাঁর কাছে লিখেছি কুফাবাসী তার সাথে আছে। অথচ আমি এখন তার উল্টা দেখতে পাচ্ছি। ওমর এ সমস্ত কথাগুলো ইবনে যিয়াদের কাছে প্রকাশ করলে সে এতে সম্মতি দেয়।[৬৬] সে এটাও বললো যদি হযরত হুসায়ন (রাঃ) আমাদের শর্ত না মানে তবে তাঁকে ফেরত যেতে দেয়া হবে না। আর আমাদের কথা মেনে নিলে তাকে কষ্ট দেয়ার আমাদের কোন

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন নেই। অতঃপর ইবনে যিয়াদ মুসলিম ইবনে আকিলকে উচ্চ প্রাসাদের উপরে নিয়ে যেতে বললেন। এ সময় মুসলিম আল্লাহ্‌র তাছবীহ, তাকবীর আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে থাকলেন, সমস্ত ফেরেস্তাদের উদ্দেশ্যে দোওয়া পড়লেন এবং বললেন "হে আল্লাহ তুমি আমার এবং যে সম্প্রদায় আমাকে ধোকা ও প্রতারণা করেছে তাঁদের সাথে ন্যায় বিচার কর"।

এ সময় বাকীর ইবন হামরান নামক এক ব্যক্তি তার ঘাড়ের উপর তরবারীর আঘাত করলেন।*

এভাবে মুসলিমে হত্যা করার পর তাঁর মাথা প্রাসা'দ এর উপর থেকে ফেলে দেয়া হয়। পরে আবার তার মাথা দেহের সাথে লাগিযে রাখা হয়। হানী ইবনে আরফাতা মুজহাজীকে ববারীর বাজারে হত্যা করা হয়। কুফার কুনাসা নামক স্থানে যখন তাঁকে গুলী বিদ্ধ করা হয়। তখন এই দৃশ্য দেখে একজন কবি একটি কবিতা পাঠ করেন। তাবারী এবং কামিল গ্রন্থে কবির নাম আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের আল আসা'দী বলা হয়েছে; কেহ বলেন তিনি হলেন কবি ফারজদক। আখবারুত তোয়ালের ২৪২ পৃঃ তে তার নাম আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়ের আল আসা'দী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফতুহ ইবনে আছমে বলা হয়েছে আসা'দ গোত্রের কোন এক লোক; মররুজ জাহাবে শুধু বলা হয়েছে কবি বললেন।

মুসলিম বিন আকিলের অবশিষ্ট সঙ্গী সাথীরাও ইবনে যিয়াদের হাত থেকে রক্ষা পেল না। তাঁদের কেউ হত্যা করে, সবার মাথা ইয়াযীদ ইবনে হযরত মুআবিয়ার কাছে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হল। এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সে সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে ইবনে যিয়াদ তাঁর কাছে একটা পত্রও লিখলেন।[৬৭]

ইতিপূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ বসরা থেকে কুফা যাত্রা করার পূর্বে ভীতি প্রদর্শন করে বসরাবাসীদের উদ্দেশ্যে একটা বক্তৃতা দেশ যাতে তারা কোন রকম বিভেদ ও কেতনা সৃষ্টি না করে, হিশাম ইবনে কালাবী এবং আবু মাখনাফ সাক্কআফ ইবনে জহির থেকে; তিনি আবু উছমান নাহদী থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) বসরার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে তার গোলাম সুলায়মান মারফত একটা পত্র লিখেন।**

---

* তারাবী ৬/২৮০ তে তার নাম সুলায়মান বলা হয়েছে এবং মাকজলে হুসাইন কেতাবে বলা হয়েছে তার নাম ছিল জিরা তিনি হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দুধ ভাই ছিলেন।

* তারাবী ৬/২৮০ তে তার নাম সুলায়মান বলা হয়েছে এবং মাকজলে হুসাইন কেতাবে বলা হয়েছে তার নাম ছিল জিরা তিনি হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দুধ ভাই ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন কর্তৃক প্রেরিত পত্রটি ছিল নিম্নরূপ-

"আল্লাহ তায়ালা মুহম্মদ (সঃ) কে তাঁর সকল বান্দাদের মধ্য হতে বাছাই করেছেন এবং নবুওয়াত দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর রেসালাতের জন্য বাছাই করেছেন। অতঃপর মৃত্যু দিয়ে তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি তাঁর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের অনেক উপদেশ দিয়েছেন আর তিনিও তাঁর প্রতি অর্পিত নবুওয়াতের দায়ীত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। আমরা তারই আহল, আত্মীয় উত্তরাধিকারী; একারনে অন্যান্য মানুষ থেকে আমাদের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রযেছে। এজন্য আমরা যে সব মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ চাই না। বরং ক্ষমা করাকেই পছন্দ করি। আর এ ব্যাপারে আমাদের কর্তব্যই বেশী। আমাদের পূর্ববর্তীগণ মানুষের প্রতি সদাচার ও তাদের কার্যাবলী সংশোধন করেছেন এবং সত্যকে প্রতির্ষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ তাদের প্রতি করুনা বর্ষণ করুন এবং আমাদের ও তাদের ক্ষমা করুন।

আমি তোমাদের নিকট এ পত্রটা প্রেরণ করলাম। আর আমি তোমাদের আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাতের দিকে আহ্বান করছি। কেননা সুন্নত ইতমধ্যেই লুপ্ত হয়ে গেছে এবং বেদআত চালু হয়েছে।

তোমরা আমার কথা শুন এবং আমার আদেশ মান্য কর। যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর তবে আমি তোমাদেরকে সত্য সুন্দরের পথ প্রদশ্র্ণ করবো। তোমাদের প্রতি সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।"

ইবনে কাছীর বলেন এটুকুই আমার কাছে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা এসেছে। কিন্তু শাইআ এর বর্ণানায় এর চেয়েও বেশী লিখা রয়েছে। তিনি বলেন সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে যারাই এ পত্র পড়লো তারাই চুপ করে থাকলো। কিন্তু মনযের ইবনুল জারুদ চুপ থাকালো না। সে মনে করলো এ ব্যক্তি ইবনে যিয়াদের গুপ্তচর সে তার কাছ থেকেই এসেছে। এ কারনে সে ঐ দূতের কাছে গিয়ে তার গর্দানের উপর আঘাত করলো।

এদিকে আনসাফ আলকারা নামক আরবের রাসাহ্ গোত্রের এক লোক বসরাবাসীদের কাছে বলতে লাগলেন আমি কুফা হতে গতকাল এসেচি এবং আগামীকাল কুফায় আমীরের সাথে মিলিত

Dhaka University Institutional Repository

হবো তোমরা এখন উসমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আবি সুফিয়ানের বায়আ'ত কর। তোমরা মত বিরোধ ও বিরোধীতা করা থেকে সাবধান থাকো।

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার বিরোধীতা করবে তাকে হত্যা করা হবে এবং তার আত্মীয় স্বজনকে সনাক্ত করা হবে এবং তাদের সবাইকে লাঞ্ছিত করা হবে যতক্ষণ না তারা আমার আদেশ মেনে নেয়। শেষ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ আমার বিরোধীতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। আমি সায়েদের পুত্র নিষ্ঠুরতায় তার চেয়ে কম নয়। আমার মামা চাচাও নিষ্ঠুরতায় আমার সমকক্ষ হতে পারেনি। অতঃপর সে বসরা হতে বের হলো এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুসলিম আমর আল বাহিনী তার সাথী হল। [৬৮]

আবু মাখনাফ সাকাআব ইবনে জহির থেকে, তিনি আওন ইবনে আবু জহিফা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে মুসলিম ইবনে আকিল জিলহজ্বের ৮ তাং মঙ্গলবার কুফা হতে বের হচ্ছিলেন আর ৯ই জিলহজ্ব বুধবারে নিহত হন। (আখবারুত তোয়াল গ্রন্থের ২৪২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে - তাঁকে ৬০ হিজরীর জিলহজ্ব মাসের ৩ তাং মঙ্গলবার হত্যা করা হয়।)

৬০ হিঃ ঐ দিন ছিল আরাফার দিন। আর হযরত হুসায়ন (রাঃ) ইরাকের উদ্দেশ্যে মক্কাহতে রোববারের দিন বের হন। আর মদীনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে তিনি ৬০ হিঃ রজব মাসের দুই রাত্রি অবশিষ্ট থাকতে রোববারে রওনা হন। শাবান মাসের ৩ তারিখ জুমার দিন মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি মক্কায় শাবান মাসের বাকী দিন গুলো এবং রমজান শাওয়াল এবং জ্বিলকদ মাস অবস্থান করেন আর তিনি মক্কা হতে জিল হজ্জ মাসের ৮ তারিখ মঙ্গলবার তার বিয়ার দিন বের হন।

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে মুসলিম ইবনে আকিল নিহত হওয়ার পূর্বে যখন কান্নাকাটি করতে থাকেন তখন তাঁকে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সালামী বললেন তুমি যার অন্বেষনে আছ-এর অন্বেষনে যারাই বের হয় তারা এরকম বিপদ আসলেও কখনো কাঁদেনা। তখন তিনি বললেন "আল্লাহ্‌র শপথ আমি নিজের জন্য কাঁদছিনা। নিহত হওয়াকে আমি ভয়ও করিনা বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যু বরণ করাকে পছন্দ করি। কিন্তু আমি কাঁদছি কুফাবাসীদের যারা আমাকে গ্রহণ করেছিল তাদের জন্য এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজনের জন্য অতঃপর মুহম্মদ ইবনুল আস আছ তাঁর সামনে বললেন-হে আল্লাহ্‌র বান্দা আমি আপনার পক্ষ হয়ে হযরত

Dhaka University Institutional Repository

হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে কি আপনার বার্তা পৌছে দিতে পারি না? আমার তো মনে হয় আজকেই তিনি তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে বাহির হয়ে পড়বেন। অথচ তিনিতো এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারছেন না।

জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে যেয়ে বলবে-মুসলিম ইবনে আকীল আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি জানিনা আজ সকালে অথবা সন্ধ্যায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে কিনা? তিনিতো আপনাকে আপনার পরিবার পরিজন নিয়ে ফিরে যেতে বলেছেন। আপনি যেন কুফাবাসীদের ধোকায় না পড়েন। কেননা তাঁরা আপনার পিতার সাথেও তাঁরা মত বিরোধ করেছে এবং তাঁকে হত্যা করেছে। কুফাবাসীরা আপনাকে এবং আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমি আপনার কাছে মিথ্যা বলছিনা।

ইবনুল আস আস বললেন আল্লাহ্‌র শপথ আমি এটা করবোই। অথচ আমি জানি ইবনে যিয়াদ আমাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন।

আবু মাখনার বলেন অতঃপর ইবনুল আস আজ ইয়াস ইবনুল আব্বাস এবং তাইঈকে ডাকলেন যিনি বনি মালেক ইবনে সামামা গোত্রের লোক। সেখানে একজন কবি ছিলেন সে তাকে বললেন আমার এই লেখাটি হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে দিবেন। সে তার কবিতার মাধ্যমে ঐ বিষয় লিখলেন যা মুসলিম ইবনে আকিল তাঁকে বলেছিলেন। অতঃপর তাকে একটা সাওয়ারী দেয়া হলে সে এটি নিয়ে চলে গেল।

যে জাবালা নামবা স্থানে হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে মিলিত হন তাঁর যাত্রার চতুর্থ দিনে। তারপর তিনি নিজে মুখে খবর দিলেন এবং পত্রটিও তাঁর হস্তগত করলেন। তখন হুসায়ন (রাঃ) বললেন আল্লাহ্ তালার পক্ষ থেকে যা হবার তাতো হবেই। আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করি আমিতো এখন বিপদের মধ্যে আছি।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ কুফার উদ্দেশ্যে হুসায়ন (রাঃ) ও ঘটনার পরম্পরা

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে উপর্যপূরী ইরাকবাসীদের দূত ও চিঠি আসতে লাগলো। ইতিমধ্যে মুসলিম ইবনে আকীলের আহ্বান হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে পৌছালে তিনি ইরাকবাসীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ইরাক যাত্রা করার সংকল্প করলেন। অথচ আকস্মিক কুফারপট পরিবর্তন এবং মুসলিমের হত্যার কথা তাঁর অগচরে রয়ে গেলো। তাঁর সাথীগণ তারাবিয়ার দিন রওনা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ঐ দিন ছিল মুসলিম হত্যার পূর্বদিন। মুসলিম ইবনে আকীল নিহত হয়েছেন আরাফার দিন।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ইরাক যাত্রার খবর প্রচারিত হওয়া মাত্র বহুলোক হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে মক্কা ত্যাগ করতে বারন করলেন। মক্কার লোকেরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে পুনরায় তাঁদের মহব্বত এবং কুফাবাসীরা তাঁর পিতা ও বড় ভাই এর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিল তা স্মরণ করিয়ে দিল।

সূফীয়ান ইবনে ওয়াইনা ইব্রাহিম ইবনে মাইসারা থেকে, তিনি তাওস থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) ইবনে আব্বাসের পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন যে আমার ক্ষমতা থাকলে আমি তোমাকে কোন ক্রমেই যেতে দিতাম না।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) কুফাবাসীদের চরিত্র আমি জানি কিন্তু ইয়াযীদ আমাকে নিস্কৃতি দিবেনা। আমি এখানে থাকলে আমার জন্য মক্কার পবিত্র ভূমিতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবে। হাদীস শরীফে আছে মক্কায় কোন এক সময় শোনিত স্রোত বহিবে। আমিই সেই শোনিত পাতের কারণ হতে চায় না। আবু মাখনাব হারেস ইবনে কা'আব আল ওয়ালাবি থেকে বর্ণনা করেন তিনি ওকবা ইবনে সিম'আন থেকে (কিন্তু তাবারী গ্রন্থে ওকবার স্থলে উৎবা বলা হয়েছে) বর্ণনা করেন হুসায়ন (রাঃ) যতক্ষন তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল হয়ে রইলেন তখন ইবনে আব্বাস পুনারায় হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে আসলেন এবং বললেন হে আমার ভাতিজা মক্কার মানুষেরা তোমাকে এতো চায় তথাপি তুমি এদেরকে ছেড়ে ইরাক যাচ্ছ এখনও বলো তুমি কি করবে? হুসায়ন (রাঃ) বললেন আমি দুই একদিনের মধ্যেই রওনা হওয়ার সংকল্প করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

হুসায়ন (রাঃ) কে তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল দেখে ইবনে আব্বাস তাকে আবারো বললেন ইরাকবাসীরা যদি তাঁদের গভর্ণরকে হত্যা করে তোমাকে ডাকে এবং তাঁদের শত্রুদের তাড়িয়ে শত্রুদের জায়গা জমি অধিকারে আনে তবেই তুমি তাঁদের কাছে যেতে পারো। কিন্তু তাঁদের আমীর যদি জীবিত থাকে তাহলে সেইতো তাঁদের উপর কর্তৃত্ব করে তাঁদের জন্য খুব প্রভাবশালী হবে। কারণ সেই আমীরের হুকুম সে দেশে চলবে। আমার মনে হচ্ছে তাঁরা শুধু তোমাকে ফেতনার উদ্দেশ্যে ডাকছে।* ইবনে আব্বাস আরো বলেন আমি বিশ্বাস করি মানুষেরা তোমাকে ভালবাসে এবং তোমাকে চায় কিন্তু এটা তোমার জন্য বিপদের কারণ হবে।

এর পরিবর্তে হুসায়নের ভাষ্য ছিল এরকম আমি আল্লাহ্‌র নিকট ইস্তেখারা করেছি। ভালোর প্রার্থনা করেছি। এখন আমি দেখবো সামনে কি ঘটে?[৬৯]

হুসায়ন (রাঃ) এর কাছ থেকে ইবনে আব্বাস বিদায় নিলে সেখানে ইবনে যুবায়ের প্রবেশ করেন। তিনিও হুসায়ন (রাঃ) কে কুফাযাত্রা থেকে বিরত রাখার জন্য বলেন - আমি বুঝতে পারছিনা আপনি কেন আমাদের ছেড়ে ঐ সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছেন? অথচ আমরা মুহাজেরীনদের সন্তান। তা ছাড়া কুফাবাসীদের সেখানে কোন কর্তৃত্ব নাই, কর্তৃত্ব আছে অন্যদের হাতে। এখন বলেন আপনি কি করতে চান?

হুসায়ন (রাঃ) জবাব দেন আমি এ ব্যাপারে নিজের নফসের সাথে পরামর্শ করেছি। কুফাবাসীদের মধ্যে থেকে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমাকে যাওয়ার জন্য পত্র দিয়েছেন। আমিও আল্লাহ্‌ কাছে ভালোর জন্য প্রার্থনা করেছি।

ইবনে যুবায়ের বলেন আমার ব্যাপারে এরূপ ঘটলে আমি কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে এভাবে বের হতাম না।**

---

* তাবারী ৬ষ্ঠ খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা, কামেল ৪র্থ খন্ড ৩৭২ তে বলা হয়েছে তাঁরা তোমাকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং হত্যাকান্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

** আখবারুত তোওয়াল গ্রন্থের ২৪৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ইবনে যুবায়ের হোসেনের কাছে পৌছালেন এবং বললেন আমি যদি হেরেম শরীফে অবস্থান করা অবস্থায় অন্য দেশের চিঠিপত্র প্রাপ্ত হতাম বিশেষ করে ইরাকের লোকেরা যদি আমাকে চিঠি লিখত এবং ভয় ভীতিহীন অবস্থায় তাদের কাছে যাওয়ার জন্য বলতো তাহলেও আমি তাদের আহ্বানে বের হতাম না। মরুজ-জাহাব ৩য় খন্ড ৬৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ইবনে যুবায়ের হুসায়ন (রাঃ) কে বললেন তাঁরা যদি এভাবে সাহায্যে সহযোগীতার কথা কলতো তবুও আমি তাদের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতাম না।

Dhaka University Institutional Repository

(এ কথাগুলো বলেও ইবনে যুবায়ের একটু ভয় পেলেন হয়ত হোসেন (রাঃ) তাকে কোন কড়া কথা শুনিয়ে দিবেন) বরং আপনি যদি এ স্থানে থেকে আমাকে এবং হেজাযবাসীদের ডাকেন আপনার হাতে বায়আ'ত হওয়ার জন্য তাহলে আমরা সবাই আপনার কাছে আগ্রহ সহকারেই বায়আ'ত হবো।[৭০] ইবনে যুবায়ের হুসায়ন (রাঃ) এর কাছ থেকে চলে গেে হুসায়ন (রাঃ) বললেন আমার কাজের ব্যাপারে ইবনে যুবায়ের একমত না অথচ মানুষেরা আমাকে ছাড়ছেনা।[৭১]

পরবর্তী দিন সকালেই ইবনে আব্বাস পুনরায় হোসেন (রাঃ) এর কাছে আসলেন এবং বললেন হে রাসূল বংশধর আমি তোমার ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করতে চাই কিন্তু পারছিনা। আমি ভয় পাচ্ছি এ পথে গেলেই তুমি মারা যাবে। কারণ ইরাকবাসীরা ধোকাবাজ। তুমি তাদের ধোকায় পড়োনা বরং তুমি এ দেশেই থাক। যদি তারা তাদের শত্রুদের দেশ থেকে বের করে দেয় তবেই তুমি তাদের কাছে যেতে পারো। এর চেয়ে তুমি ইয়ামেনের দিকে যেতে পারো কারণ সেখানে তোমার স্বগোত্রীয়, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তোমার পিতার অনুসারীরা রয়েছে। তুমি মানুষের থেকে একটু পৃথক থাকো। তুমি তাদের কাছে পত্র দাও এবং তোমার দাওয়াত প্রেরণ কর। আমি আশা করি এটাই তোমার জন্য ভাল হবে।

হুসায়ন (রাঃ) বলেন হে আমার চাচা আমি জানি তুমি আমার হিতাকাঙ্খী এবং দরদী। কিন্তু আমিতো যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

ইবনে আব্বাস বললেন একান্তই যদি যেতে চাও তবে পুত্র কন্যা ও পরিবার সঙ্গে নিবার দরকার নাই। কিছু যোদ্ধা সহ তুমি একাই যাও। কারণ কুফাবাসীরা খিলাফত প্রদানের জন্য শুধু তোমাকেই চায়। তিনি আরও বলেন আল্লাহ্র কসম আমি নিশ্চিত ভয় পাচ্ছি যে উসমান (রাঃ) কে যেমন তার আত্মীয় পরিজনদের মধ্যেই নিহত করা হয়েছিল অথচ সে সময় তারা তাকিয়ে দেখছিল আমার আশংকা এমন ভাবে তুমিও নিহত হবে। ইবনে আব্বাস বললেন ইবনে যুবায়ের একমাত্র তোমাকে দেখে শান্তি পায়। আল্লাহ্র কসম তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। তুমি যদি তার মনের কথা বুঝতে তবে তুমি সে অনুযায়ী কাজ করতে এই বলে ইবনে আব্বাস সেখান থেকে বাহির হয়ে ইবনে যুবায়েরের কাছে চলে গেলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ইবনে যুবয়েরের কাছে গিয়ে বললেন হে ইবনে যুবায়ের তোমার চক্ষু কি শীতল আছে? এ কথা বলেই তিনি কবিতায় - দুঃখের বাণী উচ্চারন করতে লাগলেন।[৭২]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) অত্যন্ত আবেগ আপ্লুত হয়ে বলতে লাগলেন, হে যুবাযের হুসায়ন (রাঃ) তোমাকে এবং এই হেজাযবাসীদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে সালীম এবং মানজীর ইবনে মুশাম্মান আল আসা'দী বলেন আমরা হজ্বের উদ্দেশ্যে কুফা থেকে মক্কা রওনা হই। সেখানে আমরা তারবীয়ার দিন প্রবেশ করি তখন আমরা দেখি পূর্বাহ্নে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এবং ইবনে যুবায়ের হজরে আসওয়াদ এবং কাবা শরীফের দরজার মাঝখানে দাঁড়িযে আছেন। তখন আমরা ইবনে যুবায়েরকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে বলতে শুনি আপনি চাইলে এখানে অবস্থান করেন। আমিও আপনার সাথে এখানে অবস্থান করবো। আপনি কি কর্তৃত্ব গ্রহণ করবেন? তাহলে আমি আপনার পক্ষে সমর্থন দিব। আপনার সৌভাগ্যের কারন হব। আপনাকে প্রয়োজনে উপদেশ দিব। আমরা কি আপনার হাতে বায়আ'ত হব? তখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) বলেন আমার পিতা বলেছে এই কাবা শরীফে কোন এক সময় কাবসা যবেহ্ হবে, আমিই সেই কাব্সা হতে চাই না। তখন ইবনে যুবায়ের বলেন তাহলে আপনি চাইলে এখানে অবস্থান করেন, আমাকে নেতৃত্ব দেন, আপনি আমাকে অনুসরন করেন। আমার বিরোধীতা করবেন না। তখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) বলেন আমিতো এটাও চাচ্ছি না।

এভাবে ইবনে যুবায়েরের বক্তব্য সম্পর্কে ২ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্যান্য শীর্ষ সাহাবী ও শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন নেতৃবর্গের বক্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেলেও তাঁদের মূলভাবে তেমন কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না।

শাবাবা ইবনে সওয়ার থেকে বর্ণিত তিনি বলে আমাদের নিকট ইয়াহইয়া ইবনে ইসমাইল ইবনে সালেম আল আসা'দী বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন যে আমি শায়বাকে ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি এমতাবস্থায় তিনি তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন সে হযরত হুসায়ন (রাঃ) মক্কা থেকে বের হওয়ার তৃতীয় রাত্রিতে তার সাথে সাক্ষাত ঘটে। তিনি তাঁকে জীজ্ঞাসা করলেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হযরত হুসায়ন (রাঃ) বলেন ইরাক। তাঁর সাথে ছিল ইরাকবাসীদের চিঠি ও বায়আ'ত নামা। তখন ইবনে ওমর বললেন আপনি তাঁদের কাছে যাবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হুসায়ন (রাঃ) তা অস্বীকার করলেন। তখন ইবনে ওমর তাঁকে একটা হাদীস শুনালেন একদা জীব্রাইল (আঃ) নবীর কাছে আসলেন এবং তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোন একটা গ্রহণের ব্যাপারে এখতিয়ার দিলেন। রাসূল (সঃ) আখেরাতকেই প্রাধান্য দিলেন। দুনিয়া গ্রহণের ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করলেন না। ইবনে ওমর আরো বললেন আপনিতো রাসূল (সঃ) এর শরীরের একটি অংশ। আল্লাহ্‌র কসম দুনিয়াতে কেউ আপনাদের সমকক্ষ হতে পারবেনা। আর এই পথ অবলম্বন করে থাকা আপনাদের জন্য উত্তম। তবুও হযরত হুসায়ন (রাঃ) ফিরতে রাজী হলেন না। ইবনে ওমর তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি আপনি যেন নিহত না হন।[৭৩]

অন্য সূত্রে সাঈদ ইবনে মিনা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি ইবনে ওমরকে বলতে শুনেছি হোসেন (রাঃ) তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে খুব তাড়াতাড়ী করেছে। আমি যদি তাকে পেতাম তাহলে ছাড়তাম না। কেননা তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে তিনি সহ তাঁর পরিবারের সবাই নিহত হবে। ইবনে ওমরের এই কথা দ্বারা পরোক্ষ ভাবে প্রমান হয় সে পরবর্তীতে ফাতেমীয়দের শাসনের কথা বলা হলেও সেটা মিথ্যা। ইমামগণের একাধিক সূত্রে বর্নিত হয়েছে যে ফাতেমী বংশের কেউই পরবর্তীতে রাজনীরি সাথে জড়িত ছিলেন না।[৭৪]

ওমর বিনতে আব্দুর রহমান মা আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন (রাঃ) রাসূলকে বলতে শুনেছেন যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) বাবেল দেশে নিহত হবেন।[৭৫]

আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান* (রাঃ) কে বলেন হে আমার পিতৃব্য পুত্র আপনিকি চিন্তা করেছেন ইরাকবাসীরা আপনার আব্বা ও ভাই এর সাথে কেমন আচরণ করেছিল। আর আপনি তাদেরি কাছে যাচ্ছেন। তারাতো দুনিয়া পূজারী (তাবারী এবং ইবনে আছিরে তাদেরকে দিরহাম ও দিনারের পূজারী বলা হয়েছে) তাঁরা আপনাকে হত্যা করবে। আপনাকে ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিলেও আপনাকে আপমানিত করবে। সুতরাং আপনি আপনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র স্মরনাপন্ন হন।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) বললেন আল্লাহ্‌ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

---

* তাবারী ৬/২১৫ তে বলা হয়েছে তার নাম ওমর ইবনে আব্দুর রহমান, মরুজ জাহাবে ৩/৬৯ এ বলা হয়েছে আবুবকর ইবনে হারিস ইবনে হিশাম।

Dhaka University Institutional Repository

আবুবকর বললেন উন্নালিল্লাহে-- রাজেউন।

এমনকি ইবনে জাফরও হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে ভীতি প্রদর্শন করে চিঠি লিখলে হুসায়ন (রাঃ) উত্তরে চিঠি দেন এই বলে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি রাসূল (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলাম তিনি আমাকে একটা কাজের আদেশ করলেন। এ স্বপ্নের ব্যাপারে আমি কাউকে কিছু বলব না যতক্ষন না আমি কাজটি করে ফেলছি।[৭৬]

ইয়াযীদ ইবনে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মক্কা যাওয়ার খবর জানিয়ে ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখেন এবং বলেন- হুসায়ন (রাঃ) কে আটকিয়ে রাখবেন। তাঁর নিকট পূর্বাঞ্চলীয় লোকেরা খিলাফতের দাওয়াত নিয়ে আসছে। আপনার নিকটও এ ব্যাপারে তথ্য ও খবর পৌঁছেছে যদি সে খোফতের দাবীদার হয়েই বসে তাহলে সে আমার ও তার মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদ করবে। আর আপনি হলেন আহলে বায়াতেব গুরুজন আপনিই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। আপনি তাকে খিলাফতের দাবীদার হওয়া থেকে নিষেধ করেন।[৭৭]

তিনি তাঁকে এবং মক্কা ও মদীনাবাসী কুরাইশদের উদ্দেশ্যে কবিতাও লিখে পাঠান-

ইবনে আব্বাস তার কাছে পত্র লিখেন আমি এমনটা চাইনা যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) ইরাকে গিয়ে এমন কাজে লিপ্ত থেকে যা তোমার অপছন্দ কিন্তু তাঁর প্রতি অত্যাধিক স্নেহ মমতা থাকার কারনে আমি তাঁকে সকল কাজে বাধা প্রদান করে উপদেশ দিতে পরি না।

অতঃপর ইবনে আব্বাস হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে এসে অনেক্ষণ কথাবার্তা বলেন। তিনি বলেন তোমাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বলছি তুমি ইরাকের পথে গমন করে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে না একান্তই যেতে চাইলে হজ্বের মৌসুমটা অপেক্ষা করে যাও- যাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের সাথে কথা বার্তা বলে তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারো। এর দ্বারা ১০ ই জিলহজ্বের কথা বলা হয়েছিল কিন্তু হোসেন (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং ইবনে জুবায়েরকে বললেন-তোমার চক্ষু কি শীতল হবে। তার সাথে আমার অন্তর বাধা অতঃপর তিনি তাঁর কাছ থেকে রাগত স্তরে বের হলেন - এবং দরজার কাছে ইবনে যুবায়েরকে দেখে বললেন হে ইবনে যাবায়ের তুমি যা পছন্দ করো তাতো হয়ে যাচ্ছে।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

এইভাবে কুফা যাত্রার প্রাক্কালে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিত্ববর্গ, আত্মীয় স্বজন, পরিচিতজন এবং জন সাধারন যে অকাট্য যুক্তি দেখালেন, তাতেও হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে তাঁর কুফা যাত্রা থেকে বিরত রাখা গেলনা। কাল বিলম্ব না করে তিনি কুফার পথে মক্কা থেকে যাত্রা করলেন।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) মদীনার বনী আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের লোকদের কে তার পার্শ্বে আসার আহ্বান জানালেন তারা ছিল পুরুষ, মহিলা, শিশু, নিজভাই ও কন্যা, স্ত্রী মিলে ১৯ জন। মুহম্মদ ইবনে হানাফিয়া মক্কায় এস হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে বললেন আজকে এইভাবে বের হওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। তিনি তাঁর ছেলেকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে যাওয়া থেকে বিরত রাখলেন এটা দেখে হযরত হুসায়ন (রাঃ) বললেন তুমি কি তোমার ছেলেকে এজন্য যেতে দিচ্ছনা আমি বিপদে পড়বো তাই? হানাফী প্রতিউত্তরে বললেন আপনি বিপদে পড়বেন তাতেই বা কি দরকার? আর কেনইবা আমরা আপনার সাথে বিপদে পড়বো? কুফাবাসীদের চাইতে আপনি কি আমাদের কাছে বড় বিপদে পড়তেন।

হুসায়ন (রাঃ) যখন কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন তখন তাঁর সাথে ৬০ জন কুফাবাসীও ছিল।* সেদিন ছিল ১০ই জিলহজ্ব সোমবার।

মক্কা থেকে কুফা প্রায় ৮ শত মাইল দূর। চিরন্তন রাস্তা এই পথে ইতিপূর্বে আলী (রাঃ) পরিবার কুফা থেকে মদীনা ফিরেছিলেন। আজ পুনঃ সেই পথে চলল ফতুহ ইবনে আসমে ৫/১২০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে তাঁর সাথে ৮২ জন দল ভূক্ত লোক ছিল এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পরিবার।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) কুফার পথে রওনা হওয়া মাত্র মারওয়ান এবং আমর ইবনু সাঈদ ইবনুল আস হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ব্যাপারে ইবনে যিয়াদকে সতর্ক করে চিঠি দিলেন। মুহম্মদ ইবনে যিয়াদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণানা করেন ইয়াযীদও ইবনে যিয়াদের কাছে চিঠি লিখলেন এই বলে যে আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কুফার পথে রওনা হয়েছে এ ব্যাপারে তুমি ও তোমার এলাকা পরীক্ষার সম্মূখীন হয়েছো। এখন তোমার কাজ দিয়ে তুমি নিজেকে পরীক্ষা করে

---

* ফতুহ ইবনে আসমে ৫/১২০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে তাঁর সাথে ৮২ জন দল ভূক্ত লোক ছিল এবং তাঁর আহলে বায়াত

Dhaka University Institutional Repository

নিতে পারো। তাঁর কিন্তু অনুসারীর অভাব নাই। আর একথা শুনেই ইবনে যিয়াদ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা কেটেই ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর এ সম্পর্কে বলেন সহী বর্ণনা হ'ল এই যে ইবনে যিয়াদ আসলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা ইরাকে পাঠায়নি।

অন্য এক রেওয়াতে আছে ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদের কাছে লিখলেন হুসায়ন (রাঃ) ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে তুমি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাক। তুমি তাঁকে পথিমধ্যেই বাঁধা প্রদান করো। তুমি তার সাথে যুদ্ধ করবা না যতক্ষণ না সে তোমার সাথে যুদ্ধ করে। আর তুমি তাকে যে সমস্ত প্রস্তাব দিবে সে সম্পর্কে কি ঘটে তা আমাকে অবগত করে চিঠি লিখবে।[৭৯]

ওকবা ইবনে সামআন বলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) যখন কুফার পথে রওনা হলেন আমর ইবনে সাঈদ এর দূত তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালো।* যিনি ছিলেন মক্কার গভর্ণর তার ভাই ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে বললেন ফিরে আসুন, আপনি কোথায় চলেছেন? কিন্তু হযরত হুসায়ন (রাঃ) কোন তোয়াক্কা না করে যেতেই থাকলেন তাদের প্রবল বাঁধাকে অগ্রাহ্য করে। তখন ইয়াহিয়া বললো হে হযরত হুসায়ন (রাঃ) আপনি কি আল্লহ্ কে ভয় করেন না? আপনি জামা আত থেকে বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন আর উম্মতের মধ্যে ঐক্য আসার পর আপনি তাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন। তখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) কোরআনের এ আয়াত পাঠ করে শুনালেন "আমার কাজের জন্য আমি দায়ী আর তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী আমি যা করছি তা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর তোমরা যা করছ তা থেকে আমিও মুখফিরায়ে নিলাম"[৮০]

হযরত হুসায়ন (রাঃ) পথি মধ্যে তাসয়ীম নামক স্থানে পৌছালে বুজাইর ইবনে জিয়াদ আল হুমাইরী কর্তৃক প্রেরিত এক বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। আনয়ীম মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী কিছুটা মক্কার নীকটবর্তী স্থানের নাম। তিনি ছিলেন ইয়ামেনের প্রতিনিধি। তাকে ইয়ামেনের পক্ষ হতে ইয়াযীদের দরবারে পাঠানো হচ্ছিল।

পথিমধ্যে কবি ফয়জদকের সাথ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাক্ষাত হয়। ফরজদ হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে সালাম দিয়ে বলেন আপনি যা ভাল মনে করেন আল্লাহ্ আপনার সেই বাসনা পূরন করান। হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁর কাছে কুফার অবস্থা জানতে চাইলেন। তিনি কবি সুলভ ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর দিলেন "কুফাবাসীদের অন্তর আছে আপনার সাথে, তরবারী আছে বনী উমাইয়াদের সাথে। আর ফয়সালাতো আসবে আসমান থেকে। আল্লাহ্ য ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে।"[৮১]

হযরত হুসায়ন (রাঃ) বলেন তুমি সত্যই বলেছো। আগে পিছে সমস্ত কাজের ফয়সালা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ্তো বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ফয়সালা যদি আমরা যা চেয়েছি তাই হয় তবেতো আল্লাহ্র শুকরিয়া। তিনিই তো শুকরিয়া পাওয়ার একমাত্র যোগ্য। যদি বিপরীত হয় তাহলেও আমরা সে পথ থেকে পিছাবো না।

হারেস আল ওয়ালাবি আলী ইবনে হোসেন ইবনে আলী থেকে বর্ণনা করেন আলী ইবনে হোসেন বলেন যখন আমরা মক্কা হতে বের হলাম তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর তার দুই ছেলে আওন এবং মুহম্মদ এর মারফতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে একটা চিঠি লিখলেন এই বলে যে আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনাকে বলছি, আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্র আপনি মক্কায় ফিরে আসবেন কারণ আমি ভয় পাচ্ছি আপনি যার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন সেখানে গেলে আপনি এবং আপনার আহলে বায়াত ধ্বংস হয়ে যাবেন।

আপনি যদি নিহত হন তাহলে ইসলামের আলো নিভে যাবে।* কেননা আপনি হচ্ছেন পথ প্রদর্শন কারীদের জ্ঞান স্বরূপ এবং মুমীনদের আশা ভরসা। সুতরাং আপনি ভ্রমনের জন্য তাড়াতাড়ী করবেন না। আমি এই চিঠির মাধ্যমে আপনাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি।**

আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর আমর ইবনে সাঈদের কাছেও গিয়ে বললেন আপনিও তাকে নিরাপত্তা, আত্মীয়াতার সম্পর্ক এবং সম্মান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিঠি লিখেন। তাহলে আশা করা যায় তিনি এ চিঠি পেয়ে ফিরে আসতে পারেন। তখন আমর বললেন আপনি যা ইচ্ছা তা লিখেন, আমি তাতে স্বাক্ষর করে দিব। অতঃপর জাফর আমর ইবনে সাঈদের পক্ষ হয়ে যা মনে আসলো লিখলেন। অতঃপর এই চিঠি নিয়ে তিনি আমর এর নিকট গেলেন। তিনি তাতে স্বাক্ষর করে দিলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর ইবনে সাঈদকে বললেন আপনি আমার সাথে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা স্বরূপ

---

* তাবারী ৬/২১৯ এবং ফতুহ্ ইবনে আছম ৫/১১৫ তে বলা হয়েছে যমীনের আলো নিভে যাবে।

** ফতুহ্ ইবনে আছমে আছে আমি ইয়াযিদ এবং সমস্ত উমাইয়াদের নিকট থেকে আপনার জান মাল সন্তান সন্ততি এবং আপনার আহলে বায়াতের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির অঙ্গীকার নিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

আপনার পক্ষ থেকে কাউকে প্রেরন করুন। ইবনে সাঈদ তাঁর ভাই ইয়াহিয়াকে তাঁর সাথে প্রেরণ করলেন।

তাঁর দুজনে রওনা হয়ে হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করে, ঐ চিঠি পড়ে শুনালেন। কিন্তু তিনি ফিরে আসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন আমি স্বপ্নে রাসূলকে দেখেছি। তিনি আমাকে একটা কাজের আদেশ দিলেন। আমি সেই কাজ করে তাঁর কাছে চলে গেলাম। তাঁরা দুজনেই জীজ্ঞাসা করলো স্বপ্নটি কি? তিনি বললে এই স্বপ্নের কথা আমি কাউকে বলব না। যতক্ষণ না আমি আল্লাহ্র সাথে মিলিত হই।[৮২] মুহম্মদ ইবনে কায়েস বলেন হুসায়ন (রাঃ) চলতে চলতে জিরামার হাজের নামক স্থানে যখন পৌছালেন তখন তিনি কায়েস ইবনে মাসহার সায়েদাবীকে একটা চিঠি দিয়ে কুফাবাসীরের কাছে পাঠালেন। চিঠিতে তিনি রিখলেন "পরম করুনাময় আল্লাহ্তালার নামে শুরু করছি"

এই পত্রটি হযরত হুসায়ন (রাঃ) ইবনে আলীর পক্ষ থেকে তার ভাই মুমীন মুসলমানদের নিকট প্রেরণ করছি। আপনাদের প্রতি সালাম। আমি আল্লাহ্র কাছে আপনাদের প্রশংসা করেছি যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই।

মুসলিম ইবনে আকীলের চিঠি আমার কাছে পৌছেছে যাতে আপনাদের উত্তম সিদ্ধান্ত এবং আমাকে সাহায্য করার ব্যপারে আপনাদের ঐক্য বদ্ধ হওয়ার খবর ছিল। আমি এখন আমার সেই পাওনা চাচ্ছি। আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছি। তিনি যেন আমাদের জন্য উত্তম ফয়সালা করেন। এবং আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। আমি মক্কা হতে জিলহজ্জ মাসের ৮ম তারিখে তার বিয়ার দিন মঙ্গলবার বের হয়েছি। আমার পত্র আপনাদের কাছে পৌছালে আপনাদের সিদ্ধান্ত গোপন রাখবেন। কেননা আমি আজকেই ইনশাআল্লাহ্ আপনাদের কাছে পৌছাবো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

মুহম্মদ ইবনে কায়েস বলেন মুসলিম এর পত্র তার নিহত হওয়ার ২৭ দিন পূর্বে পৌছেছিল। মুসলিমের পত্রে লেখাছিল তারা আপনার দূতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেননি। সমস্ত কুফাবাসী আপনার সাথে আছে। এই চিঠি পেয়ে আপনি চলে আসবেন। আসসালামু আলাইকুম।

Dhaka University Institutional Repository

কায়েস ইবনে মাসহার সাইদাবী যখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর চিঠি নিয়ে কুফার পথে যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে কাদেসিয়া নামক স্থানে তাঁকে হাছিন ইবনে নামির ধরে নিয়ে ইবনে যিয়াদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

ইবনে যিয়াদ বলল এই লোককে উচুঁ দালানের উপর উঠাও সে সেখান থেকে ঘোষণা দিবে "আলী ইবনে আবি তালেব এবং তার ছেলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) মিথ্যা বাদীর পুত্র মিথ্যাবাদী (নাউযুবিল্লাহ্) বলে সে যেন গালি দিতে থাকে।

ইবনে মাসহার সাঈদাবীকে উচুঁ প্রাসাদের উপর উঠান হ'ল। তখন তিনি সেখানে উঠে হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। এর পর তিনি বললেন হে লোকসকল নিশ্চয় হযরত হুসায়ন (রাঃ) আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি হলেন রাসূল কন্যা ফাতিমার পুত্র আর আমি তার দূত হিসাবে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি জিরামার হাজের নামক স্থানে আছেন। সেখান থেকে আমি পৃথক হয়ে দূত হিসেবে তোমাদের কাছে এসেছি। সুতরাং তোমরা তাঁর কথায় সাড়া দাও, তাঁকে মান্য কর। এই কথা শুনে ইবনে যিয়াদ তাকে এবং তার পিতাকে লানত দিতে শুরু করলেন।

অতঃপর ইবনে যিয়াদ হুকুম করলেন ওকে নিয়ে প্রাসাদের উপর উঠে কতল করে, ওর হাড়হাড্ডি বালির সাথে মিশিয়ে দাও। অতঃপর আব্দুল মালেক ইবনু আমীর আল বাজালী উঠে গিয়ে ইবনে মাসহার সাইদাবীকে জবাই করে ফেলল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে পত্র বাহক ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে বখতার যিনি হুসায়ন (রাঃ) এর দুধ ভাই ছিলেন তাকে উঁচু প্রাসা'দ থেকে ফেলে দেয়া হয়।

এদিকে হুসায়ন (রাঃ) কুফার দিকে আগাতে লাগলেন। কিন্তু কি সব ঘটনা ঘটে গেল হযরত হুসায়ন (রাঃ) সে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত রয়ে গেলেন।

বকর ইবনুল মাসআ'ব মাযানী বর্ণনা করেন যে হুসায়ন (রাঃ) সুদূর মক্কা থেকে যে পানি বহন করে এনেছিলেন সেই পানি ছাড়া অন্য কোন পানি তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি।

আব্দুল্লাহ ইবনে সলিম এবং মনজুর ইবনে মাসামমা আল আসা'দী বর্ণনা করেন যে আমাদের হজ্ব শেষ হওয়ার পর হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা হুসায়ন (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে দেখতে পেলাম যে তিনি একটি লোককে অতিক্রম করার করার সময় তাকে কিছু জীজ্ঞাসা করলেন। লোকটিকে তার পথে এগুতে দিলেন। অতঃপর আমরা লোকটির সাথে মিলিত হয়ে তাকে জীজ্ঞাসা করলাম কুফার লোকজনের খবর কি? তখন সে বললো আল্লাহ্‌র কসম আমি কুফা হতে ঐ সময় পর্যন্ত বেরহইনি যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম ইবনে আকীল এবং হানী ইবনে উরুয়া নিহত না হন। আমি তাদের দুজনকে বাজারের মধ্যে পা টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি। আমরা হোসেননের সাথে মিলিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি অনবরত "ইন্নাইল্লাহে ওয়া ইন্নায়িলাইহে রাজেউন পড়তে থাকলেন। তখন আমরা তাঁকে বললাম আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনি নিজের প্রাণ রাক্ষা করুন। হুসায়ন (রাঃ) বললেন তাঁদের দুজনের নিহত হওয়ার পর আমার আর বেঁচে থাকার কোন আগ্রহ নাই আমরা তাঁকে বললাম আল্লাহ আপনার কল্যান করুন। তখন হুসায়ন (রাঃ) এর সাথীদের মধ্যে একজন বললেন। আল্লাহর কসম আপনার মর্যদা তো মুসলিমের মত নয়। আপনি কুফায় পৌছালে লোকের আপনার দিকে দৌড়িয়ে আসবে।

তাঁদের দুজন ছাড়া অন্য একজন বর্ণনা করেন- যখন হুসায়নের সাথীরা মুসলিমের নিহত হওয়ার কথা শুনলো তখন আকীল ইবনে আবি তালেবের গোত্রের লোকেরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসলো এবং বললো আল্লাহ্‌র কসম আমরা এর প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত ফিরে যাবো না। অথবা আমাদের পরিনাম আমাদের ভাই এর মতই হবো। মরু আরবের সীমানা পার হয়ে কাফেলা যখন বাজরুত নামক স্থানে এসে পৌছলো তখন, হযরত হুসায়ন (রাঃ) মক্কা হতে বের হওয়ার পর কুফাবাসীদের কাছে এক লোককে পাঠিয়েছিলেন তিনি এসে মুসলিমের মৃত্যু সংবাদ শুনালো। হযরত হুসায়ন (রাঃ) হাজের নামক স্থানে পৌছে তাঁর সঙ্গী সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন- আমাদের পক্ষীয় লোকেরা আমাদেরকে অপদস্ত করেছে। এখন তোমাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারো। এতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। তখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে যারা মক্কা থেকে তাঁর সাথে রওনা হয়েছিল তাঁরা ব্যাতীত আর সবাই চলে গেল। যারা হোসেন (রাঃ) এর দল ত্যাগ করলো তাঁরা বুঝতে পেরেছিল এর পর মৃত্যু ব্যতীত আর কোন ফয়সালা নাই। মক্কা থেকে যারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথী হয়েছিল তারা এই মন স্থির করেই এসেছিলেন যে তাঁরা সর্বাবস্থায় হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথী থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

অতপর যখন তাঁরা সাহারা নামক স্থানে পৌঁছালো। তখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁর ছেলেকে বললেন সবাইকে তুমি পানি পান করাও।

কাফেলা আবার চলতে শুরু করে এবং ওকবা নামক স্থানে পৌছে হযরত হুসায়ন (রাঃ) দেখতে পেলেন পার্শ্বে ময়দানে এক বিস্তৃত তাঁবু।

ইয়াযীদ রাশাকী হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর আহলে বায়াতের কারো থেকে বর্ণনা করেন ঐ তাঁবু শীর্ষে একটা তা-লোয়ার ঝুলছিল এবং দ্বারে একটা তৈজস্বী অশ্ব রজ্জুবদ্ধ আছে। হযরত কৌতুহলী হয়ে অনুসন্ধানে জানতে পারলেন কুফার প্রসিদ্ধ সওদাগর আব্দুল্লাহ কুফী এই তাঁবুতে অবস্থান করছেন। সংবাদ পেয়ে আব্দুল্লাহ্ হযরত হুসায়ন (রাঃ) সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি বললেন ইয়া ইবনে রাসূল, আপনি প্রতারিত হয়েছেন। কুফাবাসী আপনার পক্ষ ত্যাগ করেছে, সেখানে আপনার নিধনের কাজ সম্পূর্ন। এই সংবাদ বলবার জন্যই আমি এখানে আপনার প্রতীক্ষায় আছি। হযরত বললেন, ভাই আব্দুল্লাহ্ তুমি যদি আমাকে প্রকৃতই ভালবাস তবে আমার সঙ্গে যোগদান করো না কেন, যাতে আপদে বিপদে আমার সাহায্য করতে পারো। আব্দুল্লাহ বললেন সমস্ত কুফা আপনার বিপক্ষে আর ইয়াযীদের সৈন্য সংখ্যা প্রচুর। সে ক্ষেত্রে আমি তাদের বিরোধীতা করতে অক্ষম। আমাকে ক্ষমা করুন। তবে আমার ঐ তাঁবুশীর্ষে তলোয়ার আর দ্বারে অশ্ব প্রস্তুত। আপনি যদি ইচ্ছা করেন তা নিয়ে চলে যেতে পারেন। এই অশ্বের সমান তেজোগামী অশ্ব ইরাকে আর নাই, আর এই তালোয়ার দিয়ে শত্রুকে এক আঘাত বই দ্বিতীয় আঘাতের দরকার পড়বে না। কাজেই আপনাকে কেউ অনুসরন করে কৃতকার্য হবে না।

হক ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত আহলে জান্নাতের দৃঢ় বিশ্বাসী হুসায়ন কি এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন? কাফেলা সামনে এগিয়ে চললো। এখানে যাত্রা শুরু করার পূর্বে হযরত হুসায়ন (রাঃ) আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করলেন হে আল্লাহ্ সকল বিপদ আপদে আপনি আমদের উদ্ধারকারী। সকল কঠিন অবস্থায় আপনি আমার ভরসা স্থল। সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আপনি আমার জন্য যথেষ্ট। আপনি সুখে দুখে সকল অবস্থায় আমার অভিভাবক। আপনি আমার আশা ভরসার চরম লক্ষ্য স্থল।

Dhaka University Institutional Repository

আবি মা'আ সার বর্ণনা করেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) যখন কারবালায় পৌছালেন। তখন তিনি লোকদের জীজ্ঞাসা কললেন এ জায়গার নাম কি? তাঁর বললো "কারবালা" তখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) বললেন কারব-ওয়া-বালা। (কঠিন ও মুসিবত)

হযরত হুসায়ন (রাঃ) কুফা অভিমূখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি জানতেন না যে আব্দুল্লাহ্ যিয়াদ তাঁর আগমন বার্তা অনেক আগেই অবগত হয়েছেন এবং সমস্ত রাস্তায় সৈন্য মোতায়েন করেছেন। পথিমধ্যে এক আরব বেদুইনকে দেখে হযরত হুসায়ন (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন মানুষের কি হয়েছে? তখন তারা বললেন আল্লাহ্র কসম আমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা শহরে প্রবেশও করতে পারছিনা আবার এখান থেকে বের হয়ে যেতেও পারছিনা। হযরত হুসায়ন (রাঃ) সেখান থেকে ইয়াযীদ ইবনে হযরত মুআবিয়ার দিকে যাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু তাদের ঘোড়া সমূহ কারবালা নামক স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। তাঁরা সেখানে শিবির সন্নিবেশ করে আল্লাহ্কে ডাকলেন এবং তাঁর কাছে শান্তি চাইলেন।

অদূরে ফুরত নদী। নির্জ্জন ময়দান, জনমানবের বসতিহীন এক ভয়াবহ বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এই সেই কারবালা যার নামে মানুষ আজো শিহরিয়ে উঠে।

মোহাঃ ইবনে কায়িন আল বাজালী হজ্ব শেষ করে এসে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে মিলিত হন। আবি মাখরামা আল মুরাদি এবং আরো দুজন ব্যক্তি আমর ইবনুল হাজাজ এবং মঈন আসসামীর তাঁর সাথে মিলিত হলেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন ইবনে যিয়াদ কাকে তাঁর দিকে পাঠিয়েছে? তখন ৫ হযরত হুসায়ন (রাঃ) গায়ে ছিল বরূদের যুব্বা।

দুই একদিন বিশ্রামের পরও শিবির সেখান থেকে সরান গেল না। কারন ইতিমধ্যে ওমর*-বিন-সা'দ ৪ হাজার সৈন্য নিয়ে কারবালা ময়দানে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি হযরত হুসায়ন (রাঃ) গতিরোধ করে দাঁড়ালেন।

---

* ওমর ছিলেন কডেসিয়ার যুদ্ধের বিখ্যাত সেনাপতি সাদ বিন ওক্কাসের পুত্র। সা'দ বিন ওক্কাস ছিলেন হযরত রাসূলের একজন সাহাবী এবং খলীফা ওমর মৃত্যুকালে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনের জন্য যে পঞ্চায়েত নিযুক্ত কনে সেই শালিসীর প্রধানদের মধ্যে অন্যতম। গোড়ার দিকে ওমর ইমাম বিদ্বেষী ছিলেন না। আব্দুল্লাহ্ যিয়াদ বহু অর্থ দিয়ে এবং মক্কা মদীনার গভর্নরের পদ স্থায়ীভাবে তাঁকে অর্পন করবেন এরূপ ওয়াদা করে কারবালা যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহনে তাঁকে বাধ্য করেন। কারবালা, বরকতুল্লাহ, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ভাষণ

হযরত হুসায়ন (রাঃ) বুঝতে পারলেন এই খানেই তাঁকে ইয়াযীদ সৈন্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন ঘটনা স্রোত কোন পথ অবলম্বন করে। আসার পথে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কয়েক জায়গায় সততা ও ন্যায়ের এক একটি অমোঘ বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। নিজের পরিবার পরিজন সহ শত্রু সেনাদের সামনেও ইসলাম ও ইসলামী খিলাফতের প্রয়োজনে নিঃস্বার্থ সংগ্রাম, মানবতা ও মাননীয় শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাধের মুখোমুখি রুখে দাঁড়াবার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এক জায়গায় তিনি বলেন- পরিস্থিতি কোথায় গিয়েছে তা তোমরা অনুধাবন করেছো? দুনিয়া পূন্য শুন্য হয়ে গেছে, সত্য মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, পূন্য থেকে জগত শূন্য হয়ে গেছে, সামান্য অংশ অবশিষ্ট রয়ে গেছে, আক্ষেপের বিষয় তোমরা কি দেখছ না যে, সত্যকে পিছনে ফেলে দেয়া হয়েছে আর অন্যায় অসত্যের ওপর আমল করা হচ্ছে। এমন কেউ নেই যে আজ সত্যের প্রতি হাত এগিয়ে দেয়। সময় এসেছে যখন মুমিন সত্যের পথে আল্লাহর ইচ্ছা কামনা করবে। কিন্তু আমি শহীদের মৃত্যুই কামনা করি। জালেমের সাথে জীবিত থাকাই একটি মহাপাপ।

এসব হৃদয় উজাড় করা বক্তব্য হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর অনুসারী ও অনুগতদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা, ও সংশয়হীনত্য ও সাহসের দীপ্তি জাগিয়ে তুললেও বিরোধী পক্ষের পাশবিকতা কে সামান্য তমও কমাতে পারেনি।

পরিস্থিতি রক্তক্ষয় ও অভিশাপের এক ভয়াবহ মোড়ে এসে পৌছলো। এরই মধ্যে পাঁচশ সৈন্যগিয়ে ফোরাত নদীর তীরে পাহারা বসালো যেন হুসায়ন (রাঃ) এর বাহিনীর কেউ সেখানে পৌছতে না পারে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৮ সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা

ইতিমধ্যে সেনাপতি ওমর হযরত হুসায়ন (রাঃ)কে লিখে পাঠালেন আপনি যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করে ইয়াযীদের আনুগত্য স্বীকার করুন। আমি চায়না যে আপনি আমার হাতে নিহত হন।

সঙ্গী সাথী ও শিশুনারীদের কথা ভেবে হযরত হুসায়ন (রাঃ) ওমরকে বললেন- হে ওমর আমি তোমাকে ৩টি প্রস্তাব দিচ্ছি এর যে কোন একটা আমাকে করার সুযোগ দাও-

১। আমি যেমনটি এসেছি তেমনি আমাকে ফিরে যেদে দাও।

২। যদি এটা অস্বীকার কর তাহলে আমাকে ইয়াযীদেরদের দরবারে যেতে দাও আমি তার হাতে হাত রাখাব। তারপর তিনি যা ইচ্ছা তা করবেন।

৩। যদি এটাও করতে অস্বীকার কর তাহলে আমাকে তুর্কী সীমান্তে যেতে দাও। সেখানে আমি আমরণ শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবো।

ওমর এ সমস্ত কথা একজন লোক মারফত ইবনে যিয়াদের কাছে পেশ করার জন্য পাঠালেন। ইবনে যিয়াদ তাকে ইয়াযীদের কাছে পাঠানোর ইচ্ছা পোষণ করলেন। তখন শীমার ইবনে যিলযাওশান বললেন কখনও না। এটা আপনি করবেন না। যতক্ষণ না সে আপনার কথা মেনে নেয়।[৮৩] অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে এই কথা ওমরকে জানাতে পুনরায় ফেরত পাঠানো হল।

ওমর এ কথা হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে অপগত করালেন যে-আপনি আগে ইয়াযীদের নামে বায়াত হবেন। তারপর আপনি যিয়াদ মারফত ইয়াযীদের কাছে প্রেরিত হবেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) ইবনে যিয়াদের এই ধৃষ্টতা পূর্ণ জবাবের উত্তরে বললেন -আল্লাহ্‌র কসম এটা আমি কক্ষনও করবনা।

ওমর একথাও ইবনে যিয়াদকে লিখে পাঠালেন। তিনি উত্তরে বললেন না কখনই না। হযরত হুসায়ন (রাঃ) আগে আমার কাছে বায়াত হবে, তারপর অন্যকোন কথা।

পহেলা মহররম হযরত হুসায়ন (রাঃ) কারবালায় পৌঁছান। এই সব আদান প্রদানে ৭দিন কেটে গেল। অষ্টম দিবসে আব্দুল্লাহ্ যিয়াদ বিরক্ত হয়ে গেলেন। ওমর হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যার ব্যাপারে গড়িমসি করতে লাগলেন। এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। ইবনে যিয়াদ

Dhaka University Institutional Repository

শীমার বিন যিলযাওশানকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে বলেন ওমর বড় শৈথিল্য করছে, তুমি কারবালা রওনা হও। সেখানে আমার কথামত কাজ না হলে তুমি ওমরকে বলবে- হয় তুমি অগ্রসর হও নয়ত তুমি সেনাপতিত্ব গ্রহন করবে এবং তুমি নিজে কার্য্যোদ্ধার করবে। ৮ই মহররম শীমার রওনা হয়ে ৯ তারিখে ওমরের সৈন্যদলে যোগদান করল। ইতিপূর্বে ওমর সৈন্যদলকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হতে হুকুম দিয়েছিলেন। তখন ওমরের কাছে ৩০ জন কুফী ছিল তাঁরা ওমরকে বলল রাসূল কন্যা ফাতেমার পুত্র তোমাদের কাছে ৩টি প্রস্তাব করল তার একটিও তোমরা গ্রহন করলে না ?

এই কুফীগন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষ নিল এবং তার পক্ষ নিয়েই যুদ্ধ করলো।

সা'দ ইবনে ওবায়দা বলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিহত হওয়ার স্থানে দেখলাম জুব্বা, বন্ধন, কোমরবন্ধ ও তরবারী।

আমর ইবনে খালেদ আততাহাবী বলেন তাঁর হাতে ছিল তীর ধনুক। আমি দেখলাম যে তীরটা তাঁর কোটি বন্ধের সাথে ঝুলানো আছে। হেলাল ইবনে ইসাফ বর্ণনা করেন ইতিপূর্বে ইবনে যিয়াদ লোকদের আদেশ করেন তোমরা সিরিয়া এবং বসবার রাস্তা পাহারা দাও যেন কোন লোক এখানে ঢুকতে না পারে এবং কেউ বেরও না হতে পারে।

ওমর ইবনে যিয়াদের আদেশ অনুযায়ী যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে খবর পাঠান ইয়াযীদকে খলীফা হিসাবে মেনে নিযে নিঃশর্ত আত্মসমর্থন নয়ত যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই।

হেলাল ইবনে ইসআব বলেন- এ সময় ইবনে যিয়াদ ওমর বিন সা'দ, শীমার বিন যীলযাওশান এবং হাসীন বীন খামীরকে হযরত হুসায়ন (রাঃ)-এর দিকে প্রেরণ করেন।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁদেরকে আল্লাহ্র দিকে এবং শান্তির দিকে আহ্বান করে বললেন যেন তারা তাকে আমীরুল মোমেনীন ইয়াযীদের কাছে গিয়ে হাতে হাত রাখার সুযোগ করে দেয়। তারা বললো না কখনই না। যত ক্ষণ না তুমি ইবনে যিয়াদের কথা মেনে নাও।

এসময় তাদের মধ্যে হুর ইবনে ইয়াজিদ আল হানযালি নামক এক ব্যক্তি ছিল। সে তখন তার ঘোড়ার উপরে সাওয়ার ছিল। যখন সে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর এ কথা শুনতে পেল তখন সে

Dhaka University Institutional Repository

বলল তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ভয় করনা? তোমরা কি তাঁর এ কথাকে মেনে নিবে না? তিনি যদি তুর্ক অথবা দায়লামের দিকে চলে যেতে চান তাহলে তাঁকে বাধা দেয়া ঠিক হবে না। এরপরও কি তোমরা ইবনেযিয়াদের কথার উপর আমল করবে? কিন্তু ইবনে যিয়াদ বাহিনীর লোকেরা তাঁর কোন কথাই শুনলো না তখন সে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দিকে যেতে লাগলো। তখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) পক্ষীয় লোকেরা মনে করল হুর তাদেরকে হত্যা করতে আসছে। কিন্তু যখন সে তাঁদের নিকটবর্তী হল তখন তিনি তাঁদেরকে সালাম দিলেন এবং ইবনে যিয়াদের লোকদের গালি গালাজ করতে লাগলেন এবং তাঁদের দুজন লোক নিহত করে, নিজেও নিহত হলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতি রহম করুন।

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হুর ইয়াযীদ পক্ষীয় সেনাপতি। তিনি এক হাজার সৈন্য নিয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) গতিরোধ করার জন্য পথ আগলিয়ে ছিলেন। তিনি সামান্য কয়জন অনুচর নিয়ে সামনের পথ ঘাট পর্যবেক্ষণে বাহির হয়েছিলেন। তিনি ইমামকে সালাম জানিয়ে আদরের সাথে বললেন-ইয়া সৈয়দ আপনি আর অগ্রসর হবেন না। কুফা আর আপনাকে চায় না। আপনি দক্ষিনে অথবা বামে দেখুন কিন্তু মদীনার পানে যাবেন না। সে পথ আপনার জন এখন বিপদসঙ্কুল। আব্দুল্লাহ্‌ যিয়াদের নিয়োজিত প্রধান সেনাপতি ওমর বিন সা'দ সসৈন্যে আপনার দিকে আসছেন। তার পৌছাবার বেশী বিলম্ব নাই। আর মদীনার রাস্তায় সতর্ক প্রহরী মোতায়েন রয়েছে। আপনি হয়ত জানেননা যেদিন আপনি ইরাকের সীমান্ত অতিক্রম করেছেন সেইদিন হতেই আপনার গতিবিধি প্রত্যহ গুপ্তচর মারফৎ আব্দুল্লাহ্‌ যিয়াদের গোচরীভূত হচ্ছে। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আমি ইয়াযীদের বেতনভোগী হলেও মনে প্রাণে নবী বংশকে শ্রদ্ধা করি।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাফেলা উত্তর পূর্ব দিকে কুফা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল আর সেনাপতি হুর তার সঙ্গে সঙ্গে রইলেন। তিনি হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে বললেন, আমার উপর আব্দুল্লাহ্‌ যিয়াদের হুকুম আপনাকে বন্দী করা। কাজেই আমি আপনাকে প্রকাশ্যে ছেড়ে দিতে পারিনা। তা দিলে আমার গর্দ্দান যাবে। রাত্রের অন্ধকারে আপনি কাফেলা সহ অন্যদিকে চলে যাবেন, যেন আমি কিছুই জানতে পারিনি।

হোরের কথায় হযরত হুসায়ন (রাঃ) সন্দেহ করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে হোর কি শত্রু না মিত্র। কাফেলা আরও এগিয়ে চলল। সন্ধা সমাগমে তাঁরা কুফা হতে প্রায় ৪০ মাইল

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর পশ্চিমে, ফোরাতের পশ্চিম তীরে এক ময়দানে উপনীত হলেন। অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে আসল আর পথ দেখা যায় না কাফেলা সেখানে বিশ্রাম কতে থামল। হোর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরবর্তীতে হোর যখন দেখলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তখন তিনি ইয়াযিদ পক্ষ ত্যাগ করে হযরত হুসায়ন (রাঃ) জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করতে কৃতসংকল্প হয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে যোগদেন। আর তার ভাই ও গোলাম সহ ৩০ জন অনুচরও তাকে অনুসরণ করেন।

কুফার যাত্রাপথে তরমাহ ইবনে আদী নামক এক ব্যক্তির সাথেও হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সফরসঙ্গীদের সংখ্যা দেখে বিস্মিত হয়ে বলেন এই সফরসঙ্গী নিয়ে আপনি যারা সৈন্য বাহিনী ও অশ্ববাহিনীতে পূর্ণ তাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনি আপনার জীবনের প্রতিসতর্ক হন। আপনি যদি গাসসান ও হামীর এলাকায় যেতে চান তাহলে আমি নিজে আপনাকে সেই গ্রামে পৌছে দিতে পারি। সেখানকার তাঈ গোত্রের দশ হাজার লোকের জিম্মাদার আমি। এসমস্ত লোকেরা আপনার পক্ষে তরবারী চালাবে, কোন শত্রু আপনাকে স্পর্শ করতে পারবেনা।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) সফর সঙ্গীসহ পানি পানের বিরতির পর চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পথিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। ফজরের সময় হলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) সাথীদের নিয়ে নামায পড়ে দ্রুত সাওয়ারী হয়ে রওনা দিয়ে নিনুয়া নামক স্থানে পৌছালেন। ইবনে আছমে ঐ জায়গার নাম গাজিরিয়াহ বলা হয়েছে। স্থানটা কুফার নিকটবর্তী কারবালার এক গ্রাম যা কুফার সুওয়াদ এলাকায় অবস্থিত।[৮৪] এ স্থানে সওয়ার হওয়ার পর সবাই দেখতে পেলেন কুফার দিক থেকে এক লোক অগ্রসর হয়ে হুর ইবনে ইয়াযীদের কাছে এসে তাকে সালাম দিল কিন্তু হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে সালাম দিল না। তাবারীতে এ লোকের নাম মালেক ইবনে নুছায়ের আলবুদ্দী বলা হয়েছে। সে হুরকে একটি পত্র দিয়ে বললো এটা ইবনে যিয়াদ পাঠিয়েছেন। এই চিঠির বিষয়বস্তু ছিল এরকম যেন হোসেনকে ইরাকের দিকে আসার পথে কোন গ্রামের লোক অথবা অন্য কেউ অন্যায় আচরণ না করে অথবা বন্দী না করে। সেদিন ছিল ৬১ হিজঃ মহররম মাসের ২য় তারিখ বৃহস্পতিবার।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর দিন ওমর ইবনে সা'দ ৪ হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁর সম্মুখীন হলো। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি ওমর বিন সা'দ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলনা। তাঁর বোনের ছেলে হামজা বিন মুগীরাহ্ বিন শুবা ওমর বিন সা'দকে সাবধান করে দিয়ে বলেন আল্লাহ্র কসম এ দেশের সবকিছু ছিড়ে চলে যাওয়া তোমার জন্য প্রিয় হযরত হুসায়ন (রাঃ) রক্তপাত করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়ে তিনি বলেন ইনশাল্লাহ্ আমি তাই করবো।

ওমর বিন সা'দ অনেক সময় ধরে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে কথা বলেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) যে তিনটি শর্ত রাখেন সেগুলো ওমর ইবনে যিয়াদের কাছে লিখে জানালে যিয়াদ এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তৎক্ষনাৎ শীমার বিন যিল-যওশান দাঁড়িয়ে বলে উঠে আল্লাহ্র কসম এরকম শর্ত মেনে নিবেন না। যতক্ষণ না হযরত হুসায়ন (রাঃ) তার সাথীসহ আপনার আদেশ মেনে নেয়। শীমার আরো জানা তার কাছে খবর পৌছেছে যে ইবনে সা'দ এবং হুসায়নের সাথে অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ আলোচনা করেছে।

উকবা বিন সামআন বলেন -আমি মক্কা থেকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর নিহত হওয়ার স্থান পর্যন্ত তাঁর সাথী ছিলাম, এবং তিনি যে সব কথাবার্তা, বক্তৃতা করেছেন সবই আমি শুনেছি। কিন্তু আমি একথা তাঁকে বলতে শুনিনি যে তিনি ইয়াযীদের দরবারে গিয়ে তার হাতে হাত রেখে বায়াত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি পাহাড়িয়া এলাকার দিকেও যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। বরং তিনি তাদের নিকট দুটি প্রস্তাবের যে কোন একটা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। (১) যেখান থেকে তিনি এসেছেন সেখানে তাকে ফিরে যেতে দেয়া হোক। (২) প্রসস্থ জমিনের উপর লোকালয়ের মধ্য দিয়ে যেতে দেয়া হোক যাতে লোকেরা তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।[৮৫]

ইবনে যিয়াদ প্রথমে নমনীয় হলেও শীমারের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওমর বিন সা'দকে তার শৈথিল্যের ব্যাপারে ধিক্কার দিয়ে চিঠি দিয়ে বল্লেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) যদি তার অস্বীকৃতি জানায় তাহলে যেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) সাথীদেরসহ তাকে হত্যা করা হয়। কেননা তারা হচ্ছে বিদ্রোহী। এ সময় আবী মুহাল্লা ইবনে যিয়াদের কাছে তার ফুফু উম্মুল বানীন বিনতে হাজাম এর ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে নিরাপত্তা চাইলো। তার ছেলে মেয়েরা হলেন আব্বাস, আব্দুল্লাহ্, জাফর ও উসমান ইবনে যিয়াদ এদের ব্যাপারে নিরাপত্তা দিয়ে পত্র লিখলেন ৯ই মহররম বৃহস্পতিবার আব্বস আবদুল্লা জাফর ও উসমানকে তাঁদের নিরাপত্তার ব্যাপারে শীমার তাঁদের অবগত করলে তাঁরা এক

Dhaka University Institutional Repository

বাক্যে বলেন তোমরা আমাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছ অথচ রাসূলের সন্তানদের ব্যাপারে দিচ্ছ না। এরকম নিরাপত্তার আমাদের কোন দরকার নাই।

এদিকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) স্বপ্নে দেখেন রাসুল (সাঃ) তাকে বলছেন তুমিতো আমাদের কাছে চলে আসবা। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর স্বপ্নের কথা শুনে তাঁর বোনের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং তিনি বিলাপ করতে থাকেন। হুসায়ন (রাঃ) তাঁকে চুপ করতে বলেন। এদিকে ২০ জন ঘোড়সাওয়ারী (ইবনে আছমে বল ৫/২৭৬ এ বলা হয়েছে ১০ জন ঘোড় সাওয়ারী)। হযরত হুসায়ন (রাঃ) দিকে অগ্রসর হয়ে বলেন আমাদের কাছে গভর্নরের হুকুম এসেছে যে হয় তোমরা তার হুকুম মেনে নিবে নতুবা আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো। হযরত হুসায়ন (রাঃ) বলেন তিনি গভর্নরের আদেশ মেনে নিবেন না।

হুসায়ন (রাঃ) এর সিদ্ধান্ত ওমর বিন সা'দ শীমারকে জানিয়ে এ ব্যাপারে তার কি মত জানতে চাইলে, শীমার বলেনঃ আপনি সেনাপতি আপনার মতেই কাজ হবে।

এই রাত্রে হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁর সঙ্গীদের বললেন আসো নামাজ পড়ি এবং আল্লাহকে ডাকি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহ্ নিশ্চয় জানেন আমি তাঁর নামাজ ও কোরআন তিলওয়াত, ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাঁর কাছে দোওয়া করাকে ভালবাসি। হযরত হুসায়ন (রাঃ) রাত্রের প্রথম ভাগে তাঁর আহলে বায়াতকে ওসিয়ত করলেন এবং বক্তৃতা করলেন। আল্লাহ্র শুকরিয়া, ও প্রশংসা করে, রাসুলের প্রতি দরুদ পাঠ করে আবেগ আপ্লুত ভাবে তাঁর সাথীদের বললেনঃ তোমাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা চলে যেতে পারো। আজকের রাত খুবই কঠিন রাত। প্রতিপক্ষের লোকেরা শুধু আমাকেই চায়। তারা আমাকে পেলে আর কাউকে তালাশ করবে না। সুতরাং তোমরা চলে যাও; দেখ এ ব্যাপারে আল্লাহ্র কি ফয়সালা। আকীল গোত্রের লোকদেরকে কেউ বললেন তোমাদের জন্য তোমাদের ভাই মুসলিমের শাহাদতই যথেষ্ট। তোমাদের অনুমতি দিলাম তোমরা চলে যাও। একথা শুনে তাদের সবাই একবাক্যে বললেন আল্লাহ্র কসম আমরা এরকম করবো না। বরং আমরা আপনার হাতে আমাদের জীবন মাল ও আত্মীয় স্বজনকে সোপর্দ করলাম। আপনার সিদ্ধান্ত হাছিল না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনার সাথী হয়ে যুদ্ধ করবো। এরকম ভাবে মুসলিম বিন আওসাজা আল আসা'দী, সাঈদ ইবন আবদুল্লাহ, আল হানাফীও বললেন। হুসায়ন (রাঃ) এর সাথীদের সবাই একের পর এক একই রকম কথা বললেন। তাঁরা সবাই হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে বললেন আমরা আপনার

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পৃথক হবোনা। আমাদের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও আমরা আপনাকে রক্ষা করব আর আমাদের হাতকে শক্তিশালী করে আপনার শরীরকে রক্ষা করব। আমরা যখন আপনার সামনে নিহত হব তখন আপনি আমাদের সম্পর্কে যা ভালো মনে করেন তা করবেন।

হারেস বিন কাব এবং আবু যিহাক আলী বিন হযরত হুসায়ন (রাঃ) -(যয়নুল আবেদীন) থেকে বর্ণনা করেন- যেদিন সকালে আমি আমার পিতার পাশে ছিলাম আমার ফুফু যয়নব আমার অসুস্থতার কারণে আমাকে সুশ্রুষার করছিলেন এবং কবিতা পাঠ করছিলেন। এই কবিতা তিনি দুই/তিনবার আবৃত্তি করলেন। এতে আমিও তা মুখস্থ করে ফেললাম এবং এর মর্মও বুঝজতে পারলাম। আমরা সবাই বুঝতে পারলাম বিপদ নিকটবর্তী হয়েছে। আমার ফুফু আমার পিতার নিকটবর্তী হয়ে বললেন হায় বিপদ ! যদি মৃত্যু আমাদের থেকে ফিরে যেতো। এভাবে কথা বলতে বলতে ফুফুর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। আমার পিতা তাঁর মুখে পানির ছিটা দিয়ে বললেন - "হে বোন আল্লাহ্কে ভয় কর, ধৈর্য্য ধর আল্লাহ্র ফায়সালার উপর স্থির থাক। জেনে রেখো দুনিয়ার বুকে যা কিছু আছে সবই মৃত্যু বরন করবে। এক মাত্র মহান সত্ত্বা সৃষ্টি কুলের স্রষ্টার অস্তিত্ব ছাড়া সব কিছুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। তিনিই কাউকে তার ক্রোধের মাধ্যমে এবং কাউকে ইজ্জত গিয়ে মৃত্যু দেন। তাদের সবাইকে তার নিকট ফিরে যেতে হবে। সুতরাং একমাত্র তারই ইবাদত কর। তিনিই একক সত্ত্বা। জেনে রেখো আমার পিতা আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, আমার এবং তাদের জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রাসূল (সাঃ) এর জীবন উত্তম চরিত্রের আদর্শ। সুতরাং আমার ইন্তেকালের পর তোমরা ভেঙে পড়োনা। ফুফুর হাত ধরে তিনি তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসলেন।

এরপর আমার পিতা বের হয়ে তার সাথীদের কাছে গিয়ে আদেশ করলেন সবার তাঁবুকে খুব কাছাকাছি করার জন্য। যেন একটা থেকে অন্যটার মধ্যে সহজেই চলাচল করা যায়। আর শত্রুদের উদ্দেশ্যে কেউ যে একা সিদ্ধান্ত না নেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁর সাথীদের নিয়ে নামাজ, ইস্তেগফার দোওয়া এবং আল্লাহ্র নিকট কান্নাকাটির মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করলেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এ সময় কুরআনের সূরা আল ইমরানের ১৭৮নং আয়াত পাঠ করছিলেন।

এ সময় শত্রুদের ঘোড়া গুলো তাদের পিছনদিকে ঘুরাফিরা করছিল। এ ঘোড়ার উপর উজরা বিন কায়েস আল আহসামী ছিল। কিন্তু ইবনে আছমে উরত্তয়া বিন কায়েস বলা হয়েছে। সে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কথা শুনতে পেয়ে বললোঃ আল্লাহ্র কসম আমাদের মিজানের পাল্লা

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে। তাঁর এ কথা বলাতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) পক্ষীয় লোকদের সাথে তার বাকবিতন্ডা শুরু হয়ে যায় অতঃপর উজরা বিন কায়েস তার বাহিনীর দিকে ফিরে যায়।

ওমর সেদিন ভোরে সাথীদের নিয়ে জুমার দিনের ফজরের নামাজ পড়লেন। কেউ বলেন সেদিন ছিল শনিবার এবং এদিনই ছিল আশুরার দিন। অতপর সে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হল।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এদিকে তাঁর সাথীদের নিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন। তারা ছিলেন ৩২ জন ঘোড়া সাওয়ারী এবং ৪২ জন পদাতিক। তাঁর লোকদের তিনি সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়করিয়ে ডান দিকের নেতৃত্ব দিলেন জহির বিন কাইনকে, বামদিকে হাবীব বিন মুতহারকে।* আর পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করলেন তার ভাই আব্বাসকে। আর হেরেমের মধ্যে যারা ছিল তাদেরকে পিছনের দিক দেখার দায়িত্ব দিলেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর আদেশে রাত্রিতেই তাঁবুর পিছনের দিকে গর্ত খনন করা হয়েছিল। আর সে গর্তের মধ্যে লাঠি, সোটা, লতা পাতা ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় যাতে পিছনের দিক থেকে কেউ আক্রমন করতে না পারে।

অন্যদিকে ওমর বিন সা'দ তার বাহিনীর ডানদিকে আমরবিন হেজাজ যুবাইদিকে বামদিকে শীমার বিন যিলযাওশানকে নিযুক্ত করলেন। যিলযাওশানের প্রকৃত নাম হলো- শুরাহবীল বিন আশুয়ার বিন আমর বিন হযরত মুআবিয়া তিনি হলেন যুবার বিন কেলাব গোত্রের লোক। অশ্ব বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল উজরা বিন কায়েস আল আহমাসী, পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল শুবাইস বিন রবী। আর এদের সবার উপর নেতৃত্ব দেয়া হল তার গোলাম নাওরিদানকে।* উভয় পক্ষ সামনা সামনি অবস্থান নিল।

হুসায়ন (রাঃ) এদিন তাবুর সবার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করলেন-গোছল করলেন, চেহারাকে পরিপাটি করে মেশ্‌ক মাখলেন-এই মুহূর্তটুকু নিরর্থক নয় এবং করো যে নিহত হবে এটা সবাই বুঝতে বাকী রইলনা। এসময় হযরত হুসায়ন (রাঃ) অশ্বে সাওয়ার হলেন সাথে একখন্ড কুরআন নিলেন। আলী বিন হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে অশ্বের উপর তুলে নিলেন। তিনি ছিলেন দূর্বল ও অসুস্থ। এরপর বিরুদ্ধ পক্ষের লোকদের সম্মখীন হয়ে বলতে লাগলেন- হে আল্লাহ্ আপনিই

---

* তাবারীতে তার নাম মুজাহের বলা হয়েছে। আখবারুত তোয়াল পৃঃ ২৫৬ তার নাম মুজহার বলা হয়েছে।

* তাবারীতে জাওইদ এবং আখবারুত তোয়ালে জায়েদ বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমার সকল কঠিন সময়ের বন্ধু এবং সকল মছিবতের ভরসাস্থল। মানুষদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন হে মানুষ সকল তোমরা আমার কিছু নসিহত শুন, তিনি হামদ ও সানা পাঠ করে বললেন হে মানুষ সকল যদি তোমরা আমাকে কবুল করতে এবং আমার প্রতি সুবিচার করতে তাহলে তোমরা ভাগ্যবান হতে। অথচ এ মূহুর্তে আমার পক্ষে তোমাদের জন্য কিছুই করা সম্ভব না যদি তোমরা আমাকে গ্রহণ না কর। অতঃপর তিনি সূরা ইউনুছ এর ৭১ নং আয়াত পাঠ করলেন।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ভগ্নীগন তাঁর কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) বললেন আল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কথাই ঠিক রাখলেন, মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় বলেছিলেন আপনি মহিলাদের নিয়ে বের হবেন না বরং এখানে থেকেই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁর ভাই আব্বাসকে ভগ্নীদের কাছে পাঠিয়ে তাঁদের থামালেন।

এরপর হুসায়ন (রাঃ) শত্রুপক্ষীয় লোকদের উদ্দেশ্যে তাঁর ইজ্জত সম্মান শ্রেষ্টত্ব, বংশমর্যাদা এবং বংশের শ্রেষ্টত্ব ও কুলীনতার কথা তুলে ধরে এবং বললেন- তোমরা বিবেচনা করে দেখ আমাকে হত্যা করলে কি তোমাদের মঙ্গল হবে। আমিতো তোমাদের নবী কন্যার পুত্র। আর আমি ছাড়া এ দুনিয়াতে তোমাদের নবী কন্যার কোন সন্তান নাই। .... রাসুল (সাঃ) আমার ও আমার ভাই সম্পর্কে বলেছেন এ দু'জন জান্নাতী যুবকদের সর্দার হবে। আল্লাহ্র কসম যেদিন থেকে আমি জেনেছি মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন-সেদিন থেকে আমি মিথ্যা বলার ইচ্ছাও পোষণ করি না। .... ।

হুসায়ন (রাঃ) এর এ সব বক্তব্য শুনে শীমার বললো-সেতো একজন সাধারণ মানুষের মতই আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগী করে, কিন্তু সে যে কি বলে কিছুইতো বুঝতে পারিনা। তখন হাবীব বিন মোতাহার* তাকে বললো আল্লাহ্র কমস হে শীমার তুমি যদি আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগী কর এবং সে সাথে আমরাও যদি সেই পরিমান ইবাদত করি তবুও আমরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কথার মর্ম বুঝতে পারবনা। আর তোমার অন্তরের উপরতো মোহর পড়ে গেছে।

হযরত হুমায়ন (রাঃ) আরো আবেগপূর্ণ কথা বললেন কিন্তু শত্রুপক্ষীয় লোকেরা তাঁকে পাত্তা দিলনা। এমনকি যারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে কুফার পথে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিল তারাও তাঁকে

---

* তাবারীতে মুজাহের বলা হয়েছে আর কামিল গ্রন্থে মুজহের

Dhaka University Institutional Repository

অস্বীকার করলো। এরা সবাই হযরত হুসায়ন (রাঃ) কথার প্রেক্ষিতে বলতে লাগলো আপনার চাচার (হযরত মুআবিয়ার) বংশের লোকেদের হুকুম মেনেনিতে আপনার আপত্তি কোথায় ? তাহলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এসব বলতে বলতে তাঁরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ৩০ জন অশ্বারোহী বাহিনীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। সে বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল হুর ইবনে ইয়াযীদ। সে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে এসে আক্ষেপ করতে করতে, সে বললো আমি যদি তাদের উদ্দেশ্য জানতাম তাহলে আমি আপনাকে গোপনে ইয়াযীদের দরবারে নিয়ে যেতাম। হোর ইবনে ইয়াযীদ এবং জোহাইর বিন কায়িন শত্রুদের সাবধান করে হেদায়েত পূর্ণ কথা বললেন। রাসুল দৌহিত্রকে হত্যা করার ফল এ দুনিয়াতে কি হবে বা মৃত্যুর পর কিরূপ আজাব হবে, এই মূহুর্তে রাসূল দৌহিত্রের সঙ্গে তাঁদের কেমন আচরণ করা উচিৎ ইত্যাদি কথা বলেও তাঁরা শত্রু পক্ষীয় লোকদের মন নরম করতে পারলেন না। উল্টা তাঁরা তাঁকে গালি দিতে লাগলো এবং ইবনে যিয়াদের গুনকীর্তন করতে থাকলো তারা আরো বে হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তাঁর পিতৃব্য পুত্র ইয়াযীদ বিন হযরত মুআবিয়ার ব্যাপার তাদের মধ্যে ছেড়ে দাও। আমার জীবনের কসম হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যা না করা হলেও তোমাদের আনুগত্যে ইয়াযীদ সন্তুষ্ট থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন এসব কথা শুনেও শীমার বিন যিল যাওশান তাঁর দিকে তীর নিক্ষেপ করে বলতে লাগলো চুপকর চুপ কর আল্লাহ্ তোর মুখ বন্ধ করুক। তুই আমাদেরকে অনেক তহমত দিলি। তবুও সে চুপ থাকলোনা, কথা বলতেই লাগলো।

এ সময় হোর বিন ইয়াযীদ ওমর বিন সা'দকে সাবধান করে দিয়ে বললো এখনও সময় আছে তুমি সঠিক পথ বেছে নাও। হোরকে তার সাথীরা গালমন্দ করতে থাকলো। তবুও হোর হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষ নেয়াটাকে অধিক শ্রেয় বলে মত প্রকাশ করে ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষে যোগ দিলেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) পক্ষ নিয়েও তিনি শত্রুদের ধিক্কার দিয়ে বিভিন্ন কথা বলতে লাগলেন।

এ সময় একজন পদাতিক ধনুকে তীর উচিয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সামনে এসে উপস্থিত হয় তখন ওমর বিন সা'দ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সামনে এসে তাঁদের উদ্দেশ্যে বললো যদি এ ব্যাপারের কর্তৃত্ব আমার হাতে থাকত তাহলে আমি হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কথা মেনে নিয়ে তার সাথী হতাম- কিন্তু ওবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ আমাকে এটা করতে বাঁধা দিচ্ছে। এ সময়

Dhaka University Institutional Repository

হোর তাকে ধিক্কার দিয়ে বললো তোমাদের ধ্বংস হোক, যে ফুরাতের পানি ইহুদী, নাসারা, কালো শুকর, কুকুরেও পান করে আর সেখান থেকে তুমি হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রী পুত্র পরিজনকে পানি পানে বাঁধা দিচ্ছ। তিনিতো এখন বন্দী অবস্থায় আছেন, তার নিজের ভালমন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নেই।

এতে ওমর বিন সা'দ সামনে অগ্রসর হয়ে তার গোলামের কাছে বললো হে দারীদ* তোমার মতামত ব্যাক্ত কর। সে তার মতামতব্যক্ত করার সাথে সাথে ওমরের দল পাষাণ হয়ে গেল তার পরই সে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দিকে তীর নিক্ষেপ করল, এবং বললো হে লোক সকল তোমরা সাক্ষী থেকো যে আমাদের মধ্যে যে প্রথম তীর নিক্ষেপ করল সে হলো এ ওমর।

তার পর থেকেই শুত্রু পক্ষীয়রা তীর নিক্ষেপ শুরু করে। যিয়াদের গোলাম ইয়াসার (যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের গোলাম) এবং উবায়দুল্লাহ্‌র গোলাম সালিম বের হয়ে এসে বলতে লাগলো তোমাদেরকে অগ্রসর হবে হও। তখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষের উবায়দুল্লাহ বিন ওমর আলকালাবী* হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর অনুমতি নিয়ে সামনে বের হয়ে এসে প্রথমে তরবারীর আঘাতে ইয়াসার অতঃপর সালেমকে হত্যা করে। সালেমও অবশ্য তরবারীর আঘাতে তার বাম হাতের আঙ্গল গুলো কেটে ফেলে। অতঃপর তাদের পক্ষের আবদুল্লাহ্‌ বিন হাওজা আক্রমন পরিচালনা করে এমন কি হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সামনে এসে বলতে থাকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) দোযখের সুসংবাদ গ্রহণ কর। হযরত হুসায়ন (রাঃ) উত্তরে বলেন কখনো নয় তোমার ধ্বংস হোক। আমি আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল বান্দা এবং অনুগ্রহ পাওয়ার বেশী হকদার বরং তুই দোযকের বেশী উপযুক্ত।

এভাবে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষ এবং বিপরীত পক্ষের মধ্যে অনেক বাকবিতন্ডা চললো এবং তীরের পরীক্ষা হল।

এ সময় ওমর বিন সাদের পক্ষের একজন নেতৃস্থানীয় লোক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে নিষেধ করে- সেই মুহূর্তে ওবায়দুল্লাহ্‌ বিন যিয়াদের ডানপক্ষীয় দলনেতা আমর বিন হাজ্জাজ আক্রমন করে বসলো

---

* আখবারুত তোয়াল ২৫৬ পৃ যায়েদ এবং তাবারীতে জাওইদ
* তাবারী ৬/৪৪৫ পৃঃ এবং কামিল ৪/৬৫পৃঃ তার নাম গুলাইম গোত্রের আমির এবং ইবনে আছমে ৫/১৮৯পৃঃ ওহাব বিন আবদুল্লাহ বিন হুবাব আল কালাবী বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই বলতে বলতে যে - যারা দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়েছে এবং মুসলিম জামাতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে তাদের হত্যা কর।* এর উত্তরে হযরত হুসায়ন (রাঃ) বলেন -হে হাজ্জাজ তোমার ধ্বংস হোক তুমি এ কথা বলে কি মানুষদেরকে আমার বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত করছ? আমরা দ্বীনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করি আর তুমি তার উপর দৃঢ় রয়েছো ? অতি শীঘ্রই তুমি মারা যাবে তখন বুঝতে পারবে কে দোযখের বেশী উপযোগী। এই আক্রমনেই হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষের প্রথম শাহাদত বরণকারী ব্যক্তি মুসলিম বিন আওসাজা নিহত হলেন। (ইন্নালিল্লাহে ----- রাজেউন)। হত্যাকারীরা হলো মুসলিম বিন আব্দুল্লাহ আজ জুবাবী এবং আব্দুর রাহমান বিন আবি খুশগুকারা আল বাজালী।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করলেন। আওসাজার প্রাণবায়ূ নির্বাপিত হওয়ার আগে তিনি সাথী হাবিবকে অছিয়ত করেন - তোমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শরীরে কোন আঘাত না লাগে।

---

* তাবারী এবং কামেল গ্রন্থে জামাতের স্থলে ইমাম উল্লেখিত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

২.৯ একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন

বাম দিক দিয়ে শীমার আক্রমন পরিচালনা করে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দিকে ধাবিত হতে থাকে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর আশ্বরোহীগণ ভীষণ বেগে তার গতি রোধ করে এতে উভয় পক্ষে তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ সময় শীমার ওমর বিন সাদের কাছে তীরন্দাজ বাহিনী তলব করলে সে প্রায় ৫০০ পদাতিক তীরন্দাজ বাহিনী পাঠিয়েদেয়। তারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর অশ্বের দিকে তীর পরিচালনা করতে লাগলো। এতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সমস্ত অশ্বই ক্ষত বিক্ষত হল।

এদিকে শীমার তাবুর কাছে এসে বলে আমি তাবুতে আগুন ধরিয়ে এর মধ্যে যারাই আছে তাদের পুড়িয়ে হত্যা করব। তাবুতে অবস্থিত মহিলাগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বের হয়ে পড়ে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) শীমারকে বলেন আল্লাহ্ তোমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারুন। শুবাইছ বিন রবী এবং হামিদ বিন মুসীলম বলেন তুমি তোমার নিজের জীবনের জন্য দু'টি মারাত্মক বিষয়কে একত্রিত করছ এক-তুমি আল্লাহ্র আযাবের উপযুক্ত হচ্ছো, দুই- তুমি কি শিশু ও মহিলাদের হত্যা করতে চাচ্ছো। তোমার আমীর শুধু পুরুষদের হত্যা করাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। শীমার হামিদ বিন মুসলিমের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি তা অস্বীকার করে।

এ সময় জহীর বিন কাইন নামক হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর এক সাথী শীমারের উপর পতিত হয়ে তাকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছ থেকে সরিয়ে দেয়।* এ আক্রমনে শীমারের দলের আবু ইজ্জা আলজুবাবী নামক এক ব্যক্তি নিহত হয়। হযরত হুসায়ন (রাঃ) পক্ষীয় খলিল নামক একজন শত্রু পক্ষীয় বেশ কিছু লোককে নিহত করেন। তাদের সংখ্যা অধিক হওয়াতে তাদের পরিচয় ঠিক করে জানা যায়নি।

জহর নামাজের ওয়াক্ত হলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) বললেন তোমরা তাদের বলো তারা যেন নামাজ পড়ার সময়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। এ কথা শুনে বুদাইল বিন সুরাইম নামক আফফান গোত্রের এক কুফাবাসী বলে তোমাদের নামাজ গৃহীত হবে না। হাবীব বিন মুতহার এর জবাবে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন তোমার ধ্বংস হোক। রাসুল (সাঃ) এর বংশধরদের নামাজ গৃহীত হবে না আর

* তাবারী ৬/২৫১-তে বলা হয়েছে তার ১০ জন সাথী এক যোগে শীমারের উপর পতিত হলেন

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের নামাজ গৃহীত হবে। একথা হাবীব তাকে জোরে আঘাত করলে তার পা কেটে যায়। অতঃপর এক লোক হাবীবকে আহত করে। হাছীন বিন নামীর হাবীবের মাথায় আঘাত করে। সে মৃত্যু বরণ করলে তার মাথা যিয়াদের দরবারে আনীত হয়। হাবীবের ছেলের নাম কাসিম সে তার পিতার মাথা চিনতে পারে। সে তাঁর পিতার হত্যাকারীকে তরবারীর আঘাত করলে সেও মারা যায়।

মুহাম্মদ বিন কায়েস বর্ণনা করেন হাবীব নিহত হলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁর মৃতদেহকে শান্তনাবানী শুনালেন। হোর হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে সরিয়ে আনেন।

এরপরই হোর জহীর বিন কাইনের সাথে ভীষণ বেগে যুদ্ধ শুরু করেন। একজন একটু ক্লান্ত হলে অপরজন পূর্ণ বেগে যুদ্ধ করেন। এভাবে ঘন্টা খানেক অতিক্রান্ত হওয়ার পরই ওমর বাহিনীর লোকেরা হোরের উপর আক্রমন করে তাকে হত্যা করে ফেলে। হত্যাকারী তারই চাচাত ভাই যার সাথে তার পূর্ব শত্রুতা ছিল।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) পক্ষীয়রা নামাজ আদায় করে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথীরা তাঁর কাছ থেকে শত্রুদের হটাতে থাকে। তাঁরই সামনে জহির বিন কাইন কবিতা আবৃত্তি করতে করতে যুদ্ধ করতে থাকে। এ সময় কাছীর বিন আবদুল্লাহ্ আশ শাইবী এবং মুহাজির বিন আওস তার উপর আক্রমন করে হত্যা করে।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথী-নাফে ইবনে হিলাল আল জামালী।* তাঁর তীরের মাথায় কোন ব্যক্তির নাম লিখেব তারপর তা দিয়ে সেই ব্যক্তিকে আঘাত করতেন। এভাবে তিনি ইবনে সাদের ১২ জন লোককে নিহত করেন। অসংখ্য আহত করেন আহতদের হিসাব ছাড়াই। এরপর তিনিও আক্রান্ত হন। ফলে তাকে বন্দী করে ইবনে সাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে গালমন্দ করলে সেও এর প্রতিউত্তর দিতে থাকলে ওমর শীমারকে বলে ওকে হত্যা কর। ওমরের আদেশে শীমার তার উপর তরবারী উঠালে নাফে তাকে বলতে লাগলো- হে শীমার তুমি মহা পাপ করছ .... ।

নাফে বলতে লাগলেন, আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদের মৃত্যু ঘটালেন তার সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টির হাতে। পরমূহুর্তে শীমার নাফেকে হত্যা করে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথীদের উপর চড়াও

---

* ইবন আছমে হিলাল বিন রাফে আল বাজালী ৫/২০০

Dhaka University Institutional Repository

হয়। তার সাথে ছিল আরো অনেকে। এমনকি তারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর একেবারে নিকটবর্তী হয়ে পড়লো। হোসেন (রাঃ) এর সাথীরা শত্রু পক্ষীয় অনেক লোক দেখেও নিহত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সামনে এসে তাঁকে সালাম দিয়ে বলতে লাগলো আমাদের ইচ্ছা আমরা যেন আপনার সামনে নিহত হই এমতাবস্থায় যে আমরা আপনাকে রক্ষা করছি। হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে বললেন তোমরা আমার নিকটবর্তী হও। আঃ রহমান বিন উজরাহও আবদুল্লাহ্ বিন উজরাহ আল গিফারী সবাই তার নিকটবর্তী হয়ে তাঁর সামনে কবিতা আবৃত্তি করে নিহত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকলো। আর তিনি সবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে লাগলেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথীরা জোড়ায় জোড়ায় এবং একা একা আগাতে লাগলো এবং নিহত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকলো।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর একজন সাথী আবেদ ইবনে আবু শুবাইছ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ। তিনি হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে এসে বললেন আল্লাহ্‌র কসম আমার কাছে দূরের এবং কাছের এ পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে আপনার চেয়ে আমার নিকট প্রিয়। যদি আমার সামর্থ থাকত তাহলে আমি আমার রক্ত ও জীবন দিয়ে হলেও আপনাকে রক্ষা করতাম। হে আবু আবদুল্লাহ্ আপনার প্রতি সালাম। আপনি সাক্ষী থাকুন আমি আপনার হেদায়েতের উপর ছিলাম। এরপর তিনি কপালে আঘাত প্রাপ্ত অবস্থায় শত্রুতের উদ্দেশ্যে ডাক দিয়ে বললেন তোমাদের মধ্যে কি কেউ নেই যে আমার সাথে যুদ্ধ করবে? সবাই তাকে চিনতো যে সে একজন শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ ফলে কেউ কাছে আসতে সাহস করছিল না। কিন্তু ওমর বিন সাদের পরামর্শে সৈন্যদল তাঁকে পাথর ছুড়ে আঘাত করে তার উপর প্রায় ২০০ জন একযোগে ঝাপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করলো। হোসেন (রাঃ) এ সময় তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকলেন।

এদিকে সৈন্যরা তার মাথা নিয়ে টানাটানি করে প্রত্যেকে দাবী করতে লাগল আমি তাকে হত্যা করেছি। ওমর বিন সা'দ সবাইকে সরিয়ে দিয়ে বললেন ঝগড়া করোনা কেননা তাকে তোমাদের কেউ একা হত্যা করোনি।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে যুদ্ধ করতে করতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথীদের সবাই নিহত হয়ে গেলেন। একমাত্র সুয়াইদ বিন আমর বিন আবু মুতা আল খাশআমী জীবিত ছিলেন।*

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বংশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম নিহত হন আলী আকবর বিন হযরত হুসায়ন (রাঃ) বিন আলী। তাঁর মাতা হলেন লাইলী বিনতে আবী মুররা বিন উরউয়া বিন মাসউদ আস সাকাফী। তাকে মুররা বিন মুনফিজ বিন নুমান আল আবিদী-প্রথমে আহত করে পরে হত্যা করে। কেননা তিনি তার পিতার নামে কবিতা আবৃত্তি করে তাঁকে রক্ষা করছিলেন।

এসময়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষে যারা নিহত হয়েছিলেন পর্যায় ক্রমিক ভাবে তারা হলেন -

- আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন আকীল
- আবদুল্লাহ বিন জাফরের পুত্রদ্বয় আওন ও মুহম্মদ
- আকীল বিন আবু তালেবের পুত্রদ্বয় আঃ রহমান ও জাফর
- কাসেম বিন হাসান বিন আলী বিন আবু তালেব

ইবনে আছমে বলা হয়েছে প্রথমে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ভাইদের সন্তানদের মধ্য থেকে যারা বের হন তারা হলেন -

আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন আকীল, জাফর বিন আকীল, তারপর তার ভাই আব্দুর রহমান বিন আকীল

মুহম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাফর, আওন বিন আবদুল্লাহ বিন জাফর, আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন আলী বিন আবু তালেব।

* তাবারী ৬/২৫৫তে যায়েদ, কামেল ৪/৭৩ পৃঃ তে যিহাক বিন আবদুল্লাহ আল মাশরাফী বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফুজাইল বিন খাদীজ আলকিন্দি থেকে বর্ণিত যে ইয়াযীদ বিন যিয়াদ তীরন্দাজ ছিলেন, তিনি হলেন আবু শাদা আল কিনানী* বাহদালা গোত্রের লোক। যিনি ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সামনে এসে তার পক্ষ নিয়ে শ্রত্রুদের উদ্দেশ্যে ১০০টি তীর নিক্ষেপ করলেন যার মাত্র ৫টি তীর মাটিতে পড়লো।

কারবালার হত্যাকান্ডের মধ্যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এ ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবীর কাসেমের হত্যাকান্ডও ছিল হৃদয় বিদারক। কেননা অল্পদিন আগেই মদীনায় কাসেমের বিবাহ হয়েছিল হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মেয়ে সকিনার সাথে। মৃত্যু কালে হাসান এই বিবাহের জন্য আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) দেশ ত্যাগের পূর্বে মৃত ভাইএর সেই আকাঙ্খা পূরণ করেন।

হামিদ থেকে বর্ণিত বলেন আমাদের কাছে একজন যুবক এগিয়ে আসল তার মুখমন্ডলে চন্দ্রের আভা পরিলক্ষিত হচ্ছিল তার হাতে ছিল তরবারী গায়ে ছিল জামা ও লুঙ্গি, পায়ে ছিল জুতা। একটা জুতার তলার কিছু অংশ খুলে গিয়েছিল। তিনি বলেন যে আমি ভুলে গেছি জুতাটা বাম পায়ের ছিল কিনা। তখন আমাদেরকে ওমর বিন সা'দ বিন নুফাইল আল আজদী বললেন (এ ওমর সেনাধক্ষ্য ওমর নয়) আল্লাহ্র কসম আমি অবশ্যই ঐ যুবকটির উপর আক্রমন চালাবো। তখন আমি তাকে বললাম সুবাহানাল্লাহ্। তুমি তার সম্পর্কে কি ধারনা পোষন করছ, তোমার জন্য অন্যান্য লোকদের হত্যা করাই যথেষ্ট। তারপরও সে তার উপর আক্রমন চালালো তখন যুবকটি চিৎকার করে বলে উঠল - হে চাচা! এ মুহূর্তে হযরত হুসায়ন (রাঃ) ওমর বিন সা'দের উপর আক্রমন চালালে যুবকটিও ছুটে গেল। বিন সা'দও হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর উপর তরবারীর আক্রমন চালালে ওমর হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছে মারা পড়বে এ আশংকা দেখে কুফাবাসী অশ্ববাহিনীর লোকেরা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। অশ্বারোহী বাহিনী যুবকটিকে (কাসেমকে) খুব জোরে আঘাত করে বসে ফলে তার মাথা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পদতলে লুটিয়ে পড়ে, এসময় তাঁর পা খুব বেশী নড়াচড়া করছিল। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এটা দেখে বললেন আল্লাহ্ তাদের সর্বনাশ করুন যারাা তোমাকে হত্যা করল। কেয়ামতের দিন তোমার দাদা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন। তিনি আরো বললেন হে ভাতিজা তুমি বিপদের মূহুর্তে আমাকে ডাকলে কিন্তু আমি সাড়া দিতে পারলাম না - আর একটু সাড়া দিলেও কোন সাহায্য করতে পারলাম না। একমাত্র আল্লাহই পারেন কারো উপকার করতে। এরপর তিনি নিজের

---

* তাবারী ৬/২৩২, কমিল-৪/৭৩তে আল কিন্দি বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বুকের সাথে তার বুক লাগালেন তারপর নিজের ছেলে আলী আকবর এবং আহলে বায়েতের মধ্যে যারা নিহত হয়েছেন তাদের সাথে মিলিয়ে রাখলেন। বর্ণনাকারী বলেন আমি যুবকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি তিনি হলেন কাসিম বিন হযরত হুসায়ন (রাঃ) বিন আলী বিন আবু তালিব।

অন্যদিকে শুবাইহু আল হাজরামী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আশুরার দিন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাতের ঘটনার সময় আমি ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলাম ঘোড় সওয়ারীগন ছাড়া সেখানে অন্য কেউ ছিল না। তিনি বলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বংশের একটি ছেলে তাঁবু থেকে বের হয়ে শত্রুদের দিকে এগিয়ে আসলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) দুর থেকে ছেলের দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন তার গায়ে ছিল জামা পরনে ছিল লুঙ্গী তিনি এদিক সেদিক দেখছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন- আমি দেখছিলাম তার দুই কানে যেন মতি চমকাচ্ছিল। তার পার্শ্ব পরিবর্তনের সময় এটা মনে হতো। তারপর তার দিকে একজন অশ্বরোহী ছুটে আসলো এমনকি তার নিকটবর্তী হয়ে তরবারীর আওতার মধ্যে এস পড়লে সে ঘোড়া থেকেই তার উপর তরবারীর আঘাতে করে হত্যা করে ফেলে। হিশাম আস্‌সুকুনী বলেন, হত্যাকারীর নাম হানী বিন শুবাইহু। তার উপর হত্যার দোষ আসার ভয়ে সে এটা গোপন করত। এখানে বর্ণনাকারী অবশ্য নিহত ব্যক্তির পরিচয় বলেননি। তবে বর্ণনায় মনে হয় কাসিম বিন হযরত হুসায়ন (রাঃ)। যদিও দুইটি বর্ণনার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

384671

Dhaka University Institutional Repository

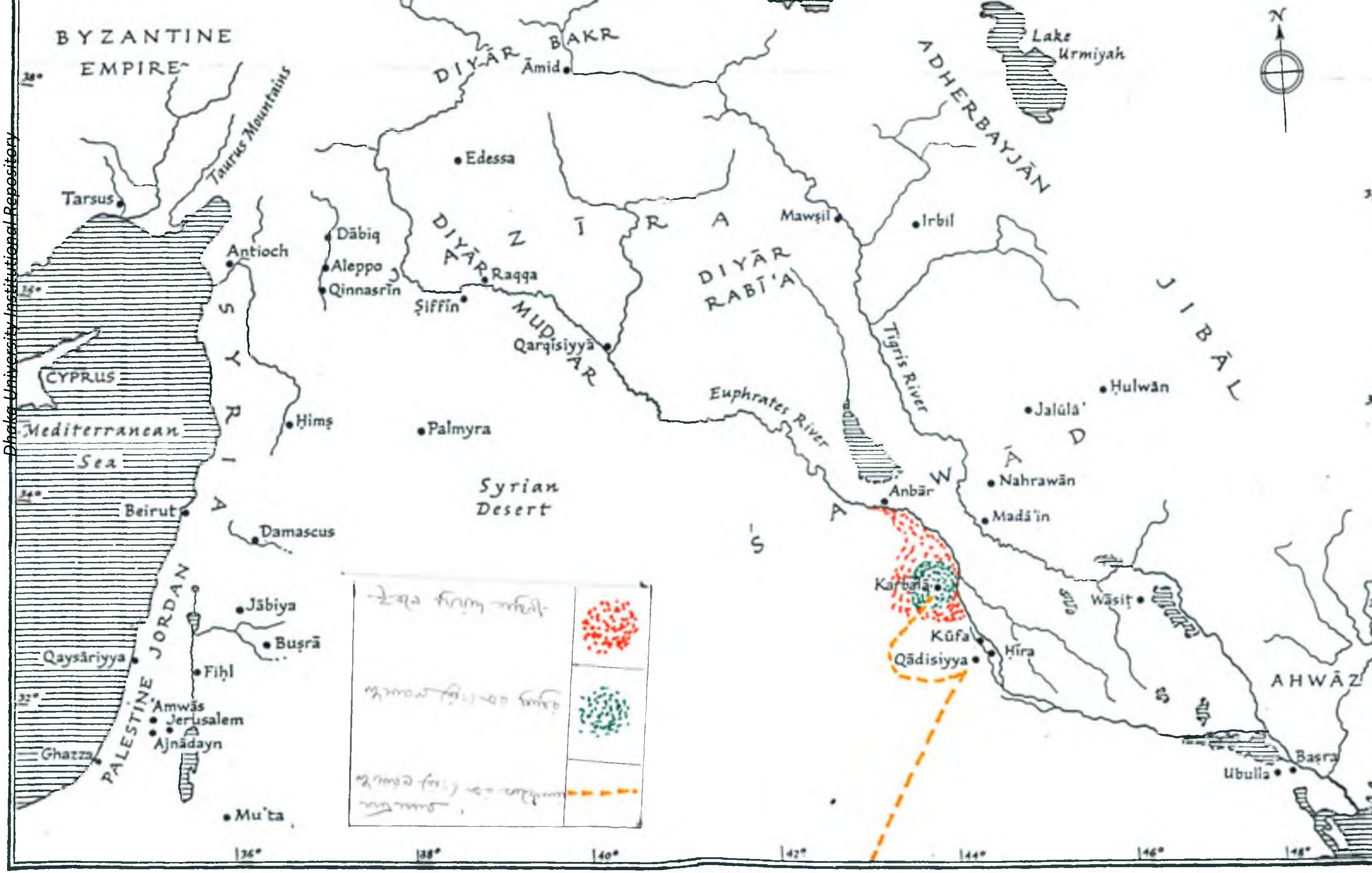

2 Syria, Jazira and Sawād

Dhaka University Institutional Repository

২.১০ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর স্বয়ং অস্ত্র ধারন ও শাহাদাত বরণ

সবাইকে হারিয়ে ক্লান্ত হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁবুতে গিয়ে বসে পড়েন। ছোট ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আছমে বলা হয়েছে সেছিল দুধের শিশু হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাকে কোলে বসিয়ে আদর করে চুমু দিচ্ছিলেন আর বিদায়ের বানী শুনিয়ে পরিবারের লোকদের অছিয়ত করছিলেন। এ সময় ইবন মারকাদুননার নামক এক ব্যক্তি তাঁর দিকে তীর নিক্ষেপ করলে এতে ছেলেটি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যায়। হযরত হুসায়ন (রাঃ) ছেলের রক্ত হাতের তালুতে নিয়ে আসমানের দিকে তুলে ধরে বলেন- আয় আল্লাহ্ আপনি যদি আমাদের থেকে সাহায্য উঠিয়ে নিয়ে থাকেন তাহলে আমাদের জন্য যা উত্তম তা করুন এবং জালেমদের থেকে রক্ষা করুন।

সঙ্গীরা সবাই শহীদ হয়েছেন। জীবিত আছেন শুধু মহিলা ও পীড়িত পুত্র জয়নুল আবেদীন। যুদ্ধের ময়দানে একা কেবল হযরত হুসায়ন (রাঃ) এ অবস্থায় শত্রুরা তাঁকেও আক্রমন করে নিহত করে। এসম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন।

সবাই শহীদ হওযার পর ক্লান্ত, বিষন্ন হযরত হুসায়ন (রাঃ) সারাদিন একাকী অবস্থান করছিলেন। শত্রুরা সবাই ফিরে যাচ্ছিল। কেউ তার দিকে আসছিল না। এমনকি কেহই তাঁকে হত্যা করতে ইচ্ছা করছিলনা। এমন সময় বাদ্দাগোত্রের মালেক বিন বশীর (তাবারী এবং কামিল গ্রন্থে কিন্দি গোত্রের নুসাইর) সামনের দিকে এসে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথার উপর তরবারীর আঘাত করে এতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) আঘাতকারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন তুমি এটা খাবেও না পানও করবেনা আল্লাহ্ তোমার হাশর নশর জালেমদের সাথে করুন। এরপর হযরত হুসায়ন (রাঃ) বরনছটি ফেলে দিয়ে মাথায় পাগড়ি পরলেন।

হুসায়ন (রাঃ) অত্যাধিক পিপাসা কাতর হয়ে পানি পানের উদ্দেশ্যে ফুরাতের দিকে অগ্রসর হতে চাইলে - শত্রুরা তাঁকে বাধা দিতে থাকলো তা সত্ত্বেও তিনি ফুরাতের পানি পানের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলে হাসিন বিন তামিম নামক এক ব্যক্তি তার দিকে তীর নিক্ষেপ করে, তীরটা তাঁর গলায় বিদ্ধ হয়।* তীরটা সেখানে লেগে ছিল হযরত হুসায়ন (রাঃ) সেটা টান দিয়ে তুলে

---

* তাবারীতে বলা হয়েছে তার মুখে বিদ্ধ হয়। কামিল গ্রন্থে ৪/৭৬ এ বলা হয়েছে -তীর নিক্ষেপকারী হাসিন বিন নামীর, ইবনে আছমে ৫/২২৫ বলা হয়েছে তীর নিক্ষেপকারী আবু জনব, আর তীরটা তার কপালে বিদ্ধ হয়

Dhaka University Institutional Repository

ফেল্লে সেখান থেকে রক্তের প্রবাহ বইতে থাকলো। তাঁর দু'হাত রক্তে লাল হয়ে গেল। আপোষহীন বীর পুরুষ হযরত হুসায়ন (রাঃ) আকাশের দিকে রক্তমাখা দুহাত তুলে বললেন- আল্লাহ তুমি আমার আঘাত কারীদের একটা একটা করে বন্দি করে নিগৃহীত ভাবে হত্যা করিও। আর এ জালিমদের কাউকে তুমি জমিনের বুকে জীবিত রেখো না। সত্যিই তার এ দোয়া বৃথা যায় নি। পরবর্তীতে হত্যাকারীদের সবাই অত্যন্ত নিগৃহীত ভাবে মৃত্যুবরণ করে।

হুসায়ন (রাঃ) এর বাম দিক থেকে যে লোক তীর নীক্ষেপ করেছিল বর্ণানাকারী তার সম্পর্কে বলেন সে লোক হঠাৎ করে অত্যাধিক পিপাসা কাতর হয়ে পড়ে ফলে সে চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। তাকে ঠান্ডা পানি ও পরে ঠান্ডা দুধ দেয়া হলো তারপরও সে চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। সে বলতে লাগলো তোমাদের সর্বানশ হোক- আমাকে কেন পানি পান করাচ্ছো না। আমাকে তোমরা পিপাসার্ত অবস্থাতেই মেরে ফেললে। শেষ পর্যন্ত সে পশুর মত চিৎকার করতে করতে মৃত্যু বরণ করে।

এদিকে ১০ জন সৈন্য হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে ঘিরে ছিল শীমার বিন যিল যাওসান তাঁদের দিকে অগ্রসর হলো - তখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন- তোমাদের সর্বনাশ হোক। তোমাদের কি কোন ধর্মনাই? তোমরা কি হিসাবের দিনের ভয় কর না? .... । তোমাদের কাছে অনুরোধ, তোমরা আমার আহলে বায়েতের ব্যাপারে কোন খারাপ সিদ্ধান্ত নিও না। তাঁদেরকে তাদের বাসস্থলে পৌছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করিও। তোমাদের মূর্খতা যেন তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে। এ সব কথা শুনে শীমার বললো রাখো তোমার কথা হে ইবনে ফাতিমা।

শীমার তার সাথীদেরকে হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যার ব্যাপারে তাগা'দা দিতে থাকলে, সাথীদের মধ্য থেকে আবু জুনুব নামক এক ব্যক্তি বলে উঠে-তোমাকে কে নিষেধ করলো তাকে হত্যা করতে? শীমার তাঁকে জীজ্ঞাসা করলো তুমি আমাকে এ কথা বলছো কেন ? আবু জুনুব তখন তুমি কি আমাকে কৈফিয়ত তলব করছো ? আবু জুনুব ছিলেন কুফী সৈন্যদের মধ্যকার একজন বীর পুরুষ। সে বললো আল্লাহর শপথ আমি ইচ্ছা করলে তোমার সামনে থেকে একে হত্যা করে একাই বিজয় গৌরব ছিনিয়ে নিতে পারি। এভাবে তাদের মধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর শীমার তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

Dhaka University Institutional Repository

হুসায়ন (রাঃ) তার তাবুর পার্শেই পড়ে ছিলেন। তার পাশে তখন কেউ ছিল না। এমন সময় তাবু থেকে পূর্ণিমার চাঁদের মত একটা ছেলে বের হয়ে আসে। তার সাথে সাথে জয়নব বিনতে আলী (রাঃ) বের হয়ে এসে তাঁকে সামনে যেতে বারণ করেন। সে তার ফুফুর কাছে গেল। এ সময় এক ব্যক্তি তাকে তরবারী দিয়ে আঘাত করলে তিনি হাত দিয়ে বাধা দিলেন এতে হাতের চামড়ার কিচু অংশ কেটে গেল। ছেলেটা হে আব্বা বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন -আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদানের আশা কর। আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতিদান দিবেন। নিশ্চয়ই তুমি দুনিয়ার যাবতীয় ওয়ালীদের পিতা হবে এ সময় হোসেন (রাঃ) এর চারপাশ হতে তার প্রতি আক্রমন শুরু হলে তিনিও তাদের দিকে ডানে বামে দ্রুত তরবারী ঘুরাতে লাগলেন। এটা দেখে তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল। যেমন ভাবে হিংস্র সবউন* /বাঘ দেখলে মানুষ ভয়ে পালাতে থাকে। হুসায়ন (রাঃ) এর দিকে তার বোন যয়নব বিনতে ফাতিমা বের হয়ে এসে বললেন -হায়! আসমান যদি জমিনের উপর পড়ে যেত। এরপর তিনি ওমর বিন সাদের কাছে গিয়ে বললেন- "হে ওমর তুমি কি এটা পছন্দ কর তোমার সামনে আবু আবদুল্লাহ মানুষের হাতে মার খেয়ে মারা যাবে আর তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে?" একথা শুনে ওমরের দাড়ি বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সে যয়নবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যার জন্য আবারও কেউ আগাচ্ছিল না। এ সময় শীমার বিন যিলযওশন তার সাথীদের বললো তোমাদের সর্বনাশ হোক তোমরা এ লোকটার দিকে তাকিয়ে কি দেখছো? নাদান মূর্খের দল -ওকে হত্যা কর। একথা শুনার সাথে সাথে তারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে চারদিকে থেকে আক্রমন করলো। জার 'আ বিন সারীক আততামীমী তাঁর বাম কাঁধের উপর আঘাত হানল। এরপর তাঁরা সবাই হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছ থেকে সরে গেলো। তিনি ব্যাথায় ছটফট করতে থাকলেন। সেখানে সিনান বিন আবু আমর বিন আনাস আন নাখয়ী হোসেন (রাঃ) এর কাছে এসে বর্শার আঘাত হানলো এতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) জমীনের উপর পড়ে গেলেন। এসময় সে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর উপর চেপে বসে তাঁকে জবেহ করে তাঁর মাথা পৃথক করে ফেলে।** এরপর তাঁর মাথা খুলী বিন ইয়াযিদের কাছে দেয়া হয়।

---

* তাবারী ও কামেল গ্রন্থে সাবউন এর স্থলে বীর শব্দ উল্লেখিত হয়েছে।

** তাবারী ৬/২৬০ এ তার নাম সিনান বিন আনাস বিন আমর আর ইবন আছমে সিনান বিন আনাস আন নাখয়ীর কথা বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে সে ব্যক্তি হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর গলার উপর তীর নিক্ষেপ করে আর সালিহ বিন ওহাব আল ইয়াজনি তার কোলের উপর তরবারীর আঘাত করে এতে তিনি জমিনের উপর পড়ে যান। ইবন আছম ৫/২১৮ তে বলা হয়েছে পরদিন সকালে খুলী- বিন ইয়াজিদ তার মাথা কেটে পৃথক করে কিন্তু তাবারী কামিল এবং মররুয যাহার গ্রন্থে ইবনে কাছিরের বেদায়া ওয়ান নেহায়ার মতই

Dhaka University Institutional Repository

আবু মাখনাফও হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর নিহত হওয়ার উপরোল্লিখিত ঘটনার এমতই বর্ণনা দেন। তিনি এটা সাক'আব ইবন জহীর, হুমাইদ বিন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেন যে হোসেন (রাঃ) আহত অবস্থায় পা দ্রুত নাড়াচ্ছিলেন এবং বলছিলেন -তোমারা কি আমাকে হত্যা করেই খুশী থাকবে? .... । যদিও তোমরা এখন আমাকে হত্যা করছ কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন সময় অতিশীঘ্রই আসছে যখন তোমাদের একদল তোমাদেরই অন্যদলের উপর শক্তিশালী হয়ে হত্যাযজ্ঞ চালাবে। এরপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দ্বারা গ্রেফতার করবেন এবং তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। আল্লাহ্র কি মহিমা তাঁর একথা বিফল হয়নি। সে প্রসঙ্গে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। [দ্রঃ কারবালা সংঘটকদের পরিনতি ।]

তাঁকে হত্যাকরী হলো শীমার বিন যিলযাওশান। আবার কেউ বলেন ওমর বিন সা'দ বিন আবি ওক্কাস। কিন্তু দ্বিতীয়মত ঠিক নয়। ওমর ছিল সে বাহিনীর প্রধান যে বাহিনী হোসেন (রাঃ) কে হত্যা করে। প্রথম মতটা বেশী প্রসিদ্ধ।

আবদুল্লাহ বিন আম্মার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন -আমি দেখলাম শত্রুরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ডান পার্শ্ব থেকে আক্রমন পরিচালনা করে। আল্লাহ্র কসম আমি পূর্বে কখনও এমন মৃতদেহ দেখিনি যাঁকে হত্যা করার কিছুক্ষণ পূর্বে যাঁর সঙ্গী সাথীকেও নিহত করা হয়েছে অথচ তার চেহারায় কি সুন্দর আভা। আল্লাহ্র কছম তার পূর্বে ও পরে এমন কাউকে কখনো দেখিনি।

আমর বিন হাসান বর্ণনা করেন যে, কারবালার ঘটনার দিন আমরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে ছিলাম। হোসেন (রাঃ) শীমারে দিকে তাকিয়ে বলেন- আল্লাহ্র রাসুল সত্যই বলেছেন যে- আমি যেন দেখতে পাচ্ছি একটা পাগলা কুকুর তার জিহ্বা বের করে আমার আহলে বায়েতের রক্ত পানের জন্য এগিয়ে আসছে। আর সেই ছিল শীমার। শীমার সীনান এবং আরো অন্যরাা হোসেন (রাঃ) এর উপর আক্রমন পরিচালনা করে।

আবু মাখনাফ জাফর বিন মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন যে আমরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর গায়ে তাঁর নিহত হওয়ার সময় ৩৩টি কাটা দাগ এবং ৩৪টি জখম দেখতে পেয়েছিলাম। শীমার সে

বলা হয়েছে। কিন্তু আখবারুত তোয়াল গ্রন্থের ২৫৮ পৃ বলা হয়েছে -তাঁর মাথা কেটে পৃথক করে শিবল বিন ইয়াযীদ সে খুলীর ভাই ছিল

Dhaka University Institutional Repository

সময় আলী বিন হযরত হুসায়ন (রাঃ) "যয়নুল আবেদীনকে" ও হত্যাকরতে চেয়েছিলো। তিনি ছিলেন খুবই ছোট এবং অসুস্থ। সেকারণে শীমারের এক সাথী হামিদবিন মুসলিম তাঁকে হত্যা করতে বাধা প্রদান করে।

হুসায়ন (রাঃ) নিহত হওয়ার পর সেখানে ওমর বিন সা'দ আসলো এবং বললো-সাবধান তোমরা কেউ মহিলাদের অঙ্গনে প্রবেশ করবেনা এবং এই ছেলেকেও কেউ হত্যা করবেন। আর মহিলাদের কোন মাল সামগ্রী লুণ্ঠন করে থাকলে তা ফেরত দাও। পূর্বেই শত্রুরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর তাঁবুর মধ্যে থেকে মালসামগ্রী এমনকি মহিলাদের পবিত্র বসনও লুণ্ঠন করে ছিল কিন্তু তারা কিছুই ফেরত দিল না। তখন আলী বিন হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাকে বললেন আমি উত্তম প্রতিদান আশা করছি সে জন্য আল্লাহ্ তোমার সাথে খারাপ বাক্য ব্যয় করা থেকে আমাকে বিরত রেখেছেন। এসময় সিনান বিন আনাস ওমর বিন সা'দ এর কাছে গিয়ে একজন বিখ্যাত ও অতীব সুন্দর গঠনের মানুষকে হত্যা করার বর্ণনার মাধ্যমে গর্ব প্রকাশ করে উচ্চ স্বরে কবিতা আবৃতি করতে থাকে। এ কবিতা শুনে তিনি তার প্রতি চাবুক নিক্ষেপ করেন এবং বলেন তোমার ধ্বংস হোক তুমি পাগল। আল্লাহ্র কসম, যদি ইবনে যিয়াদ তোমাকে একথা বলতে শুনে তাহলে গর্দান কেটে ফেলবে।*

কারবালার ঘটনায় হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে ৭২ জন নিহত হয়। তাদেরকে আসা'দ গোত্রের গাদিরিয়া পরিবারের লোকেরা নিহত হওয়ার একদিন পর দাফন করে। এরপর ওমর বিন সা'দ আদেশ করলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দেহকে ঘোড়ার পায়ে পিষে ফেলতে।**

তবে এ পর্যন্ত ওমর বিন সা'দের আচরন সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি তার পদাধিকার বলে ইবন যিয়াদের আদেশ ব্যতীত তেমন কোন অমুলক খারাপ আচরণ করেননি।

---

* তাহজীবুত তাহজীব গ্রন্থে ৩/৩৪২ ইবনে আসাকীর, মররুয যাহাবে ৩/৮৫ সামতুন নুজুমুল আওয়ালী ৩/৭২তে বলা হয় এ কবিতা সে ইবনে যিয়াদ এ সামনে পাঠ করছিল। ইবনে আছমে ৫/২২১ বলা হয়েছে বাশার বিন মালিক ইবনে যিয়াদের সামনে আবৃতি করছিল তিনি তা দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে তার গর্দানের উপর আঘাত করেছিলেন। আর এতেই সে মারা যায়।

** ইবনে কাছীর তার আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থের ৮/২০৫ পৃষ্ঠায় বলেন এ কথা সঠিক নয়। আততাবারী ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯-৩০৫, এ বলা হয়েছে তিনি আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাকে জবাই করা হয়, তাঁর কাছে যা কিছু ছিল, সবই খুলে ফেলা হয়, এমনকি তাঁর পাশ থেকে কাপড় খুলে ফেলা হয়। এবং পরে তাঁকে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই তিনি নিজে আদেশ দিয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দেহকে পিষে ফেলতে বলেছেন এ কথা ঠিক নয় বলেই মনে হয়।

মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া বর্ণনা করেন যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে এমন ১৭জন নিহত হন যারা সবাই ফাতেমা (রাঃ) এর বংশের। আর হাসান বসরী বর্ণনা করেন যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে এমন ১৬জন নিহত হন যাঁরা সবাই আহলে বায়েতের লোক ছিলেন। দুনিয়ার বুকে সে সময় তাঁদের মত সম্মানী লোক আর ছিলেন না। অন্যরা বর্ণনা করেন যে তার সাথে তার সন্তানাদি, তার আহলে বায়েত মিলে নিহত হয়েছিলেন ছিলেন- জাফর, হুসায়ন, আব্বাস, মুহাম্মদ, উসমান, আবু বকর এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সন্তান আলী আকবর এবং আব্দুল্লাহ, হযরত হুসায়ন (রাঃ) বড় ভাই হযরত হাসান (রাঃ) এর তিন সন্তান-আবদুল্লাহ, কাসেম, আবুবকর, আবদুল্লাহ বিন জাফরের দুই সন্তান আওন এবং মুহাম্মদ, আকীলের সন্তানদের মধ্যে জাফর, আবদুল্লাহ, আব্দুর রহমান এবং মুসলিম। মুসলিম কুফায় দৌত কার্যে গিয়ে নিহত হন। আরো দু'জন হলেন আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন আকিল এবং মুহাম্মদ বিন আবু সাঈদ বিন আকিল। অন্যান্যদের মধ্যে যারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে কারবালার ময়দানে নিহত হন তাদের মধ্যে তার দুধভাই আবদুল্লাহ বিন বকতার। অবশ্য তার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে যে তিনি এর পূর্বে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পত্র নিয়ে কুফাবাসীদের কাছে গেলে ইবনে যিয়াদের নিকটবর্তী হওয়া অবস্থায় তাকে আক্রমন ও হত্যা করা হয়। অন্যদিকে ওমর বিন সাদের দলের কুফাবাসীদের (আহতগণের গননা ব্যতিত) নিহত হয় ৮৮ জন পুরুষ। ওমর তাদের সবার জানাজা নামাজ পড়ান এবং দাফনের ব্যবস্থা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.১১ কারবালা ঘটনার পরবর্তী ঘটনাবলী

হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যা করার পরদিন সকালে খুলী বিন ইয়াজিদকে তাঁর মাথা দেওয়া হয় যেন সে তা ইবনে যিয়াদের দরবারে নিয়ে যায়। সে ইবনে যিয়াদের প্রসাদের সামনে এসে দেখে দরজা বন্ধ। এ জন্য সে মাথাটা নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসে কাপড় কাচার গামলার নীচে চাপা দিয়ে রাখে। সে তার স্ত্রী নাওয়ার বিনতে মালিককে বলে আমি তোমার জন্য এ যুগের শ্রেষ্ট সম্মান নিয়ে এসেছি -সে জীজ্ঞাসা করে সেটা কি জিনিষ উত্তরে সে বলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) মাথা। তার স্ত্রী এতে রেগে যায়। সে বলে মানুষ স্বর্ণ রৌপ্য বাড়িতে নিয়ে আসে, আর তুমি রাসুল তনয়া ফাতিমা (রাঃ) এর পুত্রের মাথা নিয়ে এসেছো, আল্লাহ্র কসম এখন থেকে আমি আর তোমার বিছানায় থাকবো না, এ বলেই সে তাকে ছেড়ে চলে যায়। এরপর সে বনী আসা'দ গোত্রের দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে ঘুমায়। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর বর্ণনায় - আল্লাহ্র কসম আমি দেখেছি- যে পাত্রের নীচে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা রাখা হয়েছিল আসমান থেকে ঐ পাত্র পর্যন্ত নুর চমকাচ্ছিল আর সা'দা সা'দা পাখি এর কাছ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।[৮৬] সকালে খুলী মাথা নিয়ে ইবনে যিয়াদের সামনে উপস্থিত করে। সেখানে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথীদের মাথাও একত্রিত করা হয়। একথাই প্রসিদ্ধ। আর মাথার সমষ্টি ছিল ৭২টি। এরপর সেখান থেকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা সিরিয়ায় ইয়াযীদ বিন হযরত মুআবিয়ার দরবারে পাঠানো হয়।

ইমাম আহমদ বিখ্যাত সাহাবী আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন - হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের কাছে উপস্থিত করা হয় অতঃপর তা একটি পাত্রে রাখা হয়। তখন সে মাথা মুবারকটিকে খোঁচাতে শুরু করে এবং তার রূপ সৌন্দর্য সম্পর্কে নিন্দাবাদের কিছু উক্তি করে। তখন আনাস (রাঃ) তাকে বললেন, হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর চেহারা রাসুল (রাঃ) এর সাথে অনেক মিল আছে।* ইমাম তিরমিজি আনাস (রাঃ) থেকে হাসান এবং সহীহ রিওয়াতের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, ইবনে যিয়াদ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মুখের সম্মুখ ভাগের উপরের দাঁতে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে এবং বলতে থাকে -দেখতে এগুলো বেশ সুন্দরতো। আনাস (রাঃ) বলেন আল্লাহ্র কসম-তোমার অমঙ্গল হবে। তুমি যেখানে লাঠি দিয়ে আঘাত করছ আমি সেখানে রাসুলকে

---

* বুখারী শরীফে ১/৯৩০ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, তবে সেখানে মুহাম্মদ ইবনে হুসায়ন আনাস সূত্রেই এটি বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চুমু দিতে দেখেছি। তিনি বলেন এ কথা শুনে সে লাঠির আঘাত করা থেকে বিরত হলো এবং উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রেখে চলে গেল।[৮৭] আবু মাখনাফ সুলায়মান বিন আবু রাশেদ তিনি হামিদ বিন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন- হামিদ বিন মুসলিম বলেন ওমর বিন সা'দ আমাকে তার পরিবারের কাছে কারবালার বিজয়ের সুসংবাদ পাঠানোর জন্য ডাকলেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখি ইবনে যিয়াদ লোকদের নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় একদল আগন্তক তার দরবারে প্রবেশ করল। আমিও তাদের সাথে ঢুকে পড়লাম। দেখি তাদের সামনে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা রাখা রয়েছে-আর ইবনে যিয়াদ তার ছড়া দিয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সামনের উপরের দাঁতের উপর ঠুকরাচ্ছে; এভাবে সে প্রায় ঘন্টাখানেক করল। এমন সময় দরবারে অবস্থিত বিখ্যাত সাহাবী যায়েদ বিন আরকাম বলে উঠলেন আপনি তাঁর দাঁতের থেকে ছড়ি উঠান। আল্লাহ্‌র কসম যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই -আমি রাসুল (সাঃ) এর ঠোট মুবারক দিয়ে ঐ দাঁতে চুমু দিতে দেখেছি। একথা বলেই বৃদ্ধ কেঁদে ফললেন। তখন ইবনে যিয়াদ [আল্লামা আইনী হযরত যায়দ ইবন আকাম (রাঃ) এর প্রশংসা করতে যেয়ে বলেন- আমি যায়দ ইবন আরকাম আন্সারী খাযরাজীয় জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করি। আল্লাহ তার মঙ্গল করুন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি রাসুলের (সাঃ) এর সাথে ১৭টি জেহাদে শরীক হয়েছিলেন। আর সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষে অংশ নেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্যতম। তিনি ৬৬ হিজরী সনে মতান্তরে ৬৮ হিজরী সনে কুফাতে ইন্তেকাল করেন। (এই সেই সম্মানিত ও বহুগুনের অধিকারী সাহাবী ইবন যিয়াদের ভাষায় যিনি মতিভ্রম ও দূর্বল বৃদ্ধ বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন।] তাকে বললো-আল্লাহ্‌ তোমাকে আরো কাঁদাক। আল্লাহ্‌র কসম তুমি যদি তুমি বৃদ্ধ মানুষ না হতে তা হলে আমি তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম। এখনি তোমার ঘাড়ের উপর তরবারীর আঘাত পড়ত। একথা রাগত স্বরে বলে ইবনে যিয়াদ বাইরে চলে গেলো। ইবনে যিয়াদ চলে যাওয়ার পর যায়েদ বিন আরকাম ইবনে যিয়াদ সম্পর্কে অনেক কথা বল্লেন। তা শুনে লোকেরা বলাবলি করছিল ইবনে যিয়াদ যদি এ কথা গুলোশুনতো তাহলে সে তাঁকে অবশ্যই হত্যা করত। হামিদ বিন মুসলিম বলেন আমি সে লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম সে কি বললো তারা বললো যায়েদ ইবনে আরকাম আমাদের কাছ দিয়ে যাওয়র সময় বলছিলেন - হে আরব জাতি শুনে রাখ। আজ থেকে তোমরা গোলামে পরিণত হলে। তোমরা

Dhaka University Institutional Repository

ফাতিমার সন্তানকে হত্যা করলে এবং ইবনে মুরজানাকে নেতা বানালে। সে তোমাদের ভাল লোকদের হত্যা করবে এবং খারাপ লোকদের আশ্রয় দিবে।*

ইমাম তিরমিজি উমারা বিন উমাইর এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন পরবর্তীতে (আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের চাচাত ভাই ও ইরাকের গভর্ণর মাসআবের সময়) উবয়দুল্লাহ বিন যিয়াদের এবং তার সাথীদের মাথা কেটে নিয়ে সেগুলো মসজিদের প্রশস্ত মেঝেতে ফেলে রাখা হয়। উপস্থিত লোকেরা তা দেখার জন্য ভীড় জমায় এমন সময় তারা চীৎকার করে বলতে থাকে -এসে পড়েছে এসে পড়েছে। তখন সবাই তাকিয়ে দেখে একটা সাপ মাথা সমূহের মধ্যে প্রবেশ করল-এরপর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের নাকের ভিতর ঢুকে পড়ল কিছুক্ষণ থাকার পর আবার বের হল। আবার লোকেরা বলে উঠলো এসে পড়েছে এসে পড়েছে। এভাবে সাপটা দুইবার অথবা তিনবার করল।**

এ প্রসঙ্গে একথা বলা যায় উপরিউক্ত ঘটনা সত্য। এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিহত হওয়ার সময় বলেছিলেন তোমাদের একদল অন্যদলের উপর শক্তিশালী হয়ে হত্যাজজ্ঞ চালাবে। এরপর আল্লাহ্ তোমাদের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দ্বারা গ্রেফতার করবেন এবং তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। সে পবিত্র মুখের কথা যে বিফল হয়নি উপরিউক্ত ঘটনা তারই প্রমান বহন করে।

হিংস্রতা আর নির্মমতার এক সাক্ষাত মূর্তি ইবনে যিয়াদ হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারকের সাথে বেআদবী করেই ক্ষান্ত হয়ে ছিল না। সে জনতাকে জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য আদেশ করে অতঃপর নামাজ শেষে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলে আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দিয়েছেন, যে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে এবং মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তাঁকে আমাদের দ্বারা হত্যা করিয়েছেন। একথা বলার সাথে সাথে আবদুল্লাহ বিন আকীফ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো - হে ইবনে যিয়াদ তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি নবীদের সন্তানদেরকে হত্যা করে সত্যানুসারীদের মত কথা বলছো ? এ কথা শুনে যিয়াদ ক্রোধে তাকে হত্যা করার আদেশ দিল। তৎক্ষণাৎ লোকেরা তাকে হত্যা করে শুলে চড়িয়ে দেয়া হয়।[৮৮]

---

* ইবনে কাসীরের আল বেদায়া ওয়ান নেহায়াতে ৮ম খন্ডে ২০৭ পৃষ্ঠায় এ বর্ণনার উল্লেখ আছে। সেখানে উল্লেখ আছে আরকাম চলে যাওয়ার সময় এ কবিতা পাঠ করছিল "বাঁদীর বাচ্চা বাঁদী শাসক হয়েছে-গর্ব অহংকারে পেয়ে বসেছে"। আল্লামা আইনীও এই ঘটনাটি বিশদ ভাবে উল্লেখ করেছেন একই রূপে ৬/৬৭০ পৃষ্ঠাতে আবু দাউদ শরীফেও একই সনদে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর তিবরানীতে ছাবেত যায়েদ থেকে বর্ণনা করেন।

** ইমাম তিরমিজি বলেন-এ বর্ণনা হাসান সহীহ। ইমাম তিরমিজি এ হাদীসটি তার মানাযের গ্রন্থের ৩১নং অধ্যায় ৩৭৮০নং হাদিসে ৫/৬৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কারো মৃত্যুর পর তাকে গালমন্দ করা শরীয়ততো দূরের কথা মানব সুলভ চরিত্রেরও পরিপন্থী। আর হযরত হুসায়ন (রাঃ) তো ছিলেন নবীকুল শিরোমনির, কলিজার টুকরা বেহেস্তের যুবকদের সর্দার। তাঁকে এভাবে কলংকিত করা দ্বীন এবং নৈতিকতার দৃষ্টিতে আরও জঘন্য অপরাধ।

শেষে ইবনে যিয়াদ তাঁর লোকদের সাথে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা সহ যুদ্ধের ময়দান পরিদর্শনে যান। এরপর সেখান থেকে জহর বিন কায়েসের নেতৃত্বে হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তাঁর সাথীদের মাথা সিরিয়ায় ইয়াযীদ বিন হযরত মুআবিয়ার দরবারে পাঠানো হলো। জহরের সাথে ছিল একদল অশ্বারহী বাহিনী। তাদের মধ্যে আবু বুরদা বিন আওফ আল আজাদী নামক এক ব্যক্তিও ছিল। তারা চলতে থাকলো এবং সিরিয়ার ইয়াযীদ বিন হযরত মুআবিয়ার দরবারে সকল মাথা হাজির করল।

Dhaka University Institutional Repository

আহলে বায়েতের সাথে ইয়াযীদ ও তার পরিবার বর্গের আচরণ

ঐতিহাসিক হিশাম রবীয়া আল জারশী আল হামীরী এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন রবীয়া বলেন- আল্লাহ্‌র কসম জহর বিন কায়েস যখন ইয়াযীদ বিন হযরত মুআবিয়ার দরবারে উপস্থিত হয় তখন আমি তার দরবারে উপস্থিত ছিলাম। ইয়াযীদ তাকে বললো-তোমার ধ্বংস হোক। তোমার সাথে এসব কি? সে বললো - হে আমীরুল মুমীনীন -আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করেছেন ও বিজয় দান করেছেন এবং আমাদের উপর থেকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) বিন আলী-বিন আবু তালিব ও তার ১৮জন আহলে বায়েতকে এবং তার ৬০ জন অনুসারীকে সরিয়ে দিয়েছেন। আমরা তাদের সাথে মিলিত হয়ে প্রথমে সন্ধি করতে বলি এবং উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের শাসন কর্তৃত্ব মেনে নিতে বলি নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলি, তারা যুদ্ধ করাকেই বেছে নিল। আমরা দিনের প্রথম ভাগেই চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলি, তারা পলাতে চেষ্টা করেছিল .... আমরা তাদেরকে শিকার ধরার মত ধরে ফেলি। আল্লাহ্‌র কসম তাদের কাউকে ছেড়ে দেইনি। সবাইকে জবেহ করে ফেলেছি। তাদের দেহ সেখানেই পড়ে আছে। সেখানে তাদের গায়ের পোষাক সবই পড়ে আছে আর বাতাসে নড়ছে।[৮৯]

রাবীয়া আল জারশী-আল হামীরী বলেন- এ কথা শুনে ইয়াযীদের চোখে পানি এসে গেলো এবং তিনি বলেন, হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যা না করলেও আমি তোমাদের আনুগত্যে সন্তুষ্ট ছিলাম। ইবনে যিয়াদের উপর আল্লাহ্‌র লানত। আল্লাহ্‌র শপথ আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে ক্ষমা করে দিতাম। তিনি আরও বলেনঃ হুসায়ন! আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমার প্রতি পক্ষে থাকলে তোমাকে হত্যা করতাম না।[৯০]

কিন্তু আবু মাখনাফ কাসিম বিন বুখাইত থেকে অন্যভাবে বর্ণনা করেন- কাসিম বিন বুখাইত বলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা যখন ইয়াযীদের সামনে রাখা হল তখন সে তার হাতের লাঠি দিয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) মুখের মধ্যে খুঁচাতে লাগলো। তখন আবু বারজা আল আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি তোমার লাঠি সরিয়ে নাও। এ স্থানে আমি রাসুল (সাঃ) কে চুমু দিতে দেখিছি। তিনি আরো বলেন- সাবধান! জেনে রেখ মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জন্য সুপারিশ করবেন -আর তুমি ইবনে

Dhaka University Institutional Repository

যিয়াদের সুপারিশের আশা করছো। এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।[৯১] অনুরূপ বর্ণনা ইবনে আবিদ দুনিয়া অন্য সনদে আবু বারজার হাদিস বর্ণনা করেন।

আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারক সিরিয়ায় ইয়াযীদের কাছে পাঠানো হয়েছিল কিনা। এ ব্যাপারে ২টি মত আছে। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ মত হলো পাঠানো হয়েছিল।* হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারক ইয়াযীদের সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি সেই মাথা মুবারকের সঙ্গে যে আচরন করেছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর জীবিত অবশিষ্ট আহলে বায়েতও মহিলাদেরকে ওমর বিন সা'দের নেতৃত্বে সিরিয়া পাঠানোর দায়ীত্ব দেয়া হলে তিনি তাদেরকে সতর্কতার সাথে ও সাবধানতার সাথে সাওয়ারীব হাওদাজের মধ্যে উঠালেন, তারা চলতে চলতে মা'রেকা নামক স্থানে পৌছেন। সেখানে তারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তাঁর সাথীদের মাথা সমূহকে যমিনের উপর রাখা অবস্থায় দেখতে পান। এসব দেখে মহিলারা চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিলেন। তখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বোন যয়নব তাঁদের উদ্দেশ্যে গুনরাজী বর্ণনা করতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগলেন কবিতা আবৃত্তি করে,

"হে প্রশংসিত জন হে প্রশংসিত জন

তোমার পতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক

আসমানের ফেরেস্তাদের সালাম বর্ষিত হোক

এই যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) আজ উন্মুক্ত অবস্থায়

রক্তই তাঁর পোষাক

হে প্রশংশিত জন

---

* তাবারী ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ৩০৯-৩৫৬ ইবনুল আসীর ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ২৮২, ২৯৯ এবং আলবেদায়া ৮ম খন্ডে এ কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার হস্তপদ কর্তিত মেয়েরা বন্দি, ছেলেরা নিহত।"

কুররা বিন কায়েস বর্ণনা করেন যখন এ মহিলাগণ নিহতদের অতিক্রম করছিলেন তখন কান্নায় চোখের পানি তাদের গাল দিয়ে বেয়ে পড়ছিল। তিনি বলেন- আমি এ দিনে মহিলাদের যে মর্মবেদনার দৃশ্য দেখেছি, সে রকম আর কখনও দেখিনি। তাঁরা কারবালা থেকে কুফায় আনীত হলে ইবনে যিয়াদ বাহকদের সম্মান প্রদর্শন করলেন-এবং খাওয়া পরার ব্যবস্থা করলেন। যয়নব (রাঃ) কে খালি পায়ে ও মলিন পোষাকে যিয়াদের সামনে নেয়া হলো। উবায়দুল্লাহ যিয়াদ তাঁর পরিচয় জীজ্ঞাসা করলে তিনি নিরুত্তর রইলেন। তখন সেখানকার একজন আমত্য বলল এতো যয়নব বিনতে ফতিমা। তখন যিয়াদ বললো- সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি তোমাদের অধোঃ পতিত করেছেন এবং হত্যা করেছেন এবং তোমাদের বাক্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন। যয়নব (রাঃ) এর উত্তরে বলেন বরং সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং তোমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন এবং তোমার থেকে আমাদেরকে হেফাযত করে পবিত্র রেখেছেন। নিশ্চয় পাপী ও ফাসেক মিথ্যা ও জুলুমের কথাই বলে থাকে।

ইবনে যিয়াদ বললো তুমি কি দেখনা আল্লাহ্‌ তোমাদের আহলে বায়েতের সাথে কেমন ব্যবহার করলেন। উত্তরে যয়নব (রাঃ) বললেন আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর হত্যা লিখে রেখেছেন। অতপর তোমরা তাদেরই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। অতিশীঘ্রই তোমাকে তাঁদের সামনে করে আল্লাহ্‌র কাছে দন্ডায়মান হতে হবে। তাঁরা আল্লাহ্‌র সামনে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করবেন। এসব কথা শুনে ইবনে যিয়াদ রাগান্বিত হয়ে তাঁকে বেত্রাঘাত করতে চাইলে আমর বিন সা'দ তাকে বাঁধাদেন।

মুজালিদ বিন সাঈদ থেকে আবু মাকনাফ বর্ণনা করেন যখন যিয়াদ আলী বিন হযরত হুসায়ন (রাঃ) (যয়নুল আবেদীন) কে দেখলো তখন একজন পুলিশ তাকে বললো আপনি কি এর ব্যাপারি দুশ্চিন্তা করছেন। যদি করেন তাহলে বলুন ওর গর্দান কেটি ফেলি। তারা ছেলেটার পোষাক খুলে ফেললো। তখন ইবনে যিয়াদ বললো যাও একে হত্যা কর, তখন আলী বিন হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাকে বললেন যদি আপনার সাথে এ বন্দিনী মহিলাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে তাহলে আপনি তাদের সাথে এমন একজন পুরুষ লোক প্রেরণ করেন যিনি তাঁদের হেফাযত করবেন। তখন ইবনে যিয়াদ তাঁকে বললেন তুমিই আস। এরপর তাকেই বন্দিনীদের সাথে প্রেরণ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

আবু মাখনাফ হামীদ বিন মুসলিমের উক্তি বর্ণনা করেন, এ একই ঘটনা একটু অন্যভাবে, যয়নল আবেদীন যিয়াদের সামনে আনীত হলে, যিয়াদ তার নাম জিজ্ঞাসা করলে সে বলে আমি আলী বিন হযরত হুসায়ন (রাঃ) তখন যিয়াদ বলে আল্লাহ্ কি আলী বিন হযরত হুসায়ন (রাঃ) হত্যা কনেনি? তিনি চুপ থাকেন পরে যিয়াদের কথায় সে বলে আমার এক ভাই ছিলেন তার নামও আলী ছিল লোকেরা তাকে হত্যা করেছে। যিয়াদ বললো -আল্লাহ্ তাকে হত্যা করেছেন। এতে তিনি নিরুত্তর থাকেন। যিয়াদ তাকে বললো তোমার কি হলো কথা বলছনা কেন ? উত্তরে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন "আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া কোন প্রাণীই মৃত্যুবরণ করতে পারে না।"[১২] তখন ইবনে যিয়াদ বললো তুমিও তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে। তোমাদের ধ্বংস হোক তোমরা এ ছেলেটাকে দেখ আমি একে প্রাপ্ত বয়স্ক বলে মনে করি। সেখানে শারী বিন মুয়াজ আল আহমারী আসেন এবং বলেন হ্যাঁ সেতো প্রাপ্ত বয়স্কই। তখন ইবনে যিয়াদ বলে একে হত্যা কর। তখন আলী বিন হুসায়ন (রাঃ) বললেন -এই মহিলাদের অভিভাবক কে হবে ? তখন সেখানে তার ফুফু যয়নব (রাঃ) আসলেন এবং বললেন হে যিয়াদ আমাদের প্রতি এ পর্যন্ত যা করেছ তাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি কি আমাদের রক্ত দেখনি? আমাদের কোন পুরুষকেকি তুমি জীবিত রাখবে না? যিয়াদ বললো মহিলাটিকে এখান থেকে নিয়ে যাও। যয়নাব (রাঃ) তখন বলেন আল্লাহ্র ওয়াস্তে তুমি যদি মুমীন হও তাহলে তার সাথে আমাকেও হত্যা কর। তখন আলী ইবনে যিয়াদকে আহবান করে বললেন হে ইবনে যিয়াদ যদি তোমার সাথে এ মহিলাদের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে তুমি এ মহিলাদের সাথে মুত্তাকী-পরহেজগার প্রকৃত মুসলমান একজন পুরুষকে সাথী করে দাও। তখন ইবনে যিয়াদ মহিলাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর নিজ লোকদের দিকে তাকিয়ে বললো কি আশ্চর্যরকম রক্তের সম্পর্ক, আল্লাহ্র কসম আমি যদি এ ছেলেটাকে হত্যা করি তাহলে ঐ মহিলাটিকেউ সাথে হত্যা করতে হবে। ছেলেটাকে ছেড়ে দাও। সে তার আত্মীয় মহিলাদের সাথে মিলিত হোক। এরপর যিয়াদ হুসায়ন (রাঃ) এর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদেরকে ইয়াযীদের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল এবং আলী বিন হুসায়ন (রাঃ) এর গলায় রশি লাগানোর নির্দেশ দিল। মাহকার ইবনে সালাবা আল আঈজীর নেতৃত্বে তাদেরকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো।* তার সাথে শীমার বিন যিলযাওশানকেও পাঠানো হলো।

---

* কুরাইশ এরই এক শাখাগোত্রের লোক সে, তাবারী ৬/২৬৪ তে লোকটার নাম মাহফাজ, কামিল ৪/৮৪তে মাহফার আর আখবারুত তোয়াল গ্রন্থের ২৬০ পৃঃ তাঁর নাম মেহফান বলা হয়েছে।)

Dhaka University Institutional Repository

তারা যখন ইয়াযীদবিন হযরত মুআবিয়ার দরবারে গিয়ে উপস্থিত হল তখন মাহকার বিন সালাবা উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগলো এই যে মাহকার বিন সালাবা আমীরুল মুমীনীনের দরবারে সকল অপরাধীদের নিয়ে এসেছে। ইয়াযীদ বিন হযরত মুআবিয়া তখন বললো - তোমার মা একজন খারাপ সন্তানের জন্ম দিয়েছে; তুমি ও তোমার মা উভয়েই হতভাগ্য।

যখন সমস্ত কর্তিত মস্তক ও মহিলাদেরকে ইয়াযীদের সামনে হাজির করা হল- তিনি তখন সিরিয়ার নেতৃস্থানীয় লোকদের আহ্বান করলেন তারা সবাই তার চরিদিকে ঘিরে বসে পড়লো। অতঃপর তিনি আলী বিন হুসায়ন (রাঃ) এবং হুসায়ন (রাঃ) এর স্ত্রীগণকে ডাকলেন। তারা সবাই সেখানে আসলেন লোকেরা তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

ইয়াযীদ আলী বিন হুসায়ন (রাঃ) কে বললেন -হে আলী তোমার পিতা আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ছিল আর আমার মর্যাদাকে ভুলে গিয়েছিল। আর আমার শাসন কর্তৃত্বের প্রতিদন্দ্বী হয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ এ ব্যাপারে যা করার তা করে ফেললেন যা তুমি দেখতে পাচ্ছো। তখন আলী (রাঃ) বললেন- এ যমীনে কোন প্রাণীর উপর যে সব বিপদ আপদ এসে থাকে তা আল্লাহ পূর্বেই লিখে রাখেন।[৯৩] এরপর ইয়াযীদ তার পুত্র খালিদকে বললেন তার কথার উত্তর দাও। কিন্তু সে এ কথার উত্তর দিল না। পিতা মনে করল হয়ত সে এর উত্তর দিতে পারছে না, তাই তিনি তার ছেলেকে বললেন বলো- "তোমাদের উপর যে মছিবতই আসুক তা তোমাদের কর্মেরই ফল, আর আল্লাহ্ অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন"[৯৪] এরপর ইয়াযীদ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হুসায়ন (রাঃ) এর পরিবার ভুক্ত মহিলাদেও স্ত্রী পুত্রদের ডাকলেন। সে তাদেরকে খুবই করুন অবস্থায় দেখতে পেলেন। এরপর সে বললো আল্লাহ্ ইবনে মারজানার অমঙ্গল করুন। যদি তার সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকত তাহলে সে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করতে পারতনা। আর তোমাদেরকেও এরকম ভাবে পাঠাতে পারতনা।

আবু মাখনাফ হারিস বিন কাব থেকে তিনি ফাতিমা বিনতে হুসায়ন থেকে বর্ণনা করেন ফাতিমা বলেন আমাদেরকে যখন ইয়াযীদের সামনে উপস্থিত করা হলো তখন সে আমাদেরকে কিছু আদেশ করল এবং আমাদের প্রতি অনুকম্পা দেখালো। অতঃপর কালবর্ণের এক সিরিয়াবাসী ইয়াযীদের কাছে দাড়িয়ে বললো হে আমীরুল মুমীনীন আমাকে এই মেয়েটি দিন আমি দাসী হিসাবে রাখবো, আমাকে টানতে শুরু করলো। সে মনে করেছিল এটা করা তার জন্য বৈধ। আমি তখন

Dhaka University Institutional Repository

আমার বোন যয়নবের কাপড় টেনে ধরলাম। তিনি জানতেন এটা করা ঐ লোকের জন্য বৈধ নয়। তিনি লোকটাকে বললেন -আল্লাহ্র কসম তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি নিন্দনীয় কাজ করছ। এটা করা তোমার জন্য এমনকি ইয়াযীদের জন্যও বৈধ নয়। এ কথা শুনে ইয়াযীদ রেগে গেলো এবং তাকে বললো তুমি মিথ্যা কথা বলছো। নিশ্চয় আমি ইচ্ছা কবলে আমার জন্য বৈধ হবে। উত্তরে তিনি বলেন আল্লাহ্র কসম কখনো নয়। যতক্ষননা তুমি আমাদের মিল্লাত থেকে এবং ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবে। তিনি বলেন এতে ইয়াযীদ আরো রাগান্বিত হলো এবং তাঁকে ধমঁকিয়ে বের করে দিতে চাইলো এবং বললো তোমরা কি একথা মেনে নিবে না, তোমরা তো তোমাদের পিতা ও ভাইয়ের ধর্ম থেকে বের হয়ে পড়েছো। প্রতি উত্তরে যয়নব বললেন আল্লাহ্র দ্বীন আমার পিতা ও ভাই নানার দ্বীন থেকে পেয়েছেন অথচ তুমি তোমার পিতা ও তোমার দাদা এ দ্বীনের হেদায়েতই নিয়েছো। উত্তরে ইয়াযীদ বললো হে আল্লাহ্র শত্রু তুমি মিথ্যা বলছো। উত্তরে যয়নব বললেন আপনি আমিরুল মুমীনিন আপনি রাজ্য ক্ষমতার বলে আমাদের উপর প্রভাব খাটাচ্ছেন এবং ছড়ি ঘুরাচ্ছেন। ফাতেমা বিনতে হুসায়ন বলেন আল্লাহ্র কছম একথায় সে লজ্জিত হলো এবং চুপ হয়ে গেল।

পুনরায় ঐ লোকটি দাঁড়ালো এবং বললো -হে আমীরুল মুমীনিন আমাকে এ মেয়েটি প্রদান করুন-ইয়াযীদ উত্তরে বললো তুমি কুমারই থাকো-আল্লাহ্ তোমাকে কুমার অবস্থায়ই মৃত্যু দিন। এরপর ইয়াযীদ নুমান বিন বশীরকে কিছু সংখ্যক বিশ্বস্থ মানুষের মাধ্যমে অশ্বে সওয়ারী করে তাদেরকে মদীনায় পাঠানোর জন্য আদেশ করলো। মহিলাদের এ দলে আলী বিন হোসেন (রাঃ) কেও সাথী করা হলো। অতঃপর তাদেরকে ইয়াযীদের হেরেম শরীফে প্রবেশ করানা হলো, হযরত মুআবিয়ার পরিবারভূক্ত মহিলাগণ তাঁদেরকে সাদর সম্ভাষন জানালেন এবং হুসায়ন (রাঃ) এর জন্য মর্মবেদনা প্রকাশ করে কাঁদতে লাগলেন। সেখানে তারা তিনদিন বেশ আদর আপ্যায়নের সঙ্গে থাকলেন। আর এ তিন দিনে সব সময় ইয়াযীদ আলী বিন হুসায়ন (রাঃ) ও তাঁর ছোট ভাই ওমর বিন হুসায়ন (রাঃ) কে সাথে করে রাখতো। একদিন ইয়াযীদ ওমর বিন হুসায়ন (রাঃ) কে বললো -(সে ছিল খুবই ছোট) তুমি কি একে হত্যা করবে? অর্থাৎ তার পুত্র খালিদ বিন ইয়াযীদকে। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য শুধু কৌতুক ও তামাশা করা। তখন সে বললো দাও আমাকে চাকু দাও।* তাকে চাকু দেয়া হলো। এতে সে তার সাথে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করে দিল। এরপর ইয়াযীদ তার হাত থেকে চাকু

* আখবারুত তোয়াল ২৬১ পৃ তববারীর কথা বলা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

নিলেন এবং তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন এতো স্বভাবে তার পিতার মতই, সাপতো সাপেরই জন্মদেয়।*

ইয়াযীদ যখন তাদের বিদায় দিচ্ছিল তখন সে আলী বিন হুসায়ন (রাঃ) কে বললো -আল্লাহ ইবনে সামিরার উপর নাখোশ হোন, আল্লাহ্‌র কসম আমি যদি তোমার পিতার নিকট উপস্থিত থাকতাম তাহলে তিনি আমাকে যে প্রস্তাব দিতেন আমি তাই মেনে নিতাম। আমি যে ভাবেই হোক তার মৃত্যু ঘটাতে দিতাম না। যদিও এতে আমার কোন সন্তানের ধ্বংস হত। কিন্তু আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা ছিল তাতো হয়েই গেছে, যা তুমি দেখতে পাচ্ছো। অতঃপর সে তাদের রওনা হওয়ার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে দিল এবং তাকে অনেক মাল সামগ্রী ও পোষাক দিল। তাঁদের সাথে যে দুতকে দেয়া হয়েছে তাকেও উপদেশ বানী শুনাল। সে বললো তোমার যে কোন অভাবের কথা আমাকে লিখে জানিও।

হুসায়ন (রাঃ) এর আহলে বায়েতের কাফেলা মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হল। তাঁদের সাথী ঐ দূত লোকটা সব সময় রাস্তায় তাদের থেকে বেশ কিছু দূরে দূরে থেকে তাদের পথ নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিল আর। এভাবেই তারা মদীনায় পৌছে গেলেন। ফাতিমা বিনতে আলী বলেন- আমি আমার বোন যয়নবকে বললাম যে দূত লোকটা আমাদের সাথে সাথে আসলো সে কতইনা সুন্দর লোক, কত সুন্দর ভাবেই না আমাদের পথ প্রদর্শন করেছে। আমি তাকে বললাম লোকটাকে কিছু দেওয়ার মত আছে কি? কিন্তু তাদের কাছে অলংকার ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। তখন তারা ঐ অলংকারই লোকটিকে দিতে চাইলেন তার উত্তম আচরনের প্রতিদানে। কিন্তু লোকটা ওগুলো নিতে অস্বীকার করে বললো আমি আপনাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছি একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং রাসুল (সাঃ) এর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে।

ইবনে কাছিরের অন্য এক বর্ণনায় এটাও আছে যখন ইয়াযীদ হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারক দেখতে পেল তখন সে বললো তোমরা কি জানো ইবনে ফাতেমাকে কোথা হতে আনা হলো? আর তাকে কেই বা এমন করল, এখান কার কেউ কি ঘটনার সময় ছিলে? উপস্থিতগন বললো

---

* (চাকু দিয়ে আঘাত করে সে খালিদের রক্ত বের করে ফেলেছিল। ইবন আছমে এ ছেলের নাম আমর বিন হাসান (রাঃ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৪/৮৭, কিন্তু অন্য স্থানে আমর বিন হোসেন (রাঃ) বলা হয়েছে। সেছিল বেশ ছোটএস আঘাত করতে সক্ষম হয়নি। আর তার মা ছিল উম্মে ওয়ালাদ অর্থাৎ দাসী মাতা)

Dhaka University Institutional Repository

না।[৯৫] তখন সে বললো জেনে রেখ তার পিতা আমার পিতার চেয়ে উত্তম আর তাঁর মা ফাতিমা বিনতে রাসূল (সাঃ) আমার মায়ের চেয়ে উত্তম আর তার নানা, আমার দাদা, নানার চেয়ে উত্তম। আর তিনি নিজেও আমার চেয়ে উত্তম। আর শাসন ক্ষমতার জন্য তিনিই আমার চেয়ে বেশী উপযুক্ত ছিলেন।

অন্য সূত্রে ইবনে কাছির এভাবেও লিখেছেন -তাঁর পিতা আমার পিতার চেয়ে উত্তম। এখন আমার পিতা তার পিতার সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে নিজেদের যুক্তি পেশ করছেন। মানুষেরা জানত তাদের মধ্যে কার উপযোগীতা বেশী ছিল। অন্য বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে তার মাতা আমার মাতার চেয়ে উত্তম। অন্য বর্ণনায় তাঁর নানা রাসুল (সাঃ) আমার দাদার চেয়ে উত্তম। আমার জীবনের কসম যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই জানবে এবং জানা উচিৎ রাসুল (সাঃ) আমাদের জন্য ছিলেন ন্যায়েব প্রতীক, অন্যায়ের নয়।

কিন্তু তাঁর হুসায়ন (রাঃ) এর কুরআনের এ আয়াতগুলো বেশী করে অনুধাবন করা প্রয়োজন ছিল, "বল হে মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহই রাজাধিরাজ, তিনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন আর যার থেকে ইচ্ছা কেড়ে নেন। আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন"।[৯৬] আল্লাহ্‌ আরো বলেন আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা তাঁকে তাঁর রাজত্ব দান করেন।[৯৭]

মহিলাগনকে যখন ইয়াযীদের সামনে আনা হলে -তখন ফাতিমা বিনতে হুসায়ন (রাঃ) বললেন (তিনি সকিনার চেয়ে বড় ছিলেন) হে ইয়াযীদ! রাসূলের কন্যাগণ আজ বন্দিনী। ইয়াযীদ বললো -হে আমার ভ্রাতুষকন্যা আমি পূর্ব থেকেই এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট। ফাতিমা বলেন- আমি বললাম আল্লাহ্‌র কসম তারা আমাদের স্বর্ণ রৌপের অলংকারও ছেড়ে যায়নি। সে উত্তরে বললো হে আমার ভ্রাতুষ কন্যা আমি তোমাকে তার চেয়ে আরো ভালো জিনিষ প্রদান করব। ইয়াযীদ তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তার স্ত্রীগণকে বললো তোমাদের কি অলংকার আছে তোমরা সব গুলি এ মেয়েদের দিয়ে দাও। স্ত্রীদের মধ্যে যার যা ছিল তা সবই তাদের উদ্দেশ্যে বের করে দিল। কেহই বাদ থাকলো না।

কাসেম বিন বুখাইত থেকে বর্ণিত যখন কুফার প্রতিনিধি দল- হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারক নিয়ে দামেস্কের মসজিদে প্রবেশ করল তখন মারওয়ান বিন হাকাম ও তার ভাই ইয়াহহিয়া

Dhaka University Institutional Repository

বিন হাকাম এগুলো দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠলো এমন কাজ তোমরা কেমন করে করলে? তোমাদের এ কাজ সমর্থন যোগ্য নয়।

বর্ণনাকারী বলেন- যখন মদীনাতে হুসায়ন (রাঃ) এর নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছাল তখন মদীনার বনী হাশিম গোত্রের মহিলাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। আল বেদায়ায় অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে ইয়াযীদ তার দরবারের লোকদের নিকট আহলে বায়েতের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে তাঁদের একদল বলে আপনি কুকুরের বংশকে নিশ্চিহ্ন করুন। আপনি আলী বিন হুসায়নকে হত্যা করুন যেন হুসায়ন বংশের আর কেউ জীবিত না থাকে। এসব কথা শুনে ইয়াযীদ নিশ্চুপ থাকল।

তখন নুমান বিন বশীর বলেন তাদের সাথে আপনি এমন আচরণ করুন যেমন আচরণ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের সাথে এ অবস্থায় করতেন। তখন ইয়াযীদ হুসায়ন (রাঃ) এর পরিবারের মহিলাদেরকে পৃথক করে তার মহিলাদের অঙ্গনে নিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে তাদের ঘরেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করল।

হুসায়ন (রাঃ) নিহত হওয়ার পর ইবনে যিয়াদ পত্র মারফত হারামাইন শরীফের গভর্নর আমর বিন সাঈদকে হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যার সুসংবাদ প্রচার করে দিতে বলে। এ সংবাদ হাশিমী গোত্রের মহিলারা শুনে উচ্চস্বরে কান্না ও বেদনা প্রকাশ করতে শুরু করে দেয়।* মহিলাদের কান্না শুনে আমর বিন সাঈদ বলতে লাগলো এ কান্না উসমান বিন আফফানের স্ত্রীগণের কান্নার প্রতিধ্বনি। আবদুল মালিক বিন আমীর বলেন আমি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের দরবারে এমন সময় উপস্থিত হয়েছিলাম যখন তার সামনে একটা তসতরীর মধ্যে হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারক রাখা ছিল। তিনি বলেন - আল্লাহ্‌র কসম অল্প কিছুকাল পরেই মুখতার বিন আবি উবাইদ এর শাসনকালে তার দরবারে প্রবেশ করে ঐ একই অবস্থায় তার সম্মুখে উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের মাথা রাখা দেখতে পাই। এরপর তিনি আরো বলেন- এর অল্প কিছুকাল পরে আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসন আমলে তার দরবারে প্রবেশ করে ঐ একই অবস্থায় তার সম্মুখে তসতরীতে মাসআব বিন জুবাইরের মাথা কর্তিত অবস্থায় রাখা দেখতে পাই।

* তাবারী ৬/২৬৮তে বলা হয়েছে পত্র বাহক ছিল মালিক বিন আবিল হারেস আস-সালামী

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস নির্মম, ইতিহাস এমন ভাষাতেই কথা বলে সর্বকালে সর্বত্র, কারবালার ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গেরও কেউই আল্লাহর নিখুঁত অলংঘ বিধান থেকে রেহাই পাইনি।

ইমাম তিরমিজি এক বরাতে উল্লেখ করেছেন, যে ইবন যিয়াদ ও তার সাথীদের মাথা মসজিদে রাখা এবং বারবার সাপের আগমন ঘটা, অদৃশ্য থেকে তা বেরিয়ে আসাদেখে লোকদের চিৎকার করে উঠা, সমস্ত মাথার মধ্যে শুধু ইবন যিয়াদের নাকে-মুখে বারবার প্রবেশ করা ও বেরিয়ে আসার কথা সচিত্তারে উল্লেখিত হয়েছে। আল্লামা-ইমাম তিরমিজি এটিকে সঠিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বস্তুতঃ এ ঘটনাটি কুপ খনন কারীর কুপে পতিত হওয়ার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ যে তার লাঠি দ্বারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে বে-আদবী করেছিল। আল্লাহ তায়ালা একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর সাহায্যে তাকে লাঞ্ছিত করলেন। আর এ ভাবে রাসুলের হাদীছে "যে তার ভাইদের জন্য কুপ খনন করে সে নিজেই তাতে পতিত হয়" সত্যে পরিনত হলো। হাদীসের ভাষ্যমতে কবরে শাস্তি ভোগকারীদের উপরই এরূপ আযাব নিপতিত করে থাকে। মানুষ কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে আল্লাহ কর্তৃক অপদস্ত হওয়া কত কঠিন। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আর এভাবে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর তাদের সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বানী কার্যে পরিনত হলো।

মোট কথা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারক একটি পাত্রে করে ইবন যিয়াদের নিকট নিয়ে আসা উক্ত মাথা মুবারকের সাথে ইবন যিয়াদের বেআদবী করা এবং এতদ প্রেক্ষিতে তার জঘন্য মানসিকতার পরিচয়দান সংক্রান্ত বিবরণ আল্লামা ইমাম বুখারী, কাযযায তাবরানী ইবন হাজার আসকালানী ও বদর উদ্দীন আইনীর মত বড় বড় মুহাদ্দিস গন অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তারা ঘটনাটি হযরত আনাছ ইবন মালিক ও যায়দ ইবন আকরামের মত সম্মানিত সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন সুযোগ নেই। আর এ সাথে একথাও স্পষ্টভাবে প্রমানিত হলো যে হযরত হোসাইন (রাঃ) এর মাথা মুবারককে তাঁর দেহচ্যুত করা হয়েছিল। প্রাচ্যবিদগন বলে থাকেন তাঁর মাথা দেহ থেকে চিচ্ছিন্নই করা হয়নি, এরূপ খন্ডিত তথ্যহীন কথার কোন গুরুত্ব নেই।

Dhaka University Institutional Repository

২.১২ হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদতের ক্ষেত্রে ইয়াযীদের ভূমিকা

হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যা করার পিছনে ইয়াযীদের হাত ছিল কিনা এসম্পর্কে বিভিন্ন পরিলক্ষিত হয়। আল্লামা ইবন কাছীর লেখেন ঃ "ইয়াযীদ হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে তাঁর সাথীগনসহ উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের মধ্যেমে হত্যাকরে"।[৯৮] কুস্তলানী আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাখানী থেকে নকল করে লেখেন, "হযরত হোসাইন (রাঃ) এর হত্যাকান্ড সম্পর্কে ইয়াযীদের রাযী থাকাও এ জন্য খুশী প্রকাশ করা এবং নবীজীর আহলে বায়াতকে লাঞ্চিত করা এগুলো অকাট্য ভাবে প্রমানিত হয়েছে। যদিও এর বিশদ বর্ণনা গুলো খবর ওয়াহেদের পর্যায়ভূক্ত।[৯৯]

হাফিজ ইবন কাছীর (রাঃ) হাদীছ থেকে এরূপ একাধিক রেওয়াতে উল্লেখ করেছেন যাতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যার ব্যাপারে ইয়াযীদের সম্মত থাকার কথা প্রমানিত হয়। এ ব্যাপারে আবু মাখনাফ থেকে একটি বিশদ রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। সাধারণত সাবায়ী বর্ণনার অজুহাতে নাসিবী সম্প্রদায় তার রেওয়ায়েত গুলোকে প্রত্যাখান করে থাকে। কিন্তু মুহাদ্দিস ইবন আবী আদদদুনয়া মুহাদ্দিস সুলভ ভঙ্গিতে কিছুটা সংক্ষিপ্ত ভাবে সেই বিষয় বস্তুটি তুলে ধরেছেন যেমনঃ "ইবন আবী আদ্‌দুনয়া হযরত জাফর (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথাটি ইয়াযীদের নিকট পেশ করা হ'লো সে সময় তার নিকট সাহাবী আবু বারযা (রাঃ) ও উপস্থিত ছিলেন। সে তখন তার লাঠি দ্বারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মুখ-মন্ডলে আঘাত করতে লাগরো তখন আবু বারজা (রাঃ) বললেন, তোমার লাঠি সরিয়ে নাও। এ স্থানে আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে চুমু দিতে দেখেছিল।[১০০]

কিন্তু ইয়াযীদ কর্তৃক হুসায়ন (রাঃ) এর মাথায়ও দন্ত মুক্তায় ছড়ি মারার কথাকে অপ্রমানিত রেওয়ায়েত বলে -আল্লামা ইমাম ইবনে তায়মিয়া বলেন এই রেওয়ায়েত শুধু অপ্রমানিতই নয়, এটা যে একেবারে মিথ্যা তার জলন্ত প্রমান হচ্ছে এই যে, ইয়াযীদ কর্তৃক ইমামের দাতে ছড়ি মারার ঘটনা যে সকল সাহাবীর বাচনিক উপরিউক্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের একজনও তখন শামে ছিলেন না, তারা তখন সকলেই ছিলেন ইরাকে।[১০১] অথচ বিজ্ঞ আলেম সাহেব এখানে সেই সমস্ত সাহাবীদের ইরাকে অবস্থান করা সম্পর্কিত কোন অকাট্য দলিল পেশ করেন নি। অথচ ইয়াযীদ কর্তৃক হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা ও দন্তে ছাড়ী মারার ঘটনা একাধিক সহীহ হাদীছ সূত্রে প্রমানিত, যদিও তা খবরে ওয়াহেদের পর্যায়ভূক্ত। ইবনে তাইমিয়া আরো বলেন "একাধিক ঐতিহাসিক

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছেন, ইয়াযিদ হযরত হুসায়নকে নিহত করার হুকুম দেয়নি আর এ দুষ্কার্যে তার কোন স্বার্থও ছিলনা, স্বীয় পিতা হযরত মুআবিয়ার নির্দেশ মত হযরত হুসায়নকে খাতিরও সম্মান করাই তার অভিপ্রত ছিল অবশ্য তার এও ইচ্ছাও ছিল যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) খিলাফতের দাবী যেন না করেন আর তার বিরুদ্ধে উত্থিত না হন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) কারবালায় পৌঁছে যখন কুফাবাসী গাদ্দারদের বিশ্বাস ঘাতকতা বুঝতে পারলেন, তখনি তিনি স্বীয় দাবী পরিহার করে সোজাসুজি ইয়াযীদের কাছে যেতে চেয়েছিলেন অথবা স্বীয় জন্মভূমি প্রত্যবর্তন করতে বা সীমান্তের যুদ্ধে প্রেরিত হতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। আমরা ইমাম সাহেবের এ সব কথার সবই এক বাক্যে মেনে নিতে পারিনা। কারণ প্রকাশ্য ও প্রমানিত দলিলের মুকাবেলায় কিয়াস দলিল হতে পারেনা। অপর পক্ষে যে সব সাহাবীদের সামনে ইয়াযীদ ঐ কুকীর্তি করেছিল-সে সব সাহাবী যে তখন শামে ছিলেন না, একথার কোন ভিত্তি নেই। অপর পক্ষে আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছীর, আল বেদায় ওয়ান নেহায়াতে আত তাবারী, ইবনুর আছীর - দলিল প্রমান সহ বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াযীদ এ কাজ করেছিল। অপর পক্ষে এ সম্পর্কে কুস্তনালী কর্তৃক আল্লামা তাফতা-যানীর আকীদাও ঘটনাটির উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, এই আকীদার ও ঘটনার সত্যতার সাথে তিনি সম্পূর্ন একমত। তাই একজন মুহাদ্দিস ও একজন মুসলিম যুক্তিবাদীর মতৈক্যের ফলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যা করার ব্যাপারে ইয়াযীদের সম্মতি ও তার ফিস্‌ক প্রমাণিত হয়। তাই এটাকে সাবায়ী বর্ণনার অজুহাতে নাসিবী সম্প্রদায়ের মত অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। ইয়াযীদের ব্যক্তি চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তার পক্ষে যে এরূপ জঘন্যও মর্মান্তিক কাজ করা সম্ভব তারও প্রমান মিলে।

আল্লামা ইমাম ইবনে তায়মিয়াও তাকে ফাসেকের পর্যায়ে রেখেছেন। অপর পক্ষে দুনিয়ার সকল ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস ও কালাম শাস্ত্রবিদ গনও এক বাক্যে তার নৈতিক চরিত্র যে জঘন্য ছিল তা উল্লেখ করেছেন। জঘন্য চরিত্রের লোকের মধ্যেও কিছু কিছু ভালোগুন থাকতো পারে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ইবন হুমাম বলেন, ইয়াযীদের কুফরের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ তাকে কাফির বলেন। কেননা তার থেকে এমন বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায় যা তার কুফরকে প্রকাশ করে। কারণ সে সা'দকে হালাল মনে করত এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তার সাথীদের হত্যা করার পর তার মুখ থেকে একথা বেরিয়েছিল যে, আমি (হুসায়ন প্রমুখদের থেকে) বদলা নিয়েছি, যা তারা আমার পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষদের সাথে বদর প্রান্তরে করেছিল ইত্যাদি। সম্ভবত এ কারনেই ইমাম আহমদ তাকে কাফির বলেছেন। কেননা তাঁর কাছে ইয়াযীদের এই ভাষনটি নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রমানিত হয়েছিল।[১০২]

বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট সমাদৃত হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পবিত্র মাথা মুবারক তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিনন করার ব্যাপারটি অকাট্য প্রমানাদির ভিত্তিতেই প্রমানিত হয়েছে। সুতরাং তা ইয়াজিদের দরবারে নীত না হওয়ার কোন যুক্তি যুক্ত কারণ থাকতে পারেনা। অনন্তর উক্ত ঘটনা সংক্রান্ত বর্ণনার অস্বীকৃতিই বা কেমন করে সম্ভব বরং এর বিপরীত ইবন মারজানা কর্তৃক তার অবদান ইয়াযীদ সম্মুখে তুলে না ধরা এবং ইয়াযীদের সন্তুষ্টি বিধানে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারক তার সামনে উপস্থিত না করাটাই ছিল আশ্চর্য্যের ব্যাপার। এই নির্মম জুলুম কাজের পক্ষে যা না করে নিস্তার ছিলনা সুতরাং পূর্বোল্লিখিত ইবন আবি আদ-দুনয়ার সূত্রে বর্ণিত ইবন কাছিরের রেওয়ায়েতটি অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। তাও আবার বর্ণনা গত ভাবে এটা ইবন কাছীরের রেওয়ায়েত। তিনি এটির কোন সমালোচনা না করে সরাসরি মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া সময়ের চাহিদাও নিয়মানুযায়ী ইবন মারজানার এত বড় একটি কীর্তি ইয়াযীদের সমীপে তুলে না ধরা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর ও কঠিন বিষয়। আর এটাই স্বাভাবিক। উপরন্ত এর সমর্থনে এত বিপুল পরিমান হাদীস ও বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায় যা কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া সাধারণ জ্ঞানেও বুঝা যায়-এত বড় একজন মহৎ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে স্বয়ং খলীফার আদেশ অথবা ঈঙ্গিত ছাড়া হত্যা করা সম্ভবপর নয়।

হুসায়ন (রাঃ) এর দেহচ্যুত মাথা দেখে ইয়াযীদ প্রথমে মনে মনে খুশী হয়েছিল। কারণ যে প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারা তার ক্ষমতা হারানোর আর্শংকা ছিল তা তিরোহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরক্ষনেই তার মধ্যে ভাষান্তর ঘটে। হাফিজ ইবনে কাছীর বলেন, "হুসায়ন ও তার সাথীদের হত্যা করে ইবন যিয়াদ যখন তাদের মাথা ইয়াযীদের নিকট পেশ করলো, তখন তাদের হত্যার কারণে সে খুশী হয়েছিল এবং এর জন্য তার কাছে ইবন যিয়াদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু পরক্ষনেই সে ভাবান্তরিত হয়।"[১০৩]

তার এই ভাবান্তর প্রকাশ পায় যখন সে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যাকারী ইবন মারজানাকে/ইবন যিয়াদকে ভৎসনা করে। এর কারণ ইয়াযীদ নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে হাফিজ ইবন কাছীর উল্লেখ করেন, "ইবন মারজানা তা হতে দেয়নি হযরত হুসায়ন (রাঃ) যা চেয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

(১) তিনি কামনা করেছিলেন হয় তাকে মুক্ত দেয়া হোক যাতে তিনি যেখানে ইচ্ছা গমন করতে পাবেন (২) সীমান্তের দিকে তাকে যেতে দেয়া হোক, যেখানে তিনি বাকী জীবন ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে কাটাবেন। (৩) অথবা তাকে ইয়াযীদের নিকট যেতে দেয়া হোক যাতে তিনি নিজেই তার সাথে সমস্যার সমাধান করে নিবেন। কিন্তু সে তাকে অবরুদ্ধ করে হত্যার জন্য বাধ্য করে এবং নিহত করে। এভাবে ইবন মারজানা আমাকে মুসলমানদের কাছে ধিকৃত করেছে এবং তাদের অন্তরে আমার ব্যাপারে শত্রুতার বীজ বপন করেছে। সুতরাং ভালো মন্দ সকলেই এখন আমার সাথে শত্রুতা পোষন করবে। কারণ আমার দ্বারা হযরত হোসায়ন (রাঃ) কে হত্যা করা সকলের কাছেই অসহনীয়। এখন এই দুর্ভাগা ইবন মারজানার সাথে আমার কীই- বা সম্পর্ক থাকতে পারে। আল্লাহ তাকে নাশ করুন, তার উপর আল্লাহর ক্রোধ নিপতিত হোক।[১০৪]

এ প্রসংগে ইমাম ইবনে তাইমিয়া উল্লেখ করেন "ইয়াযীদ আর তার পরিবার বর্গের কাছে ইমাম হোসায়নের নিধন সংবাদ যখন পৌছে তখন তারা অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তারা ইমামের জন্য উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করেছিল। ইবনে যিয়াদকে উদ্দেশ্য করে ইয়াযীদ বলেছিল, ইবন মার্জানার প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত। আল্লাহর শফত! যদি হযরত হুসায়ন (রাঃ) সাথে ওর আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক থাকত তাহলে তাকে সে কিছুতেই হত্যা করতো না। ইয়াযীদ একথাও বলেছিল আমি হযরত হুসায়ন (রাঃ) কতল ছাড়াও ইরাক বাসীদের আনুগত্য মেনে নিতে পারতাম। অতঃপর ইয়াযীদ হযরত হুসায়ন (রাঃ) পরিবার বর্গকে বিপুল ভাবে সম্বর্ধনা জানায় আর বিশেষ সম্মানের সাথে সর্বোৎকৃষ্ট উপঢৌকনাদিসহ তাঁদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়।"[১০৫]

কিন্তু সার্বিক দিক আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি-ইয়াযীদের এরূপ লাঞ্ছিত, অনুতপ্ত ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়া হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতি মহব্বতের কারণে নয়। বরং সে যে ধুরন্দাজ, চালাক, মুনাফিক, ও কুটকৌশলী তারই প্রমান মিলে। দুনিয়াদার রাজা বাদশাহগণ এমন ক্ষেত্রে সাধারণত এরূপ উক্তিই করে থাকে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যা জনিত কারনে সে লাজ্জিত নয়; বরং কেয়ামত পর্যন্ত তার ভাগ্যে পতিত অপমানের এবং অনতিবিলম্বে জনরোষে পতিত হওযার অশংকায়। সুতরাং হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যার ব্যাপারে ইয়াযীদ রাজী ছিলনা- একথা বলা স্বয়ং ইয়াযীদের অভিপ্রায়ে পরিপন্থী, তার খুশির ব্যাপার যেমন ভিন্ন, তেমনি তার অসন্তুষ্টির বিষয় ও আলাদা। কারণ সর্বজন স্বীকৃত কথা এই যে, ইয়াযীদ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষ সমর্থন

Dhaka University Institutional Repository

করেনি, তার হত্যা কারীদের গ্রেফতারও করেনি, তাদের কাছ থেকে এই পৈশাচিক হত্যা কন্ডের প্রতিশোধও নেয়নি। অথচ সে ছিল খলীফা এবং সেই যুগে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, যার আদেশই আইন, তার উপর কারও দ্বিমত করার সাধ্য থাকত না। অপর পক্ষে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতি তার মহব্বত অথবা স্বীয় পিতার উপদেশাবলীর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমবেদনা যা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যার ঘটনা তার কাছে পৌছার সাথে সাথেই তার পক্ষ থেকে প্রকাশ পেত। অথচ ব্যাপারটা এর উল্টো ছিল। অনেক সময় অতি বাহিত হওয়ার পরে এমনকি বুখারী শরীফের ইবন আবিদ দুনয়ার হাদিস মতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারকের সাথে তার অসৌজন্য এবং চরম বৈরীতা মূলক আচরনের পর এ ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। যা কখনোই ভালোবাসার বা আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কারণে নয় নিছক রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে।

হাফিজ ইবন কাছীর এ ব্যাপারে বলেন, "যদিও ধরে নেয়াযায় যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যা করার ব্যাপারে ইয়াযীদের কোন স্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। বস্তুত এক্ষেত্রে ইয়াযীদের ভূমিকাটিছিল উহুদ যুদ্ধে তার পিতামহের ভূমিকার অনুরূপ। (উহুদ যুদ্ধে শহীদদের নাক, কান ইত্যাদি কেটে দেয়া হয়েছিল।) অতএব সে যদি এরূপ আদেশ নাও দিয়ে থাকে, তবু এই গর্হিত কাজে সে অসন্তুষ্ট ছিলনা। এ বক্তব্য দ্বারা একথা প্রমানিত করা উদ্দেশ্য যে, হযরত হোসায়ন (রাঃ) কে হত্যা করার কারণে ইয়াযীদ কখনো অসন্তুষ্ট ছিলনা।[১০৬] তবে ইয়াযীদ যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা ও দন্ত মুক্তায় ছড়ি দিয়ে খুচিয়ে ছিল বলে উল্লেখিত হয়েছে তা অকাট্য বলে প্রমান করা যায় না- কারণ তা একমাত্র খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে আর খবরে ওয়াহেদ অকাট্য দলিল নয়। অবশ্য রাফেজীগণ যা বলে থাকে তাও ঠিক নয়। তারা বলে হোসায়ন পরিবারকে ইয়াযীদ বান্দি ও পোষাক পরিচ্ছদ বিহিন অবস্থায় উটের ঘরে রাখে। সে সময় অলৌকিক ভাবে উটের কুজগুলো উচু হয়ে মহিলাদের সম্মুখ ও পিছনের দিকে পর্দার ব্যবস্থা হয়ে যায়। তারা আরো বলেন- ইয়াযীদ ইমামের পরিবার বর্গকে দাসী বানিয়েছিল। দেশে দেশে তাদেরকে বেপর্দা ভাবে ঘুরিয়েছিল, বেপর্দা ভাবে উটের খালি পিঠে চড়িয়েছিল। এসব কথার বিন্দু মাত্রও সত্য নয়। সমস্তই মিথ্যা।[১০৭] আল্লাহর মেহেরবানীতে আজ পর্যন্ত কোন মুসলমানের এরূপ দুর্বুদ্ধি হয়নি, তারা কখনো কোন হাশেমী নারীকে দাসী বানায়নি। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর স্ত্রী কন্যাতো অনেক বড় কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্‌আতী আর স্বার্থপরের দল এরূপ গাল গল্প করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াযীদ নিজে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যা কান্ডের ব্যাপারে মৌন খুশী থাকলেও তার পুরনারীদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়ে যায়। এজন্য সে তাদেরকে পরম সমাদরে বিশেষ সৌজন্য সহকারে তাদের গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, অতঃপর হযরত হুসায়ন (রাঃ) পারিবারকে বলে, তাঁরা ইচ্ছা করলে যাবজ্জীবন তার সাথে বাসবাস করতে পারেন, কিন্তু তারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় ইয়াযীদ তাঁদেরকে সসম্মানে মদীনায় পৌঁছে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৩ হুসায়ন (রাঃ) এর দেহ বিচ্ছিন্ন মাথা মুবারকের সর্বশেষ অবস্থা

প্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থকার ও ইতিহাসবিদ গণের মতে ইবনে যিয়াদ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারককে ইয়াযীদ বিন হযরত মুআবিয়ার নিকট প্রেরণ করেছিল। যা ইতঃপূর্বে প্রমানসহ উল্লেখিত হয়েছে। আর সে সাথে এটাও প্রমানিত হয়েছে যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারককে দেহ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রমান্য সত্য কথা-কে পাকিস্থানের নাগরিক মাহমুদ আব্বাসী তার গ্রন্থ - খেলাফতে হযরত মুআবিয়া ও ইয়াজিদ গ্রন্থে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা দেহ বিচ্ছিননই করা হয়নি। সুতরাং ইয়াযীদের দরবারে পাঠানোর প্রশ্নই আসেনা। পশ্চিমা ঐতিহাসিক ডোযীও একথাই বলেছেন। কিন্ত আমরা একাধিক প্রমান্য ও নির্ভর যোগ্য বর্ণনার বিপরীতে তাদের তথ্যহীন বক্তব্যকে মেনে নিতে পারিনা। আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছির (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়ার প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারও ঐতিহাসিক) বলেন- আমার নিকট প্রথম মতটিই সঠিক ও প্রসিদ্ধ। অতঃপর তার মাথা মুবারক কোথায় দাফন করা হয়েছে এব্যাপারেও যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। মুহাম্মদ বিন সা'দ বর্ণনা করেন ইয়াজিদ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারক মদীনার গর্ভনর আমর বিন সাঈদের নিকট প্রেরণ করে অতঃপর তা জান্নতুল বাকীতে তার মায়ের কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়। অপর দিকে ইবনে আবীদ দুনিয়া উসামন বিন আঃ রহমানের বরাত দিয়ে তিনি আবার মুহাম্মদ বিন ওমর থেকে বর্ণনা করেন যে, - হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারক ইয়াজিদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তার ধনাগারে রক্ষিত ছিল। ইয়াযিদের মৃত্যুর পর এ মাথা মুবারক সেখান থেকে বের করে কাফন পরায়ে দামেস্ক নগরীর "বাবুল ফারাদিস" নামক গোরস্থানে দাফন করা হয়। ইমাম ইবনে কাছির বলেন- বর্তমানে ঐ স্থানের একটি মসজিদ মসজিদে "রাস" নামে অর্থাৎ মাথা মুবারকের মসজিদ নামে পরিচিত। এবং মাথা মুবারকের স্থানে প্রবেশের জন্য মসজিদ থেকে পৃথক একটা দরজা করা হয়েছে। কিন্তু ইবনে কাছির বর্ণনা করেন যে, ইবনে আবীদ দুনয়া এবং মুহাম্মদ বিন ওমর দুজনই দুর্বল রাবী। দুর্বল রাবীর বর্ণনা দলীল হতে পারেন। অপর পক্ষে মুহাম্মদ বিন সা'দ শক্তিশালী রাবী। সুতরাং হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারক ইয়াযীদ যে, স্ব-সম্মানে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন এবং তা তার মাতা ফাতিমা (রাঃ) এর কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়েছিল এটাই মেনে নিতে হবে। আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ ইয়াযীদের সাথে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর এমন কোন শত্রুতা ছিলনা-যার কারণে তিনি এটা না করে মাথা তার ধনাগারে

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষিত রাখবেন। ইসলামী শরীয়াতে এটা করা তার জন্য অবৈধ ছিল। বরং তা দেহের সাথে মিলিয়ে দাফন করাই ছিল শরীয়তের হুকুম। আর তাই তিনি করেছিলেন। কিন্তু স্বার্থানেষীর দল এ সমস্ত বিষয়কে পুঁজি করে অনেক কল্প কাহিনী রচনা করেছে। আর তা ইতিহাসেও স্থান পেয়েছে। তবে তা বর্ণনা করা ঐতিহাসিকদের দোষ নয় বরং এ সম্পর্কে কোথায় কি কথা বা প্রথা প্রচলিত আছে তা বর্ণনা করাও ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব।

অপর পক্ষে ইবনে আসাকীর তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের "রায়্যাহাজিনাতু ইয়াজিদ বিন হযরত মুআবিয়া" নামক অধ্যায়ে বলেন- যখন ইয়াযীদ বিন হযরত মুআবিয়া হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারক তার সামনে রাখলো তখন জুবাআরী নামক এক কবি আনন্দে একটি কবিতাও পাঠ করতে থাকেঃ

তিন দিন পর্যন্ত মাথা উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হলো- তারপর সেখান থেকে ইয়াযীদের অস্ত্রাগারে সংরক্ষন করা হয়। সুলায়মান বিন আঃ মালিকের শাসনামলে এ মাথা সেখান থেকে বের করে তার সামনে আনা হয় তখন তা- সা'দা হাড্ডিতে পরিনত হয়েছিল তারপর তিনি তাতে কাফন পরিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দামেস্কর মুসলিম কবরস্থানে দাফন করেন। আব্বাসীয়দের শাসনামলে বনি উমাইয়াদের কবর থেকে হাড় হাড্ডি উত্তোলন ও পুড়িয়ে ছাই করার অভিযানের সময় হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারকও উত্তোলোন করা হয়। ইবনে আসাকীর বর্ননা করেন- উমাইয়া শাসনের একশত বছর পর পর্যন্ত তা আব্বাসীয়দের নিকটই থাকে। তারপর মিশরীরের ফাতেমীয় শাসনামলে ৬৬০ হিঃ মিশরের দিয়ার বকর নামক স্থানে তা দাফন করা হয়। সেখানে একটি স্মৃতি সৌধ নির্মান করা হয় যা "তাজুল হুসায়ন" নামে পরিচিত।

ইবনে আসাকীরের এ বর্ণনা আলেম গণের সমর্থন পায়নি এবং সমর্থন যোগ্যও নয় কারণ এটাতে যেমন বর্ণনা সূত্রের দুর্বলতা রয়েছে অপর পক্ষে রাসূল (সঃ) এর নাতীর দেহের সর্বশ্রেষ্ট অংশ মাথা মুবারকের সাথে এরূপ আচরণ তৎকালীন মুসলিম সমাজ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিবেন তাও কল্পনা করা যায় না। এ বিষয় নিয়ে কেহ বা কোন গোষ্টী প্রতিবাদ করেছেন এমন কোন বর্ণনাও পাওয়া যায়না।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ আলিমগণের অভিমত হলো মিশরের মিথ্যা ফাতেমীয় দাবীদার শাসকগণ নিজেদেরকে শরীফ হিসেবে পরিচিত করানোর জন্য একটা অন্য যে কোন মানুষের মাথা নিয়ে এসে-হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা বলে প্রচারনা চালায় অতঃপর তা দিয়ার বকর নামক স্থানে দাফন করে সৌধ নির্মান করে। এর নাম দেন "তাজুল হুসায়ন" যাতে লোকেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতঃপর তারা ঐ স্মৃতি সৌধের পার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মান করে রাসুল হযরত হুসায়ন (রাঃ) নামে নামকরণ করে প্রচার চালায়। আর তখন থেকেই তার প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। মূলতঃ এরূপ কাজ দুনিয়াদার স্বার্থান্যাসী রাজা বাদশাহগণ নিজেদের স্বার্থের অভিসন্ধিতেই করে। উমাইয়া শাসক আঃ মালিক বিন মারওয়ানও জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য "কুবাবতুস সাখরা" তৈরী করে তা তাওয়াক কয়ার জন্য বাধ্য করেন। ইতিহাসে এরূপ ঘটনার উদাহরণ অনেক মিলবে।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৪ তাঁর দেহ ও তাঁর সাথে শাহাদত প্রাপ্তদের অবস্থা

আল্লামা ইমাম ইবনে কাছীর বলেন ওলামায়ে মুতাআখখেরীনের মতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দেহকে আলী (রাঃ) এর সমাধি স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। যায়গাটি কারবালা নদীর তীরবর্তী তীফনামক স্থানে অবস্থিত। আর এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তার কবরের উপরেই একটি গুম্বুজ নির্মান করা হয়েছে।[১০৮] কিন্তু ইবনে জরীর ও অন্যান্য বর্ণনাকারী বলেন-যে হোসাইন (রাঃ) এর দেহ মুবারককে এমনভাবে ইয়াযীদের লোকেরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল যাতে লোকেরা আর কখনও তাঁর দেহকে সনাক্ত করতে না পারে। খাজা হাসান নিযামীর মহররম নামা গ্রন্থে ও একই কথার প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। "তিনি বলেন" আব্দুল্লাহ যিয়াদের নির্দেশ ছিল, হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে কতল করে তার ছিন্ন মস্তক কুফায় পাঠাবে আর দেহ অশ্ব খুরে দলিত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে। দুর্বৃত্তেরা তাই করে। তারা ইমামের দেহের বস্ত্র উন্মোচন করল এবং কুড়ি জন অশ্বারোহী সে মৃত্য দেহের উপর দিয়ে পূনঃ পূনঃ অশ্ব চালনা করতে লাগলো। খুরের আঘাতে শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে অস্থি মাংস খন্ড বিখন্ড হয়ে ধূলায় মিশে গেল।[১০৯]

এ প্রসংগে ঐতিহাসিক আল ফাখরী বলেন

This is a Catastrophe Where of I Care not to speak at length as it is too grievous and horrible, for verily it was a Catastophe Than which naught more Shameful hath happend in Islam.

অপর দিকে আবু নাঈম আল ফজল বিন দাকীনও যারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কবরস্থান সনাক্ত করতে পেরেছেন তাদেরকে অস্বীকার করেন। কিন্তু হিশাম বিন কালাবী বর্ণনা করেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কবরের প্রভাব এমন যে, কোন পানির প্রবাহ ঐ কবরের উপর দিয়ে চলে সেখান হতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পানির প্রবাহ চলতে থাকে। তিনি আরো বলেন আসা'দ গাত্রের এক কবি একদা এ স্থানে এসে তাঁর কবরের এক মুঠো মাটি উঠিয়ে বারবার ঘ্রান নিতে থাকে। তারপর কবরের উপর মাটি ফেলে বলতে থাকে হে হুসায়ন (রাঃ) আপনার উপর আমর পিতা মাতা কুরবান হোক আপনি কতইনা সুগন্ধি যুক্ত ছিলেন যে, আপনার কবরের মাটিকেও সুঘ্রান যুক্ত করে ফেলেছেন। তার পর তিনি একটি কবিতা আবৃতি করতে থাকেন

Dhaka University Institutional Repository

যার ভাবার্থ নিম্নরূপঃ-

"তারা তোমার কবরকে গোপন করতে চেয়েছিল কিন্তু তোমার কবরের সুগন্ধ তা প্রকাশ করে দিল।"

আলোচনায় এটাই প্রমান হয় যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মৃত দেহের প্রতি ও ইবনে যিয়াদের ক্ষোভের বহিঃ প্রকাশ ঘটায় এবং অশ্ব খুরে দলিত করে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়ে ছিল কিন্তু মাত্র ২/৩ দিন পরে লোকেরা ঐ দেহ সনাক্ত করে তার পিতার কবরের পার্শ্বে দাফন করে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে যারা শাহাদত প্রাপ্ত হয়েছিল তাদেরকে দাফন করা হয়েছিলেন কিনা এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কোন কোন বর্ণনায় একথা বলা হয়েছে যে, তাদেরকে কারবালাতেই জানাযা ও দাফন করা হয়েছিল।

ইবনে কাছীর বলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে নিহত ৭২ জনসহ তাঁকে আসা'দগোত্রের গাদিরিয়া পরিবারের লোকেরা একদিন পর দাফন করে।[১১০]

মুসনাদে আহমদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল নির্ভুল সনদ সহ বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর সর্ব প্রথম হযরত আম্মার ইবনে ইয়ামের (রাঃ) এর মস্তক দ্বিখন্ডিত করা হয়। এবং ইবনে সা'দ (রাঃ) তাবাকাতেও তা উদ্ধৃত করেছেন। সিফফিন যুদ্ধে হযরত আম্মার (রাঃ) এর মস্তক খন্ডিত করে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিকট হাজির করা হয়। এ সময় দুই ব্যক্তি ঝগড়া করছিল। উভয়েরই দাবী ছিল- আমি আম্মারকে হত্যা করেছি।[১১১]

এরপর আল্লাহর রাসুলের অন্যতম সাহাবী আমার ইবনুল হামেক (রাঃ) এর মস্তক দ্বিখন্ডিত করা হয়। আল্লাহর রাসূলের অন্যতম সাহাবী হলেও হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যায় তিনিও অংশ গ্রহন করেন। যিয়াদ ইরাকের গর্ভনর থাকা কালে তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করা হয়। তিনি পলায়ন করে একটি গুহায় আশ্রয় নেন, সেখানে সাপের দংশনে তিনি মারা যান। পিছু ধাওয়া কারীরা মৃত্যদেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে। যিয়াদের নিকট উপস্থিত করে। তিনি এ খন্ডিত মস্তক দামেস্কে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিকট প্রেরণ করেন। সেখানে তা রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শনীর পর তার স্ত্রীর কোলে নিক্ষেপ করা হয়।[১১২]

Dhaka University Institutional Repository

এমনি বর্বরোচিত আচরন করা হয় মিসরে নিযুক্ত হযরত আলী (রাঃ) এর গভর্নর মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) এর সাথে। হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মিসর অধিকার করার পর তাঁকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন এবং মৃত্যু গাধার চামড়ায় জড়িয়ে তার লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়।[১১৩]

এরপর থেকে রাজনৈতিক প্রতিশোধ হিসাবে যাদেরকে হত্যা করা হয়, তাদের লাশকেও ক্ষমা না করা একটি স্বতন্ত্র রীতিতে পরিনত হয়। কারবালায় হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে সেখান থেকে কুফা এবং কুফা থেকে দামেস্কে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তাঁর লাশের উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দেয়া হয়।[১১৪]

ইয়াযীদের শাসনকাল পর্যন্ত হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বনী উমাইয়াদের সমর্থক ছিলেন। মারওয়ানের শাসনামলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে সমর্থন করার অপরাধে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর মস্তক কর্তন করে তার স্ত্রীর কোলে ছুঁড়ে দেয়া হয়।[১১৫]

হযরত মাসআব ইবনে যুবায়ের এর মস্তক কুফা এবং মিসরে প্রদক্ষিন করানো হয়। তারপর দামেস্কে নিয়ে প্রকাশ্যে রাজপথে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এরপর সিরিয়ার রাজপথে ঝুলিয়ে রাখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আঃ মালিক ইবনে মারওয়ানের স্ত্রী আতেকা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে হযরত মুআবিয়া নিজে এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করে বলেন। এযাবৎ যা কিছু করেছ, তাতেও কি তোমাদের প্রাণ ঠান্ডা হয়নি? এখন আবার তার প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছ কেন ? অতঃপর মস্তক নামিয়ে গোসল দিয়ে দাফন করা হয়।[১১৬]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের এবং তাঁর সাথী আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান এবং উমারা ইবনে হাযম, এর সাথে এর চেয়েও কঠোর, বর্বরোচিত এবং জাহেলী যুগের আচরণ করা হয়। দেহ থেকে তাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে মক্কা থেকে মদীনা, মদীনা থেকে দামেস্কে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানে স্থানে প্রদর্শনী করা হয়। তাদের দেহ মক্কোর কয়েকদিন যাবৎ শুলিতে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। পচে গেলে যাওয়া পর্যন্ত তা এ অবস্থায় ছিল।[১১৭]

যাদের লাশের সাথে এহেন আচরণ করা হয়েছে, তাঁরা কোন স্তরের লোক ছিলেন তা আলোচনায় না আনলেও এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। ইসলাম কি কোন অমুসলিমের সাথেও এহেন আচরণের অনুমিত দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৫ ইয়াযীদ পক্ষীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচয় ও কার্যকলাপ

আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ

আব্দুল্লাহ বা উবায়দুল্লাহ ওরফে ইবনে মারজানা হলেন- খলীফা হযরত মুআবিয়ার শাসনামলে বসরার গভর্ণর যিয়াদ এর পুত্র। যিয়াদ যেমন ছিল স্বার্থবাদী তার ছেলে ইবনে যিয়াদ পিতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যিয়াদ তার পিতার নামে পরিচিত না হয়ে মাতর নাম পরিচিত ছিল। তার মাতার নাম ছিল সুমাইয়্যা। এ জন্য তাকে ইবনে সুমাইয়্যাও বলা হত। হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখনই কোন কঠিন সমস্যা মুকাবেলা করার ইচ্ছা করতেন তখনই যিয়াদের ডাক পড়ত। আর এমন সময়েই শুধু তিনি তাকে নিজের ভাই বলে পরিচয় দিতেন। তাকে অবশ্য ভাই বলার যুক্তিও আছে যদিও ইসলাম তা নিষিদ্ধ করেছেন। তাহলো এই যে, তায়েফে সুমাইয়্যা নাম্নী একজন দাসীর উদরে যিয়াদের জন্ম। লোকে বলে; জাহেলী যুগে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পিতা আবু সুফিয়ান সুমাইয়্যার সাথে অবৈধ মিলন করেন। তার ফলে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়। হযরত আবু সুফিয়ানও একবার এদিকে ঈঙ্গিত করে বলেছিলেন যে, তার বীর্যে যিয়াদের জন্ম। যৌবন প্রাপ্ত হয়ে তিনি উন্নত মানের ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, সেনাধ্যক্ষ এবং অনন্য সাধারণ যোগ্যতার অধিকারী বলে প্রমানিত হন। ইনি হযরত আলী (রাঃ) এর বিরাট সমর্থক ছিলেন এবং অনেক খিদমতও আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তার পরে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাকে নিজের সমর্থক এবং সহায়ক করার জন্য তাঁর পিতার ব্যাভিচারের সাক্ষ্য গ্রহণ করে প্রমাণ করেন যে, সে তাঁর পিতার অবৈধ সন্তান। আর এই ভিত্তিতে তিনি তাকে নিজের ভাই এবং আপন পরিবারের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেন। আইনের দৃষ্টিতে এটা ছিল স্পষ্ট অবৈধ কাজ। কারণ শরীয়তে ব্যভিচারের মাধ্যমে কোন নসব (বংশ ধারা) প্রমানিত হয়না।

আল্লাহর রাসূলের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে "শিশু যার বিছানায় ভূমিষ্ট হয় তার; আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে প্রস্তর খন্ড।" উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা এ জন্য তাঁকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তাঁর সাথে পর্দা করে চলেন।[১১৮]

এ যিয়াদেরই পুত্র আব্দুল্লাহ ওরফে উবায়দুল্লাহ পিতা অপেক্ষাও নির্মম। সে জন্য লোকে তাঁকে কশাই আখ্যা দিয়েছিলেন। ইয়াযীদ তাকে ঘৃণা করতেন এবং বাঁদীর বাচ্চা বলে উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। কিন্তু প্রয়োজনে তথা-নিষ্ঠুর ও নির্মম কাজের প্রয়োজন হলেই তাকেও তাঁর পিতার মতই ডাকা হতো। কারবালার ঘটানোর পূর্ব পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ দক্ষিন ইরাকে বসরার গভর্ণর ছিলেন। কিন্তুহযরত হুসায়ন (রাঃ) কে প্রতিরোধ করার জন্য তাঁকে কুফারও গভর্ণর বানানো হয়। সাথে এ হুকুমও দেয়া হয় যে, যদি ইতি মধ্যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কুফায় পৌছে থাকে তবে তাঁকে বন্দি করে দামেস্কে প্রেরণ করেন। হুকুম মত ইবনে যিয়াদ কুফায় গমন করেন এবং কুফার নেতৃস্থানীয় নাগরিকগণকে ডেকে এক সভা আহবান করে সকলকে সম্বোধন করে বললেন- দেখ আমি যিয়াদের বেটা আবদুল্লাহ যিয়াদ কিরূপ নৃশংস ছিলেন তা তোমরা অবগত আছ। আমি ততোধিক। শীয়ায়ে আলী দাবীদার ভীরু কুফাবাসীগন তার এ এক ধমকেই কম্পিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাক্ষনাৎ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বায়আ'ত থেকে (দুই এক জন ব্যতিত) নিজদিগকে মুক্ত করলো এবং ইবনে যিয়াদের নিকট নিজদের আনুগত্য প্রকাশ করলো। এ ইবনে যিয়াদই হুকুম দিয়ে সর্ব প্রথম হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দূত ও চাচাত ভাই মুসলিম বিন আকীল ও তাঁর আশ্রয়দাতা-হানীর মস্তক কেটে দুর্গ-শীর্ষ হতে জনতার সম্মুখে গড়ায়ে দেয়।

অনেক বর্ণনায় এমন পাওয়া যায় যে, মুসলিমের সাথে তাঁর দুই কিশোর পুত্র কুফায় গিয়েছিল এবং তাঁরা তথায় নির্মম ভাবে ইবনে যিয়াদ বাহিনীর হাতে নিহত হয়। একাহিনীর সত্যতা খুবই সন্দেহ জনক। কারণ যে অবস্থায় মুসলিম গোপন দৈত কার্য্যে কুফায় গিয়েছিলেন তাতে দু'জন নাবালক পুত্রকে সংগে লওয়ার কোন সঙ্গতি দেখা যায় না। আল-বেদায়া সহ বিখ্যাত আরবী ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ হয়নি। খুব সম্ভব মহররম কাহিনীকে অধিকতর করুণ করার জন্য এটা গল্প কারদের দ্বারা কল্পিত হয়েছিল। মীর মুশারফ হোসেনও তাঁর অমর সাহিত্য বিষাদ সিন্ধুতে অতি করুণ করে এ কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন। ইবনে যিয়াদই সর্ব প্রথম হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সন্ধিশর্ত অস্বীকার করে আর বন্দি অবস্থায় তার সম্মুখে উপস্থিত করতে এবং ইয়াযীদের নামে তার হাতে বায়াৎ করতে বলে। সে তার লোকদের এ হুকুমও করে যে, ফোরাতের পানি হযরত হুসায়ন (রাঃ) পক্ষ যেন কিছুতেই না পায় যাতে তৃষ্ণাকাতর হয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) আত্ম সম্পন করতে বাধ্য হয়। আর এ হুকুম অনুযায়ীই ইবনে হিজায নামক তার এক সেনাপতি পাঁচশত সেনাসহ ফোরাতের তীরে প্রেরীত হয়। তারা ফোরাতের তীর ঘিরে ফেলে এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) শিবির পানি সংগ্রহের পথ বন্ধ করে দেয়। ইমাম ইবনে কাছীর তাই দুঃখ করে বলেন- যে ফোরাতের পানি

Dhaka University Institutional Repository

হাজার হাজার শৃগাল কুকুর পর্যন্ত খেতে বাধা নেই আর সেখান থেকেই রাসূল পরিবারের লোকদেরকে পানি পান করতে নিষেধ করা হলো।

তারই হুকুমে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পরিবারের যুদ্ধ বন্দিনীগণকে লয়ে শিমার কুফা রওনা হয়। তার বিশ্বস্থ অনুচর খুলী বিন ইয়াজিদ হযরত হুসায়ন (রাঃ) শীর বর্শাগ্রে গেঁথে তার আগে আগে যায়। আর তাদেরই পশ্চাতে হাওদা হীন উষ্ট্রের নগ্নপৃষ্টে চড়ানো হয় হযরত হুসায়ন (রাঃ) পুরনারীগণকে ও রুগ্ন যয়নুল আবেদীনকে (আল্লাহর ওলীদের অলংকারকে) দারুন গ্রীষ্মের পাথর-ফাটা রোদ্রের মধ্যে দিয়ে।

আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদেরই নির্দেশ ছিল হযরত হুসায়ন (রাঃ)কে কোতল করে তাঁর ছিন্ন মস্তক কুফায় পাঠাবে এবং দেহ অশ্বখুরে তাঁর ছিন্ন মস্তক কুফায় পাঠাবে এবং দেহ অশ্বখুরে দলিত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে। দর্বৃত্তেরা তাই করলো। তারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) দেহের বস্ত্র উন্মোচন করলো এবং কুড়িজন অশ্বরোহী সেই মৃত দেহের উপর দিয়ে পূণঃপূণঃ অশ্বচালনা করতে লাগলো। খুরের আঘাতে সোনার অংগ ক্ষত বিক্ষত হল এবং অস্থি মাংস খন্ড বিখন্ড হয়ে ধুলায় মিশে গেল।[১১৯]

বুখারী শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে "মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন আনাছ ইবনে মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে যিয়াদের নিকট হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারকটি নীতি হয়েছিল। তা একটি পাত্রে রাখা ছিল। তখন সে মাথা মুবারকটিতে খুচাতে শুরু করে এবং তার রুপ সৌন্দর্য্য সম্পর্কে কিছু বিদ্রুপাত্বক উক্তি করে। আনাস ইবনে মালিক বলেন, রাসূল (সাঃ) এর সাথে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর অনেক মিল ছিল।[১২০] (হযরত আনাস (রাঃ) হলেন সেই বিখ্যাত সাহবী যিনি রাসুলুল্লাহ এর (সঃ) এর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে ও খেদমতে একধারে দশ বৎসর ছিলেন)

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী, মাসনাদে বাযযায থেকে এর সাথে আর একটি বাক্য যোগ করে লেখেনঃ "অর্থাৎ বায়যায অন্য সূত্রে হযরত আনাম থেকে এ বাক্যটি বাড়িয়ে বলেছেন যে, "তোমার ছড়িটি যে স্থান স্পর্শ করছে আমি রাসূল (সাঃ) কে ঠিক সে স্থানে চুমু খেতে দেখেছি।"[১২১]

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজ ইবন হাজার বুখারীর উক্ত রেওয়ায়েতটির ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তাবরানী থেকে একটি ঘটনা রেওয়ায়েত করেছেন- "অর্থাৎ তাবরাণীর বর্ণনায় যায়দ ইবন আকরামের হাদীছে আছে যে, ইবন্ যিয়াদ তার হাতের ছড়ি দ্বারা হযরত হুসায়নের নাকে মুখে খোচাতে লাগলো। তখন আমি তাকে বললাম- "তোমার ছড়িটি সরিয়ে নাও।" কারণ, "আমি সে স্থানে রাসূল (সাঃ) কে তার মুখ মুবারক রাখতে দেখেছি। তাব রানীরই অপর একটি সূত্রে এই রেওয়ায়েতটি হযরত আনাস থেকেও বর্ণিত আছে।"[১২২]

আল্লামা আইনী এটি আরো বিশদ ভাবে উল্লেখ করেছেন যে হযরত যায়াদ ইবন আকরাম (রাঃ) হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর চেহারা মুবারকে ছড়ি দিয়ে গুতো মারার কারনে ইবনে যিয়াদকে যখন ধমকাছিলেন, তখন তিনি আবেগে কাঁদ ছিলেন।

আল্লামা আইনী বর্ণনা করেনঃ যায়দ ইবনে আকরাম কাঁদতে লাগলেন। তখন ইবন যিয়াদ বললো- আল্লাহ তোমার চক্ষুকে কান্নারত রাখুক। আল্লাহর শফথ! তুমি যদি জ্ঞান লোপ পাওয়া, দুর্বল বৃদ্ধ না হতে, তাহলে আমি তোমার শিরচ্ছেদ করে ফেলতাম। তৎপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং চলে গেলেন। তখন যায়েদ ইবন আকরাম ইবন যিয়াদ সম্পর্কে কিছু উক্তি করলেন- তখন লোকেরা বলাবলি করছিল যদি যায়াদ ইবন আকরাম তার কথা শুনতো তাহলে সে তাকে অবশ্যই হত্যা করতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কি বললো - তারা বললো যায়দ ইবন আকরাম আমাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলছিল - হে আরব জাতি শুনে রাখ। আজ থেকে তোমরা গোলামে পরিণত হলে। তোমরা ফাতিমার সন্তানকে হত্যা করলে আর ইবন মুর জানাকে নেতা বানালে। সে তোমাদের ভালো লোকদের হত্যা করবে এবং খারাপ লোকদের আশ্রয় দিবে।[১২৩] আল্লামা ইবনে কাছীর এ প্রসংগে বলেন -"অতঃপর যায়দ ইবন আকরাম কবিতার আকারে বলেন-

বাঁদীর বাচ্চা বাদী শাসক হয়েছে, গর্ব অহংকারে পেয়ে বসেছে।"

এতদ প্রেক্ষিতে আল্লামা আইনী হযরত যায়দ ইবন আকরামের প্রশংসা করতে যেয়ে বলেনঃ- "আমি যায়দ ইবন আকরাম আনসারী খায়রাজীর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করি। আল্লাহ তার মঙ্গল করুন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি রাসুল (সাঃ) এর সাথে সতেরটি জেহাদে শরীক হয়েছিলেন। আর সিফফিন যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষে অংশ নেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্যতম। এই সম্মানীতও বহুগুনের অধিকারী সাহাবী ইবন যিয়াদের ভাষায় মতিভ্রম ও দুর্বল-বৃদ্ধ বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন।

এই ইবন যিয়াদ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ছিন্ন মস্তক কুফায় নিয়ে জন সমক্ষে তার প্রদর্শনী, আর তার সাথে শুধু বেআদবীই করেনি বরং জামে মসজিদের মিম্বরে দাড়িয়ে ঘোষণা করে ঃ-

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সত্য এবং সত্যের অনুসারীকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন, আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদ এবং তাঁর দলকে বিজয়ী করেছেন, আর মিথ্যাবাদীর পুত্র মিথ্যাবাদী হযরত হুসায়ন (রাঃ) ইবন আলী এবং তার সমর্থকদেরকে হত্যা করেছেন।"[১২৪]

এরই দৃষ্টিতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) ছিলেন বিদ্রোহী ও আল্লাহর নিকট অপরাধী। তাই সে এ উক্তি করারও স্পর্ধা করেছিল "তার নামায কবুল হবেনা"।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার এ অপরাধ ক্ষমা করেননি। দুনিয়াতেই তার নযীর স্থাপন করেছেন। যাতে পরবর্তী বংশধরগন এ থেকে উপদেশ নিতে পারে।

ইবন যিয়াদের নির্মম পরিনতি কি হয়েছিল, সে সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী শরহে বুখারীতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন ঃ-

"অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সেই অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে বদলা দিলেন যে ছিষট্রি হিজরীর যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ শনিবার দিন ইব্রাহীম ইবন আশতারের হাতে তার হত্যা কান্ড সংঘটিত হয়।" "জাযর" নামক স্থানে তার হত্যা কান্ড সংঘটিত হয়। এখান থেকে "ওয়াসিল" নামক স্থানের দূরত্ব পাঁচ মাইল। এর বিবরণ এই যে, মুখতার ইবন আবু উবায়দা যিয়াদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। ইবন যিয়াদ নিহত হওয়ার পর তার মাথা এবং অন্যান্যদের মাথা মুখতারের নিকট নিয়ে আসা হয়। তখন একটি সাপের আবির্ভাব ঘটে, এবং সেটি ঘুরতে আরম্ভ করলো। শেষ পর্যন্ত ইবন মুরজানা (ইবন যিয়াদ)- এর মুখে প্রবেশ করলো এবং তার নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হলো। অতঃপর তা পুনরায় নাক দিয়ে প্রবেশ করে তার মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো এবং এরূপ হতে থাকলো। অর্থাৎ তা কেবল ইবন যিয়াদের মাথায় প্রবেশ করতে থাকলো আর বের হতে লাগলো। অতঃপর মুখতার ইবন যিয়াদের ও তার সঙ্গীদের মাথা মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া

Dhaka University Institutional Repository

অন্য বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন যুবায়েরের নিকট প্রেরণ করা হলো। তৎপর এগুলো মক্কাতে ঝুলিয়ে দেয়া হলো।[১২৫]

এই একই ঘটনা আরো একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাছিরও তার আল বেদায়া ওয়ান নেয়ার ৮ খন্ডে ইমাম তির মিজির বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন। যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। মোট কথা এরূপ ঘটনা কূপ খনন কারীর কূপে পতিত হওয়ারই নামান্তর। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ-

অর্থঃ যে তার ভাইয়ের জন্য কূপ খনন করে সে নিজেই তাতে পতিত হয়।

এটা আল্লাহ্‌র শাস্তি কারবালায় মমার্ন্তিকও নির্মম হত্যা কান্ডের মহানায়কের মূল ভূমিকা পালন কারী আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের এ পরিনতি য একাধিক নির্ভুল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে । এবং আল্লামা ইমাম তিরমিজিয়াকে সঠিক বলে রায় প্রদান করেছেন। বুখারীসহ অন্যান্য সার্জন শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ একথাই প্রমান করে কারবালায় ঘটনায় মূলত ইবনে যিয়াদ মহা পাপ করেছিল, যদিও সে নামাজ পড়ত জুমার নামাজে খুতবা পাঠ করতো আর নিজেকে মনে করতো সত্যাশ্রয়ী।

শীমার

ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির তার গ্রন্থের শীমার বিন যিল যাওশান অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে যিল যাওশান প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। কেহ বলেন তার নাম ছিল শারজীল, আবার কেহ বলেন তার নাম ছিল উছমান বিন নওফল। তার বংশপরিচয় এরূপ উসমান বিন আওস বিন আওর আল আমীরী আল জুবাবী। জুবাব কেলাব গোত্রের শাখা। শীমার ছিল তার উপনাম।

আমর বিন হাসান বর্ণনা করেন যে, কার বালার ঘটনার দিন আমরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে ছিলাম। সে সময় হযরত হুসায়ন (রাঃ) শীমার বিন যিল যাওশানের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল সত্য বলেছেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি একটা পাগলা কুকুর তার জিহবা বের করে আমার আহলে বায়েতের রক্ত পানের জন্য এগিয়ে আসছে। আমার বিশ্বাস সেই ছিল শীমার।[১২৬]

Dhaka University Institutional Repository

এই শীমারই বর্শাঘাতে আহত ও ভূপর্তিত হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মস্তক কেটে জগতের নিষ্ঠুরতম অভিনয় সম্পূর্ন করে। সে ও তার বাহিনীর নিষ্ঠুরতার একানেই সমাপ্তি হলোনা। তারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কর্তিত শির বর্শা বিদ্ধ করে উঠিয়ে নেয় এবং দেহের উপর অত্যাচার শুরু করে, আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদের নির্দেশ মত আরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মস্তক খুলী বিন ইয়াযীদ মারফত কুফায় পাঠায় এবং দেহ অশ্ব খুরে দলিত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।[১২৭]

যুদ্ধাবসানে শীমার ও ওমর কতিপয় অনুচর সহ হযরত হুসায়ন (রাঃ) শিবিরে প্রবেশ করে খীমা লুণ্ঠন করে স্ত্রী লোক দিগের গায়ের মূল্যবান চাদর ও অলংকারাদি কেড়ে নেয়। তৎপর খীমায় অগ্নী সংযোগ করে এবং খীমার স্ত্রীলোকগণকে বাহিরে এনে যুদ্ধ বন্দীরূপে দামেস্কে প্রেরণের ব্যবস্থা করে। পীড়িত যয়নুল আবেদীন কে শীমার হত্যা করতে চেয়েছিল। সে একথাও বলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) বংশের কোন পুরুষ সদস্যকে জীবিত রাখার হুকুম নেই। কিন্তু ওমরের বাধাদান ও কঠোর নির্দেশের কারনে তা আর করতে পারলো না।

এই শীমারের নেতৃত্বে হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তার সাথে কারবালায় নিহত সকলের মস্তকসহ যুদ্ধ বন্দিনীগনকে লয়ে দুই সপ্তাহের পথ চলার পর রাজধানী দামেস্কে ইয়াযীদের দরাবারে উপনীত হয়। শিমার সগর্বে হযরত হুসায়ন (রাঃ) মির ইয়াযীদের সম্মুখে স্থাপন করে।

এই শীমারই সর্ব প্রথম কারবালার প্রান্তরে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সন্ধি প্রস্তাব দৃঢ়তার সাথে নাকচ করে। এবং কারবালার ঘটনায় নৃশংশতম চরিত্রের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়।

ওমর বিন সা'দ

ওমর ছিলেন কাদসিয়া যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি সা'দ বিন ওক্কাসের পুত্র। সা'দ বিন ওক্কাস ছিলেন রাসুলুল্লাহর একজন বিখ্যাত সাহাবী। খলীফা ওমর (রাঃ) মৃত্যুকালে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য যে পঞ্চায়েত নিযুক্ত করেন সেই শালিসী প্রধানদের অন্যতম। তারই পুত্র ওমরও প্রধান সেনাপতি পদে আসীন হন। তিনি ছিলেন কুফা ও বসরার গভর্ণর আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রধান সেনাপতি। গোড়ার দিকে তিনি রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর আহলে বায়েত বিশেষ করে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর অনুরক্তই ছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন যিয়াদ বহু অর্থ দিয়ে এবং মক্কা ও মদীনার গভর্নরের পদ স্থায়ীভবে তাকে অর্পন করবেন এরূপর ওয়াদা করে কারবালা যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণে

Dhaka University Institutional Repository

তাকে বাধ্য করেন। ইমানের শক্তি ও আল্লাহর ভয় পুরো থাকলে হয়তো এটা গ্রহণ থেকে তিনি বিরত থাকতেন। কিন্তু তার কাছে দুনিয়ার স্বার্থই বড় বলে মনে হলো।

কুফার যে সমস্ত জননেতা হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে কুফায় আসার জন্য পত্র প্রেরণ করেছিল, তাঁর হাতে বায়াত হয়ে জীবনকে ধন্য করতে চেয়েছিল ওমর বিন সা'দ ছিলেন তাদের অন্যতম কারবালার ময়দানে হযরত হুসায়ন (রাঃ) তার সামনে তারই দাওয়াত কারীগণদেরও দেখতে পেয়ে একে একে নাম ধরে বলতে লাগলেন তোমরাই না আমাকে পত্র লিখেছিলে ও কুফায় আসতে আহ্বান করেছিলে। আজ তোমরাই আমাকে হত্যা করতে এসেছ। কেহই উত্তর করলনা। হযরত হুসায়ন (রাঃ) তখন আকাশের পানে হাত তুলে মুনাজাত করলেন। ইয়া ইলাহী আমি সংকটাপন্ন, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ)ও ইরাক বাসীদের নিকট তাদের পত্রের জবাবে একটি পত্র লিখে তার গোলাম সুলায়মান মারফত পাঠান।*

পত্রটা ছিল এরূপঃ- সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার যিনি মুহাম্মদ (সঃ) কে তাঁর সকল বান্দাদের মধ্যে রাসূল হিসেবে বাচাই করেছেন। এবং নবুয়ত দিয়ে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর তাঁর নিকট উঠায়ে নিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের অনেক উপদেশ দিয়েছেন। আর তিনিও তাঁর প্রতি অর্পিত নবুয়তের দায়ীত্ব পুরো পুরি পালন করেছেন। আমরা তাঁরই আহলে বায়েত ও উত্তরাধিকারী। আর এ কারনে আমাদের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। হে ইরাকবাসীগণ আমরা তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমরা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ চাইনা বরং ক্ষমা করাকেই পছন্দ করি। আর এ ব্যাপারে আমাদের কর্তব্যও বেশী। আমাদের পুর্ববর্তীগণ মানুষের প্রতি সদাচার ও তাদের কার্যাবলী সংশোধন ও সত্যকে প্রতিষ্টিত করেছেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন আর আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।

আমি এ পত্র মারফত তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নতের দিকে আহ্বান করছি। ইতি মধ্যে সুন্নত বিলুপ্ত হওয়ার পথে আর বিদ'আত চালু হয়ে গেছে। তোমরা যদি আমার কথা শুন এবং আমার আদেশ মান্য কর তাহলে আমি তোমাদেরকে সত্য ও সুন্দরের পথ প্রদর্শন করবো।

---

* তাবারী ৬/২০০ পৃঃ তার নাম জিরা বলে উল্লেখিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের প্রতি সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।[১২৮]

এ ছাড়া হযরত হুসায়ন (রাঃ) কারবালা প্রান্তরেও অনেক হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দেন। কিন্তু তা সত্যেও ওমর বিন সা'দ ও তার বাহিনীর লোকেরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) প্রতি সাড়া দিলনা। তবে কিছুক্ষণের জন্য তাদের মধ্যে নিস্পন্দ ভাব বিরাজ করল। তার পর তাদের মধ্যে কিছু কানা কানি ও গড়িমসি চললো। কে আগে ইমামের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করে গোনাহের ভাগী হবে, এই হলো সমস্যা। সেনাপতি হোর ওমরকে বলল হে ওমর অর্থের লালসায় আমরা কি পরকাল হারাবো। চল হযরত হুসায়ন (রাঃ)কে ছেড়ে আমরা গৃহে ফিরে যাই। তখন ওমর তাকে বলল তুমি কি পাগল হয়েছ? হযরত হুসায়ন (রাঃ) বন্দি না করে ছেড়ে গেলে কি আমাদের কারো গর্দান থাকবে? হোর এতে বিরক্ত হয়ে তার ভ্রাতা ও গোলামসহ ত্রিশ জন অনুচর হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষ নিয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করার ইচ্ছা জানালো।

এদেখে শিমার সেনাপতি ওমরকে ডেকে বললো ওমর কি দেখছো, আর বিলম্ব করোনা। অন্যথা একে একে তোমার সকল ইরাকী সৈন্যই হযরত হুসায়ন (রাঃ) পক্ষে চলে যাবে। ওমর তৎক্ষণাৎ ধনুকে তীর সংযোগ করে উচ্চস্বরে সবাইকে ডেকে বলে উঠলে তোমরা সকলে স্বাক্ষী থাকো প্রথম যে ব্যক্তি হোসাইনের প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো সে এই ওমর এ বলেই সে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ব্যূহের দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। আর তখন থেকেই হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতি তাদের আক্রমন শুরু হয়ে গেল।[১২৯]

তাদের আক্রমনের শিকার হয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) যখন নিজেই অস্ত্রধারন করলেন তখন তার নিকট তার বোন যয়নব বিনতে ফাতিমা এসে বলতে লাগলেন হায় আসমান যদি জমিনের উপর পড়ে যেত। তিনি ওমর বিন সা'দের দিকে এসে বলতে লাগলেন হে ওমর তুমি কি এটাই পছন্দ করছো তোমার সামনে আবু আব্দুল্লাহ হুসায়ন (রাঃ) মার খেয়ে মারা যাবে আর তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। এ কথা শুনে ওমরের মনে ব্যথা অনুভব হয়। কান্নায় তার দাড়ি পর্যন্ত ভিজে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুনিয়ার পদ মর্যাদার লোভ তাকে এমন ভাবে আকড়িয়ে ধরে যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতি মহব্বতথাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি পক্ষ রূপেই থেকে যায় এবং প্রতি পক্ষের সেনাপতি যে আচরণ সাধারনত করে থাকে তার চেয়েও মারাত্মক ভূমিকা পালন করে।[১৩০]

Dhaka University Institutional Repository

তারই সামনে জারআ' বিন শারীক বিন শারীক আত-তামীমী হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাঁদের উপর আঘাত হানে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) ব্রথায় ছটফট করছিলেন। আর এ সময়ই সিনান বিন আবু আমর বিনআনাসআল নাখয়ী বর্শার আঘাতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে জমীনের উপর ফেলে দিয়ে হবেহ করে মস্তক পৃথক করে ফেলে।[১৩১]

ইবনে কাছীর বলেন- কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় ওমর বিন সা'দ এরআদেশেই হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দেহকে ঘোড়ার পায়ে পিষে ফেলা হয়। কিন্তু এ কথা সঠিক নয় বলে ইবনে কাছীর তার আল বেদায়া ওয়ান নেহায়াতে উল্লেখ করেছেন।

ওমর বিন সা'দ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বিপক্ষ ভুমিকা পালন করেও কিছু ভালো কাজও করে দেখিয়েছে। যেমন শিমার যখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মহিনা অংগনে প্রবেশ করে মাল সামগ্রী লুন্ঠন করছিল এবং নাবালক ও অসুস্থ যয়নুল আবেদীনকে (আলী বিন হুসায়নকে) হত্যা করতে উদ্যত হচ্ছিল তখন ওমর ধমকের সুরে বললেন সাবধান তোমরা কেহ মহিলাদরে অঙ্গনে প্রবেশ করবেনা আর এ ছোট ছেলেকেও হত্যা করবেনা। আর মহিলাদরে কোন মাল সমগ্রী নিয়ে থাকলে তা ফেরৎ দাও। বর্ণনা কারী আবু মাখনাফ কছম করে বলেন তার আদেশ শুনে কেহ মাল সামগ্রী ফেরত দেয়নি। তবে জয়নুল আবেদীনকে হত্যা করার আর কেহ সাহস করেনি।[১৩২]

আলোচনায় প্রমান হয়-ওমর বিন সা'দ এর নবী ভক্তি আল্লাহ ভীতি সব কিছু থাকা সত্ত্বেও দুনিয়া তথা, রাজ্য ও ক্ষমতার লোভকেই সে প্রাধান্য দিল। বিখ্যাত সাহাবীর সন্তান হয়েও ইমানের দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেনি। অথচ হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাকেও বিশিষ্ট বন্ধু, নির্বাচিত ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করে তাদের প্রতি আস্থাশীল হয়েই কুফার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন।

তার মত ভীরু কুফাবাসীগণও ইবনে যিয়াদের এক ধমকেই কম্পিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বায়াৎ হতে নিজদিগকে মুক্ত করে এবং ইবনে যিয়াদের নিকট নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করে।

নো'মান বিন বশীর

Dhaka University Institutional Repository

নো'মান বিন বশীর ছিলেন একজন আল্লাহ ও রাসূল ভক্ত সাহাবী। জ্ঞান গুনে মাধুর্যের ও ইবাদত গুজারে সাহাবীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী কারবালা ঘটনার পূর্ব থেকেই তিনি উমাইয়া গভর্ণর হিসেবে কুফা শাসন করছিলেন। তিনি প্রানে প্রাণে হযরত আলী (রাঃ) এর বংশের উত্থান চাইতেন কিন্তু বাহ্যতঃ ইয়াযীদের ভৃত্য ছিলেন।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দূত কুফায় এসে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর নামে লোকদের বায়আ'ত গ্রহণ করলেও তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন। কুফার বনি উমাইয়াগণ তাকে এ ব্যাপার জানালেও তিনি তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। উমাইয়া গণ বলতে লাগলো কি দেখছেন আরও কি ঘুমিয়ে থাকবেন। মুসলিম দলে দলে লোকদের বায়আ'ত করছে, দেশ তো তাদের হাতে চলে গেল। রাষ্ট্রের মঙ্গল চান তো এই মুহুর্তে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করুন এবং যারা তার হাতে বায়আ'ত হয়েছে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করুন। হুসায়ন শীঘ্রই এসে পড়বে তখন আর পেরে উঠবেন না। কিন্তু নো'মান (রাঃ) সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। যেন কিছুই হয়নি বনি উমাইয়াগণ এ অবস্থা দেখে খলীফার নিকট পত্রলিখল। তারা মুসলিমের কার্যকলাপ ও নো'মানের শৈথিলের কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে লিখে নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমান করলো

এ সময় আব্দল্লাহ বিন যিয়াদ দক্ষিণ ইরাকে বসরার গভর্ণর ছিলেন। ইয়াযীদ পত্র দ্বারা তাকে কুফার শাসন ভার অর্পন করে অবিলম্বে তথায় যেতে এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর গতিরোধ করার হুকুম দিলেন। আবদুল্লাহ বিন যিয়াদ ইয়াযীদের পত্র পেয়ে বসরার শাসনভার ছোট ভাই এর উপর ন্যস্ত করে বসরার দুই তৃতীয়াংশ সৈন্য সংগে লয়ে রওয়ানা হলেন। কিসাবেন নামক স্থানে এসে সৈন্যগণকে নগরের পশ্চাৎ দিক দিয়ে কুফায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দিলেন। এবং নিজে কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে সম্মুখ তোরনের দিকে অগ্রসর হলেন। সন্ধ্যা অতীত হলে তিনি নগর উপকন্ঠে উপনীত হন। নগর প্রবেশের প্রাক্কালে তিনি হেজাজী পোষাক পরিধান করলেন। আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত করলেন, মাথায় কালো পাগড়ী এবং ডান হাতে কালো আশা ধারন করলেন। এভাবে সজ্জিত হয়ে একটি মাত্র গোলাম সহ আবদুল্লাহ উষ্ট্র পৃষ্টে নগরে প্রবেশ করলেন।

ঈশা নামাজের প্রাক্কালে তিনি যখন এ ছদ্ম বেশে নগরে প্রবেশকরলেন তখন জনগণ মনে করলো এই তো হযরত হুসায়ন (রাঃ) এসে গেছেন। চতুর্দিক থেকে শুধু সালাম আর সালাম পেতে থাকলেন। তিনি সোজা রাজপ্রাসাদে গিয়ে স্থির হলেন।

Dhaka University Institutional Repository

বয়োঃবৃদ্ধ গভর্ণর নো'মান বিন বশীর রাজ প্রাসাদেই ছিলেন। তাঁর নিকট ইতি মধ্যেই খবর পৌছেছিল হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ) তশরিক এনেছেন। তিনি হযরত হুসায়ন (রাঃ) মঙ্গল কামনা করেই এবং নিজেকে দোষ মুক্ত রাখার জন্য দ্রুত প্রাসদ দ্বার বন্ধকরে উপর থেকে বলতে লাগলেন হে রসূল তনয়, এখান হতে চলে যান, ইয়াযীদ এ শহর আপনাকে কখনো ছেড়ে দিবে না। আমি ইহা চাইনা যে, আমর রাজধানীতে আপনি নিহত হন। আবদুল্লাহ তখন মুখ হতে বস্ত্র উম্মোচন করলো। বৃদ্ধ নো'মান তৎক্ষণাৎ দরজা খুললেন এবং আবদুল্লাহর রুদ্রমুর্তি দেখে হতভম্ভ হয়ে গেলেন। ঐ রাত্রিতেই আব্দুল্লাহ নো'মান বিন বশিরের নিকট থেকে কার্য্যোভার বুঝে নিলেন। পরদিন সকালে তিনি দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন।[১৩৩]

ইমাম ইবনে কাছীর প্রায় একই রূপ বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন "কুফার উমাইয়া সমর্থক গণ যখন গভর্ণর নো'মান বিন বশীরের নিকট, হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দূত মুসলিমের কুফায় আগমন ও লোকদের বায়াৎ করার খবর দিলেন এবং তাকে প্রতিরোধ এমনকি কতল করার জন্য অনুরোধ করলো তখনও তিনি নির্লিপ্ত থাকলেন এবং বললেন আমার সাথে কেহ যুদ্ধ না করলে আমিও করবনা, আমাকে কেহ গালি না দিলে আমিও দিবনা। তখন আব্দল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে শোবা আল হাজরামী দাড়ালেন। তোরাবী ও কামেল গ্রন্থে ঐ ব্যক্তির নাম যায়িদ বনা হয়েছে এবং বললেন- যুদ্ধ ছাড়া এ ব্যাপারে কোন মিমাংসা হবেনা। খলীফা-তো আপনাকে দুর্বল লোকদের রক্ষা করার জন্যই আমীর নিযুক্ত করেছেন। উত্তরে নো'মান বললেন আল্লাহর না ফরমানী করে আমি দুর্বল লোকদের রক্ষা করতে পারিনা। অর্থাৎ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দূতের সাথে যুদ্ধ করাকে তিনি আল্লাহর না ফরমানী বলে মনে করলেন।[১৩৪] প্রকাশ থাকে যে, কুফার এ ভূতপূর্বে গভর্ণর নবীভক্ত নো'মান বিন বশীরকেই ইয়াযীদ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পরিবার বর্গের সাথে মদীনা যাত্রী কাফেলার সাথে রক্ষক স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। ইয়াযীদ এ ব্যাপারে তাকেই বিশ্বস্থ মনে করেছিলেন। মূলতঃ তিনি বিশ্বস্তই ছিলেন। তার প্রমান স্বয়ং আহলে বায়েতের মুখ থেকেই পাওয়া যায়, এ সম্পর্কে ইবনে কাছিরও উল্লেখ করেনঃ- ইয়াযীদ আলী বিন হোসাইন (জয়নুল আবেদীন) কে সান্তনা বানী শুনায়ে তাদেরকে মদীনায় রওয়ানা হওয়ার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে দিলেন। পথে যাতে তাদের খাদ্যও পানিয়ের অভাব না হয় সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নো'মান বিন বশীরকে তাদের সাথে রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি কাফেলা থেকে দুরে দুরে থেকে তাদের পথ নির্দেশ করতে লাগলেন। আর এভাবেই তারা মদীনায় পৌছে গেলেন। ফাতিমা বিনতে আলী বলেন আমি আমার বোন যয়নবকে বললাম এই বয়স্ক লোকটি আমাদের সাথে সাথে আসলো সে কতই না ভালো মানুষ। কত সুন্দর ভাবেই না আমাদের পথ প্রদর্শন করলেন। আমি আমার বোনকে বললাম লোকটিকে উপহার স্বরূপ দেওয়ার মত কিছু আছে কি? বোন বললেন আমাদের গায়ের অলংকার ছাড়া কিছু নেই। তাকে বললাম অলংকারই তাকে দাও। ফাতিমা বলেন অতঃপর আমরা সবাই আমাদের অলংকার বের করে তাকে দেওয়ার জন্য পাঠালাম। সাথে এ কথাও বলে দিলাম তাকে যেন বলা হয় আমাদের সাথে উত্তম আচরনের জন্য উপহার স্বরূপ আমরা তাকে এগুলো দিচ্ছি। তখন নো'মান বিন বশির বললেন উপহার বা টাকা পয়সা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি আমি এরূপ করে থাকি তাহলে তা হবে আমার দুনিয়ার স্বার্থের উদ্দেশ্যে। আপনারা আমাকে এগুলো দিতে চেয়েছেন তাই আমার জন্য যথেষ্ট আর এতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি আপনাদের সাথে উত্তম আচরন করেছি একমাত্র আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।[১৩৫]

এ বৃদ্ধ আল্লাহ্ ও রাসূল প্রেমিক সাহাবী ইয়াযীদের শাসন কাল পর্যন্ত পর্যন্ত বনি উমাইয়্যাদের সমর্থক ছিলেন। মারওয়ানের শাসনামলে আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে সমর্থন করার অপরাধে তাঁকে হত্যা করা হয। তার মস্তক কর্তন করে তাঁর স্ত্রীর কোলে ছুঁড়ে দেয়া হয়।[১৩৬]

সার্বিক রাজনৈতিক কার্যকারণ বিশ্লেষণ করলে সর্বশেষ একথাই বলা যায় যে সঠিক পদ্ধতির ব্যবহার ব্যতিরেকে হযরত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তারই দ্বারা ইসলামী গুনাগুন বিচার বিশ্লেষণ উপেক্ষা করে তারই পুত্রকে ওলী আহাদ তথা পরবর্তী খলীফা মনোনীত করা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মূল কারণ। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের যে সকল বৈশিষ্ট আবশ্যক তা এ ক্ষেত্রে মানা হয়নি। যেমনঃ

একঃ একটি স্বাধীন জাতি সম্পূর্ন ইচ্ছা প্রনোদিত হয়ে মহান আল্লাহর সামনে আত্ম-সমর্পন করবে

দুইঃ সার্বভৌমত্বকে আল্লাহর জন্য বিশেষিত করা

তিনঃ রাষ্ট্র প্রতিষ্টা পরিবর্তন পরিচালন সম্পূর্ন ভাবে জনগণের রায় অনুযায়ী হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চারঃ ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামের মৌলিক দর্শন ও বিধান বিধান মেনে চলবে।

পাঁচঃ এটা এমন এক রাষ্ট্র যা বংশ বর্ণ ভাষা এবং ভৌগোলিক জাতীয়তার পরিবর্তে শুধু নীতি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

ছয়ঃ রাজনীতিকে স্বার্থের পরিবর্তে নীতি নৈতিকতার অনুগত করা এবং আল্লাহ ভীতি ও পরহেজগারীর সাথে তা পরিচালনা করা।

সাতঃ এটা একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র

আটঃ সবার জন্য সমান অধিকার মর্যদা এবং সুযোগ সুবিধা থাকবে।

নয়ঃ এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য থাকবে। সর্বশেষ্ট খিলাফতপ্রতিষ্ঠাকরতে পরামর্শ নিতে হবে কিন্তু হযরত মুআবিয়া থেকে ইয়াযীদ পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তরবারীর জোরে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ের উদ্ধৃতি সূচী

১ কু ক, ৫/৮৪
২ প্রগুক্ত, ২ /৩১
৩ প্রগুক্ত, ৭/১০)
৪ প্রগুক্ত, ২২/৬৫
৫ প্রাগুক্ত, ৭/৬৯
৬ প্রাগুক্ত
৭ প্রাগুক্ত, ৭/১২৯
৮ প্রাগুক্ত, ১০/১৪
৯ প্রাগুক্ত, ৩৫/৩৯
১০ প্রাগুক্ত, ৮৯/৬-১১
১১ প্রাগুক্ত, ৭৯/১৭-২৪
১২ প্রাগুক্ত, ২৪/৫৫
১৩ প্রাগুক্ত, ৫/২
১৪ প্রাগুক্ত, ৭৬/৪২
১৫ প্রাগুক্ত, ৪২/৮৩
১৬ প্রাগুক্ত, ৪/৫৯
১৭ প্রাগুক্ত, ১৮/২৮
১৮ প্রাগুক্ত, ২৬/১৫১-১৫২
১৯ প্রাগুক্ত, ৪/৫
২০ প্রাগুক্ত, ৪/৫৮
২১ রুমা ৫/৫৮
২২ সুআদা ৪/২১১, মাআ ৪/২৭৩
২৩ কাউ ৫/২৩৭৪নং হা, আতা ২/৪৪৯, ইস্তিয়াব ২/৬৮৯,
২৪ আতাতাউমু ২/৬১৮,
২৫ তাইসা ৩/৩০৬-৭
২৬ আতা ৩/২৯২, ইআ ৩/৩৪-৩৫, তাইসা ৩/৩৪৪, ফবা ৭/৪৯
২৭ ফবা ২/১২৫
২৮ আতা ৩/২৯৬, ইআ ৩/৩৬, আবেনে ৭/১৪৬
২৯ ফবা ৭/৪৯-৫০, আতারিনাফিমাআ ২/৭৬, ইখা ১২৫ পৃ., ইখি পৃ. ৩২৪
৩০ তাইসা ৩/৬৪
৩১ আতা ৩/২৯১
৩২ কাউ ৫/২৩২৪ নং হাঃ
৩৩ আবেনে ৭/১৪৬
৩৪ আতা ৩/৪৫৮, ইআ ৩/১০০, আবেনে ৭/২২৭-২৮
৩৫ আবেনে ৭/২৩৭-৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৩৬ ইআ ৩/৪৬, ইখা ২/১৭০
৩৭ আতা ৪/৩৮, আবেনে ৭/২৭৬, ইখা ২/১৭৫
৩৮ ইস্তিয়াব ১/২৪৫, আবেনে ৮/১৩৫
৩৯ আবেনে ৮/১৬
৪০ ইআ ৩/২৪৯, আবেনে ৮/৭৯, ইখা ৩/১৫-১৬
৪১ আতা ৪/২২৫-২২৮, ইআ ৩/২৪৯-৫০, আবেনে ৮/৭৯
৪২ ইআ ৩/২৫০, আবেনে ৮/৮৯
৪৩ ইআ ৩/২৫০-৫১, আবেনে ৮/৮০
৪৪ ইআ ৩/২৫২
৪৫ তাইসা ৪/১১৩
৪৬ আতা ৪/১১২, মুযা ২/৪৬
৪৭ আবেনে ৮/১৩-০১৪
৪৮ দামাই ২৫২
৪৯ প্রগুক্ত, ২৫২
৫০ ইস্তিয়াব ১/১৪০
৫১ দামাই ২৫২
৫২ হাকিম ২/১৭৫, মুসান্নাফা ১১/৪৫২
৫৩ উগা ৩/১৭৫
৫৪ ইসাবা পৃ. ৩৩০
৫৫ দামাই ২৫৫
৫৬ ASHS - P. 83
৫৭ ইআ ৪/১০, আবেনে ৮/১৫৭
৫৮ আবেনে ৮/১৫৭
৫৯ কার পৃ. ৯০
৬০ খিই পৃ. ১১০
৬১ ASHS পৃঃ-৮৫
৬২ প্রাগুক্ত, পৃঃ -৫৬
৬৩ মিসু ২/২৩৮
৬৪ আবেনে ৮/১৬৩
৬৫ প্রাগুক্ত, ৮/১৬৩
৬৬ ফইআ ৫/১০০-১০১, আতু পৃ. ২৪১
৬৭ ফইআ ৫/১০৮, আতা ৬/২১৫
৬৮ আবেনে ৮/১৭১
৬৯ আবেনে ৮/১৭২
৭০ প্রাগুক্ত
৭১ প্রাগুক্ত, ৮/১৭৩
৭২ আবেনে ৮/১৭৩, মুযা ৩/৬৯, কামেল ৪/৩৯, ইআ ৫/১১৪
৭৩ আবেনে ৮/১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

---

৭৪ প্রাগুক্ত
৭৫ প্রাগুক্ত, ৮/১৭৬
৭৬ প্রাগুক্ত
৭৭ প্রাগুক্ত, ৮/১৭৭
৭৮ প্রাগুক্ত, ৮/১৭৮
৭৯ প্রাগুক্ত, ৮/১৭৯
৮০ কুক ১০/৪১
৮১ আবেনে ৮/১৮০
৮২ প্রাগুক্ত, ৮/১৮১
৮৩ প্রাগুক্ত, ৮/১৮৩
৮৪ মুব্র
৮৫ আবেনে ৮/১৯০
৮৬ প্রাগুক্ত, ৮/২০৬
৮৭ প্রাগুক্ত, ৮/২০৭
৮৮ প্রাগুক্ত, ৮/২০৮
৮৯ প্রাগুক্ত
৯০ আতা ৪/৩৫২
৯১ আবেনে ৮/২০৯
৯২ কুক ৩/১৪৫
৯৩ প্রাগুক্ত, ৫৭/২২
৯৪ প্রাগুক্ত, ৪২/৩০
৯৫ আবেনে ৮/২১২
৯৬ কুক ৩/২৬
৯৭ প্রাগুক্ত, ২/২৪৭
৯৮ আবেনে ৮/২২২
৯৯ প্রাগুক্ত - ৫/১২৪-১২৫
১০০ প্রাগুক্ত -৮/১৯৮
১০১ মিসু ২/২৪০
১০২ শফিআ, পৃ. ৮৮
১০৩ আবেনে -৮/২৩২
১০৪ প্রাগুক্ত, ৮/২৩২
১০৫ মিসু ২/২৪৫
১০৬ আবেনে ৮/২৩২
১০৭ আবেনে ৮/২১৩ মিসু -২/২৪৮
১০৮ আবেনে - ৮/২২১
১০৯ আতা ৪/৩০৯-৩৫৬, ই আ ৩/২৮২।
১১০ আবেনে ৮/২০৫
১১১ মাআ হা নং ৬৯২৯, তাইসা ৩/২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

---

[১১২] মাআ হা নং ৬৫৩৮, ৬৯২৯

[১১৩] ইস্তিয়াব- ১/২৩৫, আতা ৪/৭৯, ইআ ৩/১৮০, ইখা ২/১৮২

[১১৪] আতা ৪/৩৪৯, ইআ ৩/২৯৬

[১১৫] তাইসা ৬/৫৩, আবেনে ৮/২৪৫

[১১৬] ইআ ৪/১৪, ইখা ৩/৩৫।

[১১৭] ইস্তিয়াব ১/৩৫৩, আতা ৫/৩৩, আবেনে ৮/৩৩২, ইখা ৩/৩৯

[১১৮] ইস্তিয়াব ১/১৯৬, ইআ ৩/২২০, আবেনে ৮/২৮, ইখা ৩/৭

[১১৯] মনা পৃ ৩৫১

[১২০] সবু, পৃ. ৯৩৫

[১২১] আইনী ৮/৬৫৭

[১২২] ফবা ৭/৭৫

[১২৩] আইনী ৭/৬৭৫

[১২৪] আতা ৪/৩৫০, ইআ ৩/২৮৫, আবেনে ৮/১৭০

[১২৫] আইনী ৭/৬৫৭

[১২৬] আবেনে ৮/২০৫

[১২৭] আবেনে ৮/২০৫, ম না পৃ. ৩৫১

[১২৮] আবেনে ৮/১৬৯

[১২৯] প্রাগুক্ত, ৮/২০০

[১৩০] প্রগুক্ত ৮/২০৪

[১৩১] প্রাগুক্ত ৮/২০৪

[১৩২] প্রাগুক্ত ৮/২০৫

[১৩৩] কার পৃ. ১১৮

[১৩৪] আবেনে ৮/১৬৩

[১৩৫] প্রাগুক্ত ৮/২১২

[১৩৬] তাইসা ৬/৫৩, আবেনে ৮/২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব

৩.১ বংশ পরিচয়

কুরাইশদের পূর্বপুরুষ ফিরকুরেশ খৃষ্টীয় ২০০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মক্কায় বসতি স্থাপন করেন। ফির কুরেশের সন্তান সন্ততি বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে মক্কা ও তার চারপাশে বসতি বিস্তার করতে থাকে। এরা সবাই কুরাইশ নামে পরিচিত।

কুরাইশ বংশ ছাড়াও আরো কিছু বংশ মক্কা অঞ্চলে বাস করত। কিন্তু যে কাবার জন্য মক্কা নগরী সমগ্র আরব ভূমির তীর্থস্থানে পরিনত হয়েছিল সেই কাবার রক্ষক ও সেবাইত হিসেবে কুরাইশদের মর্যাদা ছিল সর্ব্বাধিক। তারাই মক্কার সব রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রাধান্য করত। ফির কুরাইশের ষষ্ঠ পুরুষ প্রসিদ্ধ কুশাই জীবনের বহু বিপর্যয় ও রোমাঞ্চকর ঘটনার ভিতর দিয়ে শেষে মক্কানগরীর প্রধানের আসন লাভ করেন। ৪৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জীবনের অবসান ঘটলে তার জ্যেষ্ঠপুত্র আবদেদ্দার এই ক্ষমতার অধিকারী হন। কিন্তু আবদেদ্দার অপেক্ষা তাঁর কনিষ্ঠভাই আবদে মানাফ অধিকতর কর্মকুশল ও প্রভাবসম্পন্ন ব্যাক্তি ছিলেন। আবদেদ্দার এর মৃত্যু হলে ঐ সব ক্ষমতা আবদে মানাফের হস্তগত হয়। কারন আবদেদ্দারের পুত্ররা ছিল অল্প বয়স্ক। আবদে মানাফের মৃত্যুর পর আবদেদ্দার এর পুত্রেরা তাদের হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য হয়নি। বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং অধিক প্রতিপত্তিশালী মানাফ পুত্রগণ মক্কার উপর কর্তৃত্ব করতে থাকে। এবং কুশাই এর বংশের ভিতর দুইটা প্রতিদ্বন্দ্বী শাখার উদ্ভব হয়। এবং কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য শাখাগুলো কেউ এ পক্ষে কেউ অন্য পক্ষে যোগদান করে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা করলেও কার্যত তা ঘটতে পারেনি শুধু এক আপোষ মীমাংসার দরুনে। এই মীমাংসার ফলে তীর্থযাত্রীদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের ভার থাকলো মানাফ সুপ্রসিদ্ধ পুত্র হাশিমের উপর। অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হলো। আবদেদ্দারের বংশে। কাবাতীর্থের প্রধান আয়ের অধিকারী হয়ে হাশিম বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন। তার আচরণও ছিল রাজোচিত। পক্ষান্তরে আবদেদ্দারের বংশে সামরিক সহ নানা অধিকার লাভ থাকা সত্ত্বেও সমৃদ্ধির খর্ববতায় তারা ক্রমশঃ হীন প্রভ হতে লাগলেন। ফলে বনি হাশিমের উপর তাদের

Dhaka University Institutional Repository

ঈর্ষা ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। বদর যুদ্ধে হযরত ও তথা বনি হাশিমদের বিপক্ষে পরিচালিত কোরায়েশ বাহিনীর পতাকাধারী ছিরেন আবদেদ্দার বংশের প্রসিদ্ধ যোদ্ধা তালহা এবং উদোক্কাদের ভিতর অন্যতম ছিলেন উমাইয়ার পৌত্র আবু সুফিয়ান। উমাইয়া ছিলেন আসলে মানাফ গোষ্ঠীর লোক। সম্পর্কে তিনি আবদে মানাফের পৌত্র এবং হাশিমের আপন ভ্রাতুষ্পুত্র। হাশিম ছিলেন হযরত এর দাদার প্রোপিতামহ কিন্তু কালে মানাফ বংশেও গৃহ বিবাদ শুরু হয় এবং তার ফলে উমাইয়া পিতৃব্য হাশিমের সন্তাগণ হতে শুদ্ধ পৃথক হয়ে পড়েন না, তাদের জানী দুষমনে পরিনত হন। এই শত্রুতার জের চলে তার সন্তান সন্ততির ভিতর দিয়ে ইয়াযীদ কর্তৃক হযরতের দৌহিত্র হুসায়নের শাহাদৎ বরনের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ কারবালার যুদ্ধ পর্যন্ত।

প্রাচীন ভারতের কৌরব ও পান্ডবদের বিরোধের মত বনি হাশিম ও বনি হাশিম ও বনি উমাইয়াদের দীর্ঘকাল ব্যাপী গৃহবিবাদ ছিল আরব ভূমির পক্ষে বিধাতার এক নিষ্করুন অভিসম্পাত। বনি হাশিম বংশীয় আব্দুল মুত্তালিবের মত ভাগ্যবান পিতা ইতিহাসে বিরল। তার পুত্রদের মধ্যে আবুতালেব, আব্বাস, হামজা ও আবদুল্লাহ ইসলামের ইতহাসে সুপ্রসিদ্ধ। আবুতালেবের পুত্র মহাবীর আলী আব্দুল্লাহ পুত্র স্বয়ং হযরত মুহম্মদ মহাবীর হামজা মুসলিম জগতে আমীর হামজা নামে অভিবাদিত আবার সুপ্রসিদ্ধ খলীফা হারুনুর রশীদের পুর্ব পুরুষ বনি উমাইয়া বংশে জন্ম গ্রহণ করেন শ্রেষ্ট দানবীর ও বিত্তশালী হযরত উসমান এবং সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক আবু সুফিয়ান। হযরত (সাঃ) যখন নবীত্বের দাবী করেন। তখন এই আবু সুফিয়ান তাঁর বিরুদ্ধ বাদীদের নেতৃত্ব করেন। প্রসিদ্ধ বদর ও ওহোদের যুদ্ধ এরই বিরুদ্ধাচারনের ফল। এরই পত্নী হেন্দা ওহোদের সমর ক্ষেত্রে মহাবীর হামজার হৃদপিন্ড উৎপাটন করে চিবিয়ে খেয়েছিলেন। এই হেন্দার গার্ভে ও আবু সুফিয়ানের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন হযরত মুয়াবিয়া। আর মুয়াবিয়ার পুত্রই হলেন ইয়াযীদ যার শাসনামলে কারবালার ঘটনা সংঘঠিত হয়। স্বয়ং আবু সুফিয়ান হযরতের মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মুআবিয়া হযরতের আনুগত্য স্বীকার করে একজন প্রিয় সাহাবা বলে গন্য হন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি

প্রথমত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ওয়ালিদ ইবনে কা'ব (রাঃ) এবং মারোয়ান এমন এক বংশের লোক ছিলেন যাদের বলা হতো তোলাকা। তোলাকা অর্থ এমন এক বংশ; যারা মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত নবী (সঃ) এবং ইসলামী দাওয়াতের বিরোধী ছিলেন। প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সারির মুসলমানগণ, ইসলামের বিজয়ের জন্য যাঁরা প্রাণ বিসর্জন করেছেন, যাঁদের ত্যাগ কুরবানীর ফলে আল্লাহ্‌র দ্বীন বিজয়ী হয়েছে তাঁদেরকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে এরা উম্মতের নেতা হবে, স্বভাবত এটা কেউ পছন্দ করতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী আন্দোলনের জন্য এই তোলাকারা উপযুক্তও ছিলেন না। কারন, তারা ইমান অবশ্য এনেছিলেন কিন্তু নবী করিম (সঃ) এর সান্নিধ্য ও প্রশিক্ষণ দ্বারা এতটুকু উপকৃত হওয়ার তাদের সুযোগ হয়নি, যাতে তাদের মন মানসিকতা এবং নীতি ও নৈতিকতার আমুল পরিবর্তন সুচিত হতে পারে। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কাতেবে ওহী ছিলেন এটা অবশ্যাই সত্য কিন্তু তাই বলে তিনি তার অগ্রে ইসলাম গ্রহণ কারী সাহাবীগণের চেয়ে শ্রেষ্ট ছিলেন একথা বলার বিশেষ কোন কারণ নেই। যে সময় সারা আরবে মাত্র সতেরো জন মানুষ লিখতে জানতেন যাদের মধ্যে মুআবিয়া (রাঃ) ছিলেন একজন। তবে এ বংশের লোকেরা ছিলেন উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপক প্রশাসক এবং বিজেতা। কিন্তু ইসলাম তো নিছক রাজ্য জয় আর দেশ শাসনের জন্যই আসেনি। ইসলাম প্রথমত এবং মূলতঃ মঙ্গল কল্যানের একটি ব্যাপক আহ্বান বিশেষ। এর নেতৃত্বের জন্য প্রশাসনিক এবং সামরিক যোগ্যতার চেয়ে মানসিক এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বেশী। আর এ বিবেচনায় এদের স্থান ছিল সাহাবা তাবেয়ীনদের প্রথম সারিতে নয় বরং পেছনের সারিতে। এ প্রসংঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ মারওয়াম ইবনে হাকামের অবস্থাটাই লক্ষণীয়। তাঁর পিতা হাকাম ইবনে আবিল আস হযরত উসমান (রাঃ) এর চাচা ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন এবং মদীনায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর কোন কোন আচরনের কারনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে মদীনা থেকে বের করে দেন এবং তায়েফে বসবাসের নির্দেশ দেন। ইবনে আব্দুল বার আল ইস্তিয়াবে এর অন্যতম কারণ বর্ননা করে বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বড় বড় সাহাবীদের সাথে একান্তে যেসব পরামর্শ করতেন, তিনি কোন না কোন প্রকারে তা সংগ্রহ করে ফাঁস করে দিতেন। দ্বিতীয় কারণ তিনি এই বর্ণনা করেন যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ভান ধরতেন এমনকি একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে এমনটি করতে দেখে ফেলেন।[১]

Dhaka University Institutional Repository

মারোয়ানের বয়স তখন ৭-৮ বছর। তিনিও পিতার সাথে তায়েফে বসবাস করতে থাকেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হলে তাঁর কাছে তাঁকে ফিরিয়ে আনার অনুমতি চাওয়া হলে তিনিঅস্বীকার করেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়েও তাঁকে মদীনা আসার অনুমতি দেয়া হয়নি। হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর খিলাফত কালে তাঁকে ডেকে আনেন এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি এর কারণ এই বর্ণনা করেন যে আমি রাসুল (সঃ) এর নিকট তার জন্য সুপারিশ করেছিলাম তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে-তাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেবেন। এমনি করে পিতা পুত্র উভয়ে তায়েফ থেকে মদীনা চলে আসেন।[২] মারওয়ানের এ পটভূমির প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে তাঁর সেক্রেটারী পদে নিয়োগকে লোকেরা কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। হুজুর (সঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-এর সুপারিশ গ্রহণ করে তাঁকে ফিরিয়ে আনার ওয়াদা করেছিলেন। জনগণ হযরত উসমান (রাঃ) এর কথায় আস্থা স্থাপন করে এটা মেনে নিয়েছিল। তাই তাঁকে মদীনায় ডেকে আনাকে তারা আপত্তিকর মনে করে নি। কিন্তু বড় বড় সাহাবীকে বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর এ বিরাগ ভাজন ব্যক্তির পুত্রটিকেই সেক্রেটারী করার ব্যাপারটি মেনে নেয়া তাদের জন্য বড়ই কঠিন হয়ে পড়ে ছিল। বিশেষ করে তার বিরাগ ভাজন পিতা যখন জীবিত এবং পুত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যে তার প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনাও ছিল।*

তৃতীয়ত, তাদের কারো কারো চরিত্র এমন ছিল যে, সে সময়ের পবিত্রতর ইসলামী সমাজে তাদের মত লোকদেরকে উচ্চ পদে নিয়োগ করা কোন শুভ প্রভাব প্রতিফলিত করতে পারতো না। উদাহরণ স্বরুপ ওয়ালীদ ইবনে ওকবার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনিও ছিলেন মক্কাবিজয়ের পর ইসলাম গ্রহনকারীদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বনী মুস্তালিকের সদকা উসুল করার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তাদের এলাকায় পৌছে কোন কারনে ভীত হয়ে ফিরে আসেন। তাদের সাথে সাক্ষাৎ না করেই তিনি মদীনায় ফিরে এসে উল্টো রিপোর্ট দেন যে বনী মুস্তালিক যাকাত দানে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। এতে রাসুলুল্লাহ (সঃ) ক্ষুব্ধ হন এবং তাদের বিরুদ্ধে এক সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। এক বিরাট অঘটন ঘটার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কবীলার সর্দাররা এ সম্পর্কে যথা সময়ে অবহিত হন। তারা মদীনায় হাজির হয়ে আরজ করেন। ইনি তো আমাদের নিকটই আসেননি আমরা প্রতীক্ষা করছিলাম কেউ আমাদের নিকট এসে যাকাত উসুল

---

* হাকাম হযরত উসমান (রাঃ) এর শেষ সময় পর্যন্ত জিবিত ছিলেন। হিজরী ৩২ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

করে নিয়ে যাবে। এ উপলক্ষে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়।

অর্থঃ- "ইমানদাররা কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে এসে কোন খবর দিলে তোমরা অনুসন্ধান করো। তোমরা অজানা অবস্থায় কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করবে এবং পরে নিজেদের কর্ম কান্ডের জন্য অনুতাপ করবে এমন যেন না হয়।"[৩]

তাফসীরকাররা সাধারনতঃ এঘটনাকেই আয়াতের শানে নুযুল হিসাবে বর্ননা করেন। তাফসীরে ইবনে কাছীরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। ইবনে আব্দুল বার বলেনঃ আয়াতটি ওয়ালাদ ইবনে ওকবা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে এ ব্যাপারে জ্ঞানীদের মধ্যে কোন মত বিরোধ নেই। ইবনে তাই মিয়াও স্বীকার করেন যে, এ আয়াত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।[৪]

এ ঘটনার কয়েক বছর পর হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) তাঁকে পুনরায় খেদমতের সুযোগ দান করেন। হযরত ওমরের শেষ সময়ে তাকে আল জাসীয়ার আরব এলাকায় যেখানে বনী তগলব বাস করতো আমেল (কালেক্টর) নিযুক্ত করা হয়।[৫] ২৫ হিজরীতে এ ক্ষুদ্র পদ থেকে তুলে নিয়ে হযরত ওসমান ও (রাঃ) তাকে হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাসের স্থলে কুফার গভর্ণর করেন। সেখানে তথ্য প্রকাশ পায় যে তিনিশয়ার পানে অত্যম্ব। এমন কি এক দিন তিনি ফজরের নামায। ৪ রাকায়াত আদায় করান। অতঃপর মুসুল্লীদের প্রতি লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করেন আরো আদায় করবো?[৬] এঘটনা সম্পর্কিত অভিযোগ মদীনায় পৌছে এবং জনগণের মধ্যে এর ব্যাপক চর্চা হতে থাকে। অবশেষে হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরানা এবং আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ হযরত ওসমান (রাঃ) এর ভাগ্নে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খেয়ারকে বলেনঃ তুমি গিয়ে তোমার মামার সাথে কথা বলো তাঁকে বলো যে তাঁর ভাই ওয়ালীদ ইবনে ওকবার ব্যাপারে লোকেরা তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক আপত্তি তুলেছে। তিনি এব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরয করেন যে ওয়ালীদের ওপর হদ জারী করা আপনার জন্য জরুরী এ আবেদন জানালে হযরত উসমান (রাঃ) ওয়াদা করেন যে, এ ব্যাপারে আমরা হক অনুযায়ী ফয়সালা করবো ইনশাআল্লাহ। তদনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের প্রকাশ্য সমাবেশে ওয়ালীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। হযরত উসমান (রাঃ) এর নিজের আদায়কৃত দান হুরমান সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়ালিদ মদ্যপান করেছিলেন। অপর এক

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষী সাব ইবনে জুসামা (বা জুসামা ইবনে সাব) সাক্ষ্য দেন যে ওয়ালীদ তার সামনে মদ -বমি করেছিল। ইবনে হাজার বর্ণনা করেন এ ছাড়াও আরও ৪ জন সাক্ষী- আবু যয়নাব, আবু মুআররা, জুন্দুর ইবনে যোহাইর আল আযদী এবং সা'দ ইবনে সালেক আল-আশ আরীকে পেশ করা হয়। তারাও অপরাধের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তখন তার ওপর হদ জারী করার জন্য হযরত উসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরকে এ কাজে নিযুক্ত করেন এবং তিনি ওয়ালীদকে ৪০ টি বেত্রাঘাত করেন।[৭]

এসব কারনে হযরত উসমান (রাঃ) এর এ নীতি লোকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। খলীফার আপন বংশের লোকদেরকে একের পর এক রাষ্ট্রের গুরুত্ব পূর্ণ পদে নিয়োগ করা এমনিতেই ছিল যথেষ্ট আপত্তির কারণ এর পরও তারা যখন দেখতে পেলো যে এদেরকেই সামনে টেনে আনা হচ্ছে। তখন তাদের অস্থিরতা অসন্তুষ্টি আরো বেড়ে গেল। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় এমন ছিল, যা সুদুর প্রসারী এবং মারাত্বক পরিনতি ডেকে আনে।

প্রথমটি হচ্ছে হযরত উসমান (রাঃ) হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কে ক্রমাগত দীর্ঘদিন ধরে একই প্রদেশের গভর্ণর পদে বহাল রাখেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ) এর সময়ে ৪ বছর ধরে দামেশাকের শাসন কর্তার পদে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) আইলা থেকে রোম সীমান্ত পর্যন্ত এবং আল-যিরা থেকে উত্তর মহাসাগার পর্যন্ত গোটা এলাকা তার আওতাধীন করে গোটা শাসন কাল (১২ বছর) তাঁকে সে প্রদেশেই বহাল রাখেন।[৮] শেষ পর্যন্ত হযরত আলী (রাঃ) কে এর পরিনতি ভোগ করতে হয়েছে। এ শাম প্রদেশটি তৎকালনি ইসলামী সম্রাজ্যের অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক এলাকা ছিল। এর একদিকে ছিল সকল প্রাচ্য প্রদেশ আর অপরদিকে ছিল সকল প্রাশ্চাত্য প্রদেশ। মধ্যখানে এদেশটি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে, এর শাসনকর্তা কেন্দ্র থেকে বিমূখ হলে প্রাচ্য প্রদেশ সমূহকে পাশ্চাত্য প্রদেশগুলি থেকে একেবারেইবিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারতেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এ প্রদেশের শাসন কার্যে দীর্ঘকাল নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সেখানে ভালোভাবে আসন গেড়ে বসেছিলেন। তিনি কেন্দ্রের আওতায় ছিলেন না, প্রকৃত পক্ষে কেন্দ্র ছিল তাঁর দয়া অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি এর চেয়েও মারাত্বক গোলযোগ পূর্ণ প্রমানিত হয়েছিল, তাছিল খলীফার সেক্রেটারীর গুরুত্বপূর্ণ পদে মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিযুক্তি। ইনি হযরত উসমান (রাঃ) এর

Dhaka University Institutional Repository

কোমল প্রকৃতি এবং আস্থার সুযোগে এমন অনেক কাজ করেন যার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত উসমান (রাঃ) এর উপর বর্তায় অথচ এসব কাজের জন্য তাঁর অনুমতি অবগতির কোন তোয়াক্কাই করা হতো না। উপরন্ত ইনি হযরত ওসমান (রাঃ) এবং বড় বড় সাহাবীদের সোহার্দপূর্ন সম্পর্কে ফাটল ধরাবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালাতে থাকেন। যাতে খলীফা তাঁর পুরাতন বন্ধুদের স্থলে তাঁকে বেশী শুভাকাঙ্খী এবং সমর্থক জ্ঞান করেন।[৯] এছাড়াও তিনি একাধিকবার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর সমাবেশে এমন সব হুমকিপূর্ন ভাষণদান করেন। তোলাকাদের মুখ থেকে যা শুনে সহ্য করে যাওয়া প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের পক্ষে ছিল নিতান্ত কষ্টকর। এ কারনে অন্যরা ছাড়াও হযরত উসমান (রাঃ) এর স্ত্রী হযরত নায়েলাও এমত পোষণ করতেন যে হযরত ওসমান (রাঃ) এর জন্য সংকট সৃষ্টির বিরাট দায়িত্ব মারওয়ানের ওপর বর্তায়। এমনকি একদা তিনি স্বামীকে স্পষ্ট বলে দেন-আপনি মারওয়ানের কথা মত চললে সে আপনাকে হত্যা করিয়ে ছাড়বে। এ ব্যক্তিটির মনে আল্লার কোন মর্যদা নেই, নেই কোন ভয়-ভীতি ও ভালো বাসা।[১০] হযরত ওসমান (রাঃ) এর নীতির এদিকটি ভুল ছিল। আর ভুল কাজ ভুলই -তা যে কেউ করুক না কেন। সাহাবীরও ভুল হতে পারে। সাহাবীর ভুলকে ভুল বলে স্বীকার না করা দ্বীনেরও দাবী নয়। কিন্তু সত্য কথা এই যে, এ একটি দিক বাদে অন্য সব দিক থেকে তাঁর চরিত্র খলীফা হিসাবে একটা আর্দশ চরিত্র ছিল। যার বিরুদ্ধে আপত্তি উথাপন করার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত উসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগের এক বিকট ফিরিস্তি প্রণয়ন করে যার অধিকাংশই ছিল ভিত্তিহীন বা এমন দুর্বল অভিযোগ সম্বলিত যার যুক্তি পূর্ণ জবাব দেয়া যায় এবং পরে তা দেয়াও হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মদীনায় মারাত্মক হাঙ্গামা সৃষ্টি করে একান্ত নির্মম ভাবে হযরত উসমান (রাঃ) কে শহীদ করে ফেলে।[১১]

এখানে কারো মনে সন্দেহ থাকা ঠিক নয় যে মদীনা বাসীরা তাদের একাজে সন্তুষ্ট ছিল। আসল ঘটনা এই যে, এরা অকস্মাৎ মদীনায় প্রবেশ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি গুলো অধিকার করে শহর বাসীদেরকে নিরুপায় করে দেয়।[১২] উপরন্ত তারা হত্যার মত মারাত্মক অপরাধ সত্যি সত্যি করেই বসবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। মদীনা বাসীদের জন্য এটা ছিল একান্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা আকাশ থেকে আকস্মাৎ বজ্রপাতের ন্যায় তাদের উপর আপতিত হয়েছিল। পরে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিজেদের শৈথিল্যের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল।[১৩] হযরত উসমান (রাঃ) এর শাহাদতের পর মদীনায় নৈরাজ্য বিস্তার লাভ করে। কারন উম্মাতের তখন কোন

Dhaka University Institutional Repository

নেতা নেই রাষ্ট্রের নেই কোন কর্ণধার। মদীনার মোহাজের আনছার এবং বড় বড় তাবেয়ীরা- সকলেই অস্থির। রোম সীমান্ত থেকে ইয়ামান পর্যন্ত এবং আফগানিস্থান থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত এ উম্মত এবং বিশাল সম্রাজ্য নেতা শুন্য অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। তাই যথা শীঘ্র সম্ভব একজন খলীফা নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়ে ছিল। উম্মাতকে সংগঠিত করার জন্য রাষ্ট্রকে বিশৃংখলার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তৎক্ষণাৎ কোন যোগ্যতর ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্র প্রধান নিযুক্ত করা অপরিহার্য ছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর ওফাত কালে যে ছয়জন সাহাবীকে উম্মাতের সব চেয়ে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলে অভিহিত করে গিয়েছিলেন তখন তাদের মধ্য থেকে ৪ জন হযরতআলী তালহা যোবায়ের এবং সা'দ ইবনে আবি ওক্কাল (রাঃ) জীবিত ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) সকল দিক থেকে প্রথম সারিতে ছিলেন। শুরা উপলক্ষে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) উম্মাতের জনমত যাচাই করে এ ফয়সালা দেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ) এর পরে যিনি উম্মাতের সবচেয়ে বেশী আস্থা ভাজন ব্যক্তি তিনি হচ্ছেন হযরত আলী (রাঃ)।[১৪] আলী (রাঃ) অস্বীকৃতি জানালেও মসজিদে নববীর সাধারণ অধিবেশনে সকল মোহাজের আনসার ঐক্য বদ্ধ ভাবে তাঁর হাতে বায়আত করে। অবশ্য সাহাবীদের মধ্যে ১৭ জন বা ২০ জন এমনও ছিলেন, যাঁরা তাঁর হাতে বায়আত করেন নি।[১৫] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যেসব নীতির ভিত্তিতে খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হযরত আলী (রাঃ) এর নিশ্চিত রুপে সে সব মুলনীতি ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত ছিল তিনি জোর করে ক্ষমতা দখল করেননি। খিলাফত লাভের জন্য তিনি সামান্যতম কোন চেষ্টা তদবীরও করেননি। জনগন নিজেরা স্বাধীন পরামর্শ ক্রমে তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করে। সাহাবীদের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ তাঁর হাতে বায়আ'ত করেন। পরে কেবল মাত্র শাম প্রদেশ ব্যতিত গোটা মুসলিম জাহান তাঁকে খলীফা বলে স্বীকার করে। অপর পক্ষে যে ১৭ জন বা ২০ জন সাহাবী বায়আত থেকে বিরত ছিলেন তা ছিল নিছক নেতিবাচক কাজ এ জন্য খিলাফতের আইনগত পজিশনের উপর কোন প্রভাব পড়েনা। তাঁর বিপক্ষে তাঁরা প্রতি বায়আত করেন নি। অথবা উম্মত রা রাষ্ট্রের কোন খলীফার প্রয়োজন নেই এমন কথাও তারা বলেন নি। কিছু সময়ের জন্য খিলাফতের পদ শুন্য থাকা উচিৎ এমন বক্তব্যও তারা প্রকাশ করেন নি। সূতরাং সকল বিচারে হযরত আলী (রাঃ) ন্যায়ানুগ বৈধ খলীফা ছিলেন। আর এ ভাবেই হযরত উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের কালে খিলাফতে রাশেদার ব্যবস্থায় যে মারাত্মক ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলমানগণ তা পূরণ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনিটি বিষয় এমন ছিল

Dhaka University Institutional Repository

যা সে ফাটল পূরণের সুযোগ দেয়নি। বরং তা ফাটলকে আরও বৃদ্ধি করে উম্মাতকে রাজতন্ত্রের মুখে ঠেলে দেয়ার ব্যাপারে এক ধাপ অগ্রসর হয়।

একঃ হযরত উসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। যারা কার্যত হত্যা কান্ডে অংশ নিয়েছিল হত্যায় প্রেরণ যুগিয়েছিল এবং তাতে সহায়তা করেছিল; এমনি করে সামগ্রিক ভাবে এ মহাবিপর্যয়ের দায়িত্ব যাদের উপর পড়ে তারা সবাই হযরত আলী (রাঃ) কে খলীফা করার ব্যাপারে অংশ নেয়াখেলাফত কার্যে তাদের অংশ গ্রহণ এক বিরাট বিপর্যয়ের কারণ হয়ে পড়ে। কিন্তু একথা সত্য যে মদীনার সে সময়ের পরিস্থিতি বিবেচনায় তখন খলীফা নির্বাচনের কাজ থেকে তাদেরকে কিছুতেই নিবত্ত করা যেত না। তাদের অংশ গ্রহণ সত্ত্বেও যে ফয়সালা গৃহীত হয়েছিল তা ছিল একটি সঠিক ফয়সালা। উম্মাতের সকল প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐক্য মতের ভিত্তিতে হযরত আলী (রাঃ) এর হস্ত সুদৃঢ় করলে হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যাকারীদেরকে নিশ্চিত দমন করা সম্ভব হত। অথচ দুর্ভাগ্য বশত বিপর্যয়ের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তা সহজেই নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হত।

দুইঃ হযরত আলী (রাঃ) এর বায়আত থেকে কোন কোন বড় বড় সাহাবীর বিরত থাকা। কোন কোন বুযুর্গ একান্ত সদুদ্দেশ্যে ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য এ কর্মপন্থা অবলম্বন করলেও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমান করেছে যে, যে ফেতনা থেকে তারা দুরে থাকতে চেয়ে ছিলেন। তাদের এ কাজ তার চেয়েও বড় ফেতনার সহায়ক হয়েছে। তাঁরা ছিলেন উম্মাতের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি তাদরে প্রত্যেকের উপর হাজার হাজার মুসলমানের আস্থা ছিল। তাদের বিরত থাকার ফলে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। খিলাফতে রাশেদার ব্যবস্থা নব পর্যায়ে বহাল করার জন্য যে একাগ্র তার সাথে হযরত আলী (রাঃ) এর সহযোগিতা করা উম্মাতের উচিত ছিল- যা ছাড়া তিনি একাজ আঞ্জাম দিতে পারতেন না। দুর্ভাগ্য বশত তা অর্জিত হতে পারেনি।

তিনঃ হযরত উসমান (রাঃ) এর রক্তের দাবী দু পক্ষ থেকে দুটি দল এ দাবী নিয়ে এগিয়ে আসে। এক দিকে হযরত আয়েশা এবং হযরত তালহা ও যোবায়ের এবং অপর পক্ষ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)। উভয় পক্ষের মর্যাদা এবং শ্রেষ্টত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেও এ কথা না বলে উপায় নেই যে আইনের দৃষ্টিতে উভয় পক্ষের পজিশনকে কিছুতেই সঠিক বলে স্বীকার করা যায়না। বলা বাহুল্য এটা জাহেলী যুগের কোন গোত্রবাদী ব্যবস্থা ছিলোনা। যে কোন ব্যক্তি যে ভাবে খুশী নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধের দাবী নিয়ে দাঁড়াবে আর সে দাবী পূরণ করার জন্য ইচ্ছা মত যে কোন কর্মপন্থা অবলম্বন

Dhaka University Institutional Repository

করবে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা তখন ছিলনা। সেখানে একটা বিধিবদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিটি দাবী উত্থাপন করার জন্য একটা পিয়ম এবং বিধান বর্তমান ছিল। হত্যার প্রতিশোধ দাবী করার অধিকার নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের ছিল। তাঁরা বেচে ছিলেন। এবং সেখানে উপস্থিতও ছিলেন। অপরাধীদের গ্রেফতার এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ব্যাপারে সরকার সত্যিই জেনে শুনে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে অন্যরা নিশ্চয়ই সরকারের নিকট ইনসাফের দাবী জানাতে পারতেন। কিন্তু সরকার কোন ব্যক্তির দাবী অনুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ না করলে তিনি যে সরকারকে আদৌ কোন বৈধ সরকার বলে স্বীকারই করবেন না-কোন সরকারের কাছে ইনসাফ দাবী করার এটা কোন বৈধ পন্থা হতে পারেনা। শরীয়তের কোথাও এর কোন নযীর নেই। অপর পক্ষে হযরত আলী (রাঃ) যদি বেধ খলীফাই না হতেন, তাহলে তাঁর কাছে অপরাধীদের গ্রেফতার এবং শাস্তি বিধান দাবী করার কোন অর্থই থাকেনা। আবার তিনি কোন গোত্রীয় সর্দারও ছিলেন না, যে তিনি কোন আইন গত অধিকার ছাড়াই যাকে খুশী পাকড়াও করতে পারেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দিতে পারেন।

এসময় মদীনায় খলীফা অপরাধী এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সকলেই উপস্থিত ছিল এবং অপরাধীর বিচার ও দন্ড বিধান সম্ভব পর ছিল-কিন্তু তানা রে হযরত তালহা এবং যোবায়ের (রাঃ) এর বসবার পথে গমন করে সৈন্য সমাবেশ করা এবং হযরত উসমান (রাঃ) এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল এক খুনের পরিবর্তে আরো দশ হাজার খুন হওয়া এবং রাষ্ট্রের শৃংখলা বিপন্ন হওয়াই ছিল অবধারিত।

আপর পক্ষে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) শাম প্রদেশের গভর্ণর থাকা সত্ত্বেও হযরত উসমান (রাঃ) এর খুনের প্রতিশোধ গ্রহনের দাবী উত্থাপন করেন। হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট তিনি এ দাবী উত্থাপন করেন, যে অপরাধীদেরকে তাঁর হাতে পর্দ করতে হবে। যাতে তিনি নিজে তাদেরকে হত্যা করতে পারেন।[১৬] এসব কিছু ইসলামী যুগের সুশৃঙ্খল সরকারের পরিবর্তে ইসলাম পূর্ব যুগের গোত্রীয় বিশৃঙ্খলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। এ প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীর অধিকার ছিল হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পরিবর্তে হযরত উসমান (রাঃ) এর শরীয়ত সম্মত উত্তরাধিকারীদের। আত্মীয়তার ভিত্তিতে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর দাবী করার অধিকার থাকলেও তা ছিল ব্যক্তিগত ভাবে শাম এর গভর্ণর হিসেবে নয়। হযরত উসমান (রাঃ) এর আত্মীয়তা ছিল আবু সুফিয়ানের পুত্র মুআবিয়ার সাথে। শাম এর গভর্ণরী তাঁর আত্মীয়তার

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তি ছিল না। ব্যক্তিগত মর্যাদায় তিনি খলীফার নিকট ফরিয়াদী হিসেবে যেতে পারতেন দাবী করতে পারতেন অপরাধীদের গ্রেফতার করার এবং তাদের বিরুদ্ধে মামালা পরিচালনার কিন্তু যে খলীফার হাতে যথারীতি আইনানুগ উপায়ে বায়আত সম্পন্ন হয়েছে। একমাত্র তাঁর প্রশাসনাধীন প্রদেশ ছাড়া অবশিষ্ট গোটা দেশ যাঁর খেলাফত মেনে নিয়েছে তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করার-গভর্ণর হিসাব তাঁর কোন অধিকারই ছিলনা।[১৭] অধিকার ছিলনা নিজের প্রশাসনাধীন অঞ্চলের সামরিক শক্তিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার। অপর পক্ষে জাহেলী যুগের পন্থায় এ দাবী করার অধিকারও তাঁর ছিলনা যে, হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে আদালতের কার্যক্রম ছাড়াই কেসাসের দাবীদারদের হাতে সোপর্দ করা হোক যাতে তিনি নিজেই তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন।

এ বিষয়ের সঠিক শরীয়াত সম্মত মর্যাদা সম্পর্কে আহকামুল কুরআনের লেখক কারী আবু বকর ইবনুল আরবীর মত বলতে পারি হযরত উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের পর জনগনকে নেতা শুন্য ছেড়ে দেয়া সম্ভব ছিলনা তাই হযরত ওমর (রাঃ) শুরায় যাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন- তাঁদের সামনে ইমামাত পেশ করা হয়। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত আলী (রাঃ) যিনি এর সবচেয়ে বেশী হকদার ও যোগ্য ছিলেন তা গ্রহণ করেন যাতে উম্মতকে রক্তপাত এবং নিজেদের মধ্যকার অনৈক্য থেকে রক্ষা করা যায়। সে রক্ষপাত এবং অনৈক্যের ফলে দ্বীন এবং মিল্লাতের অপূরনীয় ক্ষতির আশংকা ছিল। তাঁর হাতে বায়আত করার কবুল করার পর শাম প্রদেশের জন গণ তার বায়আ'ত জন্য শর্ত আরোপ করে যে, প্রথমে হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করে তাদের নিকট থেকে কেসাস গ্রহন করা হোক। হযরত আলী (রাঃ) তাদেরকে বলেন যে আরো বায়আ'তে শামিল হয়ে যাও পরে অধিকার দাবী করো তোমরা অবশ্যি তা পাবে। কিন্তু তারা বলে "আপনি বায়আ'তের অধিকারী নন। কারন আমরা হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যাকারীদেরকে সকাল বিকাল আপনার সঙ্গে দেখছি। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ) এর মত অধিক সত্য ছিল। তার উক্তি ছিল একান্ত সঠিক, কারন তিনি তখন হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যাকারীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহনের চেষ্টা করলে বিভিন্ন গোত্র তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতো। ফলে যুদ্ধের একটি তৃতীয় ফ্রন্ট খুলে যেতো। তাই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সরকার সূদৃঢ় হোক থেকে গোটা দেশে তাঁর বায়আত প্রতিষ্ঠিত হোক এর পর আদালতে যথারীতি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপিত হবে। সত্যও ন্যায়নুযায়ী ফয়সালা করা হবে। যে

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় ফেতনা মাথা চড়া দিয়ে উঠার এবং বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে সে অবস্থায় ইমামের জন্য কেসাস বিলম্বিত করা বৈধ। এ ব্যাপারে ওলামায়ে উম্মাতের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।"

হযরত তালহা ও যুবায়ের (রাঃ) এর ব্যাপারও ছিল অনুরূপ। তারা উভয়ে হযরত আলী (রাঃ) কে খেলাফত থেকে বেদখল করেন নি। তাঁরা তাঁর দ্বীনের ব্যাপারেও আপত্তি জানান নি। অবশ্য তাঁদের মত ছিল সর্ব প্রথম হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যাকারীদেরকে দিয়েই শুরু করা হোক। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) তাঁর মতে অটল ছিলেন এবং তার মতই সঠিক ছিল। কুরআনের আয়াত "যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয় তবে তোমরা আক্রমনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে (হুজরাত -৯)

এ পরিস্থিতিতে হযরত আলী (রাঃ) উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী কাজ করেছেন। যে সব বিদ্রোহী ইমামের উপর নিজেদেরমত জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল,তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এমন দাবী করার অধিকার বিদ্রোহীদের ছিলনা। যারা কেসাসের দাবী করছিল তাদের জন্য সঠিক পন্থা ছিল হযরত আলী (রাঃ) এর কথা মেনে নিয়ে কেসাসের দাবী আদালতে পেশ করে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা। তারা এ পন্থা অবলম্বন করলে হযরত আলী (রাঃ) যদি অপরাধদের নিকট থোকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করতেন তখন তাদের দ্বিধা সংকোচেরও কোন প্রয়োজন হতোনা। সাধারণ মুসলমানেরা নিজেরাই হযরত আলী (রাঃ) কে পদচ্যুত করতো।[১৮]

এ দ্বন্দ্বের এখানেই শেষ নয় বরং এরই পরিনতি হিসেবে খারিজীদের হাতে হযরত আলী (রাঃ) কে শাহাদাত বরন করতে হয়। ইমাম হাসান (রাঃ) কে সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করতে হয় এবং কারবালার ভয়াবহ ঘটনার মধ্য দিয়ে হুসায়সন (রাঃ) কে আহলে বায়েত ও সাথীদের সহ শাহাদত বরন করতে হয়। আর ও ধারা বাহিকতা এখনও থামেনি। এখনও এভাবে যুগে যুগে এরূপ ঘটনার জন্ম হচ্ছে। হয়তোবা দুনিয়ার সর্বশেষ সময় পর্যন্ত এ ধারা চালুই থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্ধৃতি সূচী

---

১ ইস্তিয়াব ১/১১৮-১১৯,২৬৩
২ ইসাবা ১/৩৪৪, আরিনা ২/১৪৩
৩ কুক, ৪৯/৬
৪ মিসু ৩/১৭৬
৫ তাতা, ১১/১৪৪, ওকা ১৬/২০৩
৬ আবেনে পৃ. ৭/১৫৫, ইস্তিয়াব ২/৬০৪
৭ সবু
৮ তাইসা ৭/৪০২, ইস্তিয়াব ১/২৫৩
৯ তাইসা ৫/৬৩, আবেনে ৭/২৫৯
১০ আতা ৩/২৯৬ , আবেনে ৭/১৭২-৭৩
১১ আবেনে ৭/১৬৮
১২ প্রাগুক্ত ৭/১৯৮
১৩ তাইসা ৩/৭১
১৪ আবেনে ৭/১৪৬
১৫ আতা ৩/৪৫০-৫২, আবেনে ৭/২২৫-২৬
১৬ আতা ৪/৩৪, ইআ ৩/১৪৮, আবেনে ৭/২৫৭-৫৮
১৭ আতা ৩/১৩৭-৪১, আবেনে ৭/২২৯
১৮ আকু ৪/১৭০৬-৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীগত বিশ্লেষণ

৪.১ খিলাফতের উত্তরাধিকারী (ওয়ালী আহাদ) নির্বাচন

অন্যান্য পুরাতন কাহিনীর মত কারবালার কাহিনীও বহু পুরাতন কল্পিত ঘটনা যোগে বিকৃত হয়েছে। সব প্রকার ভাবপ্রবনতা পরিহার করত কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনাকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পর্যালোচনা করলে এই ঘটনার কিছু নির্ভূল ও নির্ভরযোগ্য তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কারবালার ঘটনাকে পর্যালোচনা করতে গেলে যে বিষয়গুলো জানা জরুরী হয়ে পড়ে তাহলো এই ঘটনার সাথে জড়িত বিশেষ ব্যক্তিদের আচরণ, তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং এই ঘটনার পূর্বে ও পরে যা ঘটেছিল ধর্মীয় দৃষ্টিতে তা কতটুকু গ্রহণ যোগ্য ছিল? এই বিষয়ে প্রবেশের শুরুতেই চলে আসে ইয়াযীদের খলীফা হওয়ার বিষয়টি।

মুআবিয়া তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে স্বতঃস্ফূর্ত বায়েতের পরিবর্তে উৎকোচ ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে পুত্রের প্রতি আনুগত্য আদায় করে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করেন। ইসলামের খিলাফত প্রতিষ্ঠার সঠিক পন্থা কি তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ইয়াযীদের ক্ষমতা প্রাপ্তির পদ্ধতিটি ইসলামের পদ্ধতির সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ, কেউ কেউ বলেন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তার জীবদ্দশায় ইয়াযীদকে উত্তরাধিকার না করলে তাঁর পরে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হতো, রোম সম্রাট হামলা চালাতো এবং ইসলামী রাষ্ট্রেরই অবসান ঘটতো। একারনে ইয়াযীদকে উত্তরাধিকার করার ফলে যে কুফল দেখা দিয়েছে, তা সে সকল কুফরের তুলনায় কম খারাপ। তাঁদের এ প্রসঙ্গ মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় সত্যিই যদি তাঁর উদ্দেশ্য এই থাকে, সে তাঁর পরে উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে উম্মাতের মধ্যে গৃহযুদ্ধ না ঘটুক, আর এ জন্য তাঁর জীবদ্দশায়ই উত্তরাধিকারের বায়াত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাই তিনি অনুভব করে থাকেন, তবে কি তিনি এ পবিত্র উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পারতেন না? তিনি কি অবশিষ্ট সাহাবী এবং বড় বড় তাবেয়ীদের সমবেত করে তাদেরকে বলতে পারতেন না যে, আমার উত্তরাধিকারের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে আমার জীবদ্দশায়ই বাছাই করে নিন? পদ্ধতি যাই হোক ইয়াযীদ যদিও সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম জগতের একমাত্র অধিপতি হতে পারেননি তথাপি ইয়াযীদের শাসন কর্তৃত্ব ও বাদশাহীতে সন্দেহ করার কোন কারন নেই।

মুসলিম বিদ্বান গণের একজনও ইয়াযীদকে হযরত আবুবকর, উমর, উসমান আলীর ন্যায় আদর্শ খলীফা বলে স্বীকার করেননি। হাদীছের গ্রন্থ সমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে রাসুলুল্লাহর (সঃ) মৃত্যুর পর মাত্র ৩০ বছর খিলাফত নবুয়তের আদর্শ অনুসারে চলতে থাকবে। তারপর খিলাফত রাজতন্ত্রে পরিনত হবে। উল্লেখিত হাদীছ সূত্রে আহলে সুন্নত বিদ্বানগণ ইয়াযীদ আর তারমত উমাইয়া ও আব্বাসীয় বংশের অপরাপর খলীফাদের রাজা, বাদশাহ ও নিছক শাসনকর্তা বলেই মনে করে থাকেন আর এই অর্থেই উমাইয়া ও আব্বাসীয় বংশের রাজাদের তাঁর খলীফা বলেন। নবুওতের আদর্শ মুতাবিক যে খিলাফত তাঁরা উল্লেখিত শাসন কর্তাদের রাজত্বকে যেরূপ খিলাফত বলে মুহূর্তের তরেও স্বীকার করেন না। আহলে সুন্নত বিদ্বানগনের এই ধারনা সে সঠিক ও প্রত্যক্ষভাবে প্রমানিত। সে কথা াস্বীকার করার উপায় নেই। ইয়াযীদ আরব যুগে সত্যই একজন শক্তিমান শাসনকর্তা ছিলেন। স্বীয় পিতার পরলোক গমনের পর সে সিংহাসনে উপবেশন করে। সিরিয়া ইরাক, ইরান ও খুরাসান প্রভৃতি ইসলামী রাজ্য গুলোয় তারই আদেশ বলবৎ থাকে পক্ষান্তরে হযরত হুসায়ন (রাঃ) মুসলিম রাজ্যসমূহের একটি জায়গাতেও তাঁর শাসক কর্তৃত্ব স্থাপন করার আগেই ৬১ হিজরীর আশুয়ার দিনে শাহাদৎ প্রাপ্ত হন।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় বংশের রাজা বাদশাহদের কোন ব্যক্তিকে আহলে সুন্নত বিদ্বানগণেরা খলীফা রূপে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে তিনি স্বীয় যুগে স্বাধীন ও শক্তিশালী নরপতি ছিলেন, তরবারীর অধিকারী ছিলেন, রাজস্ব ও যাকাত আদায় করে হকদারদের মধ্যে বিতরণ করতেন রাজ কর্মচারীদের নিযুক্ত ও পদচ্যুত করতে পারতেন, নিজের আদেশ বলবৎ করার ও মত ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি শরীয়তের দন্ডবিধি প্রয়োগ আর ইসলামের শত্রুদলের সাথে জিহাদ পরিচালনা করতেন। ইয়াযীদকে যারা ইমাম ও খলীফা বলে অভিহিত করে থাকেন, তাদের উদ্দেশ্য উক্ত তাৎপর্যের একটি বর্ণও অধিক নয়। ইয়াযীদ যে বাস্তবিকই এরূপ একজন নরপতি ছিল, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইয়াযীদকে স্বাধীন নরপতি রূপে অস্বীকার করা আবুবকর, ওমর ও উছমানকে মুসলিম রাজ্যের স্বাধীন অধিনায়ক অস্বীকার করা অথবা রোমক সম্রাট কায়সার আর পারস্য সম্রাট কিসরার রাজত্ব অস্বীকার করার মতই।

Dhaka University Institutional Repository

আর ইয়াযীদ, আব্দুল মালিক আর মনসুর আব্বসী প্রভৃতি খলীফারা সাধু ছিলেন না অসাধু? সে সম্পর্কে আহলে সুন্নত আলেমগণের অভিমত সর্বজন বিদিত। তাঁরা উল্লেখিত শাসন কর্তাদের নির্দোষ বা অভ্রান্ত মনে করেন না। তাঁদের সমুদয় কার্যকলাপ সংগত ও ন্যায়ানুমোদিত বলেও স্বীকার করেন না। সকল বিষয়ে তাঁদের আনুগত্যকেও তাঁরা অবশ্য কর্তব্য বলেন না। আহলে সুন্নতরা এ বিশ্বাস অবশ্যই পোষন করে থাকেন যে, ইসলামের ইবাদত ও বিধি নিষেধ প্রতিপালন করার জন্য শাসন কর্তাদের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা তাঁদের পিছনেই জুমা ও ঈদের নামাজ কায়েম করি। তাঁদের পতাকা মূলে দাঁড়িয়েই ইসলামের শত্রুদলের সাথে জিহাদ করে থাকি। ন্যায়ের প্রতিষ্টা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কল্পে তাঁদের সাহায্য নিয়ে থাকি। জাতির আদৌ কোন শাসন কর্তা না থাকলে উল্লেখিত কাজগুলো বানচাল হওয়ার আশংকাই অধিক হবে এমনকি কতক বিষয়ের অস্তিত্বই থাকবেনা।

আহলে সুন্নতগণের পরিগৃহীত উল্লিখিত নীতির দোষ ধরা যেতে পারেনা। কারন সৎকাজ সমাধা করার ব্যপারে সাধু সজ্জনাদের সাথে অসাধুরাও যদি সহযোগ করে তাতে সাধুদের সৎকার্য্যের ক্ষতি সাধিত হয়না। একথাও সত্য যে, ন্যায় পরায়ন শাসনকর্তার নিয়োগ সম্ভাবিত হলে অনাচারী ও বিদআতী ব্যক্তিকে শাসনকর্তা রূপে নির্বাচন করা বিধি নয়, আহলে সুন্নতগণও এ নিয়ম স্বীকার করে থাকেন, কিন্তু শাসন কর্তৃত্বের উভয় দাবীদারই যদি অনাচারী ও বিদআতী হয় তাহলে শরীয়তের নির্দেশ ও দন্ডবিধি আর ইবাদতের প্রতিষ্ঠা কল্পে অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন দাবীদারকেই নির্বাচন করা কর্তব্য হবে। একটি তৃতীয় পন্থাও রয়েছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে একজন অতিসাধু ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু সেনা পতিত্ব করার যোগ্যতা তার নেই পক্ষান্তরে একজন সুযোগ্য সেনাধ্যক্ষও সে স্থানে মওজুদ আছেন, কিন্তু তিনি দুশ্চরিত্র, এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকেই সেনা বাহিনী পরিচালনা করার ভার অর্পন করতে হবে। তার উত্তম কার্যের সহায়তা ও অনুসরন করা হবে, আর তার দুষ্টামি ও অনাচারের সব সময়ই প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে হবে। মোট কথা, জাতির বৃহত্তর কল্যান ও স্বার্থ সব সময় সকল ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হওযা আবশ্যক, কোন কাজে ভালো মন্দ উভয় দিক দেখতে গেলে বিবেচনা করতে হবে উভয় দিকের মধ্যে কার পাল্লা ভারী। মঙ্গলের পরিমাণ অধিকতর হলে তাই হবে গ্রহণীয় আর অমঙ্গলের পাল্লা ভারী পরিলক্ষিত হলে তা বর্জন করাই আবশ্যক হবে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে আল্লাহ কল্যান ও মঙ্গলের সমর্থন ও প্রতিষ্টা আর ক্ষতি ও অমঙ্গলের নিরসন কল্পেই উত্থিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ অত্যাচারী শাসকের সাথে গৃহীত নীতি

ইরাকবাসীদিগকে ইমাম হাসান বস্‌রী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফীর (৪৫-৯৫ হিঃ) বিরুদ্ধে উথান করতে বাধা দিতেন, তিনি বলতেন, দেখ হাজ্জাজ আল্লাহর শাস্তি বিশেষ, তোমরা আল্লাহর শস্তিকে বাহু বলে প্রতিরোধ করোনা আল্লাহর কাছেই উহা বিদুরিত করার জন্য প্রার্থনা আর কান্না কাটি কর। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন "আমরা শাস্তি সহকারে ওদের ধৃত করেছিলাম, কিন্তু তবুও তারা তাদের প্রভূর কাছে প্রণত হলো না। আর কান্না কাটিও করল না"।[১] তল্লক বিন হাবীব বলতেন, তাকওয়ার ঢাল দিয়ে ফিৎনার প্রতিরোধ কর, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো "তাকওয়ার তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান নিয়ে তাঁরই করুনার আশাধারী হয়ে তাঁর আদেশের অনুগামী হয়ে চলা আর আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞানের বর্তিকা নিয়ে তাঁর দন্ডের ভয় হৃদয়ে পোষন করে পাপাচরণ পরিহার করা"। (তল্লকের এই উক্তি ইমাম আহমদ ও ইবনে আবিদ দুনিয়া উধৃত করেছেন)। এই ভাবে মুসলিম সমাজের শ্রেষ্ট সুধীগন মুসলিম শাসন কর্তাদের সাথে বিদ্রোহ ও লড়াই করতে সর্বদা নিষেধ করতেন, আব্দুল্লাহ বিনে উমর, সাইদ বিন নুসাইর ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পুত্র যয়নুল আবেদীন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাহাবা ও তাবেয়ীগণ হাররার যুদ্ধে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে উত্থান করতে লোকদের নিষেধ করে ছিলেন। হাসান বস্‌রী ও মুজাহিদ প্রভৃতি তাবেয়ী আলেমগণ ইবনুল আশআসের (-মৃত ৩৮৫ হিঃ) হাঙ্গামায় নির্লিপ্ত থাকাই আহলে সুন্নত আলেম গণের সমবেত সিদ্ধান্ত, কারণ রসুলুল্লাহর (সঃ) প্রমানিত হাদীছে এইরূপ নির্দেশই রয়েছে। তাঁরা তাঁদের আকীদা সম্পর্কিত পুস্তক গুলিতেও এই অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। শাসকদের অত্যাচারে ধৈর্যাবলম্বন করা আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হওয়াই হচ্ছে আহলে সুন্নত আলেম গনের রীতি। অবশ্য এও অনস্বীকার্য যে বহু ধর্ম পরায়ন ও বিদ্বান ব্যক্তি এরূপ হাঙ্গামায় যোগদান ও সংগ্রাম করেছেন।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) ইরাকের অধিবাসীদের বহু অনুরোধ লিপি প্রাপ্ত হয়ে যখন ইরাক যাত্রা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন উমর আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আবুবকর বিন আঃ রহমান বিন হারিস বিন হিশাম প্রভৃতি মান্যগণ্য বিদ্বান গণ হযরত হুসায়ন (রাঃ) বহির্গত না হওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করেছিলেন, তাঁরা বুঝতে পেরে ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই নিহত হবেন, এমনকি কোন কোন ব্যক্তি হযরত হুসায়ন (রাঃ) এই বলে বিদায় দিয়েছিলেন, "হে শহীদ আমরা আপনাকে আল্লাহর হস্তে সমর্পন করছি"। কেহ কেহ একথাও বলেছিলেন "বেআদবী না হলে আমরা আপনাকে

Dhaka University Institutional Repository

আটক করতাম আর বাধা দিতাম"। যাঁরা ইমামকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ইরাকের যাত্রী হতে নিষেধ করেছিলেন হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ) এবং জাতির মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাঁদের অনুরোধ ও কাকুতি মিনতি গ্রাহ্য করেন নি। মানুষের অভিমত কখনো সঠিক হয়ে থাকে আবার কখনো কখনো বেঠিকও হয়ে পড়ে। পরবর্তী ঘটনার সাহায্যে প্রমানিত হয় যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) যাঁরা মদীনা ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন তাঁদের অভিমতই সঠিক ছিল। হযরত হুসায়ন (রাঃ) উত্থানে দ্বীনি ও দুনিয়াবী কোন স্বার্থই উদ্ধার হলোনা বরং এই সুযোগে অত্যাচারী যালিমরা রাসুলুল্লাহর (সঃ) এর পৌত্রকে দুর্বল পেয়ে তাঁকে মযলুম ভাবে শহীদ করলো। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর উত্থান ও শাাহাদাতের দরুন যে সব গোলযোগ ও অশান্তির উদ্ভব ঘটেছিল, তিনি আপন নগরীতে বসে থাকলে তার কিছুই ঘটতে পারত না। তিনি মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা আর অমঙ্গলকে বিদুরিত করতে ইচ্ছুক হয়ে ছিলেন তাঁর সে ইচ্ছা ফলবতী হওয়া দুরে থাক তাঁর উত্থান ও শাহাদতের সঙ্গে অমঙ্গলই বেড়ে গেল অমঙ্গলই প্রতিষ্ঠা লাভ করলো আর এক বিরাট অকল্যানের দুয়ার স্থায়ী ভাবে খুলে গেল। হযরত উসমান, (রাঃ) নিহত হওযায় যেরূপ ফিতনা ও ফাসাদ বিস্তার লাভ করেছিল, হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিহত হওয়ার দরুনেও সেইরূপ ফিতনার বন্যায় ইসলাম জগত প্লাবিত হ'ল।

এতে করে প্রমানিত হ'ল যে, শাসন কর্তাদের যুলমে সবর করা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হওয়া সম্পর্কে রাসুলুল্লাহর (সঃ) নির্দেশ জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যানের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক। যাঁরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে রাসুলুল্লাহর (সঃ) উপরি উক্ত আদেশের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের আচরনে লাভের পরিবর্তে জাতিকে ক্ষতিগ্রস্থই হতে হয়েছে বেশী। আর এজন্যই রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাসানের প্রশংসা করে বলে ছিলেন "আমার এই পুত্র জনগণের অধিনায়ক। একে দিয়ে আল্লাহ মুসলিম সমাজের দুই বিরাট বাহিনীর মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবেন"। যারা দাঙ্গা হাঙ্গামায় উত্থান করেছেন অথবা শাসন কর্তাদের সাথে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছেন বা তাঁদের আনুগত্য অস্বীকার করেছেন বা মুসলিম সংহতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, তাঁদের কারুরই (রাসুলুল্লাহ) প্রশংসা করেননি। রাসুলুল্লাহর (সঃ) এই হাদীছের সাহায্যে প্রমানিত হয় যে, দুইটি বিবাদমান দলে সন্ধি করে দেওয়াই আল্লাহও তদীয় রসুলের (সঃ) অধিকতর প্রিয়। আমীর মুআবীয়ার পক্ষে খিলাফতের দাবী প্রত্যাহার করে হযরত হাসান (রাঃ) মুসলমানদের রক্ত পাত বন্ধ করে ছিলেন, তাঁর ফযীলত ও গৌরবের পক্ষে এই ব্যাপারটিই যথেষ্ট। গৃহযুদ্ধ ওয়াজিববা মুস্তাহাব

Dhaka University Institutional Repository

হলে রাসুলুল্লাহ (সঃ) উহা ত্যাগ করার কারনে কিছুতেইপ্রশংসা করতেন না। মদীনায় হাররার দিবসে বা মক্কায় ইবনুয যুবায়েরের অবরোধ কালে অথবা ইবনুল আশ আস ও ইবনুল মুহাল্লবের দাঙ্গা হাঙ্গামায় যা ঘটেছিল, যে সমস্তের প্রশংসা দুরে থাক জমল ও সিফফিনের লড়াইরও রসুলুল্লাহ (সঃ) কোন ভবিষ্যতবানী রুপে প্রশংসা করেননি। কিন্তু নহরওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের সাথে হযরত আলীর লড়াইয়ের প্রশংসা রাসুলুল্লাহ (সঃ) বাচনিক পৌনঃ পুনিক ভাবে উল্লিখিত রয়েছে। জমল ও সিফফীনে যোগদান কারী বহু নিষ্ঠাবন বিদ্বান এর জন্য অনুতাপ করেছিলেন ও যুদ্ধ পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

অবশ্য উল্লিখিত দলিলের বিপক্ষেও দলিল স্বরূপ বলা যায় যে শাসন কর্তাদের বিরুদ্ধে উত্থান করা যেরূপ অনেক হাদীছে নিষিদ্ধ রয়েছে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে সেইরূপ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কল্পে অগ্রসর হতেও বারম্বার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করাকে সুরা আল ইমরানে মুসলিম সমাজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলে উল্লিখিত হয়েছে "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ যারা আহবান জানাবে সৎকাজের প্রতি নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং বারন করবে অন্যায় কাজ থেকে আর তারাই হলো সফলকাম"।[২] ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থে ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর আদেশ বর্ণনা করেছেন "আমার উম্মতের পূর্ববর্তী গণের যুগ হতে কোন নবীকে আল্লাহ উত্থিত করেছেন, তাঁর উম্মতের সাহায্যকারী ও সহচরের দলও উত্থিত করেছেন। তাঁরা তাঁর আদেশের অনুসারী ছিলেন আর তাঁর নির্দেশ মত জনগনকে পরিচালিত করতেন। অতঃপর এমনতর লোক তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা যা করেনা তাই বলে বেড়ায় আর যার আদেশ নেই তাই করে থাকে। যারা তরবারীর সাহায্যে তাদের সাথে সংগ্রাম করবে তারা মুমিন, আর যারা মুখ দিয়ে তাদের আচরনের প্রতিবাদ করবে তারাও মুমিন আর যারা অন্ততঃ মনে প্রাণে তাদের আচরনে অসন্তুষ্ট থাকবে, তারাও মুমিন। কিন্তু এরপর ঈমান সরিষার দানার পরিমানও থাকবে না।[৩] সুননের গ্রন্থকারগণ আবুবকর সিদ্দীকের বাচনিক রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যালিমের যুলমের প্রতিরোধ কল্পে যখন মানুষেরা তার উভয় হাত চেপে ধরবেনা, তখন আল্লাহ তাদের সকলকেই ব্যাপক শাস্তি প্রদান করবেন।[৪] ফল কথা "আমর বিল মারূফ ওয়ান্নাহী আনিল মনকার" ইসলামের অপরিহার্য আদেশ সমূহের অন্যতম, দুষ্ঠ ও অনাচারী শাসনকর্তাগণ যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের মূলনীতি সমূহের মর্যদা অক্ষুন্ন রাখবে অথবা তাদের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

উত্থান করায় জাতির বৃহত্তর ক্ষতির আশংকা পরিদৃষ্ট হবে শুধু ততক্ষণ পর্যন্ত দুষ্ঠ শাসকের বিরুদ্ধে উত্থান করা হাদীসে নিষিদ্ধ হয়েছে। ইয়াযীদ ও তার পরবর্তী সম্রাটদের শাসন যে, ইসলামী গণতন্ত্র বিরোধী কিস্‌রা ও কায়সারদের প্রবর্তিত রাজতন্ত্র মাত্র, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই আর এর যে, মারাত্মক কুফল হাজার বছরের ও অধিককাল ধরে জগত ভুগে আসছে তা সর্বজন বিদিত। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এরই প্রতীকার মানসে উত্থান করেছিরেন, তখনও ইয়াযীদের খিলাফত ও বায়আত বলবৎ হয়নি। ইরাকের শিয়ারা যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে, "এরূপ ইলমে গায়েব" তাঁর ছিলনা আর প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার পর হযরত হুসায়ন (রাঃ) ইয়াযীদের কাছে যেতেও সম্মতি দিয়েছিলেন কিন্তু অত্যাচারী ফাসেকদের ঘৃন্য দলপতি হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাদের হাতেই দীক্ষিত করার স্পর্ধা জানিয়েছিল। হযরত হুসায়ন (রাঃ) যালেমদের স্পধার জওয়াবে শাহাদত বরণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী ও অমর হয়েছেন।[৫]

রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাসানের যে কার্যের প্রশংসা করেছিলেন, ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল পর তার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ (সঃ) পরলোক গমনের সময় হযরত হাসান মাত্র ৯ বৎসর বয়স্ক বালক দিলেন। হযরত আলী ৪০ হিজরীর রামাযানে শহীদ হন। আর ৪১ হিজরীতে আমীর মুয়াবীয়ার সাথে হযরত হাসানের সন্ধি স্থাপিত হয়।

এ স্থলে একথাও উল্লেখ করা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাসান ও উসামা বিন যায়েদকে কে এক সঙ্গে স্বীয় ক্রোড়ে ধারন করে প্রার্থনা করতেন, "হে আল্লাহ, আমি এদের দুজনকে ভালোবাসী, তুমিও এদের ভালো বেস।"[৬] চমৎকার ব্যাপার হচ্ছে এদের দুজনকে রাসুলুল্লাহ (সঃ) যেমন স্বীয় অনুরাগে তুল্যভাবে সঙ্গী করতেন, এরা দুজনও তেমনি ভাবে উত্তর কালে মুসলমানদের সমূদয় গৃহ যুদ্ধকে সমান ভাবেই ঘৃণা করতেন আর এড়িয়ে চলতেন। সিফফীনের লড়াইয়ে হযরত উসামা আপন গৃহে বসে ছিলেন, হযরত আলী বা আমীর মুআবিয়া কারুরই দলে তিনি যোগদান করেন নি। (উসামা বিন যায়েদ বিন হারিসা ছিলেন- রাসুলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক প্রতিপালিত দাস ও পালক পুত্র প্রথম মুসলিম চতুষ্টয়ের অন্যতম হযরত যায়েদের সন্তান। হিজরতের ৭ বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করে ৫৪ হিজরীতে আমীর মুআবিয়ার শাসনকালের শেষভাগে মদীনার অন্তঃপাতি জরফ নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিশ বৎসর পূর্ণ হতে না হতে রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে সেনাপতি পদে

Dhaka University Institutional Repository

অভিষিক্ত করেন। ইবনে আসাকির লিখেছেন, তাঁর নেতৃত্বে চালিত বাহিনীতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক যোগদান করেছিলেন।[৭]

হযরত হাসান সব সময় স্বীয় পিতা হযরত আলী আর ভ্রাতা হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন আর যখন স্বয়ং ক্ষমতার অধিকারী হলেন তখন লড়াই ত্যাগ করে উভয় কলহমান দলে তিনি সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আলী ও একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চাইতে যুদ্ধ শেষ করে ফেলাই অধিকতর মঙ্গলজনক। হযরত হুসায়ন (রাঃ)ও সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার পর কারবালা প্রান্তরে যুদ্ধের সংকল্প ত্যাগ করেছিলেন। তিনি বারংবার মদীনায় প্রত্যাবর্তন বা সীমান্তের জিহাদে যোগদান অথবা সরাসরি ইয়াযীদের কাছে গমন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যালিমরা তাঁর একটি অনুরোধেও কর্ণপাত করেনি, বরং তার তাঁকে জীবন্ত কয়েদ করতে চেয়েছিল হযরত হুসায়নয় (রাঃ) জীবিত অবস্থায় কয়েদ হতে রাজী হননি, বরং স্বীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে মযলুম অবআয় শাহাদত বরণ করতে হয়েছিল।

কোন কোন ব্যক্তি বলে থাকেন যে, যুদ্ধে সাহায্য কারীদের অভাব ঘটাতেই হযরত আলীও হযরত হুসায়ন (রাঃ) যুদ্ধ ক্ষান্ত করেছিলেন। একথা মেনে নিলে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে আর মুসলমানদের ঘরোয়া লড়াইতে অস্ত্রোত্তোলন করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠে, অস্ত্রোত্তোলন কারীরা সত্যের প্রতিষ্ঠা আর অন্যায়ের প্রতিরোধ কল্পে যুদ্ধে লিপ্ত হলেও তাতে করে মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকেনা যেমন হাররা ও দয়রে জমাজমে ইয়াযীদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে কতক মুসলিম উত্থান করেছিলেন, যদি অধিকতর অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ না করলে সে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা সম্ভবপর না হয়, তা হলে সে রূপ ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই অন্যায় হবে। যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার যে পরিমান মঙ্গল নিহিত রয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি এরূপ অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় যার অমঙ্গল পার্থিত মঙ্গলের তুলনায় অধিকতর ক্ষতিকারক, তাহলে স্বয়ং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই অন্যায় হয়ে যাবে। "সত্য প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের নিরসনের" উল্লিখিত নীতিকে অবহেলা করার ফলেই খারেজীরা পৃথিবীর সমূদয় মুসলমানের রক্তকে হালাল বলে বিশ্বাস করে থাকে। এমনকি তারা হযরত আলীকেও দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। এই

Dhaka University Institutional Repository

ভাব নিয়েই মুতাযেলী, যায়েদী এবং আহলে সুন্নত গণের কতক বিদ্বান অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করেছিলেন।

ফল কথা ইয়াযীদ বিন মুআবিয়ার অবস্থাও সাধারন মুসলিম রাজা বাদশাহদের মতই তার ব্যাপারের কোন অভিনবত্ব নেই। যারা আল্লাহর আনুগত্য অর্থাৎ নামায হজ্জ জিহাদ শরীআতের দন্ড বিধির প্রতিষ্ঠা আর আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার ইত্যাদি বিষয়ে এই সকল রাজা বাদশাহদের সমর্থন করবে তারা তাদের এই নেকী আর আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের জন্য পুরস্কৃত হবে। হযরত আবুদল্লাহ বিন উমর প্রভৃতি সাহাবীগণ এই নিয়মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু যারা রাজা বাদশাহদের অসদাচরন সমর্থন আর তাদের যুলুম ও অবিচারের পক্ষ পতিত্ব করবে তারা নিশ্চয়ই পাতকী হবে। এরূপ ধরনের লোকেরা নিন্দার্হ ও দন্ডনীয়। এই নীতি অনুসরন করেই রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সহচরবৃন্দ ইয়াযীদের অধীনতায় জিহাদের জন্য বহির্গত হতেন। আমীর মুয়াবীয়ার জীবদ্দশায় যখন ইয়াযীদ কনষ্টান্টিনোপল আক্রমন করেন তখন তার বাহিনীতে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর মত মাননীয় সাহাবীও যোগ দিয়েছিলেন। ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে চালিত এই বাহিনীই হচ্ছে কনষ্টান্টিনোপল আক্রমন কারী প্রথম মুসলিম বাহিনী। সহীহ বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত ইবনে উমরের প্রমুখাৎ রাসুলুল্লাহ (সঃ) এই উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, কুসতুনতুনিয়ায় (কনষ্টান্টিনোপল) সর্ব প্রথম যে, মুসলিম বাহিনী জিহাদের জন্য অগ্রসর হবে তারা সকলেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভ করবে। ইয়াযীদের শাসন কালে যেমন হযরত হুসায়ন (রাঃ) হত্যাকান্ড হাররার লড়াই আর মক্কায় হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইয়ের অবরোধ প্রভৃতি ব্যাপার ঘটেছিল। তেমনি মারওয়ান বিন হাকামের সময়ে মর্জেয়াহিতের হাঙ্গামা হযরত নুমান বিন বশীরের সাথে খলীফা আঃ মালিকের শাসন কালে মাসআব ও তদীয় ভ্রাতা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের উত্থান এবং কাবা শরীফের অবরোধ ঘটে। হিশামের সময় হযরত যায়েদ বিন আলীর বিদ্রোহ, মারওয়ান বিন মুহাম্মাদের শাসন কালে আবু মুসলিম খুরাসানীর উত্থান, মনসূর আব্বাসীর খিলাফকালে মদীনায় মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আর বসরায় তদীয় ভ্রাতা ইব্রাহীম বিন আবদুল্লাহর বিদ্রোহ ইত্যাদি সংঘটিত হয়।

স্মরণ রাখতে হবে প্রত্যেক গোলযোগ সম্বন্ধে অবস্থার পার্থক্য লক্ষ্য করে অভিমত প্রকাশ করা উচিৎ। যে গোলযোগে যেমন ধরনের লোক যোগ দিয়েছিলেন তদনুসারে সেই গোলযোগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সর্ব প্রথম গোলযোগ ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত হয় উসমানের হত্যা

Dhaka University Institutional Repository

কান্ডের আকারে, আর এই গোলযোগই সবচাইতে বৃহৎ, এ সম্বন্ধেই ইমাম আহ্‌মদ প্রভৃতি মরফু হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে "তিনিটি গোলযোগে যে উদ্ধার পেল, সে রক্ষা পেয়ে গেল, আমার মৃত্যুর গোলযোগ, মযলুম খলীফার অন্যায়ভাবে হত্যাকান্ডের গোলযোগ আর দজ্জালের গোলযোগ উত্তাল তরঙ্গের মত এই ভয়াবহ গোলযোগ। সম্পর্কেই হযরত উমর ফারুক হযরত হুজায়ফাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "সে গোলযোগ কি আমার সম্বন্ধে নয়? হুজায়ফা বলে ছিলেন না, আপনার আর সেই ফিতনার মাঝখানে একটা অবরুদ্ধ দ্বার রয়েছে। উমর জিজ্ঞাসা করলেন দ্বারটি ভেঙ্গে ফেলা হবে না ওটাকে উদঘাটন করা হবে? হুজায়ফা বললেন, ভেঙ্গেই ফেলা হবে। হযরত উমরই জাতির অনাগত গোলযোগের মধ্যবর্তী অবরুদ্ধ দ্বার ছিলেন। হযরত উমরের নিধন প্রাপ্তীর পর হযরত উসমান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, তাঁর খেলাফতের শেষভাগে গোলযোগ ঘনীভূত হয়, শেষ পর্যন্ত তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আর ফিতনার দ্বার চৌপাট হয়ে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য খুলে যায়। এই গোলযোগের ফলেই পরবর্তী কালে জমল ও সিফফীন আর অন্যান্য গোলযোগ সংঘটিত হয়। এই হাঙ্গামার পুরুষদের সাথে অন্যকারুরই তুলনা হয়না। কারণ তাঁরা সমূদয় পরবর্তী লোকের চাইতে উত্তম ছিলেন। এইভাবে হাররা ও ইবনুল আশ আসের গোলযোগে লিপ্ত ব্যক্তিগণ তাবেয়ী ছিলেন, পরবর্তীদের তাদেরও সঙ্গে তুলনা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া সম্বন্ধে দু'টি চরম পন্থী দল

ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া সম্বন্ধে দু'টি চরমপন্থী দল আছে। কেউ তাকে খলীফায়ে রাশেদের আসনে, সাহাবা, এমন কি নবীদের আসনে সমাসীন করেছে; এ অভিমত একদম বাতিল। আর একদলের ধারনা যে, প্রকাশ্যে ইসলামের দাবীদার হলেও ইয়াযীদ অন্তরে অন্তরে কাফের ও মুনাফিক বই কিছুই নয়। বদর ও খন্দকের যুদ্ধে তার যে সব আত্মীয় বনি হাশিম আর মদীনার আনসারদের হাতে নিহত হয়েছিল তাদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যেই সে ইচ্ছা করে হযরত হুসায়ন (রাঃ) শহীদ করেছিল আর মদীনায় ব্যাপক হত্যাকান্ড চালিয়ে ছিল। তারা বলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাতের পর ইয়াযীদ এ কবিতা পাঠ করেছিল।

কবিতার অর্থ ঃ-

উটের সেই সওয়ারী আর মুন্ডুগুলো
যখন জিরোন পাহাড়ের উচ্চতার প্রকাশ পেল
তখন কাক কা-কা-কা করে উঠলো, আমি বল্লুম
তুই বিলাপ করিস, কিনা করিস
আমি কিন্তু নবীর কাছ থেকে আমার পাওনা শোধ করে নিয়েছি।

কিংবা সে বলেছিলঃ-

বদরের নিহত আমার পূর্ব পুরুষেরা যদি দেখতেন
বল্লমের আঘাতে খাযরাজদের কান্নাকাটির রোল
আমরা ওদের প্রধানদের শ্রেষ্ট নেতাকে হত্যা করেছি
আর এই ভাবে বদরের শোধ তুলেছি।

এসব একদম ঝুট আর অপবাদ মাত্র বুদ্ধিমান মাত্রই জানেন এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন। ইয়াযীদ মুসলমান সেনাদের অন্যতম আর রাজতন্ত্রী খলীফাদের একজন ছিলেন। আর হযরত হুসায়ন (রাঃ) অন্যান্য সাধু সজ্জন ব্যক্তি যেভাবে যুলুম ও স্বৈরাচারের হস্তে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছিলেন তিনিও তেমনি মযলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) হত্যাকান্ড আল্লাহও তদীয় রাসুলের অবধ্যতা ও পাপ। যারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) হত্যা করেছে অথবা ঐ হৃদয় বিদায়ক দুঘটনায় খুশী হয়েছে তারা সকলেই পাপী আর আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ ইসলামের দৃষ্টিতে বিপদে ধৈর্য্যধারণ

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যাকান্ড জাতির জন্য মস্তবড় বিপদ ও দুঃখ বিপদের কারন হলেও স্বয়ং হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর জন্য কোনই দুঃখ ও বিপদের কারণ নয়। পক্ষান্তরে তাঁর পক্ষে শাহাদাত, গৌরব ও সমৃদ্ধির কারন হয়েছে। তিনি আর তাঁর অগ্রজ আল্লাহর কাছ থেকে যে বিপুল সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন, কঠোর পরীক্ষা ও বিপদ বরন না করে তা লাভ করার উপায় ছিলনা। রাসূলুল্লাহর এই দুই দৌহিত্র ইসলামের ক্রোড়ে আদরে শান্তিতে ও ইযরতের সাথে প্রতিপারিত হয়েছিলেন, যে সব ঝড় ঝঞ্ঝার রুদ্র প্রবাহে তাঁদের পরিবার বর্গ সাঁতার কাটতে বাধ্য হয়েছিলেন, যে সব তাঁদের কিছুই স্পর্শ করেনি তাই সৌভাগ্যবানদের মনযিল শহীদদের অমর জীবন লাভ করার জন্য একজনকে মতান্তরে বিষপান করে আর অপর জনকে নিহত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলে চলবেনা যে, বণী ইসরাইলরা যে সব নবীকে হত্যা করেছিল হযরত হুসায়ন (রাঃ) হত্যা করার দুঃখ ও পাপ তার চাইতে বড় নয়। স্বয়ং হযরত আলীর হত্যাকান্ড ও হোসাইনের কতল অপেক্ষা গুরুতর পাপ। হযরত উসমানের হত্যা কান্ডও তাঁর হত্যা অপেক্ষা অধিকতর মমন্তদ এবং জাতির জন্য বিপর্যয় মূলক। এ অবস্থায় ব্যাপার যতই অসহনীয় হোক মুসিবতে সবর অবলম্বন ও আল্লাহকে স্মরন করাই হচ্ছে মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য, যাতে করে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

বিপদে ধৈয্য ধারনই কল্যান করঃ

আল্লাহ আদেশ করেছেন, ধৈর্যশীলদের আপনি সুসংবাদ দান করুন "দুঃখ ও বিপদ আঘাত হানলে যারা বলে থাকে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" আমরা সকলেই আল্লাহর জন্য আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।[৮] মুসনদে আহমদ ও সুননে ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে হুসায়ন (রাঃ) এর কন্যা ফাতিমা স্বীয় পিতার বাচনিক রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যে মুসলমান তার পুরাতন দুঃখকে নতুন ভাবে স্মরণ করে নেয়, আর আল্লাহর জন্য ধৈর্যাবলম্বন করার উদ্দেশ্যে সেই দুঃখের আলোচনা করে, তাহলে বিপন্ন হওয়ার দিনে ধৈর্যাবলম্বন করার জন সে যতটা সওয়াব লাভ করেছিল, পুরাতন বিপদকে স্মরণ করে ধৈর্যাবলম্বন করার দরুন সেই পরিমান ছওয়াবই সে প্রাপ্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ফাতিমা কারবালার তাঁর পিতার ভয়াবহ হত্যাকান্ড স্বয়ং দর্শন করেছিলেন, সুতরাং তাঁর ও তদীয় পিতা কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীছটি বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। মুসলমানদের পক্ষে হযরত হুসায়ন (রাঃ) পুরাতন মর্মন্তদ ঘটনাকে স্মরণ করে সবরের উদ্দেশ্যে আলোচনা করা শরীয়ত সঙ্গত হলেও যে সব কাজ আল্লাহ ও রাসূলের অনভিপ্রেত, যেমন মুখ আর বুক চাপড়ানো কাপড় ছিড়ে ফেলা আর জাহেলী যুগের সুর ধরে কান্না কাটি করা ইত্যাদি সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন "যারা মুখ আর বুক চাপড়ায় পরিধেয় বসন ছিন্ন করে ফেলে আর ইসলাম পূর্ব যুগের প্রচলিত গীতের সূরে কান্নাকাটি করে তারা মুসলমান নয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সালেকা, হালেকা ও শাক্কাদের থেকে নিজের নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করেছেন। মুসীবতের সময়ে যে নারী তার কণ্ঠস্বর উচ্চ করে সে হলো 'সালেকা' আর দুঃখের অতিশয্যে যে নারী তার কেশদাম মুন্ডিত করে সে হলো 'হালেকা' আর শোকাকুল হয়ে যে বস্ত্র ছিন্ন করে সে নারী 'শাক্কা' বলে কথিত হয়ে থাকে।

সহীহ বুখারীতে রাসূলুল্লাহর (সঃ) উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে নারী পারিশ্রমিক নিয়ে কান্নাকাটি করে বেড়ায়, তওবা করার পূর্বে তার মৃত্যু ঘটলে কিয়ামতে তাকে আলকাতরা সিক্ত চটের জামা পড়ানো হবে। এই শ্রেনীর জনৈকা ক্রন্দন ব্যবসায়ী নারীকে হযরত উমরের সম্মুখে উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে মারার জন্য আদেশ দেন। লোকেরা বললো এর মাথার কাপড় সরে গেছে। হযরত উমর বললেন, ওর নারীত্বের কোন মর্যদাই নেই, ও লোককে সবর করতে বাধা দেয অথচ আল্লাহ সবর করারই আদেশ দিয়েছেন ও কাঁদাকাটির জন্য প্ররোচিত করে অথচ আল্লাহ নিষেধ করেছেন, ও জীবিতদের বিপন্ন করে আর মৃত্যুদের জন্য ক্লেশের কারন হয়, ও তার অশ্রু বিক্রয় করে আর অপরের জন্য মায়া কান্না করে, ও তোমাদের মৃত্যুদের জন্য ক্রন্দন করেনা, ও তোমাদের পয়সার জন্য কেঁদে ভাসায়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাত সম্পর্কে নানা মত ও অনাচার

হযরত হুসায়ন (রাঃ) সম্বন্ধেও দুই শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায়ঃ একদল বলে থাকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) হত্যা করা ঠিকই হয়েছে। তিনি মুসলমানদের সংহতিকে বিধ্বস্ত আর সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়ে ছিলেন অথচ বিশুদ্ধ হাদীছে রাসূলুল্লাহর (সঃ) আদেশ প্রমানিত রয়েছে, তিনি বলেছেন তোমাদের শাসন কর্তৃত্ব একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকা কালে কোন ব্যক্তি যদি উত্থান করে আর তোমাদের সংহতি বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত হয়, তাহলে তাকে হত্যা কর। তারা বলেন, হযরত হুসায়ন (রাঃ) যখন উত্থান করেন তখন মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্ব একজনের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি জামাআতের ভিতর বিচ্ছেদ ঘটাতে চেয়ে ছিলেন। তাদেরই দলের কেউ কেউ বলেন, মুসলিম শাসকদের সঙ্গে বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে তিনিই সর্ব প্রথম নিষ্ক্রান্ত হয়েছিরেন।

আর একদল বলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) সত্যিকার ইমাম অর্থাৎ উম্মতের সর্বভৌম অধিনায়ক ছিলেন সুতরাং তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব ছিল। তাঁকে ছাড়া ঈমানের কোন অংশই পূর্ণ হতে পারেনা। তাঁর নিযুক্ত লোক ব্যতীত অন্য কারো পিছনে জুমা ও জামা আত দুরস্ত নয়, তাঁর পক্ষ থেকে অনুমতি না পেলে শত্রুদের সংগে জিহাদ করাও চলবেনা। এই দুই চরম পন্থীদের মাঝখানে রয়েছেন আহলে সুন্নতগণ। উল্লিখিত উভয় দলের কোন দাবীই তাঁরা গ্রাহ্য করেন না। তাঁরা বলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) মযলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন, তিনি জাতির সার্বভৌম সর্বাধিনায়ক ছিলেন না। আর যে হাদীছ তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত করা হয়েছে, তার জন্য সে হাদীছ প্রযোজ্য নয়। কারন যখনই তিনি তাঁর চাচাত ভাই মুসলিম বিন আকীলের পরিনাম জানতে পারলেন তখনই তিনি খেলাফতের দাবী প্রত্যাহার করেছিলেন আর ইয়াযীদের কাছে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার অথবা সীমান্তে প্রেরিত হবার ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছিরেন। কিন্তু বিপক্ষদল তাঁর কোন কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে বিনা শর্তে আত্মসম্পর্ন করার নির্দেশ দিয়েছিল। হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ) এ নির্দেশ প্রতিপালন করতে অস্বীকৃত হন, আর এরূপ অন্যায় নির্দেশ প্রতিপালন করতে শরীয়তের দিক দিয়ে তিনি বাধ্যও ছিলেন না। তিনটি পক্ষই নিজ নিজ বিশ্বাস ও তার স্বপক্ষে দলীল প্রমানাদি উপস্থাপন করলেও দলিল ও যুক্তিকে অকাট্য বলে মেনে নেয়া যায় না। বরং এখানে ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের ভিন্নতাই মূলত দায়ী। মদীনা ত্যাগের পূর্বে হযরত হুসায়ন (রাঃ) বড় বড় সাহাবী ও গন্য মান্য ব্যক্তি বর্গ তাদের ইজতিহাদ মুতাবেক ইরাকের পথে যাত্রা করতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তুহযরত হুসায়ন

Dhaka University Institutional Repository

(রাঃ) নিজ ইজতিহাদে তার পদক্ষেপকেই সঠিক মনে করেছিরেন অথচ তাই বাস্তবে ভুল প্রমানিত হয়। রাসূলুল্লাহ বলেছেন। ইজতিহাদ ভুলও হতে পারে আবার শুদ্ধও হতে পারে। ভুল হলে একগুন সওয়াব আর শুদ্ধ হলে দ্বিগুন ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদতকে কেন্দ্র করে দু'প্রকারের অনাচার ও বিদআত ঃ

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যাকান্ড উপলক্ষ করে মুসলমানদের মধ্যে দু'প্রকারের অনাচার ও বিদআত বিস্তার করার ব্যাপারে শয়তান সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে। একদল আশুরার দিনে অর্থাৎ ১০ই মহররমে কাঁদা কাটি আর মাতম করে থাকে, বুক আর মুখ চাপড়ায়, পানাহার পরিত্যাগ করে, মর্সিয়া পাঠ করে। অনেকে আবার এই টুকু বিদআ'তে সন্তুষ্ট না থেকে সাহাবারে কিরামদের গালিগালাজ করে তাঁদের অভিসম্পাত দেয়। আর এই মহাপাপকে পুন্য বর্ধক কার্য বলে ধারনা করে থাকে। এমনকি মুহাজির ও আনছার সাহাবীগনের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন যারা, আর কারবালার দুর্ঘটনার সাথে যাঁদের দূর বা নিকট কোন সম্পর্কই ছিলনা তারাও এই পাতকী দুর্মুখদের হাত থেকে রেহাই পাননি। শাহাদাত নামা নাম দিয়ে আশুরার দিনে যে বইগুলো পঠিত হয় সে সমস্তের অধিকাংশই মিথ্যা, জাল, প্রক্ষিপ্ত ও কিংবদন্তিতে পরিপূর্ণ। অথচ এই শ্রেণীর বই পুস্তককে সম্বল করেই আজকাল গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ চালানো হয়। প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য যে যোগ্যতা ও শ্রম স্বীকার আবশ্যক মুলতঃ তার অভাই সব চাইতে বেশী আর এর কুফলও অত্যন্ত মারাত্মক। যারা এ সমস্ত বই প্রণয়ন করেছিল, তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল গোলযোগের নিত্য নূতন দ্বারোদ্‌ঘাটন করা আর মুসলিম সমাজে কলহ ও শ্রেণী সংগ্রামের বিষ ছড়ানো। এসব কাজ ওয়াজিব, মুস্তাহাব কিছুই নয়, বরং পরলোক প্রাপ্তিদের জন্য এরূপ কান্নাকাটি আর পুরোনো শোককে পুনর্জীবিত করে মাতম করা শরীআতের হারাম কাজ সমূহের অন্যতম।

এই দলের প্রতিপক্ষ স্বরূপ আর একটি এমন দলও রয়েছে যারা আশুরার দিনে আমোদ, প্রমোদ আর স্ফুর্তির বিদআ'তে লিপ্ত রয়েছে। কুফা শহরে বর্ণিত দু'দলই বিদ্যমান ছিল। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতি সহানুভূতির দাবীদার 'শিয়া'দের নেতা ছিল মুখতার বিনে উবায়দ আসসাকাফী আল কাযযাব। [মুখতার বিন আবিউবায়দ আস্‌সাকাফী (১-৬৭) উমাইয়া রাষ্ট্রের ঘোর বিদ্রোহী কুফার উমারা দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল ইবনে যুবায়েরের দলে ভিড়ে পরাক্রান্ত হয়ে উঠে এবং হযরত আলীর অন্যতম পুত্র মোহাম্মদ বিন হানাফীয়ার পক্ষ সমর্থন করে কারবালার দুর্ঘটনার

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তিকে হত্যা করে। ইবনুল হানাফীয়ার স্থলাভিষিক্ত রূপে তার হতে প্রায় ১৭ হাজার লোক দীক্ষিত হয়, তাদের সমষ্টি ব্যবহারে মুখতার সাময়িক ভাবে কুফা মুসল ও আলজেরিয়া প্রভৃতি দখল করে বসে। ১ বৎসর ৪ মাস ছিল তার শাসন কাল। মুখতার শেষ পর্যন্ত "নবুওত" ও ওয়াহীরও দাবীদার হয়েছিল। উসতায বিন তাহির বাগদাদী তার 'ওয়াহী'র আংশিক উদ্ধৃতি তার আলকাফ নামক গ্রন্থে প্রদান করেছেন। ৬৭ হিজরীতে কুফার মুসআব বিন যুবাইয়ের সেনাদলের হাতে সে নিহত হয়। আর হযরত আলীর প্রতি বিদ্বেষ্টা 'নাসেবী' দলের নায়ক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী। বুখারীতে রাসূলুল্লাহর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, সকীফ গোত্রে মিথ্যাবাদী আর ঘাতক উত্থিত হবে। এই শিয়া মুখতার ছিল সেই মিথ্যাবাদী আর নাসেবী হাজ্জাজ ছিল সেই ঘাতক।

নাসেবীরা কতকগুলো হাদীসও রেওয়ায়েত করবে থাকে, যেমন যে ব্যক্তি ১০ই মহররমে স্বীয় পরিবার বর্গকে ভালো ভালো আহার করায়ে খুশী করে সারা বছর সে প্রাচুর্য্যের ভিতরেই অতিবাহিত করবে"। হরব কিরমানী বলেন,- আমি ইমাম আহমদকে এ হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন, এই হাদীছের অন্যতম রাবী মোহাম্মদ বিন মুনতাশার কুফী এমন লোকের নিকট থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন যিনি অজ্ঞাতনামা ও অপরিচিত। এমনি ধরনের আর একটি হাদীছ আছে যে, আশুরার দিনে যে চোখে সুরমা দিবে, সারা বছর তার চোখ উঠবেনা, যে ব্যক্তি আশুরায় দিনে গোছল করবে সে বছর সে রোগে পড়বেনা ইত্যাদি। এই সব বাতিল হাদীছের অনুসরন করে কোন ব্যক্তি আশুরার দিনে গোছল করা, চোখে সুরমা দেয়া। পরিবার বর্গের জন্য উত্তম খানা পিনা ও বেশ ভুষার ব্যবস্থা করা পূন্য বর্ধক কাজ বলে মনে করে কিন্তু এগুলো সমস্তই বিদআত। হযরত হুসায়ন (রাঃ) প্রতি বিদ্বেষ পরায়নরাই এসব আবিস্কারক করেছে। আর মাতম আর ছাতি পেটা হযরত হুসায়ন (রাঃ) ভক্তিতে যারা সীমালংঘন করেছে, এগুলো তাদেরই আবিস্কার, অথচ সব ধরনের বিদআতকেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) গোমরাহী বলেছেন। ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে কেউ শিয়া বা নাসেবীদের এসব কার্যকলাপের বৈধতা স্বীকার করেন নি। অবশ্য আশুরার রোযাকে অনেকেই মুস্তাহাব বলেছেন। তাও আবার কোন কোন বিশ্বস্ত বিদ্বান শুধু মাত্র এক দিনের জন্য আশুরার রোযাকেও মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন।[৯]

এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যা কান্ড পৃথিবীর বৃহত্তম পাপের অন্যতম। যারা এ কাজ করেছে বা হত্যা ব্যাপারে সাহায্য করেছে অথবা তাঁর নিধনে সন্তুষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে তারা সকলেই এই মহাপাপের দন্ড ভোগ করার যোগ্য কিন্তু এই ঘটনাকে যত বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে তত গুরুত্ব দেয়া উচিৎ নয়, হযরত হুসায়ন (রাঃ) চাইতে যাঁরা শ্রেষ্ট ছিলেন তাদের হত্যা কান্ডের চাইতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যা বেশী গুরুতর নয়। যেমন নবীগণ প্রাথমিক যুগের মুমীনগণ ইয়ামামা উহুদ ও বীরে মাউনার শহীদ গণ হযরত উসমান অথবা হযরত আলী শাহাদাত ইত্যাদি। স্বয়ং হযরত আলীকে তার হত্যাকারীরা কাফির বলতো তাঁর কতলকে পূণ্যবর্ধক মনে করতো কিন্তুহযরত হুসায়ন (রাঃ) কে স্বয়ং হত্যা কারীর একজনও কাফির বলেনাই আর তাদের মধ্যে অনেকে এ কাজে সন্তষ্টও ছিলনা। শুধু দুনিয়ার লোভ ও স্বার্থের খাতিরেই তারা এই মহাপাতকে লিপ্ত হয়েছিল।

অপর পক্ষে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাত সম্বন্ধে যত কথা প্রচলিত আছে তার অধিকাংশই অলীক, যেমন তাঁর শাহাদাতের দিনে আকাশ থেকে রক্ত বৃষ্টি হয়েছিল অথবা সেদিন আকাশ রক্ত রূপ ধারন করেছিল, কারবালার ঘটনার পূর্বে কখনোও আকাশ রক্ত বর্ণ হতনা এ সমস্তই বাজে কথা। কোন মানুষেরই মৃত্যু বা হত্যার জন্য কোন দিন আকাশ থেকে রক্ত বৃষ্টি হয়নি, আর আকাশের লোহিত আভার যোগাযোগ রয়েছে সূর্য কিরণের সঙ্গে। চির দিন থেকেই এরূপ ঘটে আসছে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদতের এই প্রাকৃতিক ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কথাও লোকের মুখে প্রচলিত আছে যে, কারবালা দিবসে প্রত্যেক প্রস্তর খন্ডের নীচে তাজা রক্ত দেখা গিয়েছিল। এ সমস্ত সম্পূর্ণ অর্থহীন বাহুল্য উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইমাম যুহরী লিখেছেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) হত্যা কারীদের একজনও রক্ষা পায়নি। তাদের প্রত্যেককেই দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এরূপ সংঘটিত হওয়া কিছুতেই বিচিত্র নয়, কারন যে অপরাধের দন্ড সবচাইতে দ্রুত অবতীর্ণ হয়ে থাকে বিদ্রোহ ও যুলুমের অপরাধ তন্মধ্যে অগ্রগন্য। আর হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা আর অত্যাচার মূলক আচরন সবচাইতে বড় বিদ্রোহেরই শামিল।

এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে "রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দুই সন্তান হাসান ও হুসায়নের জন্য মুসলমানদের পূনঃ পুনঃ ওসীয়ত করেছেন আর বলে গেছেন যে, এরা দু'জন তোমাদের কাছে আমার আমানত" অধিকন্ত তাদের সম্পর্কেই কোরআনে অবতীর্ণ হয়েছিল যে, 'হে রাসূল (সঃ) আপনি বলুন আমি তোমাদের কাছে স্বজনগণের প্রতি সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান কামনা করিনা। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

এসব কথার উত্তর এই যে, হাসান ও হোসাইনের দাবী সংশয়াতীত ভাবে সত্য। কারণ সহীহ বুখারী শরীফে প্রমানিত যে, রাসুল (সঃ) মক্কা ও মদীনার মাঝখানে অবস্থিত "গদীরে খম" নামক পুকুরের পাড়ে সাহাবাদের সম্বোধন করে বলেছিলেন দেখ আমি তোমাদের কাছে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহর গ্রন্থ, দেখ তোমরা আল্লাহর গ্রন্থ স্মরণ রাখবে আর তাঁকে দৃঢ় ভাবে অনুসরন করে চলবে। অপর বস্তুটি হচ্ছে আমার আহলে বায়েত। দেখ আমি আমার আহলে বায়েত এর জন্য তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। একথা রাসুল (সঃ) দু'বার বললেন।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) রাসূল (সঃ) এর পরিবারের বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। বুখারী শরীফেই বর্ণিত হয়েছে যে, একদা রাসুল (সঃ) স্বীয় পবিত্র কম্বল আলী ফাতিমা হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর উপর প্রসারিত করে প্রার্থনা করেছিরেন হে আল্লাহ এরা আমার আহলে বায়েত "আপনি এদের অপবিত্রতা বিদূরিত করুন আর এদের নিষ্কলুষ করে তুলুন" এ হাদীস গুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় আহলে বায়েতের মর্যাদা কত বেশী।

কিন্তু হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে মুসলিম জাতির হাতে আমানত স্বরুপ সোর্পদ করা সম্বন্ধে রাসুল (সঃ) এর পূনঃ পূনঃ ওসীয়তের কথা কোন নির্ভর যোগ্য হাদীছ গ্রন্থে নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর স্থান সৃষ্ট জীবের নিকট স্বীয় সন্তানদের সোর্পদ করার কথা উচ্চারন করার বহু উর্ধে। সোর্পদ বা আমানতের কি তাৎপর্য হতে পারে? লোকজনের মালপত্র হিফাযত করার মত যদি আমানত রাখার অর্থ হয়, তাহলে মানুষ সম্বন্ধে এ ধরনের হিফাযতের কথা কল্পনাতীত, আর শিশুদের প্রতিপালন ও রক্ষনা বেক্ষনের মত যদি হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) প্রতি পালনের ভার উম্মতের হাতে সমর্পন করাই যদি এই হিফাযতের উদ্দেশ্য, তাহলে একথা অবাস্তব। কারন হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) শৈশবকালে তাঁদের পিতা হযরত আলীর ক্রোড়ে ও তত্ত্বাবধানেই বর্ধিত হয়েছিলেন আর বয়োঃ প্রাপ্তির পর তাঁরা পিতাকে তাঁদের তত্ত্বাবধানের ভার থেকে মুক্তিও দিয়েছিলেন। আর হাসান হুসায়নকে রক্ষা করাই যদি জাতির হাতে সমর্পন করার তাৎপর্য হয়, তাহলে "আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষাকারী আর তিনি সমুদয় দয়াবান অপেক্ষা সর্বাধিক দয়াময় (সূরা ইউসুফ)। উম্মতের পক্ষে তাঁদের বিপদাপদ বিদূরিত করা কি করে সম্ভব হতে পারে? আর যারা তাঁদের বিপদে ফেলতে অগ্রসর হবে তাদের বাধা দেয়া আর যালিমদের সমকক্ষতায় তাঁদের সাহায্য কল্পে দাঁড়ানো যদি

Dhaka University Institutional Repository

একথার অর্থ হয় তা হলে হাসান হযরত হুসায়ন (রাঃ) কেন, তাঁদের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদেরও এরূপ সাহায্য করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব। এক মুসলমানের আর এক মুসলমানের কাছে এরূপ সাহায্য লাভ করার হক রয়েছে তবে অন্যদের তুলনায় হাসান হযরত হুসায়ন (রাঃ) এ হক যে, বৃহত্তর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অপর পক্ষে পূর্বে উল্লেখিত সূরা আশ শুরার ২৩ এর আয়াত "হে রসূল আপর্ন বলুন আমি তোমাদের কাছে স্বজন গণের প্রতি সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান কামনা করি না।" সর্ব সম্মতি ক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তখন হযরত ফাতিমা আলীর সাথে বিবাহিতাই হননি। তাঁদের বিয়ে হয় হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরে আর বাসর শয্যা হয় বদর যুদ্ধের পরে। দ্বিতীয় হিজরীর রমজানের ১৭ তাং এ বদর যুদ্ধ ঘটে। হাফেজ আব্দুল গণী মকদসী লিখেছেন হযরত হাসান তৃতীয় হিজরীর রমজানের মধ্যভাগে আর হযরত হুসায়ন (রাঃ) ৪র্থ হিজরীর ৫ ই শাবানে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা একেবারেই মিথ্যা।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটুকু বলতে হয় যে কারবালার ঘটনা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে যত মত, পথ ও শোকের উদ্ভব হোক না কেন, বর্তমান প্রজন্মের মুসলমানদের দায়িত্ব হলো সব প্রকার ভাব প্রবণতা পরিহার করে কেবলমাত্র ইসলামের দৃষ্টিতে যেটুকু বৈধ ও সমর্থন যোগ্য শুধুমাত্র সেটুকু গ্রহণ করা এবং যা অবৈধ ও সীমাতিক্রম করে সেটুকু বর্জন।

মুসলমানদের জন্য মহররম অত্যন্ত পবিত্র মাস। আল্লাহ্ এ মাসে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। আদি পিতা আদম (আঃ) এ মাসেই সৃষ্ট হয়ে জান্নাতে বাস করার অনুমতি পান। এ মাসেই হযরত নূহ (আঃ) এর জন্ম এবং তিনি মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পান এ মাসেই। ইব্রাবহিম (আঃ) এ মাসেই নমরূদের অগ্নিকুন্ড থেকে পরিত্রণ লাভ করেছিরেন। এ মাসে আয়্যুব নবী দুরারোগ্য মহারোগ থেকে মুক্তি পান। হযরত ইউনুস (আঃ) মৎস্য উদর থেকে রক্ষা পান। মুসা (আঃ) বনি ইসরাইলদের উদ্ধার করেন এবং ফেরাউন সনৈন্যে ডুবে মরে। এসমস্ত কারনে এই মাস মুসলমানদের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে আশুরার দিন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাতের কারনে।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত এই দিন সত্যশ্রয়ী জীবন দর্শন করে আত্মোৎসর্গের পথে অগ্রসর হওয়ার শপথ গ্রহণের দিন। সর্ব প্রকার অন্যায় অত্যাচার পাপাচার ও পংকিলতা ছিন্ন করে পাপমুক্ত ও নির্মল জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার দিন। সুতরাং নিছক মার্সিয়া ও ক্রন্দনের আত্ব চিৎকারে এই দিনের মাহাত্যকে ক্ষুন্ন করা কোন ক্রমেই সমীচীন হতে পারেনা।

আর পারে না বলেই পিয়ারা নবী মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেছেন, দেহের কোন অংশে আঘাত করে শোক প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। এতে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের শোকরগুজারী প্রকাশ পায় না। বরং এর দ্বারা নাশোকরির পথই বহুলাংশে উন্মুক্ত হয়। এই সম্পর্কে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ তোমরা যদি শোকর গুজারী করো তাহলে আমি তোমাদেরকে অধিকতর কল্যান ও নিয়ামত প্রদান করব। আর যদি কুফরি কর তাহলে জেনে রেখ, আমার আজাব খুবই কঠিন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আজাব ও গজবের হাত থেকে রক্ষা করুন।

আল্লাহ্র বিধানে মাসের সংখ্যা ১২, এর মধ্যে প্রথম মাস হল মহররম। কোরআন পাকে এই ১২ টি মাসের মধ্যে ৪ টি মাসকে নিষিদ্ধ মাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনের আয়াতে উল্লেখিত সম্মানিত ও মর্যাদা মাসগুলো হল- জিলকদ, জিলহজ মহররম এবং রজব। এ মাসগুলোকে সম্মানিত মনে করা হত। আরব দেশে এই ৪ মাসে সর্বপ্রকার হত্যাকান্ড বন্ধ থাকত। সবাই এ মাস গুলোকে নিরাপদ মনে করত। সর্বত্র শান্তি বজায় থাকত। মানুষ নিঃসংকোচ চলাফেরা করতে পারত। এমনকি এই মাসে কারও পিতার হত্যাকারীকে পেলেও তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করত না। আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল। এ মাসগুলোকে সম্মান করাও তাজিম করা। এ মাস গুলোর প্রতি সম্মান না করা হারাম। আর এই সম্মনিত মাসেই ইয়াযীদ বাহিনী পৃথিবীর জঘন্যতম অন্যায় কাজটি করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ হযরত হুসায়ন (রাঃ) কর্তৃক বিদ্রোহ প্রসঙ্গ

নাসেরী সম্প্রদায় দাবী করে বলে যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) রাষ্ট্রদ্রোহী খারেজী ছিলেন আর তাকে হত্যা করা ঠিকই হয়েছে, কারন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ- "একজনকে রাষ্ট্রাধিনায়ক মেনে নিয়ে তোমাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার পর যদি কেউ অধিনায়কয়ের দাবী উত্থিত করে এগিয়ে আসে আর এভাবে সে মুসলিম জামাতে বিভেদ সৃষ্টি করতে উদ্যত হয় তাহলে সে যে, কেই হোক না কেন তোমরা তরবারী দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।[১১]

কিন্তু আহলে সুন্নতগণ নাসেবীদের এ অভিমতকে অস্বীকার করেন। এবং গবেষণার দৃষ্টিতে এটাই সঠিক। কারন হযরত হুসায়ন (রাঃ) মযলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। আর যারা তাঁকে হত্যা করেছিল তারা ছিল যালিম সীমালংঘন কারী। রাসূলুল্লাহর যে হাদীস নাসেবীরা উপস্থাপিত করে থাকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতি তা প্রযোজ্য হতে পারে না, কারন হযরত হুসায়ন (রাঃ) মুসলিম সংহতিকে বিপন্ন করেন নি, শাহাদত লাভের পূর্বেই তিনি মদীনায় ফিরে আসতে অথবা সীমান্তের যুদ্ধে প্রেরীত হতে অথবা ইয়াযীদের নিকট গমন করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। তিনি মুসরিম সংহতির অন্তর্ভূক্তই ছিলেন, সংহতি বিরোধী কার্যে তিনি লিপ্ত হননি। তিনি যে কয়টি দাবী উপস্থিত করে ছিলেন, একজন নগন্য মুসলমানও এই দাবীগুলি উপস্থিত করলে তা গ্রাহ্য করে নেয়া অবশ্য কর্তব্য ছিল, অথচ যালিমরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মত ব্যক্তির এই দাবী গুলি প্রত্যাখান করেছিল, যে ক্ষেত্রে হযরত হুসায়ন (রাঃ) ইয়াযীদের কাছেও নীত হতে প্রস্তুত ছিলেন। সে ক্ষেত্রে কয়েদ বা হত্যা করা দূরে থাক তাঁকে আটক করাও তাদের পক্ষে বৈধ দিলনা।[১২]

নাসেবীগণ মুসরিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে যে মতামত পেশ করে স্বয়ং ইমাম মুসলিমই তাদের এ-মতকে ভ্রান্ত এবং এ মত পোষণ কারীদের মুর্খ বলেছেন। ঐতিহাসিক ডোযী, মাহমুদ আববসী প্রমুখগণ হযরত হুসায়ন (রাঃ) রাজদ্রোহী বলে মন্তব্য করেছেন। আল্লামা ইবনে কাছীরের উদ্বৃত ইমাম মুসলিমের রায় দ্বারা তা নাকচ হয়ে যায়। ঐতিহাসিক ডোযী, মাহমুদ আবাসী এবং নাসেবীগণ বলেন- মানুষেরা যখন এক খলীফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ তখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিক্রান্ত হয়েছিলেন। ইমাম মুসলিম এব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারন করে রেখেছেন পূর্ব থেকেই। ইমাম মুসলিম বলেন অজ্ঞতার কারনেই মানুষেরা এরূপ মন্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

করে। আর এ যুদ্ধের প্রেক্ষিতেই ইবনে যিয়াদ বাহিনী তাকে হত্যা করে। অথচ তাদের উচিৎ ছিল, হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর তিনটি প্রস্তাবের যেকোন একটি মেনে নেয়া। উম্মতের সমস্ত লোক এখন তাদেরকে দোষারোপ করেন। মাত্র কয়েকজন কুফাবাসী ছাড়া পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল ইমাম ও মুজতাহিদ গণ ইবনে যিয়াদ বাহিনীর নিন্দা করেন।[১৩]

প্রকাশ্য কুরআনের আয়াতে রয়েছেঃ-

এমন কোন লোকের আনুগত্য করোনা যার অন্তরকে আমাদের (আল্লাহর) স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে তার নফসের কামনা বাসনা এর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং যার কর্ম ধারা সীমাতিক্রম করেছে।-

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ-

"সে সব সীমালংঘনকারীর আনুগত্য করোনা, যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে- সংস্কার সংশোধন করেনা"।[১৪]

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ (ফিকাহ শাস্ত্রবেত্তা) আবুবকর আল জাসসাস (মৃত্যু ৩৭০ হিঃ) ইমামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ- ইমাম বলতে কেবল সে ব্যক্তিকেই বুঝায় যে আনুগত্যের যোগ্য যার অনুকরন অবশ্য করনীয়। সুতরাং এদিক থেকে ইমামতের উন্নত পর্যায়ে রয়েছেন নবী রসূলগন, সত্যাশ্রয়ী খলীফাগণ এবং পরে সত্যানুসারী ওলামা এবং কাযী। এ আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, ফাসেক পাপা- চারী দূরাচারী ব্যক্তির ইমামত বাতেল। সে খলীফা হতে পারেনা। সে যদি নিজেই এ পদ মর্যদায় জেঁকে বসে, তবে তার অনুগমন অনুসরন এবং আনুগত্য জনগনের জন্য বাধ্যতা মূলক নয়।[১৫]

এ প্রসঙ্গে কাযী ইয়ায বলেন, যদি ইমাম কুফর দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা শরীয়তের আহকামকে পরিবর্তন করে কিংবা তার উপর বিদআ'ত প্রাধান্য বিস্তার করে তবে সে আপনা আপনিই মুসলমানদের নেতৃত্বের পদ থেকে অপসারিত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ সে মুসলমানদের অভিভাবক থাকবেনা) তার আনুগত্য শেষ হয়ে যাবে। তখন মুসলমানদের কর্তব্য হবে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করা এবং অন্য একজন ন্যায় পরায়ন ইমাম নির্বাচন করা, যদি তাদের শক্তি থাকে। কোন ছোট

Dhaka University Institutional Repository

জামাআত দ্বারাও যদি এটা সম্ভব হয় তবে এ থেকে নিজেদের পৃথক করে নেয়া তাদের উপর ওয়াজিব।"[১৬]

তাছাড়া আরো বহু হাদীছে পরিস্কার ভাবে বিবৃত হয়েছে যে গায়র শরয়ী বিষয়ের প্রতি বাধ্য করার ফলে আমীরে আনুগত্য বাতিল হয়ে যায়। আর একজন শক্তিমান আদেশ দাতার আনুগত্য বর্জনের পরিনাম যে, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকেই ডেকে আনে যেমন বিদ্রোহের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তা বলাই বাহুল্য। এটা ভিন্ন কথা যে, সামর্থ না থাকার কারনে শরীয়ত এধরনের লোকদের অপারগ বলে ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শরীয়তের মুল বিধান এই যে, গুনাহের কাজে আমীরের আনুগত্য জায়েয নেই। পরিনামে যদি যুদ্ধকেওউস্কে দেয়। ইমাম আল গাজ্জালীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইহ্য়া আল-উলুম-আদ্দীনের ভাষ্যকার আল্লামা যুবায়দী "আমীরের মাঝে ব্যক্তিগত ফিস্ক থাকা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায়েয নয়" এতদসংক্রান্ত রেওয়ায়েত গুলো নকল করার পর সেই সব রেওয়ায়েত গুলো সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন, যাতে পাপ কাজে আমীরের আনুগত্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লামা যুবায়দী বলেন ঃ

-এবং যখন আমীর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরন করতে থাকে, তখন স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নেই। যেমন বুখারী ও সুনানে আরবাআতে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, উভয় অবস্থায় একজন মুসলমানের উপর আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব, যতক্ষন না সে পাপ কাজের প্রতি আদিষ্ট হয়। অনন্তর সে যখন পাপ কাজের প্রতি আদিষ্ট হয়, তখন কোন আনুগত্যও বাধ্যতা নেই।

প্রকাশ থাকে হযরত উবাদা (রাঃ) কর্তক বর্ণিত রাসূল (সঃ) এর বাচনিক হাদিসে ইমামের প্রকাশ্য কুফর প্রকাশ পেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের হুকুম রয়েছে বলে বর্ণিত হাদিসের কুফর শব্দের অর্থ কর্মগত বিষয়কে বুঝানো হয়েছে বিশ্বাসগত কুফর নয়। আর এর উপরই ইজমা হয়েছে। তাই উক্ত হাদিসের আলোকেও ইয়াযীদের বিরুদ্ধে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বিদ্রোহাত্বক ভূমিকার ব্যাপারে কোন আপত্তি করা চলেনা। কারন কাফির না হওয়ার কারনেও ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রাহ করা যায়েজ ছিল। কারন সে এবং তার সাহাবী দল প্রকাশ্য গুনাহে বা খোলা মেলা সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধে জড়িয়ে পড়েছিল। ('ইয়াযিদের চরিত্র কেমন ছিল' অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হয়েছে)। আর উবাদা (রাঃ) এর হাদিসে প্রকাশ্য পাপ কারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে- নিষিদ্ধ নয়।

আবার এক্ষেত্রে যদি প্রকৃত কুফরই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং শুধু পাপ বা গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার কারনে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ না হয়, তথাপিও উক্ত হাদিছের আলোকে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ হওয়ার অবকাশ থেকে যায়। কারন ফিসৃক ও পাপা চারিতার দরুন বিদ্রোহ তখনই নিষিদ্ধ যখন ইমাম সম্পর্কে কোন রূপ বির্তক না থাকে। পক্ষান্তরে বায়আ'ত প্রসঙ্গটি নিজেই যখন বিতর্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো অর্থাৎ কেউ বায়আ'ত করে নিল আর কেউ তাকে ইমাম বলে মেনে নিলনা এবং বায়আ'ত ও করলোনা। যারা বায়আ'ত করলনা তারা আনুগত্যের প্রতি দায়বদ্ধ নয়। এমতাবস্থায় তার সামাজিক পর্যায়ের দুর্নীতি ও অন্যায় সমূহের কারনে তার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ করার অধিকার আছে। শাহ আঃ আজীজ (রঃ) হাদিছটির এই সমর্থনই নির্ণিত করছেন। তিনি প্রমান করেছেন যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কুফাভিমুখে গমন এবং ইয়াযীদের বায়আ'তকে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে এ হাদীছের পরিপন্থি ছিলনা। উপরন্ত হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর এ পদক্ষেপটি ছিল ইয়াযীদের অন্যায় প্রতিরোধ রূপে। তার অপসারণ কল্পে নয়।

মাহমুদ আববাসী ঐতিহাসিক ডোযী প্রমুখ হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে বিদ্রোহী বলে অপবাদ দিয়ে তাঁর শাহাদাতকে অস্বীকার করেন। কিন্তু এ সম্পর্কে পূর্ব সূরী ইমামগনের ভাষ্য কি,তা জানা দরকার। এ প্রসঙ্গে মিশকাত শরীফের ভাষ্যকার মোল্লা আলী কারীর উদ্ধৃতিটিই যথেষ্ট হবে। বর্ণনার বিশুদ্ধতাসহ ইহা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদাও বটে। ভাষ্যকার মহোদয় এ আকীদাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফিক্হ আকবরের ভাষ্য লিখেনঃ

(অনুবাদ) "কোন কোন অর্বাচীন যে বলে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) বিদ্রোহী ছিলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত তা বাতিল বলে গন্য করে। সম্ভবতঃ ওসব খাওয়ারেজদের প্রগলভতা। বস্তুত খাওয়ারেজীয়া সত্য বিচ্যুত"[১৭]

মিশকাত শরীফে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূল (সঃ) সমকালীন বাদশাহর বিরুদ্ধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে নিষেধ করেছেন। বস্তুত হাদীসটি সেই সময়ের সাথে সম্পৃক্ত যখন সেই অত্যাচারী

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহ কোন প্রকার বাদ প্রতিবাদ ও বিরোধীতা ছাড়া পরিপূর্ণ ভাবে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্টা করতে সক্ষম হয়। অথচ এখানকার অবস্থা ভিন্ন। কারণ তখন মক্কা মদীনা ও কুফাবাসীরা (কিছু সংখ্যক উমাইয়া ছাড়া) কেউই ইয়াযীদের কর্তৃত্বের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলনা। আর হযরত হুসায়ন (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণতো বায়আ'তই করেন নি। সুতরাং ইয়াযীদের বিরুদ্ধে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বিদ্রাহ করার কথাটি অপ্রাসঙ্গিক। কারন বিদ্রোহতো তাকেই বলে যখন কাউকে নেতা রা ইমাম হিসেবে মেনে নেওয়ার পর তার বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অথচ এখানে এ কারন অনুপস্থিত। মোট কথা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ইয়াযীদ বিরোধী ভূমিকায় উদ্দেশ্য ছিল ইয়াযীদের অন্যায়কে প্রতিরোধ করা, তাকে উৎকাত করা নয়। কারন কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে বিদ্রোহ করা হলে তা হতো উৎখাতের জন্য। আর এখানে যেহেতু শুরু থেকেই কর্তৃত্বের স্বীকৃতি ছিল না সুতরাং তা প্রতিরোধ মূলক হয়েছে যা নিষিদ্ধ নয়। প্রতিরোধ ও উৎখাতের পার্থক্য সুস্পষ্ট। ফিক্‌হী শামাঈলে ইহা সুবিদিত।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) কেন ইয়াযিদ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন- সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খালদূন বলেনঃ-

-(অর্থ) ইয়াযিদের মধ্যে যখন মিথ্যাচার ও অসাধুতা দেখা দিল, তখন এ ব্যাপারে সাহাবাগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়লেন। এই হেতু কোন কোন সাহাবী তার বিরুদ্ধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওযা এবং বায়আত ভঙ্গ করাকে জরুরী মনে করলেন। যেমন হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র ও তাদের অনুসারীরা। আবার অন্যরা বিশৃংখলা ও অধিক রক্ত পাতের আশংকায় এবং এর প্রতিরোধে নিজেদের অক্ষম মনে করে তা অস্বীকার করলেন। কারন সে সময় ইয়াযীদের শক্তির উৎস ছিল বনি উমায়্যার গোত্রবাদ। তা ছাড়া মুজির গোত্রের সমস্ত বাহিনীই ছিল ইয়াযীদের স্বপক্ষে। তৎকালে সেটি ছিল সর্ব বৃহৎ শক্তি যাদের রুদ্ররোষ হজম করার শক্তি ছিলনা কারোরই। এ কারনে ইয়াযীদের বিরুদ্ধ বাদীরাও তার বিরোধীতা থেকে বিরত থাকলো। তারা তার জন্য হেদাযেতের দোয়া করতে থাকলো এবং এভাবে নিজেদের নিরাপদ রাখলো। এটাই তখনকার সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিমদের অবস্থা। তারা সকলেই ছিলেন মুজাহিদ। কোন জাগতিক স্বার্থ চিন্তা ছিলনা তাঁদের। এজন্যাই এই উভয় শ্রেনীর কেউ কাউকে তিরস্কৃত করতেন না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সত্য

Dhaka University Institutional Repository

এবং তাদের সত্যান্বেষা ছিল সুবিদিত। ইয়াযিদের মিথ্যাচার ও অবাধ্যতা ছিল সর্বজন বিদিত ব্যাপার। আর এ জন্যই হযরত হুসায়ন (রাঃ) তার প্রতি রোধ কল্পে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[১৮]

ধরে নিই, ইয়াযীদের দৃষ্টি ভঙ্গি অনুযায়ী হযরত হুসায়ন (রাঃ) বিদ্রোহীর ভূমিকায় আতীর্ন হয়েছিলেন। যদি তাই হয়েও থাকে, তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর জন্য ইসলামের কি কোন আইন নেই? ফিকাহ্র সকল বড় বড় গ্রন্থেই এ আইন লিপিবদ্ধ রয়েছে। উদাহরন স্বরূপ কেবল হেদায়া এবং তার ভাষ্য ফাতহুল কাদীর এর বিদ্রোহী অধ্যায় দেখা যেতে পারে। এ আইনের দৃষ্টিতে বিচার করলে কারবালা প্রান্তর থেকে শুরু করে কুফা এবং দামেস্কের দরবার পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে।, তা সবই একেবারে হারাম এবং মারাত্মক যুলুম ছিল। দামেস্কের দরবারে ইয়াযীদ যা কিছু করেছে যা বলেছে, সে সম্পর্কে নানা রকম বর্ণনা দেখা যায়। এ সকল বর্ণনা বাদ দিয়ে আমরা যদি শুধু এ কথাকেই নির্ভুল বলে স্বীকার করে নিই যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের মস্তক দেখে তার চোখে পানি গড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন- হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যা না করলেও আমি তোমাদের আনুগত্যে সন্তুষ্ট ছিলাম। ইবনে যিয়াদের উপর আল্লাহর লা'নত। আল্লাহর শফত আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে ক্ষমা করে দিতাম। তিনি আরো বলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) আল্লাহর কসম আমি তোমার প্রতিপক্ষে থাকলে আমি তোমাকে হত্যা করতাম না।[১৯]

এরপরও কার্যত প্রশ্ন থেকে যায়, এ বিরাট যুলুমের জন্য তিনি তাঁর কীর্তিমান গভর্ণরকে কি শাস্তি দিয়েছেন? আল্লামা হাফিস ইবনে কাছির লিখেছেন যে, তিনি তার গভর্ণর ইবনে যিয়াদকে শাস্তি দেন নি, তাকে বরখাস্তও করেন নি, নিন্দা করে কোন চিঠিও লিখেন নি।[২০]

ইসলামী ভদ্রতা তো অনেক দুরের কথা ইয়াযীদের মধ্যে বিন্দু মাত্র মানবিক ভদ্রতাও যদি থাকতো তাহলেও সে চিন্তা করে দেখতো যে, মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রসূল (সঃ) তার গোটা খান্দানের সাথে কি ধরনের সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন। আর তার সরকার তার দৌহিত্রের সাথে কি আচরন করেছে।

এরপর দ্বিতীয় মর্মান্তিক ঘটনাছিল, হাররা যুদ্ধ। ৬৩ হিজরীর শেষের দিকে এবং স্বয়ং ইয়াযীদের জীবনের শেষ অধ্যায়ে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে, মদীনাবাসীরা ইয়াযীদকে ফাসেক ফাজের ও যালেম আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তারা

Dhaka University Institutional Repository

মদীনার গভর্ণরকে শহর থেকে বিতাড়িত করে আবদুল্লাহ ইবনে হানযালাকে তাদের নেতা মনোনীত করে। ইয়াযীদ মুশরেক ইবনে উকবা -কে ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমনের জন্য প্রেরন করেন। তাকে নির্দেশ দেন যে, শহর বাসীকে ৩দিন যাবৎ আনুগত্য গ্রহনের আহবান জানাবে। এরপরও তারা আনুগত্য স্বীকার না করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর বিজয় লাভ করলে ৩ দিন যাবৎ মদীনাকে সৈন্যদের জন্য মোবাহ করে দিবে। অর্থাৎ যা ইচ্ছা তাই করার অনুমাত দিবে। নির্দেশ অনুযায়ী সৈন্যরা মদীনা প্রবেশ করে যুদ্ধে জয় করে অতঃপর ইয়াযিদের নির্দেশে তিন দিন যাবৎ মদনিায় যা ইচ্ছা তা করার জন্য সৈন্যদের নির্দেশ দেযা হয়। এ তিন দিনে শহরের সর্বত্র লুট তরাজ চলে। অধিবাসীদের পাইকারী হারে হত্যা করা হয়। ইমাম যুহরীর বর্ণনা মতে এ যুদ্ধে ৭শ সম্মনিত এবং ১০ হাজার সাধারন লোক নিহত হয়েছেন। সেনাবাহিনী মদীয়ায় ঘরে ঘরে প্রবেশ করে নির্বিচারে স্ত্রীলোকদের শ্লীলতা হানি করে। হাফেয ইবনে কাছীর বলেনঃ

-বলা হয় - এসময় এক হাজার মহিলা ব্যভিচারের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়।[২১]

যদি ধরেও নেয়া হয় যে, মদীনা বাসীদের বিদ্রোহ অবৈধ ছিল, তাহলেও কি কোন বিদ্রোহী মুসলিম জনবসতি এমনকি অমুসলিম বিদ্রোহী এবং যুদ্ধদেহী কাফেরদের সাথেও এহেন আচরন ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ ছিল। তাও আবার অন্য কোন শহরে নয় স্বয়ং মদীনাতুর রসূল (সঃ) এর ব্যাপার। এ শহর সম্পর্কে বুখারী মুসলিম নাসায়ী এবং মুসনদে আহমাদে বিভিন্ন সাহাবা থেকে রাসূরুল্লাহ (সঃ) এর উ উক্তি সমূহ উদ্ধৃত হয়েছেঃ

-যে কোন ব্যক্তি মদীনার সাথে মন্দ কাজের ইচ্ছা করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে শিশার মত গলিয়ে দেবেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেনঃ -"যে ব্যক্তি মদীনা বাসীকে যুলমে আতংক গ্রস্থ করবে আল্লাহ তাকে আতংক গ্রস্থ করবেন, তার উপর আল্লাহ তাঁর ফেরেস্তাকুল এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার কাছ থেকে তার পাপের প্রায়শ্চিত হিসেবে কোন কিছুই গ্রহণ করবেন না।

হাফেয ইবনে কাছীর বলেন, এ সকল হাদীছের ভিত্তিতে একদল আলেম ইয়াযীদের উপর লনিতকে জায়েয মনে করেন। এদের সমর্থনে ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বলের একটি উক্তিও পাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

যায়। কিন্তু এর ফলে তার পিতা বা অন্য কোন সাহাবীর উপর লানতের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার আশংকায় অপর একটি দল তা করতে নিষেধ করেন।[২২]

একবার হযরত হাসান বসরীকে বিদ্রুপ করে বলা হয় আপনি তো বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোন আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেননা, তাহলে আপনি কি সিরিয়াবাসীদের অর্থাৎ উমাইয়াদের উপর সন্তুষ্ট? জবাবে তিনি বলেনঃ সিরিয়া বাসীদের উপর আমি সন্তুষ্ট থাকবো? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। তারা কি রাসূলুল্লাহর হেরেম কে হালাল করেনি? তিন দিন ধরে সেখানকার অধিবাসীদের পাইকারী হারে হত্যা করেনি? তাদের নিবতী এবং কিবতী সৈন্যদের কে সেখানে যা খুশী করার পাইকারী অনুমতি দেওয়ার কারনে তারা শরীফ দ্বীনদার মহিলাদের উপরও আক্রমন চালিয়েছে, কারোর সম্ভ্রম বিনষ্ট করা থেকেই তারা নিবৃত্ত হয়নি। অতঃপর বায়তুল্লাহ্‌র (আল্লাহর ঘরের) উপর আক্রমন চালিয়েছে। প্রস্তর খন্ড বর্ষন করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তার উপর আল্লাহর লা'নত। তার পরিনতি হোক নিকৃষ্ট।[২৩]

তৃতীয় ঘটনাটি সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রাঃ) সর্বশেষ উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর হেরেমের ধ্বংস সাধন করে উক্ত বাহিনী হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য মক্কা আক্রমন করে এবং মিঞ্জানিক দিয়ে খানায়ে কাবার উপর প্রস্তর বর্ষন করে। ফলে কাবার এক খানা দেয়াল ভেঙ্গে যায়। কাবায় অগ্নী সংযোগের বর্ণনাওপাওয়া যায়। অবশ্য এর অন্যান্য কারণও রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়। তবে প্রস্তর বর্ষন সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই।[২৪]

এসকল ঘটনা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, ইয়াযিদ তার ক্ষমতা এর তার স্থিতি ও সংরক্ষণকে সবার উর্ধে স্থান দিতেন। তিনি এজন্য যে কোন সীমতিক্রম এবং যে কোন রকম অন্যায় কাজ করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ ইয়াযীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ইয়াযিদের ব্যক্তি চরিত্র সম্পকে ইতিপূর্বে কিছু ধারনা করা গেছে। এখন কিছুটা স্পষ্ট করার জন্য পৃথক অধ্যায়ে আসা হলো । প্রশ্ন হতে পারে কারবালার ঘটনার সাথে ইয়াযীদের চরিত্রের সম্পর্ক কি? কিন্তু বুদ্ধিমান মাএই অনুধাবন করতে পারবেন, কারবালার ঘটনা নিছক হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়। এর পিছনে অনেকের সরাসরি হস্তক্ষেপ আবার কারো পর্দার আড়াল থেকে পরিচালনা প্রভৃতি ব্যাপার ছিল। যদিও ইয়াযীদের ভাষ্যমতে ঘটনাটা তার ইচ্ছার চেয়েও বেশী মারাত্মক ছিল। তার চরিত্র কেমন ছিল তা জানা গেলে কার বালার ঘটনার সাথে তার সম্পৃক্ততার পরিমান অনুধারন করা সহজ হবে। তার চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন ঃ

"Yeazid was cruel and Trcacherous, his depraved nature knew no pity nor Justice. His pleasures were as degrading as his Companions were low and vicious. He insulted the ministers of religion by dressing up a monkey as a learned divine and carrying the animal mounted on a beautifully caparisoned Syrian donkey Where ever ne Went. Drunken riotousness Prevailed at Court and naturally imitated in the Streets of the Capital"[২৫]

উইলিয়াম মুইর বলেন ঃ-

"Yazid, born of a Beduin Mother, bred in the free air of the desert, an eagar and Skillful huntsman, a graceful poet, a gallant lover,fond of wine, music and sport and little concerened with religion, having a hand some face and kingly qualities, might temper our Judgment (held against him) had it not been for the black stain Which the Tragedy of karbala left on his memory. His reign lasted for Three years and six months. In the first year he slew hussain. in the second year he sacked Madina and in the third he attacked Kaaba[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে খালদুন তার মুকাদ্দামায় উল্লেখ করেন-

"ইয়াযীদদর মধ্যে যা উদ্ভব হওয়ার ছিল তা যখন উদ্ভব হলো অর্থাৎ তার চরিত্রে মিথ্যাচার ও অসাধুতা দেখা দিল, তখন তার খেলাফতের ব্যাপারে সাহাবাগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়লেন। এই হেতু কোন কোন সাহাবী তার বিরুদ্ধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এবং বায়আত ভঙ্গ করাকে জরুরী মনে করলেন। যেমন হযরত হুসায়ন (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) ও তাদের অনুসারীরা। আবার অন্যরা বিশৃংখলা ও অধিক রক্ত পাতের আশংকায় এবং এর প্রতি রোধে নিজেদের অক্ষম মনে করে তা অস্বীকার করলেন।[২৭]

উক্ত উদ্ধৃতিতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে ইয়াযিদের অন্যায় অত্যাচার ও সীমাতিক্রমের ব্যাপারে সাহাবাদের মাঝে কোন প্রকার দ্বিমত ছিল না। দ্বিমত ছিল শুধু তার বিরুদ্ধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারেই।

খলীফা মুআবিয়ার উমাইয়া গভর্ণরদের মধ্যেও তার চরিত্র সম্পর্কে এরূপ মত পোষণ করতে দেখা যায়। যেমন ঃ হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা মনোনয়নের ব্যাপারে বসরার গভর্ণর যিয়াদকে লিখেন, এ ব্যাপারে তোমার মত কি? তিনি উবায়েদ ইবনে কাআব আন নুমাইরকে ডেকে বলেন, আমিরুল মুমিনীন এ ব্যাপারে আমাকে লিখেছেন। আমার মতে ইয়াযীদের মধ্যে অনেক গুলো দুর্বলতা রয়েছে। তিনি দূর্বলতা গুলো উল্লেখ করেন। অতঃপর বলেন, তুমি আমিরুল মুমিনীনের কাছে গিয়ে বলো যে, এ ব্যাপারে যেন তাড়া হুড়ো না করা হয়। বাযায়েদ বলেন, আপনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর মতামত নষ্ট করার চেষ্টা করবেন না। আমি গিয়ে ইয়াযীদকে বলবো যে, আমীরুল মুমিনীন এ ব্যাপারে আমীর যিয়াদের পরামর্শ চেয়েছেন। তিনি মনে করেন জনগণ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে। কারন, তোমার কোন কোন আচার আচরন জনগণ পছন্দ করেনা। তাই আমীর যিয়াদের পরামর্শ এই যে, তুমি এসব বিষয় সংশোধন করে নাও, যাতে কাজটি সঠিক ভাবে সম্পন্ন হতে পারে।[২৮]

মুআবিয়া (রাঃ) ইয়াযীদকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিনিধিদের তলব করে বিষয়টি তাদের সামনে উথাপন করেন। জবাবে সবাই তোষামোদ মূলক বক্তব্য পেশ করে কিন্তু হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস নীরব থাকেন। মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞেস

Dhaka University Institutional Repository

করেন, হে আবু বাহর, তোমার কি মত? তিনি বলেনঃ সত্য বললে আপনার ভয়, আর মিথ্যা বললে আল্লাহর ভয়। আমীরুল মুমিনীন, আপনি ইয়াযীদের দিন রাত্রির চলাফেরা উঠা-বসা, তার ভিতর বাহির সব কিছু সম্পর্কে ভালো ভাবেই জানেন। আল্লাহ এবং এ উম্মতের জন্য সত্যিই তাকে পছন্দ করে থাকলে এ ব্যাপারে আর কারো পরামর্শ নেবেন না। আর যদি তাকে এর বিপরীত মনে করে থাকেন, তাহলে আখেরাতের পথে পাড়ি দেবার আগে দুনিয়া তার হাতে দিযে করেন না। আর বাকী রইল আমাদের ব্যাপার যা কিছু নির্দেশ দেয়া হয় তা শোনা এবং মেনে নেয়াই তো আমাদের কাজ।[২৯]

ফিক্হ আকবরের ভাষ্য গ্রন্থে আল্লামা ইবন হুমাম বলেন, ইয়াযীদের কুফরের ব্যাপারে মত ভেদ রয়েছে। কেউ কেউ তাকে কাফির বলেন। কেননা তার থেকে এমন বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায় যা তার কুফরকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ সে মদকে হালাল মনে করত এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তার সাথীদের হত্যা করার পর তার মুখ থেকে এ কথা বেরিয়ে ছিল যে, আমি (হযরত হুসায়ন (রাঃ) প্রমুখদের) বদলা নিয়েছি, যা তারা আমার পূর্ব পুরুষদের সাথে বদর প্রান্তরে করেছিল। সম্ভবতঃ একারনেই ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল তাকে কাফির বলেছিলেন। কেননা তার কাছে ইয়াযীদের এই ভাষনটি নির্ভর যোগ্য ভাবে প্রমানিত হয়েছিল।[৩০]

ইয়াযীদের ব্যক্তিগত ফিসক ও পাপাচারিতা যেমন ছিল ব্যাপক তেমনি তার সামাজিক পর্যায়ের ফিসকও ছিল অনেক। হাফিজ ইবন কাছীর, ফকীহ হিরাসী, সহ প্রমুখ মনীষীগন এমন কি তার পক্ষ নিয়ে যারা কিছু কথা উচ্চারন করেন তারাও বলেন তার ফিস্কের কারনে উম্মতের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। ব্যক্তিগত ফিস্কের কারনে ব্যক্তি সত্ত্বা বরবাদ হয়ে যায়, কিন্তু সামাজিক ফিস্কের ফলে গোটা জাতিও জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। তাই আলিম ও ফকীহ্গণ ইয়াযীদের এতদ সংক্রান্ত ফিস্কের আলোচনার প্রতিই বেশী জোর দিয়েছেন এবং এর ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন আহকাম রচনা করেছেন। আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার লিখিত "ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেনঃ- "হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফীর চাইতে ইয়াযীদ সৎ ব্যক্তি ছিল, কারন ঐতিহাসিক গণ এক বাক্যে ওকে ইয়াযীদের চাইতে অধিকতর অত্যাচারী বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইয়াযীদ আর তার মত শাসন কর্তাদের সম্বন্ধে বেশীর বেশী একথা বলা যেতে পারে যে, তারা ফাসিক ছিল।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা প্রেক্ষিতে আমরা একথা এক বাক্যে বলতে পারি যে, ইয়াযীদের কুফরির ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে কিন্তু তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক ফিসকও পাপাচারিতার ব্যাপারে কোন রূপ মত পার্থক্য নেই। আর ফাসিক পাপাচারী ব্যক্তির দ্বারা যে কোন বৃহত্তম অপরাধ সংঘটিত হওয়া বৈচিত্র কিছু নয় আর তার বৃহত্তম অপরাধটি ছিল হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যা কান্ড সংঘটিত করা। এটা তার রাজত্বের এক বেদনা দায়ক ঘটনা। ইবনে কাছীর বলেন- "ইয়াযীদ হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তাঁর সাথীগণকে আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের মাধ্যমে হত্যা করে।[৩২]

সুতরাং এ ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, ইয়াযিদের অপকীর্তি তার পাপাচারিতা ও অন্যায় সমূহ ফিক্হ ও ঐতিহাসিক ভাবে সুপ্রমানিত।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮ ইয়াযিদের উপর অভিসম্পাৎ বর্ষণ

হাফেজ ইবনে কাছীর বলেন একদল আলেম ইয়াযিদের উপর লা'নতকে জায়েজ মনে করেন। এদের সমর্থনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের একটি উক্তিও পাওয়া যায়। কিন্তু এর ফলে তার পিতা বা অন্য কোন সাহাবীর উপর লা'নতের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার আশংকায় অপর একটি দল তা করতে নিষেধ করেন।

ইবনে কাছীর ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বলের যে উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার বিবরণ এই যে, একদা তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ইয়াজিদের উপর লা'নত সম্পর্কে আপনি কি বলেন? জবাবে তিনি বলেন সে কুরআনের আয়াত অনুযায়ীই লা'নতের পর্যায়ে পড়ে-এবলে তিনি সুরা মুহাম্মদ এর এ দুটি আয়াত পাঠ করেন।

অর্থ "তোমরা ক্ষমতার অধিকারী হলে বিশ্বে বিপর্যয় ঘটাবে আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে তোমাদের কাছ থেকে এছাড়া আর কি আশা করা যায়? তারাই হচ্ছে যে সব লোক আল্লাহ যাদের উপর লা'নত করেছেন।[৩৩]

এ আয়াত পাঠ করে ইমাম আহম্মদ বলেন, ইয়াযীদ যা কিছু করেছে, তার চেয়ে বড় বিপর্যয় আর তার চেয়ে বড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন আর কি হতে পারে? সুতরাং সে লা'নত পাওয়ার যোগ্য।

মুহাম্মদ ইবনে আঃ রসূল আল বারযানজী আল ইশারাহ ফী আশরাতিস মা-আহ-এ এবং ইমাম ইবনে হাজার আল হায়সামী আস-সাওয়াযেকুল মুহরিকায় ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বলের এ উক্তিটি উদ্ধৃতি করেছেন।[৩৪]

কিন্তু আল্লামা সাফারীনী এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন- অধিক নির্ভর যোগ্য বর্ণনা মতে ইমাম আহমদ ইয়াযীদের উপর লা'নতকে পছন্দ করতেন না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ প্রসঙ্গে তার মিনহাজুজ সুন্নাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন" একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে তাঁর পুত্র সালিহ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আব্বা আপনি ইয়াযীদকে অভিসম্পাত করেন না কেন? ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন, তুমি তোমার বাবাকে কবে কোন ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করতে দেখেছ?"

Dhaka University Institutional Repository

আমরা বলতে পারি ইমাম ইবনে তায়মিয়া ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের এ উক্তি দ্বারা ইয়াযীদের উপর লা'নত না দেন সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কেননা কেহ লা'নত যোগ্য হলেই তাকে লনিত করতে হবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই। এমনকি শয়তানকে লা'নত দেওয়ার জন্য ও আমরা বাধ্য নই, যদিও সে প্রশ্নানীত ভাবে লার্নত যোগ্য।

আহলুস সুন্নাতের আলেমদের মধ্যে যারা লানতের স্বপক্ষে তাঁদের মধ্যে ইবনে জাওবী, কাযী আর ইয়ালা, আল্লামা তাফতাযানী এবং আল্লামা জালালুদীন সুয়ুতীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। আর যারা এর বিপক্ষে তাঁদের মধ্যে ইমাম গাযযালী এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া শীর্ষ স্থানীয়।

এ ব্যাপারে গবেষণা করে আমার নিকট যা পরিস্কার হয়েছে সে হিসেবে বলতে পারি অভিসম্পাত যোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের উপর সামগ্রীক ভাবে লা'নত করা যায়। যেমন বলা যায় যালেমদের উপর আল্লাহর লা'নত, কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ধারিত ধারায় লার্নত করা উচিৎ নয়। কারন তিনি জীবিত থাকলে হতে পারে পরে আল্লাহ তাকে তাওবা করার তত্তকিক দিবেন আর তিনি মারা গিয়ে থাকলে আমরা জানিনা কি অবস্থায় তার জীবনের সমাপ্তি হয়েছে। এ জন্য আমাদেরকে এসব লোকদের অন্যায় কাজকে অন্যায় বলেই ক্ষান্ত হতে হবে এবং লা'নত থেকে দূরে থাকাই উত্তম। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এখন ইয়াযীদের তারীফ করতে হবে। কেউ কেউ তো ইয়াযীদকে সাহাবী এবং সুসংবাদ প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য করেন। অথচ তা ঠিক নয় বলেই প্রমানিত। এ ব্যাপারে আলাদা অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর বিন আঃ আযীয়ের দরবারে ইয়াযীদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমীরুল মুমীনীন ইয়াযীদ শব্দ উচ্চারন করলে তিনি অত্যন্ত ক্রদ্ধ হয়ে বলেনঃ তুমি ইয়াযীদকে আমিরুল মুমীনীন বলছো? এ বলে তিনি তাকে ২০ টি কশাঘাত করেন।[৩৫]

ইয়াযীদকে লা'নত করা বৈধ কিনা এ বিষয় আলোচনার সাথে আমাদেরকে এ কথাগুলোও বিবেচনার আনতে হবেঃ-

ইয়াযিদকে লা'নত করার প্রশ্ন শুধু তার পক্ষেই সীমাবদ্ধ নয়। তারমত অন্যান্য দুনিয়াদার রাজা বাদশাহদের সম্পর্কেও এ প্রশ্ন তুল্যভাবে প্রযোজ্য। কারন এরূপ দুনিয়াদার স্বৈরাচারী শাসন কর্তাদের তুলনায় অনেকের চাইতে ইয়াযীদকে উত্তম বলা যেতে পারে। যেমন ইরাকের শাসন কর্তা

Dhaka University Institutional Repository

মুখতার বিন আবি উবায়দ সাকাফী, সে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য উত্থান করেছিল, ইয়াযিদ তার চাইতে নিশ্চয়ই ভালো ছিল। কারন মুখতার নবূয়তের দাবী করেছিল। সে বলতো জিব্রাইল (আঃ) তার কাছে অবতীর্ণ হ'ন। এ রূপে হাজ্জাজ বিন ইউসূফ সাকাফীর চেয়েও ইয়াযীদ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিল, কারন ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে তাকে ইয়াযীদের চেয়ে অধিকতর অত্যাচারী বলে সাব্যস্ত করেছেন। হাদীছে বিভিন্ন ধরনের লা'নতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন রসূল (সঃ) এর উক্তি "চোরের উপর আল্লাহর অভিসম্পতি"। যে ব্যক্তি বিদআত আবিস্কার করে অথবা বিদআতীরক আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। "সুদখোর, সুদ দাতা, সুদের দলিল লেখক আর তার সাক্ষীর উপর আল্লাহর লা'নত" যে ব্যক্তি হালালা করে এবং যার জন্য হালালা করা হয় তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত"। মদ প্রস্তুতকারী মদ যার জন্য প্রস্তুত করা হয়, মদের বাহকে, আর যার জন্য বহন করা হয়, মদ পান কারী, আর তার মূল্য খাদকের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।"

কোন ফাসিককে নির্দিষ্ট করে লা'নত করা যায় কিনা, যে সম্বন্ধে বিদ্বান গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের ছাত্র মন্ডলীর মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও স্বয়ং ইমামের প্রসিদ্ধ অভিমত যে, কোন পাপীকে নির্ধারিত ভাবে লা'নত করা মাকরুহ।

কুরআনে উল্লেখিত হয়েছেঃ

"তোমরা অবহিত হও যে, "যালিমদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত"।এ স্থলে ব্যাপক লা'নতের উল্লেখ রয়েছে। অপর পক্ষে হাদীস সমূহেও ব্যাপক লানতের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে ব্যক্তি বিশেষের উপর নয়। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে যে, "জনৈক ব্যক্তি সুরা পান করতো আর বারবার রসূল (সঃ) এর কাছে ধৃত হয়ে আসতো আর মার খেতো। এ ভাবে সে যখন একবার ধৃত হয়ে আসলো, জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো ওর উপর আল্লাহর লা'নত বারবার ধরা পড়ে তবুও মদ্যপান পরিত্যাগ করেনা"। রসূল (সঃ) একথা শ্রবন করে বললেন, দেখ ওকে লা'নত করোনা। এ স্থলে লক্ষণীয় যে, মদ্যপায়ীদের উপর রসূল (সঃ) স্বয়ং ব্যাপক ভাবে লা'নত করেছেন। কিন্তু এ লোকটিকে নির্দেশিত ভাবে লা'নত করতে নিষেধ করলেন আর তার কারণ স্বরূপ উল্লেখ করলেন যে সে আল্লাহ ও তার রসূল (সঃ) কে ভালো বাসে।

Dhaka University Institutional Repository

এ হাদীছের সাহায্যে প্রমানিত হয় যে, ব্যাপক ভাবে পাপীদের লা'নত করা চললেও নির্দিষ্ট ভাবে কোন পাপীকে লা'নত করা চলবেনা আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ) কে ভালো ভাসে তাকেও অভিসম্পাতকরা চলবেনা। আর একথা সর্বজন চিহ্নিত যে কপট মুনাফিক ছাড়া প্রত্যেক পাপী তাপী মুসলমানও আল্লাহ ও রসূলকে অল্প বিস্তর ভালো বেসে থাকে। যারা কোন নির্দিষ্ট পাপীকে লা'নত করা বৈধ মনে করেন তাদের বক্তব্য যে ভালো কাজের জন্য যেমন মুসলমানকে দোয়া করা বৈধ তেমনি পাপের জন্য তাকে অভিসম্পাত করাও বৈধ। তার জন্য দোয়া ও অভিসম্পাত দুই-ই করা যায়। ভালো কাজের জন্য দোয়া, মন্দ কাজের জন্য বদদোয়া। সাহাবা, তাবেয়ীন, ও আহলে সুন্নত বিদ্বানগন এব দ্বিবিধ অভিমতই পোষণ করে থাকেন। কিন্তু খারেজী মুতাযেলী আর একদল শিয়ার অভিমত হচ্ছে যে, একই ব্যক্তির ভিতর পাপ ও পূন্যের যুগপৎ সমাবেশ সম্ভবপর নয়, আর পাপী ও যালিমদের মুক্তির কোন আশাই নেই। কিন্তু তাদের একথা সঠিক নয়। সহীহ হাদীসে পূণঃ পূণঃ উল্লিখিত হয়েছে যে, শাফায়াতের দরুনে বহু পাপী দোযখ থেকে মুক্ত হবে আর যার হৃদয়ে সরিষার দানার পরিমানও ইমান আছে, শেষ পর্যন্ত সে দোযখ থেকে রেহাই পাবেই।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া এ প্রসংগে উল্লেখ করেন যে, যারা ইয়াযিদকে লা'নত করা বৈধ মনে করে, তাদের প্রথমতঃ দুটি বিষয় সাব্যস্ত করতে হবে প্রথমতঃ যে শ্রেণীর ফাসেক ও যালেমদের লা'নত করা বৈধ, ইয়াযীদ তাদেরই অন্তর্ভূক্ত, আর সে তার মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য তওবা করেনি। দ্বিতীয়তঃ নিদিষ্ট ভাবে কোন পাপীকে লা'নত করা বৈধ। যে সকল আয়াত ও হাদীসে পাপীদের বিভিন্ন প্রকার পাপের জন্য লা'নতের উল্লেখ রয়েছে, সে গুলোর সাহায্যে এ টুকই সাব্যস্ত হয় যে, অমুক অমুক পাপ লা'নতের কারন হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের পাপ তার অন্য বিধ পূণ্য বা তওবার ফলে ক্ষমা হওয়ার কথাও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত রয়েছে। সুতরাং ইয়াযীদ বা অন্যান্য রাজা বাদশাহদের কাহারও একথা বলা কেমন করে সঙ্গত হতে পারে যে, তারা তাদের পাপের জন্য তওবা করেনি। আর আল্লাহ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না ? অথচ আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন. "বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার পাপ ক্ষমা করবেন না। আর উহা

Dhaka University Institutional Repository

আমরা সকলে একথা ভালো ভাবেই অবগত আছি যে, প্রত্যেক মুসলমানই কোননা কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অন্যায় অনাচারে জড়িত থাকেই। যদি লা'নত অর্থ্যাৎ অভিসম্পাতের দ্বার এমন ব্যাপক ভাবে খুলে দেয়া যায় তাহলে অধিকাংশ মৃত মুসলমানই লা'নতের খপ্পরে পড়বে। অথচ মৃত মুসলমানের জন্য আল্লাহ আমাদের দোয়া করতেই নির্দেশ দিয়েছেন, লার্নত করার অনুমতি দেননি। বিশেষ করে জীবিতদের চেয়ে মৃতদের লা'নত করা গুরুতর পাপ। রসুল (সঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এরূপ করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "সাবধান! তোমরা মৃত ব্যক্তিদের কুটক্তি করোনা, কারণ তারা তাদেরকৃত কর্মের ফল পেয়ে গেছে।" শুধু এটুকই নয় আবুজিহলের মত সর্ববাদী সম্মত ইসলাম বৈরীকে যখন কতিপয় মুসলমন গালমন্দ করছিলেন, তখনও রাসূল (সঃ) তাঁদের বাধা দিয়ে বলে ছিলেন "দেখ তোমরা আমাদের মৃত আত্নীয় স্বজনদের (তারা যদি কাফেরও হয়) কুটক্তি করোনা, কারণ এতে করে তোমরা আমাদের জীবিতদের মনোকষ্টের কারণ হবে।"

ইমাম ইবনে তায়মিয়া বলেন, লা'নত সম্পর্কিত উল্লেখিত কুরআনের ও হাদীস উভয়রই তাৎপর্য ব্যাপক নির্ধারিত নয়, সুতরাং ব্যাপক লা'নতের ব্যবস্থা শুধু ইয়াযীদের জন্য নির্ধারিত হবে কি করে? স্বয়ং বনি হাশিমীয়দের কেহ কেহ পরস্পরের সংগে ইয়াযীদের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করেছে। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা যদি ইয়াযীদেকে লার্নত করা বৈধ হয়, তাহলে বনী হাশিমীয়দের মধ্যে আলাব্বী ও আব্বাসীয়দের কোন মুসলমানই লা'নত থেকে রক্ষা পাবেনা। আর এভাবে সমুদয় মুসলমানের প্রতি লা'নতের দ্বার মুক্ত হয়ে যাবে।

ইয়াযীদের বৃহত্তম অপরাধের মধ্যে মক্কা ও মদীনাবাসীদের ব্যাপক হত্যা কান্ড অন্যতম। কিন্তু ইয়াযীদ মক্কা ও মদীনাকে আক্রমন করার জন্য অগ্রসর হননি এবং মক্কা ও মদীনার মর্যাদা হানীরও তার উদ্দেশ্য ছিলনা বরং তার প্রতি দ্বন্দ্বি হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের সময়ে কাবা শরীফ অবরোধ এবং মিঞ্জানিকের ব্যবহার হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেটা ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে, কা'বা শরীফ বা মদীনা শরীফের বিরুদ্ধে নয়। একথা সর্বজন বিদিত যে কারামতী বাতেনীদের কুফর সর্বাপেক্ষা বড়, এরা হজ্জের মওসুমে হাজীদের হত্যা করে যমযমের কূপে নিক্ষেপ করেছিল আর পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তরকে কাবার দেহ হতে উপড়িয়ে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘ কাল আটক করে রেখেছিল, কিন্তু তারাও কাবা অধিকার করতে সক্ষম হয়নি। তাদের সীমাহীন ষড়যন্ত্র ও প্রাণপন চেষ্টা সত্ত্বেও আজও কাবার গৌরব ও সম্ভ্রম সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯ ইয়াযীদের সাহাবীয়ত প্রসঙ্গ

ইমাম ইবনে তায়মিয়া তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ মিনহাজুস সুন্নায় উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াযীদ সুসংবাদ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি প্রমান স্বরূপ সহীহ বুখারী শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করেন তাহলো "হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সঃ) বলেছেন, প্রথম বাহিনী, যারা কনষ্ট্যান্টি-নোপল অভিযান করবে, আল্লাহ তাদের সকলকেই ক্ষমা দান করবেন। আর যে বাহিনী সর্ব প্রথম কনষ্ট্যান্টিনোপলে চড়াও করেছিল, তার প্রধান সেনা পতি ইয়াযীদ বিন মুআবিয়াই ছিলেন। এর সাথে তিনি একথাও জুড়িয়ে দেন যে, এ হাদিসের দরুনই ইয়াযীদ এ জিহাদে নিক্রান্ত হয়েছিলেন বলে বর্ণিত।

কিন্তু আল্লামা আইনী, ইবন আছীর হাফিজ ইবন হাজার, উমদাতুলকারী প্রানেতা ও মির'আত প্রণেতা ইয়াযীদের নেতৃত্বে কনষ্টান্টিনোপল অভিযানকে অস্বীকার করেন। তারা বলেন, আমীর মুআবিয়া সুফইয়ান ইবনে আওফের নেতৃত্বে কনষ্টান্টিনোপল অভিযান প্রেরণ করেন। ফলতঃ তারা রোমে আক্রমন চালান। ইবন আব্বাস, ইবন ওমর, ইবন যুবায়র ও আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) প্রমুখ এ বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ কালে ইন্তিকাল করেন।

আল্লামা আইনী বলেনঃ ইয়াযীদের মাঝে এমন কোন গুন বা মাহাত্ম্য বিদ্যমান ছিলনা, যার কারণে তার প্রশংসা করা যেতে পারে। অধিকন্ত তার পাপাচারিতা ও অন্যায় সকলেরই জানা এবং তা সর্বজন বিদিত এবং বিনা মতপার্থক্যে সে একজন ফাসেক। তিনি আরও বলেন এ জিহাদে যে সমস্ত সাহাবী শরীক হয়েছিলেন তারা ছিলেন সুফইয়ান ইবনে আউফের নেতৃত্বাধীন ইয়াযীদের নয়। আর হাদীছটিতে মাগফিরাত এর যে অঙ্গীকার বর্ণিত হয়েছে তা কেবল তাদের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে যাদের মধ্যে এর উপযুক্ততা বিদ্যমান। বস্তুতঃ ইয়াযীদ না এর উপযুক্ত বলে প্রমানিত না এর আওতা ভূক্ত।[৩৮]

আল্লামা আইনী বলেন, আমার নিকট সর্বাধিক সঠিক কথা হলো উক্ত জেহাদে ইয়াযীদ অংশ গ্রহণ করেছিল বটে। কিন্তু এতে তার নেতৃত্ব ছিলনা।

Dhaka University Institutional Repository

আবার এ যুদ্ধে তার অংশ গ্রহনও স্বেচ্ছা প্রণোদিত ছিলনা। এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে যেয়ে ইবন আছীর বলেন- "এতে ইয়াযীদ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে অংশ গ্রহণ করেনি, বরং স্বীয় মহান পিতার নির্দেশ ক্রমে তাকে যোগদান করতে হয়। বস্তুত এ নির্দেশটি ছিল তার জন্য শাস্তি মূলক। যাতে এর দ্বারা তার বিলাস প্রিয়তা শিথিল হয়ে পড়ে এবং তার আয়েশ পূর্ণ উদাসীনতারও সাজা হয়ে যায়।

ইবন আছীর বলেন, "সে বছর মতান্তরে পঞ্চাশ হিজরীতে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) রোমের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। তাতে সুফইয়ান ইবনে আউফকে নেতৃত্ব প্রদান করা হয। ইয়াযিদকেও তাদের সাথে গমন করার হুকুম প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু ইয়াযীদ বসে থাকলো এবং টাল বাহানা শুরু করে দিল। ফলে আমীর মুআবিয়া তাকে পাঠানো থেকে বিরত থাকলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুজাহিদগন ক্ষধাও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন ইয়াযীদ (আনন্দে) নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করছিল।

অর্থ, "ফারকাদুনা নামক স্থানে এ বাহিনী রোগ যন্ত্রনা ও ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে পড়েছে তাতে আমার কি আসে যায়,

যখন দায়রে মাররানে উন্নত উপাধানে গা এলিয়ে দিয়ে উম্মুকুলসুমের সাথে আমার সময় কাটে।"

উম্মু কুলসুম হলো আবদুল্লাহ ইবন আমীরের মেয়ে এবং ইয়াযীদের স্ত্রী, একসময় ইয়াযীদের এই কাব্য চর্চার সংবাদ হযরত মুআবিয়ার গোচরীভূত হয়। তখন তিনি শফত করে বলে ছিলেন- আমি অবশ্যই ইয়াযীদকে রোম ভূমিতে অবস্থানরত সুফইয়ান ইবনে আউফের নিকট প্রেরণ করবো। যাতে সেখানকার বাহিনী যে, কষ্টের শিকার হয়েছে সেও তা ভোগ করে।[৩৯]

এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ইয়াযীদ একজন কবিও ছিল, ইবন কাছীর বলেন, "ইয়াযীদের মধ্যে কিছু সৎগুনও বিদ্যমান ছিল। যেমন ধৈয্য বদান্যতা, বাগ্মীতা, কাব্য বীরত্ব, রাষ্ট্র পরিচালনা দক্ষতা এবং সে ছিল সুদর্শন ও কোমল স্বভাবের অধিকারী। এ সকল স্বভাব সহ তার মাঝে আবার কাম

Dhaka University Institutional Repository

অনুরাগীতাও বিদ্যমান ছিল। কখনো কখনো সে নামাজ পড়তই না আর সময় পার করে নামাজ পড়াই ছিল তার সাধারণ অভ্যাস।[৪০]

এ প্রসংগে আমরা বলতে পারি ইয়াযীদ যতবড় চিজ্ঞ রাজনীতিক-ই হোক যত মহান বাগ্নী অলংকারিক ও সাবগর্ভ কাব্য প্রতিভার অধিকারী হোক, এবং ধৈয্য ও উহার বিস্তৃতার যত মহান পরাকাষ্ঠই হোক না কোন একজন নামাজ তরক কারী হিসেবে সে আদৌ দ্বীনদার বা ধার্মিক হতে পারেনা। আর আল্লাহর সাথে এরূপ আচরনকারী অর্থ্যাৎ ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তির পাপাচার সুলভ রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড নৈতিকতা বিমুখ হয়ে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ ও প্রভাব বিস্তার মূলক হওয়াই অতি স্বাভাবিক। বস্তুত ইয়াযীদের সারা যেন্দেগীই এর বাস্তব উদাহরণ।

বলা বাহুল্য এটা সর্বজন স্বীকৃত যে ইয়াযীদ ছিল একজন বিলাস প্রিয় লোক। আর যে বিলাসিতায় এতটা মত্ত, মর্দে মুজাহিদের ব্যাপারে যার এতটা উদাসীনতা ও অনাগ্রশীলতা, তার অন্তরে জিহাদের প্রতি কোন আগ্রহ ও শত্রুর মোকাবেলায় সম্মুখ সমরে নিজেকে পেশ করার কোন বাসনাই তার মধ্যে থাকতে পারেনা। তাই কলষ্টান্টিনোপল যুদ্ধে নেতৃত্ব তো নয়ই বরং তার অংশ গ্রহনই ছিল শাস্তি স্বরূপ এবং সে তার পিতার রোষানল থেকে বাঁচার তাগিদেই সে তাতে যোগদান করে। সে নিজে থেকে তাতে যোগ দেয়নি।

এখন স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যায় যে, ক্ষমার ঘোষনা থেকে বাদ পড়ার আলামত গুলো প্রথম থেকেই তার মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ইত্তামুল জিয়াদে শরীক প্রত্যেক সদস্যের জন্যই মাগফিরাতের অঙ্গীকারটি ব্যাপক। কিন্তু শর্ত হলো যে মন মানবিকতা ও আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে তাতে আত্ম নিয়োগ করা কর্তব্য ছিল ঠিক সেই অবস্থা গুলো সদা বিদ্যমান থাকতে হবে। সেই সময় অথবা পরবর্তী সময়ে যদি মনের অবস্থা পাল্টে যায় তাহলে স্বাভাবিক কারণেই সেই ব্যক্তি বিশেষের জন্য মাগফিরাতের অঙ্গীকারও বাকী থাকবেনা। উদাহরণ স্বরূপ বুখারীও মুসলিমের একটি হাদীছ উল্লেখ করা যায় "মানুষ জান্নাতের আমল করতে করতে জান্নাতের এত নিকটে পৌছে যায় যে, জান্নাতও তার সাথে মাঝে এক বিঘত পরিমান ব্যবধান থাকে। কিন্তু জীবনের শেষ মুহুর্তে সে এমন আমল করে যার কারণে সে দোযখী হয়। সুতরাং

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষনীয় যে কোন ব্যক্তিকে জান্নাতী বলাহয় না বরং জান্নাতী আমলের কারণেই বলা হয়। অনুরূপ জাহান্নামী বলার ব্যাপারটাও ঠিক একই রূপ।

আল্লামা দমীরী তৎপ্রণীত হায়ওয়াতুল হায়ওয়ান গ্রন্থে আলকায়্যা হিরাসীর একটি উক্তি নকল করেছেন। তাতে ইয়াযীদ সম্পর্কে পূর্বসূরী আলিম ও মুজতাহিদ গনের দৃষ্টি ভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"শাফিঈ মযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ আল কাইয়্যা হিরাসীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ইয়াযীদ সাহাবী কি না ? এবং তাকে অভিসম্পাত করা বৈধ কিনা ? উত্তরে তিনি বলে ছিলেন ইয়াযীদ সাহাবী ছিলনা। কারণ সে হযরত উছমান (রাঃ) এর শাসনামলে জন্ম গ্রহণ করে।[৪১] লা'নতের বিষয় পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আর ইয়াযীদ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ৬০ হিঃ তে ৩০ বৎসর বয়সে। তার শাসন কাল সম্পর্কে রাসুল (সঃ) এর ভবিষ্যৎ বাণী বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে এবং বিভিন্ন রাবী মারফত বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবু সাঈদ খুদরীর হাদীসটি হাফিজ ইবন কাছীর তার আল বেদায়া ওয়ান নেহায়াতে উল্লেখ করেন, "হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন- আমি রাসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে ষাট হিজরীর পর এমন খলীফা নিযুক্ত হবে যে নামাজ বরবাদ করবে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। ফলে সে অচিরেই গাইয়্যা (জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম) এ নিক্ষিপ্ত হবে।[৪২]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রসুল (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে, কুরায়শের কতিপয় যুবকের হাতে আমার উম্মতের ধ্বংস নিহিত।[৪৩]

উক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, কতিপয় কুরাইশ বংশীয় যুবক এ উম্মতের ধ্বংসের কারণ হবে। উক্ত যুবক গণকে বুঝাতে ক্ষুদ্রত্ব ব্যঞ্জক শব্দ দ্বারা তাদের তুচ্ছতা ও গুরুত্বহীনতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা উম্মতের মত মহান একটি বস্তুকে ধ্বংসকারী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতেই পারেনা। ফাতহুল বারীতে যে সমস্ত যুবক গনকে নির্বোধ বলে বিশেষিত করা হয়েছে। উম্মতের ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো তার সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট হওয়া। অর্থাৎ সমাজ থেকে ইসলামী খিলাফত ও ধর্মীয় নেতৃত্বের অবসান ঘটবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইবন আবি শায়বার বর্ণনায় উদ্বৃত হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বাজার সমূহে হাঁটা চলা করতে করতে বলতেন- হে আল্লাহ ষাট হিজরী সন যেন আমার উপর দিয়ে অতিবাহিত না হয় এবং বালকদের কর্তৃত্ব যেন আমাকে না পায়।[৪৪]

হাফিজ ইবন হাজার বলেন- আমার মতে ছোট বালক শব্দ দ্বারা ক্ষুদ্রত্ব ব্যঞ্জক, বুদ্ধির দুর্বলতা, ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং দ্বীনের দুর্বলতার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদিও সে বালিগ হয়। আর এখানে তাই উদ্দেশ্য।

প্রকাশ থাকে যে রাসূল (সঃ) কখনো কোন সাহাবী সম্পর্কে এরূপ ক্ষুদ্রত্বব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করেন নি, বরং তিনি এর বিপরীত বলেছেন "আমার প্রত্যেকটা সাহাবী এক একটা নক্ষত্র সমতুল্য তাদের যে কাউকে অনুসরণ করলে হেদায়েত পাবে।"

ষাটের সূচনা লগ্ন এবং বালকদের নেতৃত্ব মূলত ইয়াযীদের শাসনকালই কারণ- প্রবীনদের সরিয়ে স্বীয় নিকট আত্মীয় নবীনদেরকে নেতৃত্বের পদে সমাসীন করাই ছিল ইয়াযীদের সাধারণ নীতি।[৪৫] প্রকাশ থাকে যে ইয়াযীদের সরকারে কিছু সংখ্যক প্রবীন সাহাবী ও তাবেয়ীও ছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল অতি নগন্য। হাফিজ ইবন হাজার বলেন- ষাট হিজরীতে এসব নবীন বালকদের প্রথম ছিল ইয়াযীদ এবং হাদীছে যে ভাবে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, সে সেরূপই ছিল। ইয়াযীদ ইবন মুআবিয়াই সে বছর খলীফা নিযুক্ত হয় এবং চৌষট্টি হিজরীতে সে পরলোক গমন করে। সে সময় তার বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর। বয়সের দিক দিয়ে বালিগ হলেও জ্ঞান বুদ্ধি কর্ম কৌশল ও দ্বীনের ব্যাপারে সে ছিল অপরিপক্ক নাবালগ মাত্র।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০ হযরত হোসাইন (রাঃ) এর মর্যাদা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট

কারবালার ঘটনা এবং ঐতিহাসিক ভাবে এর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এর সাথে হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও ইয়াযীদ সংক্রান্ত আকীদার সাথে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সংশ্লিষ্টতাও রয়েছে। তাই ইতিহাস আলোচনার সাথে আকীদার আলোচনাও এসে যায়। ইতিহাস আলোচনার সময়ে আকীদা বা বিশ্বাস তথা ইমানকে কোন ক্রমেই পাশ কাটানো ঠিক নয়। বরং আকীদার আলোকেই বিচার বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। সাবায়ী বা নাসেবীয়দের জাল বর্ণনার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া যাবেনা।

খিলাফতে মুআবিয়া ও ইয়াযীদ শীর্ষক গ্রন্থের প্রণেতা পাকিস্থানের নাগরিক মাহমুদ আব্বাসী সম্ভবত সাবারীদের জাল বর্ণনার ফাঁদে পড়ে অথবা ঐতিহাসিক ডোযীর বর্ণনার বেড়াজালে পড়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাহাবিয়াত শাহাদত ইত্যাদিকে অস্বীকার করে তাকে বিদ্রোহীও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের গবেষণায় তার উক্তি বাতিল বলে প্রতিপন্ন হয়।

মাহমুদ আব্বাসী তৎপ্রণীত গ্রন্থে বলেনঃ "মূলত হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিজেকে খিলাফতের অধিক যোগ্যতর মনে করতেন এবং স্বীয় অধিকার আদায় নিজের উপর বাধ্যতা মূলক করে নিয়েছিলেন। তার দূত মুসলিমের ঘটনা থেকে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলন যে, এ অবস্থায় কুফা গমন স্বার্থের অনুকূল হবেনা। কিন্তু তার কুফার সাথীরা যখন তাকে উৎসাহিত করলো এবং নিশ্চয়তা দিয়ে বললো যে, আপনার ব্যক্তিত্ব "মুসলিমের" মত নয়, আপনাকে দেখা মাত্রই লোকেরা আপনার দিকে ছুটে আসবে, তখন অভিষ্ট সিদ্ধির তাড়না সতর্কতার উপর বিজয়ী হলো। যে ভাবে তার বন্ধু মহল ও শুভানুধ্যায়ী শ্রেনী কুফীদের অঙ্গীকারের ভরসায় মক্কা ত্যাগ করে অপরিনাম দর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই সু ধারনা তাকেও সামনে অগ্রসর হতে প্রলুব্ধ করে। ঐতিহাসিক ডোযী লিখেনঃ

"কুফাবাসীদের চিঠি পত্রে কৃত অঙ্গীকার সমূহের ব্যাপারে তিনি এতই অস্থাবান ছিলেন যে, তা নিয়ে মানুষের সামনে তিনি গর্ব করতেন।"

Dhaka University Institutional Repository

"ডোযীর" ভাষায় আববাসী সাহেব আরো বলেন, "হযরত হুসায়ন (রাঃ) সমঝদার বন্ধু মহল তাকে বহুবার বুঝাবার চেষ্টা করেছিল যে, এরূপ নাযুক পরিস্থিতিতে নিজেকে অনিশ্চিত অবস্থায় নিক্ষেপ করোনা, যারা তোমার মহান পিতার সাথে গাদ্দারী করেছে তাদের অঙ্গীকার ও মিথ্যা অনু প্রেরনায় আস্থা রেখোনা। কিন্তুহযরত হুসায়ন (রাঃ) ক্ষমতার মোহের মত প্ররোচনাকে প্রাধান্য দিল এবং তার নামে প্রেরিত সে সব চিঠি পত্র গুলো গর্বের সাথে প্রদর্শন করতে থাকলো। এ সমস্ত চিঠি পত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় এক উটের বোঝার সমান।"[৪৭]

আলোচ্য বক্তব্যে সায়্যিদুনা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বিরুদ্ধে বুদ্ধির দৈন্যতা, সামাজিক ও জাতীয় বিষয়কে নিজের অধিকার মনে করা, স্বার্থ সিদ্ধির অদম্য স্পৃহা, অদুরদর্শিতা, অহেতুক সুধারনা পোষণ, আত্মঅহংকার ক্ষমতার লোভ, প্রদর্শন প্রিয়তা, ঊদ্ধত্য ইত্যাদির অভিযোগ আনা হয়েছে।

অন্য স্থানে আবার ঐতিহাসিক ডোযীর উদ্ধৃতি দিয়ে, মাহমুদ আববাসী বলেন,

" হযরত হুসায়ন (রাঃ) ছিলেন একজন সাধারণ ভাগ্য সন্ধানী পুরুষ-যিনি অভূতপূর্ব ভ্রান্তি, মানসিক বিকার গ্রস্থতা, ও অযৌক্তিক ক্ষমতার মোহের দরুন দ্রুত ধাবিত হচ্ছিলেন ধ্বংসের গহবর পানে। ইরানীদের ধর্মীয় গোড়ামী তাকে "ওয়ালী আল্লাহ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। অথচ তার সম-সাময়িক গণ তাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতো। তারা তাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ও বিদ্রোহের দোষে দোষী মনে করতো। তাই হযরত মুআবিয়ার আমলে তিনি ইয়াযীদের হতে বায়আ'ত গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের অধিকার বা খিলাফতের দাবী প্রমান করতে সক্ষম হননি।[৪৮]

আলোচ্য বক্তব্যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) ব্যর্থ দাবীদার, সাধারণ ভাগ্য সন্ধানী, ভন্ড দরবেশ, অজ্ঞ, ক্ষমতা লোভী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, ক্ষমতার অযৌক্তিক দাবীদার ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

আবার অন্য স্থানে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দোষে দোষী সাব্যস্ত করে এর সমর্থনে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে যে, তিনিও তাঁর কুফা যাত্রাকে বিদ্রোহ ও ক্ষমতা লাভের একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলে মনে করতেন। যা অবৈধ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসংগে আব্বাসী সাহেব বলেনঃ "হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ভাই হযরত আলী (রাঃ) এর সুযোগ্য বীর সন্তান, যাহিদ ও সুপন্ডিত ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার আমীর ইয়াযীদের হাতে বায়আ'ত করা এবং শেষাবধি তাতে অবিচল থাকা, খিলাফত নিয়ে মতবিরোধ সত্ত্বেও স্বভূমিকায় অনড় থাকা, বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি নিজে এবং সন্তানদের তাতে না জড়ানো কিসের প্রমান বহন করে? পরিষ্কার কথা হচ্ছে অন্যান্য সাহাবীর ন্যায় তিনিও এ বিদ্রোহকে ক্ষমতা দখল সংক্রান্ত এমন একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলে মনে করতেন, যা সময়ের উপযোগীতা ও শরীয়তের নির্দেশ কোন ভাবেই যুক্তি যুক্ত ছিল না।[৪৯]

আলোচ্য বক্তব্যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা, অন্ধ রাজনৈতিক উন্মক্ততা, ক্ষমতা ও গদি দখল এবং শরীয়ত ও বিবেক বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণের অভিযোগ আনা হয়েছে।

এখন আমাদের দেখা দরকার- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা আতের ফকীহ, মুহাদ্দিস, দার্শনিক ও ইতিহাসবিদ গণের এতদ সংক্রান্ত দৃষ্টি ভঙ্গি কি?

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা ও দৃষ্টি ভঙ্গিঃ- হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সম্মানে বিবৃত শরীয়াতের বিধান মতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত তার সম্পর্কে এই আকীদা পোষণ করেন যে, তিনি রাসুল (সঃ) এর অংশ বিশেষ ও বিশিষ্ট সাহাবী হওয়ার কারণে বিশুদ্ধ চিত্ত, সুসংকল্পের অধিকারী, এক সত্যনিষ্ট সাহাবী ছিলেন। (সাহাবা সম্পর্কিত বিষয় পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে) গৃহে অবস্থান করুন বা বাইরে যেখানেই হোক না তাঁর ন্যায় নিষ্ঠতায় কখনো ছেদ পড়েনি। তিনি যখন মদীনার পবিত্র অঙ্গনে অবস্থান করছিলেন তখনও পবিত্র ছিলেন আর কারবালার প্রান্তরেও ছিলেন সত্যনিষ্ট, ন্যায় পরায়ন ও সুসংকল্পের অধিকারী। স্বয়ং আল্লাহই তাঁকে অর্থ্যাৎ আহলে বায়েতকে পবিত্র ও পংকিলতা মুক্ত করার কথা ব্যক্ত করেছেন। আহলে বায়েত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "হে আহলে বায়েতগন, আল্লাহ তোমাদের থেকে অপবিত্রতাদূর করতে চান আর চান তোমাদেরকে পরিপূর্ণ পবিত্র রাখতে"

সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) ছিলেন সম্মানিত আহলে, বায়েতেরই একজন সদস্য এবং উল্লেখিত আল্লাহর বানীর অন্তর্ভূক্ত। রাসূল (সঃ) তাঁদের সম্পর্কে নিজেও বলেনঃ

Dhaka University Institutional Repository

"হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়েত। সুতরাং তাদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র রেখো"। এ হাদীছটি, সহীহ মুসলিম, বাগাবী, জারীর প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হযরত আয়শা উম্মে সালমা, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস প্রমূখের সনদ দ্বারা সুপ্রমানিত।

"সুতরাং আহলে বায়েতদের সম্পর্কে তথা হযরত হুসায়ন (রাঃ) সম্পর্কে কু-ধারনা পোষণ করা, তাঁর সমালোচনা করা, অথবা তাঁর সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করা, নিঃসন্দেহে শরীয়ত বিরোধী কাজ। বস্তুত ইহা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। কারণ দৃষ্টি ভঙ্গি হয় বুদ্ধিজাত আর আকীদা গঠিত হয় আল্লাহ ও রসূলের সংবাদের ভিত্তিতে। আকীদার অপর নাম দ্বীন। পক্ষান্তরে দৃষ্টি ভঙ্গি হয় অনুমান প্রসূত। সুতরাং হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বিষয়টি একটি আকীদা গত ব্যাপার যা আল্লাহ ও রসূল (সঃ) এর সংবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গি চাই তা দার্শনিক হোক বা ঐতিহাসিক হোক, আকীদার সাথে বিরোধ দেখা দিলে, তখন আকীদাকে ঠিক রেখে একটা যথাযোগ্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গিকে আকিদার অনুকূলে করে নিতে হবে।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) ছিলেন অসম সাহসের অধিকারী দৃঢ় সংকল্পচিত্ত এক মহান বীর পুরুষ। ঐতিহাসিক কারবলার ঘটনার মধ্য দিয়ে তা আরো বিকশিত হয়ে ফুটে উঠেছে। যাকে তিনি সত্য বলে মনে করেছেন তার খাতিরে প্রাণ উৎসর্গ করাকে বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু অন্যায় ও অসত্যের সামনে মাথানত করাকে মেনে নেননি কখনো। তাইতো বন্ধুবিহীন, সহযোগী ছাড়া, নিঃসঙ্গ হয়েও একাই লড়ে গেছেন তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে এবং এ পথেই পান করেছেন শাহাদতের অমীয় সুধা।

আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছীর হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শ্রেষ্টত্ব মহাত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কিত যে সমস্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন তা হলোঃ "ইবন আবি নুঈম বলেন - আমি আবদুল্লাহ বিন ওমরকে বলতে শুনেছি যে, একদা এক ইরাক বাসী তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করল মাছি মারা যায়েজ কিনা, তখন তিনি উত্তরে বললেন ইরাকবাসীরা মাছি মারা যায়েজ কিনা জিজ্ঞাসা করে অথচ তারাই রসূল (সঃ) এর প্রিয়তম কন্যার পুত্রকে হত্যা করেছে। অথচ রসূল (সঃ) হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন "তারা দুজন দুনিয়ার সুঘ্রান" আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রসূল (সঃ) বলেছেন, "যারা হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ)কে ভালো বাসে প্রকৃত পক্ষে তারা আমাকেই ভালো বসে। আর যারা তাদের দুজনের সাথে শত্রুতা করে তারা প্রকৃত পক্ষে আমার সাথেই শত্রুতা করে।"

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিজি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন যে, একদা রাসুল (সঃ) হাসান (রাঃ), হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ) এর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন - তোমাদের সাথে যারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে আমিও তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হব। আর যারা তোমাদের সাথে শান্তি রক্ষা করে চলবে আমি তাদের সাথে শান্তি রক্ষা করবো।[৫০]

"আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "একদা রাসূল (সঃ) আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন, তখন তার সাথে ছিলেন হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) তাদের একজন ছিলেন রাসূল (সঃ) এর ডান কাঁধে অপরজন ছিলেন বাম কাঁধে, আর রাসূল (সঃ) তাদের একজনকে একবার এবং অন্য জনকে আরেক বার চুমু দিচ্ছিলেন, আর এ অবস্থায় আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হলেন, তখন আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো হে আল্লাহর রাসূল আপনি তো এদের দুজনকে খুব ভালো বাসেন, তখন রসূল (সঃ) বললেন- হ্যাঁ, যে এদের দুজনকে ভালোবাসবে মূলত সে আমাকে ভালো বাসে, আর যে এদের সাথে শত্রুতা করে সে মূলতঃ আমার সাথে শত্রুতা করে, আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন- একদা এক ব্যাক্তি রসূল (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করল- হে আল্লাহর রসূল আহলে বায়েতের মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় কে? উত্তরে রসূল (সঃ) বললেন- হাসান এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) আনাস (রাঃ) বলেন- রাসূল (সঃ) মা ফাতিমার বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তা দিয়ে ৬মাস যাতায়াত করতেন, এ সময় যখনই ফজরের নামাযের সময় সেখান দিয়ে যেতেন তখনই বলতেন-হে আমার আহলে বায়েত- নামায ! অর্থাৎ নামাযের সময় হয়েছে, তোমরাও নামাজের জন্য প্রস্তুত হও। এ সময় তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করতেন।

"হে আমার আহলে বায়েত আল্লাহ তোমাদের পাপারাজী ক্ষমা করতে চান এবং তোমাদের কে পাক পবিত্র রাখতে চান।[৫১]

"হযরত বারা (রাঃ) বলেন- রাসূল (সঃ) হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলতেন হে আল্লাহ আমি এদের দুজন কে ভালো বাসী তুমিও এদের দুজনকে ভালো বাসিও"।[৫২]

হযরত বুরাইদা (রাঃ) বর্ণনা করেন তাঁর পিতা থেকে, একদা রাসূল (সঃ) মাসজিদের মিনারে দাড়িয়ে খোতবা দিচ্ছিলেন- এমন সময় হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) লাল জামা পরিহিত অবস্থায়

হাঁটি হাঁটি পা-পা করে তার দিকে আসছিলেন -তা দেখে রাসূল (সঃ) মিম্বর থেকে নেমে পড়ে তাদের দুজনকে কোলে তুলে নিয়ে এসে নিজের সামনে বসালেন অতঃপর স্নেহ ভরে বললেন-আল্লাহ ঠিকই বলেছেন "নিশ্চয়ই তোমাদের ধন সম্পদও সন্তান সন্ততি ফিতনা",[৫৩] আমি এদের দুজনকে এভাবে আসতে দেখে ঠিক থাকতে পারলাম না-যতক্ষন না তাদেরকে তুলে আমার নিকট নিয়ে আসলাম।

ইয়া'লী বিন মুররা থেকে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন -"হযরত হুসায়ন (রাঃ) আমার শরীরের অংশ যে হযরত হুসায়ন (রাঃ)কে ভালো বাসবে আল্লাহও তাকে ভালো বাসবেন।"

ইমাম আহম্মদ ও ইমাম তিরমিজি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, "হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) বেহেস্তের যুবকদের সর্দার"

হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) আমাকে ইশার নামাজের পর বললেন এই মাত্র আমার নিকট একজন ফেরেস্তা এসেছিলেন, যিনি এরপূর্বে কখনও দুনিয়াতে আসেন নি, তিনি তার পতিপালকের নিকট থেকে এ অনুমতি নিয়ে এসেছিলেন যে, তিনি যেন প্রথমে আমাকে সালাম দেন, অতঃপর আমাকে যেন এ সুসংবাদ দেন যে, ফাতিমা (রাঃ) বেহেস্তের সমস্ত নারীদের নেত্রী, আর হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) বেহেস্তের সমস্ত যুবকদের নেতা।[৫৪]

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন- "আমরা একবার রাসুল (সঃ) এর সাথে ইশার নামায পড়েছিলেন এমন সময় হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) রসূল (সঃ) এর পিঠের উপর সওয়ার হলেন- তারপর তিনি যখন সিজদা থেকে মাথা উঠালেন তখন তিনি তাদের দুজনকে আলতো ভাবে ধরে মাটিতে বসালেন, এরপর তিনি আবার সেজদায় গেলে তারা আবার পিঠের উপর সওয়ার হলেন- আর এরূপ করতে করতেই রাসূল (সঃ) নামায শেষ করে ফেললেন। তারপর তিনি তাদের দুজনকে নিজের রানের উপর বসালেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,-আমি তখন রাসূল (সঃ) এর নিকট দন্ডায়মান হয়ে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ- আমাকে দিন আমি এদেরকে তাদের মায়ের নিকট পৌছে দিয়ে আসি। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন- তখন রাসূল (সঃ) তাদের দুজনকে আদর করলেন এবং বললেন যাও মায়ের কাছে যাও। এ বলে তিনি আমার মারফতে তাদেরকে তাদের মায়ের কাছে পৌছে দিলেন।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা হাফিজ ইবন কাছির হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর এ সকল ফজিলত সম্পর্কিত হাদীছ গুলো বিস্তারিত সনদসহ আল বেদায়া ওয়ান নেহায়ায় বর্ণনা করেছেন।

ছোট বেলা থেকেই হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পুতঃ পবিত্র চরিত্রের ব্যবধান ছিল প্রচুর। হাসান (রাঃ) এর স্বভাবগত চরিত্র ছিল সন্ধি ও শান্তি প্রিয়তা, এবং এর বিপরীত হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর চারিত্রে ছিল আল্লাহর ভালোবাসার জন্যই কাউকে ঘৃণা করা। কিন্তু একেই মাহমুদ আব্বাসী সাহেবের তাঁকে কলহ প্রিয় ও দ্বন্দ্ব কামী বলে উল্লেখ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং বাস্তবতা বিবর্জিত। বরং হাসান (রাঃ) এর চরিত্রে ছিল আল্লাহর জন্য কাউকে ভালো বাসার প্রভাব বেশী, অপর হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর চরিত্রে ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করার প্রভাব বেশী। আর এ উভয় অবস্থায়ই পূর্ণ ইমানের দুটি উচ্চস্তর বিশেষ। আল্লাহর নবী বলেন, "যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোসাসে এবং আল্লাহর জন্যই দুশমনি পোষন করে; আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করা থেকে বিরত থাকলো সে তার ইমান পূর্ণ করলো।[৫৬]

মূলতঃ এ দুটি গুন আম্বিয়ায়ে কেরামের বিশিষ্ট। তাদের সৌজন্যেই তাদের উত্তরাধিকারী গণ এগুলো লাভ করে থাকেন।

রাসূল (সঃ) নিজেই বলেন ঃ "আমি রহমত আকারে প্রেরিত হয়েছি আবার যুদ্ধের আকারেও" অন্যত্র বলেন, "আমি সন্তুষ্ট চিত্র আকার রুদ্রমূর্তিও।

আলোচ্য হাদীছ থেকে বুঝা যায় যুদ্ধ ও সন্ধি উভয়ই নবুয়তের বৈশিষ্ট্য। এক বৈশিষ্ট্যের কারণে নবীগন জগতের জন্য রহমত স্বরূপ আবার অন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য জগতবাসীর জন্য ভীতি স্বরূপ। কোমলতা ও কঠোরতা উভয়ই ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। আর এর সম্মিলনেই মানুষ হতে পারে আল্লাহর পরম প্রিয়।

হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর চরিত্রে এ উভয় গুনের সমন্বয় ঘটেছিল। তবে হাসান (রাঃ) এর স্বভাবে কোমলাতার প্রাধান্য ছিল বেশী। পক্ষান্তরে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর চরিত্রে কঠোরতা ও দৃঢ়তার প্রধান্য ছিল। আর এ জন্যই হাসান (রাঃ) একমাত্র আল্লাহকে রাজী করবার উদ্দেশ্যেই স্বীয় বৈধ অধিকার এবং করায়ত্বগত বৈধ সাম্রাজ্য পর্যন্ত হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর অনুকুলে ছেড়ে দিতে কুণ্ঠিত হননি। পক্ষান্তরে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দৃষ্টি ছিল অন্যায়

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচার এর প্রতি। আর তাই তিনি একমাত্র আল্লাহকে রাজী খুশী করবার উদ্দেশ্যেই এগুলো উৎখাত করার জন্য তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেন। আর এজন্যই তার চরিত্রে অসত্যের উৎখাত, অন্যায় কারীকে শায়েস্তা করা এবং অত্যাচারীদের দ্বারা অধিকৃত অধিকার, পূণঃ উদ্ধার করে তার মূল হকদারদের নিকট পৌছে দেওয়ার প্রেরনাই ছিল প্রবল।

হাসান (রাঃ) এর চরিত্রে ছিল সিদ্দিক সুলভ চরিত্রের ছাপ। আর এজন্যই তার সমস্ত কাজকর্ম ছিল দুনিয়া বিমুখতা ও পরকাল নীতির স্বপক্ষে। যা রাসূল (সঃ) হযরত আবু বরক সিদ্দিক (রাঃ) শানে এরশাদ করেছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর চরিত্রে ছিল শানে ফারুকিয়্যাত। আর এজন্যই তার সকল কর্মকান্ড ছিল "শক্তিশালী, বিশ্বস্ত, যে আল্লাহর ব্যাপারে কারও তিরস্কারকে তোয়াক্কা করেনা" রাসূল (সঃ) ওমর (রাঃ) এর শানে এ বানীটি উচ্চারণ করেছিল।

তবে হাসান (রাঃ) এর দয়া করুনা যা সিদ্দিকিয়্যাত চরিত্রের বৈশিষ্ট, তা কেবল পার্থিব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিলনা। বর্তমান যুগের লোকেরা যাকে কুটনৈতিক সমঝোতা ও আপোষ কামিতা বলে থাকে। কারণ এসকল কথার দ্বারা পার্থিব স্বার্থে সাধারণ মানুষের মন জয় করার গন্দ পাওয়া যায়। এ থেকে তিনি সম্পূর্ন মুক্ত ছিলেন। অপরদিকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মন ছিল উদ্যমশীল, কর্মচঞ্চল ও অসত্যের ঘৃণায় ভরপুর। আর ইহাই ফারুকিয়্যাত এর বৈশিষ্ট্য। তবে এ সব গুনাগুন পার্থিব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিলনা। সাধারণ মানুষ যাকে উপদলীয় কোন্দল নামে অভিহিত করে থাকে। আর এতে সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়ার অবকাশ থাকে। বস্তুত তিনি এসকল দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। মূলতঃ এ দুটি গুনাগুন আধ্যাতিকতার দু'টি উন্নত স্তরের নাম। বস্তুত এগুলো আল্লাহ ওয়ালাদের আত্মোৎকর্ষতার অতি উন্নত আধ্যাত্মিক স্তর বিশেষ।

নবী প্রেম জনিত আত্ম-মর্যাদার সম্মানে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর জীবন ছিল ভাস্বর। অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও অন্যায়ের প্রতিরোধ যার কর্ম ধারায় পরিস্ফুট। শেষ পর্যন্ত তিনি এই জুলুম ও অন্যায়ের প্রতিকার করতে যেয়ে নিজের জীবনের বিনিময়ে শাহাদতের মর্যাদায় উন্নিত হয়েছিলেন সুতরাং তার সম্পর্কে জনাব মাহমুদ আব্বাসীও ঐতিহাসিক ডোযী যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয়। বরং তা তাঁর মহান চরিত্রের একটা হীনতম অপব্যাখ্যা মাত্র এবং তাঁর গুনাগুনকে দোষে পরিণত করার অপকৌশল মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১১ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাহাবীয়ত প্রসঙ্গ

সর্বসম্মতি ক্রমে হযরত আলী (রাঃ) এর বিবাহ হয় হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরে আর বাসর শয্যা হয় বদর যুদ্ধের পরে। দ্বিতীয় হিজরীর রমযানের ১৭ তারিখে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হাফেয আবদুল গনী মকদসী লিখেছেন, হযরত হাসান (রাঃ) তৃতীয় হিজরীর রমযানের মধ্যভাগে আর হযরত হুসায়ন (রাঃ) ৪র্থ হিজরীর ৫ই সাবানে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। রাসূল (সঃ) ৬৩ বৎসর বয়সে ১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এসসয় হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বয়স ছিল ৮ বৎসর ৭মাস ৭দিন।

এ ব্যাপারে হাফিজ ইবন কাছীর বলেন ঃ হযরত হুসায়ন (রাঃ) রাসূল (সঃ) সম সাময়িক ছিলেন এবং তিনি রাসূলে পাক (সঃ) এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন, এ অবস্থায় রাসূল (সঃ) ইন্তেকাল করেন যে তিনি তাঁর প্রতি সন্তষ্ট ছিলেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) তখন অল্প বয়সের বালক ছিলেন।[৫৭]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, " হযরত হুসায়ন (রাঃ) ছিলেন মুসলমানদের নেতা ও জ্ঞানী সাহাবী এবং রাসূল (সঃ) এর মহিয়সী মেয়ের সন্তান। তিনি একজন আবেদ বীর পুরুষ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।[৫৮]

হাফেজ ইবন হাজারের পূর্বসূরী হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী-যিনি সুফীও ছিলেন, তিনি তাঁর "তাজরীদ" গ্রন্থে হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ)কে সাহাবীদের শ্রেনীভূক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত পুস্তকের ১৪০ পৃষ্টায় হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর আলোচনা সন্নিবিশিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাহাবিয়্যাৎ ঘোষণা দিয়ে "ফাযায়েলে সাহাবা" শিরোনামের অধীন "মানাকেবে হযরত হুসায়ন (রাঃ)" নামে বুখারী শরীফে একটি অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ ইমাম মুসলিমও তৎপ্রণীত গ্রন্থে "মানাকেবে সাহাবার" অধীন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাহাত্ম্ব সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েত গুলো উল্লেখ করেছেন। ফলে হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাহাবীয়ত কার্যত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের অভিন্ন ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ হাদীছ বিশারদ তথা-ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম যাহাবী, হাফেজ ইবনে আবদুল বার, আহমদ ইবন কাদীর, হাফেজ ইবন হাজার প্রমূখ সহ সমস্ত ফুকাহা, হাদীস বিশারদগন ও মুতাকাল্লিমুন সকলেই হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষন করেছেন।

ইতিহাস গবেষণার দৃষ্টিতে আরেকটু সম্প্রসারিত করা হলে বলা যায়- তিনি যে কেবল একজন সাহাবী রূপেই স্বীকৃত হবেন-তাই নয়। বরং বর্ণনাকারী সাহাবী হিসেবেও পরিগণিত হবেন। সে অবস্থায় সাহাবী হওয়ার জন্য যে শর্ত অর্থাৎ ইমানের সাথে রাসূল (সঃ) এর সহচার্য, সান্নিধ্য ও সংসর্গলাভই প্রমান হয়না, বরং সাথে সাথে হাদীসের শ্রবণ অতঃপর বর্ণনা করার মত সম্মান জনক বিষয়টিও প্রমানিত। বস্তুত এটা তার সাহাবিয়ৎ সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে প্রমানের ক্ষেত্রে আর একটি স্বতন্ত্র দলীল।

হাফেজ ইবন হাজার তার প্রণীত গ্রন্থ তাহযীবুত তাহযীব এ বলেনঃ-

"হযরত হুসায়ন (রাঃ) ইবন আলী রাসূল (সঃ) এর বংশধর ও ইহজগতে তার সুগন্ধি স্বরূপ। তিনি জান্নাত বাসী যুবকগণের নেতা। তিনি তার মাতামহ, তাঁর পিতা, উমার ইবনে খাত্তাব, এবং তার মামা-হিন্দ-ইবন আবি হালা প্রমূখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আবার তার কাছ থেকে হাসান ইবনে আলী (রাঃ) সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন।[৫৯]

হাফেজ ইবন আবদুল বার -যিনি হাফেজ ইবন হাজারেরও পূর্ববর্তী ছিলেন- তিনি তৎপ্রণীত আল-ইস্তিয়াব লি.মা.রিফাতি ফাতিল আসহাব শীর্ষক গ্রন্থে এমন অনেক গুলো হাদিছের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন -যা হযরত হুসায়ন (রাঃ) সরাসরি রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

যেমন হযরত হুসায়ন (রাঃ) রাসূল (সঃ) এর এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন "লোকদের ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থ বস্তু সমূহকে পরিহার করা।[৬০]

অথচ "খিলাফতে মুআবিয়া ও ইয়াযিদ" গ্রন্থের লেখক এবং গবেষক মাহমুদ আববাসী হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে সাহাবী নয় বলে প্রমান করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন নবী পাকের ইন্তেকালের সময় হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বয়স ছিলমাত্র পাঁচ বৎসর। আর এতটুক

Dhaka University Institutional Repository

বয়স বুদ্ধির বয়স নয়। অথচ ইমাম বুখারী সাহাবীর সংগায় বলেন "যিনি রাসূল (সঃ) এর সান্নিধ্য লাভ করেছেন অথবা ইমানের হালাতে তাঁকে দেখেছেন তিনি সাহাবী। এখানে বয়সের কোন শর্তই করা হয়নি। কোন কোন আলিম বালিগ হওয়ার শর্ত আরোপ করেছিলেন-কিন্তু মুহাদ্দিস গণ তা প্রত্যাখান করে দিয়েছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন- "কেউ কেউ রাসূল (সঃ) এর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে বালিগ হওয়ার শর্ত আরোপ করেন, কিন্তু একথাটি রদ হয়ে গেছে।"

অপর পক্ষে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বয়স তখন পাঁচ বছর ছিল এটাও ঠিক নয়। যদিও মাহামুদ আববাসী সাহেব মাত্র পাঁচ বছর উল্লেখ করেছেন, হাফিজ ইবন হাজারের উদ্ধৃতি পেশ করে। অথচ ইবনে হাজারের ভাষ্য এরূপ "হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ) নবী (সঃ) এর যিন্দেগীর পাঁচ বৎসর বা "তদানুরূপ" পেয়েছেন।[৬১]

এখানে স্পষ্ট খামছন অর্থাৎ এর পর পাঁচ আও নাহওয়াহু বা তদানুরূপ শব্দ উল্লেখ আছে। সুতরাং মাত্র পাঁচ বসর অর্থাৎ মাত্র শব্দ যোগ করার কোন সুযোগ নেই।

অথচ সর্ব সম্মত রায় হলো হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বয়স তখন সাত বছরের বেশী ছিল। আর এ সময় বিবেক বুদ্ধির সময় এবং শরীয়তের হুকুম আহকাম-ওয়াজিব হওয়ার সময়। রাসূল (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের শিশুরা যখন সাত বছর বয়সে উত্তীর্ণ হয়, তখন তাদের নামাজের আদেশ দাও।"[৬২]

সুতরাং হযরত হুসায়ন (রাঃ) সাহাবী ছিলেন এ ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই।

অতএব কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক উম্মতের উপর সাহাবাদের যে অধিকার আরোপিত হয়েছে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ব্যাপারেও সে সমস্ত অধিকার ও কর্তব্য মেনে নিতে হবে।

এমনি ভাবে সাহাবীদের বিরুদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ কারীর জন্য যে বিধান রয়েছে, নিঃসন্দেহে তা হযরত হুসায়ন (রাঃ) বিরোধিতা কারীদের জন্যও তা প্রয়োজ্য হবে। বস্তুত সাহাবীয়ত এমন একটি সম্মানিত পদের নাম যার মর্যাদা ও মহানত্ব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) ই সম্যক বলতে পারেন। প্রকাশ থাকে যে, কুরআনে করীম ও হাদীছে রসূল (সঃ) এক বিশেষ শ্রেণী হিসেবে সাহাবীদের শ্রেণী ব্যতিত অন্য কোন শ্রেণী বা দলের মাহাত্ম ও পবিত্রতার বর্ণনায় ব্যপৃত হননি।

Dhaka University Institutional Repository

এতে সাহাবীদের সকল ব্যাক্তিত্বকে বিশুদ্ধ চিত্ত, ন্যায়নিষ্ট, আত্ম-বিশ্বাসী ও আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি আমানতের হেফাজতকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুরা তওবাতে সাহাবীদের সমষ্টি জামাআতকে সন্তষ্টচিত্ত ও সন্তোষ ভাজন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, "মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম সারির আর যারা তাদের অনুসরণ করে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তষ্ট।[৬৩]

বলা বাহুল্য, আল্লাহর প্রতি তাঁদের সন্তুষ্টি থাকার একমাত্র অর্থ হচ্ছে এই যে, তাঁরা আল্লাহর প্রতিটি কাজে সন্তষ্ট তার নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি সন্তষ্ট, চিত্ত ও তার নিরংকুশ ক্ষমতার ব্যাপারে আস্থাশীল।

অপরদিকে তাঁদের প্রতিও আল্লাহ সন্তষ্ট, এর অর্থ এই যে, তাঁদের প্রকাশ্যও অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ের প্রতি তিনি সন্তষ্ট। তাঁদের সমূহ নিয়্যাত ও সংকল্পের প্রতি প্রসন্ন এবং তাদের চরিত্র ও কর্মের ব্যাপারে আস্থাবান। বলা বাহুল্য যে, কুটিল চিত্ততা বড় সংকল্প, ও ফিৎনা ফাসাদ পূর্ণ মুআমালাতের ক্ষেত্রে সন্তষ্টির কোন অর্থই হতে পারে না।

আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে আরো বলেন, "আল্লাহ তায়ালা ইমানকে তোমাদের (সাহাবীদের) কাছে প্রিয় করেছেন এবং উহাকে তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন। পক্ষান্তরে কুফর, ফিসক ও পাপা চারিতাকে করেছেন অপ্রিয়। আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহে তারা সৎপথের অধিকারী।"

আল্লাহ আরো বলেন, তাঁর (রাসূলের) সঙ্গীগন কাফিরদের বেলায় অতি কঠোর। পক্ষান্তরে নিজেদের মধ্যে তারা কোমল স্বভাব সম্পন্ন। তুমি তাঁদেরকে দেখবে যে, তারা রুকু অবস্থায় ও সিজদা অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার সন্তষ্টি তালাশ করে। তাদের পরিচয় তাদের চেহারায় সেজদার চিহ্ন। এগুলো তাদের গুণাবলী। তাওরাত ও ইঞ্জিলে তাদের উদাহরণ এই যে, যেমন কোন শস্য ক্ষেত্র, যাতে চারা গজিয়েছে তৎপর তা শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং নিজ কান্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা কৃষকদের চমৎকৃত করে, যেন কাফিররা হিংসানলে দগ্ধ হয়। আল্লাহ সৎকর্মশীল বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন।"[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর এ সকল বাণী দ্বারা প্রমানিত হয় যে, সাহাবীগণ কেবল ষড়রিপুর গ্রাসাচ্ছন্নতাকেই কাটিয়ে উঠেননি -বরং যাবতীয় নেক আমলের দ্বারা ছিলেন সুষমামন্ডিত। তাদের সার্বক্ষনিক ব্যস্ততা ছিল সমূহ ইবাদত বন্দেগীর কাজে আত্মনিয়োগ করা। আর এ জন্যই মহানবী (সঃ) সাহাবীদের প্রত্যেককে এক একটি হেদায়েতের নক্ষত্র বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সাহাবীদের প্রত্যেকেই এক একটি হেদায়েতের নক্ষত্র।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) ছিলেন একাধারে সাহাবী, হাদীস বর্ণনা কারী সাহাবী, রাসুল (সঃ) এর আহলে বায়েত এবং আহলে বয়েতের মধ্যে প্রিয়তম এবং বেহেস্তের সুসংবাদ প্রাপ্ত, এমনকি বেহেস্তের যুবকদের নেতা হিসেবে সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যাক্তিত্ব সুতরাং তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা নিছক ব্যক্তিগত তথা দুনিয়াবী স্বার্থে হতেই পারেনা, বরং তা ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক সাহসী পদক্ষেপ। সুতরাং তার এ পদক্ষেপকে অপব্যাখ্যা করার অর্থ হবে নিজেদের মূর্খতা ও স্বার্থবাদীতার এক জলন্ত প্রমান।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১২ কারবালার ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলের ভবিষ্যৎ বাণী

বিশ্ববিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য আরবী ইতিহাস গ্রন্থ আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়াতে আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছির এমন কতক গুলো হাদীছ ও ঘটনার উল্লেখ করেছেন তাতে বুঝা যায় কারবালার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সঃ) পূর্বেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। যেমনঃ

মুহাম্মদ বিন সা'দ, হযরত আলী (রাঃ) বিন আবু তালিব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) একদা, কারবালা প্রান্তরের যানজাল নামক বৃক্ষের পার্শ্ব দিয়ে সিফফিনের দিকে যাচ্ছিলেন-এমন সময় তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন এ জায়গার নাম কি, লোকেরা বললো কারবালা। আলী (রাঃ) এটা শুনে শিহরিয়ে উঠেন এবং বলেন কারব ওয়া বালা! (কঠিন ও বিপদ) আলী (রাঃ) তাঁর সওয়ারী থেকে সেখানে নামলেন এবং কয়েক রাকায়াত নামাজ পড়লেন- অতঃপর লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন -"এখানে সর্ব শ্রেষ্ট শহীদান শাহাদত বরণ করবেন, এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।" এ বর্ণনা পেশ করে মূলত তিনি তার সন্তান হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তার সাথীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ রাসূল (সঃ) তাকে এ ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করেছেন। যথাস্থানে তা উল্লেখ করা হবে। লোকেরা হযরত আলী (রাঃ) কাবালার এ প্রান্তর সম্পর্কে আরো অনেক কথা বললেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এ কারবালা প্রান্তরেই শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন। রাবী কা'ব আল আহবার কারবালার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কিত আছার হাদীছ বর্ণনা করেন। অনুরূপ ভাবে আবু জানাবও আল কালাবী থেকে এবং আরো অনেকের থেকেই এ হাদীছ পাওয়া যায় যে, কারবালা এলাকার লোকেরা প্রায়ই জ্বীনদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেত। জ্বীনরা কান্নার মধ্যে আরবী কবিতা উচ্চারণ করতো যার অর্থ এরূপ

"রাসুলুল্লাহ তাঁর কপালে চুমু দেন, আর গালে সোহাগ ভরা আদর,

পিতা তার শেষ্ট কুরাইশী, নানা তার সর্বশেষ্ট সৃষ্টি।

কারবালার লোকেরাও তাদের সাথে সুর মিলিয়ে কবিতা আকারে বলতো যার অর্থ এরূপ ঃ

কতইনা নিকৃষ্ট সেই সেই সৈন্যদল, যারা নবীর প্রিয়তম কন্যার পুত্রকে

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা করে নিঃশেষ করে দিবে।"

ইবনে আসাকীর তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে কিছু সংখ্যক লোকের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, একদা তারা রোম বিজয়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে গমন করে সে স্থানে পৌছে দেখতে পান - রাজসিংহাসনের দেয়ালে লেখা "তোমরা নবীর কেমন উম্মত? যে তোমরা তার দৌহিত্রকে বিনা অপরাধে হত্যা করবে? অথচ তার নানার সুপারিশের আশা পোষণ করবে।"

সৈন্যগন যেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন এ দেয়াল লিখন কে লিখেছে ? লোকেরা উত্তরে বললো- তোমাদের নবীর আগমনেরও তিন শত বছর পূর্বে ইহা এখানে এভাবে লিখিত রয়েছে।[৬৫]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন -আমি দ্বিপ্রহরে নিদ্রাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে সপ্নে মাথার চুল এলো মেলো অবস্থায় দেখতে পেলাম, তার পার্শে ছিল রক্ত ভর্তি একটা পেয়ালা। আমি বললাম আমার আব্বা আম্মা আপনার উপর কুরবান হোক ইয়া রাসুলুল্লাহ ইহা কিসের রক্ত? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ইহা হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তার সাথীদের রক্ত।[৬৬]

আম্মার (রাঃ) বলেন- ইবনে আব্বাসের স্বপ্নের কথা শুনার পর থেকে আমি ঐ দিনটির কথা স্বরণে রেখেছিলাম। তা ছিল ১০ই মহররম তথা আশুরার দিন। আর পরবর্তীতে দেখলাম হযরত হুসায়ন (রাঃ) ঠিক ঐ একই দিনে কারবালায় শহীদ হয়েছেন। ইমাম আহমদ একাই এ হাদীস বর্ণনা করলেও তাঁর সনদ সুত্র শক্তিশালী, এ বর্ণনা সুত্রের কোন স্থানে কোন দুর্বল রাবী নেই।

ইবনে আবিদ দুনিয়া প্রায় অনুরূপ হাদীছই বর্ণনা করেছেন- আলী বিন যায়েদ থেকে। আলী বিন যায়েদ বলেন আমি একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে নিদ্রা থেকে ত্রস্ত হয়ে জাগ্রত হতে দেখলাম। তিনি জাগ্রত হয়েই বলতে লাগলেন- আল্লাহর কছম হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিহত হয়েছেন। তখন তার সাথীরা জিজ্ঞাসা করলেন কি কারণে? তিনি বললেন আমি এই মাত্র রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে স্বপ্নে দেখলাম যে তাঁর হাতে রয়েছে রক্তের পিয়ালা। রাসুলুল্লাহ (সঃ) পেয়ালাটি আমাকে দেখিয়ে বললেন, "জানো কি আমার উম্মতগন আমার মৃত্যুর পর কি করবে? তারা হযরত হুসায়ন (রাঃ)কে হত্যা করবে। এই দেখো হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তার সাথীদের রক্ত। আল্লাহ আগেই এ রক্ত ধরে

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছেন।" বর্ণনা কারী বলেন-ইবনে আব্বাস (রাঃ) তার এ স্বপ্নের বিবরণ, সময়, তারিখ ও দিনের নাম লিখে রাখলেন। এরপর মাত্র ২৪দিন গত হলো হঠাৎ করে মদীনায় খবর এলো হযরত হুসায়ন (রাঃ) ঠিক ঐ একই দিনে একই সময়ে শাহাদত বরণ করেছেন।

ইমাম তিরমিজি রযীন এর বরাত দিয়ে বলেন- রযিন বলেন, আমি একদা উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি কাঁদছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া উম্মুল মোমেনীন আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তরে বললেন "আমি স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে দেখতে পেলাম এমতাবস্থায় যে, তাঁর মাথা ও দাঁড়ি মুবারকে মাটি লেগে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসুল আপনার কি হয়েছে? আল্লাহর রাসূল জবাবে বললেন এই মাত্র হযরত হুসায়ন (রাঃ) আমার সামনে নিহত হলো। আর এ জন্যই তুমি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পাচ্ছো।[৬৭]

অন্যত্র মুহাম্মদ বিন সা'দ শহর বিন হাওশব এর সনদে বর্ণনা করেন, শহর বিন হাওশব বলেন- আমরা একদা রাসুলের স্ত্রী হযরত উম্মে সালমার বাড়ীর পার্শ্বে অবস্থান করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ করে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন এই মাত্র হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিহত হলো। তিনি একথা বলার সাথে সাথে আরো বললেন আল্লাহ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যাকারীদের ঘর/কবর আগুনে পূর্ণ করুন (বর্ণনা কারীর সন্দেহ, তিনি কবরের কথা নাকি ঘরের কথা বলেছেন) এসময় তাঁকে খুবই বিষন্ন দেখাচ্ছিল। আমরা তাঁর কাছে কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ইমাম আহমাদ (রাঃ) আম্মার এর সনদে বর্ণনা করেন আম্মার বলেন- আমি উম্মে সালমা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি "আমি জ্বীনদেরকে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর জন্য কান্না করতে শুনেছি। তিনি আরো বলেন -আমি জ্বীনদের বিলাপ করে কান্না করতে শুনেছি।" হাশিম বিন হাশিম তার মা থেকে বর্ণনা করেন। তার মা বলেন আমি উম্মে সালমা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, জ্বীনেরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর জন্য বিলাপ করে কান্না করার সময় কবিতাকারে বলতো (অর্থ)

"হে মুর্খের জাতি, তোমরাই হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যা কারী?
তোমরা আজাব ও লাঞ্ছিত হওয়ার দুঃসংবাদ লও।
আসমান বাসীগণ তোমাদের উপর লা'নত করেছে

Dhaka University Institutional Repository

নবী রাসূল এবং আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যাক্তিগণ,

এবং ইবনে দাউদ, মুসা ও ইঞ্জিলের ধারক গণ।"

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আনাস বিন হারেছ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট মালাকুল কাতার নামক বিশেষ প্রতিনিধি রাসূল (সঃ) এর দরবারে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইলেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমাকে বললেন-দরজার দিকে খেয়াল রেখো যেন কেহ এখানে প্রবেশ না করে, কিন্তু হঠাৎ করেই সেখানে হযরত হুসায়ন (রাঃ) বিন আলী (রাঃ) এসে দরজায় উকি দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাঁধের উপর গিয়ে বসলেন। তখন ঐ বিশেষ প্রতিনিধি তাঁকে বললেন, আপনি কি একে ভালোবাসেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন- আপনার উম্মতগণ তাকে হত্যা করবে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন-তাহলে আমি আপনাকে তার নিহত হওয়ার স্থান দেখাতে পারি, একথা বলেই তিনি তার হাত সামনের দিকে এগিয়ে দিলেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার হাতে লাল মাটি দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সে মাটি উম্মে সালমা (রাঃ) এর হাতে দিলেন। তিনিটি মাটি কাপড়ে পুটলি করে রেখে দিলেন।[৬৮] আনাম (রাঃ) বলেন- আমরা তখন একথাও জানতে পারলাম যে, তিনি কারবালা নামক স্থানে নিহত হবেন।

ইমাম আহমদ অন্য সূত্রে আবদুল্লাহ বিন সাঈদ থেকে আর তিনি তার পিতা থেকে, পিতা মা আয়েশা (রাঃ) থেকে অথবা (বর্ণনা কারীর সন্দেহ) উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন- রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- একদা এক ফেরেস্তা আমার নিকট আসলেন -যিনি ইতি পূর্বে কখনো আমার নিকট আসেননি, তিনি আমাকে বললেন -আপনার এ পুত্র হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিহত হবেন। আপনি চাইলে আমি আপনাকে তার নিহত হওয়ার স্থান দেখাতে পরি। বর্ণনা করী বলেন একথা বলেই তিনি লাল বর্ণের মাটি তাকে দেখালেন।[৬৯] হাফেজ ইবনে কাছীর এ ঘটনাটি বিভিন্ন সনদ সূত্রে প্রায় একই রূপ বর্ণনা করেছেন।

অন্য সূত্রে কাসিম আল বগবী আনাস বিন হারিছ এর সূত্রে বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে, আমার এক পুত্র {অর্থাৎ নিজের দৌহিত্র হযরত হুসায়ন (রাঃ)} কারবালা নামক স্থানে নিহত হবে। তোমাদের মধ্যে যারা তখন সেখানে উপস্থিত থাকবে তাকে সাহায্য করিও। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সাঃ) এর উপদেশ মোতাবেক হযরত আনাছ বিন

Dhaka University Institutional Repository

হারেছ (রাঃ), হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে কারবালা প্রান্তরে গিয়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করেন। ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া এর সূত্রে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা বললেন, একদা হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে তিনিও ভ্রমনে বের হন- তাঁরা যখন সিফফিনের নিকটবর্তী নিনুয়া নামক স্থানে পৌছলেন তখন আলী (রাঃ) তাকে ডেকে বললেন "হে আবু আব্দুল্লাহ একটু থামো, হে আবু আবদুল্লাহ একটু থামো, এভাবে দুবার বললেন। যায়গাটি ছিল ফুরাত নদীর তীরবর্তী এলাকা, আমি তাকে বললাম এখানে আপনার কি ইচ্ছ ? আলী (রাঃ) উত্তরে বললেন, আমি একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম তাঁর দু'চোখে পানি গড়িয়ে পড়ছে, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আপনার কাঁন্নার কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার কান্নার কারন আছে, হযরত জিব্রাইল (আঃ) এই মাত্র আমাকে জানালেন - হুসায়ন ফুরাত তীরবর্তী এলাকায় নিহত হবে। হযরত আলী (রাঃ) আরো বলেন-তিনি আমাকে বললেন আমি কি তোমাকে তার নিহত হওয়ার স্থানের মাটির ঘ্রান নিতে দিব? আলী (রাঃ) বলেন, একথা বলেই তিনি তাঁর হাত মুবারক প্রশস্ত করলেন-অতঃপর তাতে এক মুঠো মাটি আমাকে দিয়ে বললেন- এ কারণেই অর্থাৎ এ মাটিতেই হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিহত হবে। আর এ জন্যেই আমি আমার চোখের পানি রোধ করতে পারছি না।[৭০] ইমাম আহমদ এ হাদীছটি মুফরাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৭১]

অপর পক্ষে হযরত হুসায়ন (রাঃ) যখন ইরাক তথা কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে যাচ্ছেন তখন অন্যান্যদের মত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) ও তাঁকে ইরাক যাত্রা থেকে বিরত থাকার জন্য চিঠি প্রেরণ করলেন- হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর উত্তরে লিখলেনঃ আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাকে একটি কাজ করতে আদেশ করলেন আর আমি তাই করতে যাচ্ছি। কিন্তু এর বিবরণ আমি আপনাদের জানাবো না যতক্ষণ না আমি সেয কাজটা করে ফেলি।[৭২]

এ প্রসংঙ্গে মুহাম্মদ বরকতল্লাহ তার কারবালা গ্রন্থে বলেন -"ইয়াযীদকে খলীফা বলে অস্বীকার করার পরিনাম যে কি তা তিনি ভালো ভাবেই বুঝতেন। মদীনায় অবস্থান করলে ইয়াযীদের সৈন্য সামন্ত তাঁকে ধরতে আসবে এবং মদীনা শহরে রক্তস্রোত বহাবে, এটা নিশ্চিত জেনে ইমাম মদীনা ছেড়ে মক্কা যেতে মনস্থ করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রার পূর্বে তিনি হযরতের রওজা ও জান্নাতুল বাকীয়ায় গিয়ে গুরুজনদের কবর যিয়ারত করলেন। নূর নবীর মাযারে বসে সারা রাত্র অশ্রুপাত করলেন এবং তাঁর জাগ্রত আত্মার নিকট এ মহাসংকটে কর্তব্যের নির্দেশ চাইলেন। এ অবস্থায় তিনি কখন যে রওজার পার্শ্বে ঘুমায়ে পড়েছেন তা জানতে পারেননি। ঘুমের মধ্যে প্রিয় নানাকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি ইমামের মাথা ক্রোড়ে নিয়ে বললেন বাছা যত কঠিন বিপদই আসুক তাতে ভেঙ্গে পড়োনা। মনে রেখো তুমি বেশীদিন দুনিয়ায় থাকবেনা; সত্বরই আমার নিকট চলে আসবে। এ অস্থায়ী জীবনের সুখ ও আরামের জন্য দুর্নীতি ও অধর্মের নিকট মাথা নত করিও না।"[৭৩]

সে দিন ছিল ৩রা শাবান, স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তির পর হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সকল দ্বিধা ও ভয় কেটে গেল। রজনী প্রভাত হলে তিনি আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবদের নিকট হতে বিদায় নিয়ে স্বপরিবারে মক্কায় রওয়ানা হলেন। চার মাস মক্কায় থাকা অবস্থায় উমাইয়া শক্তি সেখানেও তার জীবন নাশের ষড়যন্ত্র করছে জানতে পারলেন। ইতি মধ্যে কুফার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়, কুফাবাসীরা ইয়াযীদের বশ্যতা অস্বীকার করে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে তাঁর পিতার আসনে বসানোর সংকল্প করছিল। হযরত হুসায়ন (রাঃ) মদীনায় থাকতেই তাদের মত পরিবর্তনের কথা জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন কুফীদের মত এক অবস্থায় দীর্ঘ দিন থাকেনা। তাই তখন তিনি তাদের দিকে মনযোগ দেননি।

কিন্তু মক্কায় অবস্থান কালে তিনি দেখলেন- তাঁর সামনে এখন দু'টি মাত্র পথ বিদ্যমান। হয় মক্কায় বসে ইয়াযীদ বাহিনীর আক্রমনের প্রতীক্ষা করা অথবা কুফীদের আহবান মঞ্জুর করে তাদের সাহায্যে ইয়াযীদ বাহিনীর মোকাবেলা করা। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এ ব্যাপারে আত্মীয় স্বজন ও হিতাকাংখীদের পরামর্শ চাইলেন। সকলেই তাঁকে মক্কা ছেড়ে যেতে নিষেধ করলেন। এমন কি তার বংশের সর্বাপেক্ষা বয়োঃজ্যোষ্ট আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও বললেন- কুফাবাসীদের মতির কোন স্থিরতা নেই। তারা তোমার পিতার সাথে শত্রুতা করেছে, ভাই হাসানের সাথে শত্রুতা করেছে, তুমি হয়তো সেখানে গিয়ে দেখবে ইতি মধ্যে তারা আবার মত পরিবর্তন করেছে। হয়তো অন্য কোন প্রবলতর ব্যক্তির প্রভূত মেনে নিয়ে তারা তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে প্রস্তুত হয়েছে।[৭৪]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এতদ সত্ত্বেও তিনি কুফায় যেতে মনস্থ করলেন। হয়তো তিনি রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট থেকে স্বপ্ন মরফত এরূপ কাজের জন্যই আদিষ্ট হয়েছিলেন, যা তিনি মানুষের নিকট প্রকাশ করেন নি।

আর এজন্যই তিনি ইয়াযীদকে আমীরুল মো'মেনীন বলে স্বীকার করেননি। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এভাবেই ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করলেন। তিনি যদি প্রাণ রক্ষার্থে কিংবা কুটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে সাময়িক ভাবেও ইয়াযীদকে আমীরুল মোমেনীন বলে স্বীকার করতেন তবে দ্বীন ইসলাম টিকে থাকত না। তাহলে নামাজের ইমামতিত্বও পদাধিকার শক্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। রাষ্ট্রের নায়ক কিংবা গভর্ণর ও জেলার শাসকগণ অনাচারী হলেও পদাধিকার বলে মসজিদে ঢুকে ইমামের স্থান দখল করতো। সর্ব সাধারণ ধার্মিক মুসলমানগণ তাদেরকে বাধা দিতে পারতো না বা বাধা দিবার অধিকার থাকত না। আল্লাহ পারেক শোকর যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিজের প্রাণ দিয়েও দ্বীন ইসলামের ইজ্জত রক্ষা করে গেছেন। ইসলামকে তিনি তামাশায় পরিণত করতে দেননি। অনাচারী রাষ্ট্র নায়কের অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে পৃথিবীর অনেক ধর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে, ইসলাম সেই শোচনীয় পরিনতি থেকে রক্ষা পেয়েছে আহলে বায়েত গণের ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার দ্বারা।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- "আমার পরে ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দা গন স্বপ্ন ও ইলহামের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা পাবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেনঃ শয়তান কখনো আমার আকৃতি ধারন করে তোমাদের সামনে উপস্থিত হতে পারবেনা, এ সম্মান আল্লাহ তায়ালা আমাকে দিয়েছেন। তাই যে ব্যাক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখবে প্রকৃত পক্ষে সে আমাকেই দেখবে। অন্যত্র রাসুল্লাহ (সঃ) বলেছেন -"আমার মৃত্যুর পর যে আমার কবর যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবিত অবস্থায় আমর সাথে সাক্ষাৎ করলো, আর এমন ব্যাক্তিকে শাফায়াত করা আমার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়।"

আলোচ্য হাদীছ গুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে দেখা সত্য হয়। এবং তার নিকট থেকে কোন দিক নির্দেশনা পাওয়া ও সম্ভব। যা ইতিপূর্বের হাদীছে প্রমানিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায় হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদত সম্পর্কিত যে সব ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, তাও সম্ভব এবং তা বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ। যদিও ভবিষ্যৎ বাণী করা একমাত্র আল্লাহরই শান। কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটিতব্য কোন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁর নবীকে পূর্ব থেকেই জানিয়ে দেন, তখন তা আর অসম্ভব থাকে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ "তিনি (মোহাম্মদ) নিজেথেকে কোন কথা বলেন না, যতক্ষন না তার কাছে সে সম্পর্কে ওহী দ্বারা জানানো হয়।[৭৫] রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদত সম্পর্কিত বিষয় গুলো ওহীর মারফতে জেনেই বলেছিলেন- যা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। তবে প্রশ্ন হতে পারে - তাহলে রাসূলুল্লাহ- (সঃ) এ জন্য কষ্ট অনুভব করলেন কেন, তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো কেন, আবার তার নিহত হওয়ার সময়ে উম্মুল মো'মেনীন উম্মে সালমা (রাঃ) স্বপ্নে তাঁর (নবীর) মাথার চুল এলো মেলো, গায়ে কাদা মাটি লাগা অবস্থায় অর্থাৎ নবীর দুঃখ প্রকাশের অবস্থায় দেখলেন কেন? এর উত্তরও রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীসে পাওয়া যায়।

"রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন সন্তান সন্ততি হলো- গাছের ফল স্বরুপ, ফল গাছ থেকে ছিড়ে ফেললে গাছ থেকে যেমন কষ বের হতে থাকে-সেরূপ কোন মানুষের সন্তান মারা গেলে স্বাভাবিক ভাবেই তার চক্ষু দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে ও দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।" এতে সে যে আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট এমন কোন কিছু প্রকাশ পায় না।

অপর পক্ষে সাতটি বিষয়ের উপর ঈমান আনা মৌলিক ফরজের অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ আল্লাহর উপর বিশ্বাস, ফেরেস্তাদের উপর বিশ্বাস, আসমানী কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস, তাঁর রাসূল গণের উপর বিশ্বাস, কিয়ামতের দিবসে বিশ্বসি, ভাগ্যের ভালো মন্দের উপর বিশ্বাস, এবং মৃত্যুর পর পূনরায় জীবিত হওয়ার উপর বিশ্বসি।

মিশকাত শরীফে বাবুল কদর নামক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- "আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি জীবের ভাগ্য আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই লিখে রেখেছেন। তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর।" এ হাদীছটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে একই সনদে বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কারবালা প্রান্তরে নিহত হওয়া আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাপার এ বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। আর যে সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর ভবিষ্যৎ বাণী করাও অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহ তাঁর রাসুলকে ফেরেস্তা জিব্রইল মারফত তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৩ হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদতের যুক্তিকতা ও সার্থকতা

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাতের বিষয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কারবালার ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাক্তিবর্গ ও বিষয় স্পর্শ করা হয়েছে। তবে একটি বিষয় আলোচনা না করলে যেন অসম্পূর্ণ রয়ে যায়- তা হলো হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কারবালার ময়দানে শাহাদাতের সার্থকতা কি?

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিযে কারবালার ঘটনা পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কোন আবেগ বা উচ্ছাস তাড়িত হয়ে ক্ষমতার লোভে কারবালার প্রান্তরে অবতীর্ন হননি। রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত হলেও কারবালার ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) কি রাজ্য ও সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন এবং এজন্যেই কি তিনি প্রানোৎসর্গ করে গেছেন? কোন কোন ঐতিহাসিক যেমন ভোবী, আব্বাসী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিজেকে খিলাফতের অধিক যোগ্যতর মনে করতেন এবং স্বীয় অধিকার আদায় নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিযে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ভাগ্য সন্ধানী পুরুষ যিনি অভূতপূর্ব ভ্রান্তি, মানসিক বিকার গ্রস্থতা ও অযৌক্তিক ক্ষমতার মোহের দরুন দ্রুত ধাবিত হচ্ছিলেন ধ্বংসের গহবর পানে।

কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচনা করলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) খান্দানের উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র ওয়াকিফহাল আছেন, তিনি কখনো এ ভ্রান্ত ধারনা পোষণ করতে পারেন না যে, তারমতো লোক ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব হাসিলের জন্য কখনো মুসলমানদের মধ্যে খুন খারাবী করতে পারেন। যারা মনে করে তার খান্দান মুসলমানদের উপর রাজত্ব ও কর্তৃত্বের দাবীদার ছিল, কিছুক্ষনের জন্যে তাদের মতবাদ নির্ভুল বলে মেনে নিলেও হযরত আবুবকর থেকে হযরত আমীর মুআবিয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস একথা প্রমান করবে যে, কর্তৃত্ব লাভের জন্যে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং খুনখারাবী করা কখনো এ পরিবারের নীতি ছিলনা। তাদের নেতৃত্ব একই সঙ্গে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক, এবং তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা, নিজের সমস্ত উপায় উপকরণ কেবলমাত্র দ্বীনের উদ্দেশ্য সার্থক করার কার্যে ব্যয়িত হতো না, বরং এ ক্ষমতার মূল লক্ষ্যই হতো দ্বীনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। হযরত হুসায়ন (রাঃ) হচ্ছেন রাসূল (সঃ) এর প্রিয়তমা মেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মহীয়সী হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর পুত্র। নবী বংশজাত হওয়ার বদৌলতে নবী চরিত্রের সাথে সম্পর্কটি ছিল স্বভাবগত ও জন্মগত। হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে জান্নাতবাসী যুবকগনের নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবার রাসূল (সঃ) তাদেরকে নিজের প্রিয় বলে অভিহিত করে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছেন যেন তিনিও তাদের দু'জনকে প্রিয় করে নেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর প্রতিটি সিদ্ধান্ত আলোচনা করলেও দেখা যায় যে তাঁর কোন পদক্ষেপের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়নি। বরং আল্লাহর অইনে তৈরী খিলাফাতুন আলা মিন হাজিন নবুবিয়্যাতের ক্রমধারাকে বিকাশের লক্ষ্যেই ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের হাত সম্প্রসারিত করেননি। এমনকি অন্যায়ভাবে আনুগত্য প্রত্যাশীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হননি। ঈমানী দৃষ্টিভাঙ্গী নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর এই সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ ছিল একমাত্র ঈমান আকীদা ও দ্বীনের পরিপূর্ণ তার উদ্দেশ্যে।

কোন কোন ক্ষেত্রে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। কেউ কেউ এর সমর্থনে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ায় উদ্ধৃতি পেশ করে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কুফা যাত্রাকে বিদ্রোহ ও ক্ষমতা লাভের একটা রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলে মনে করেন।

সন্দেহ নেই ইরাকের জনগণের আহবানে ইয়াযীদের সিংহাসন ভেঙ্গে খান খান করার উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হয়েছিলেন আর ইয়াযীদের সরকার ও তাঁকে বিদ্রোহী বলেই মনে করতো। ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁর এ বিদ্রোহ বৈধ কিনা? ক্ষণিকের জন্য আমরা এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাবো। তাঁর এ বিদ্রোহ অবৈধ ছিল, তিনি একটি হারাম কার্য করতে যাচ্ছিলেন তাঁর জীব্দশায় এবং জীবনাবসানে একজন সাহাবী বা একজন তাবেয়ীও এমন কথা বলেছেন তা আমাদের জানা নেই। সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা তাঁকে বারণ করে ছিলেন, তাঁরা করেছিলেন এজন্য যে, তাদের দৃষ্টিতে দূরদর্শীতার বিচারে তা সমীচীন নয়। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করে নেয়া যায় যে এ ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টি ভঙ্গিই নির্ভূল। তাহলেও তিনি সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন না। তাঁর সাথে ছিল তাঁর ছেলে মেয়ে, পরিবার পরিজন আর ছিল ৩২জন অশ্বারোহী এবং ৪২ জন পদাতিক। কোন ব্যক্তি একে সামরিক অভিযান বলতে পারে না। তাঁর মুকাবিলায় ওমর ইবনে সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে কুফা থেকে যে বাহিনী প্রেরণ করা হয় তার সংখ্যা ছিল ৪ হাজার। একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

এত বিরাট বাহিনীর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল না তাঁকে হত্যা করার। ঘেরাও করে সহজেই তারা ক্ষুদ্র দলটিকে গ্রেফতার করতে পারতো। এছাড়া হযরত হুসায়ন (রাঃ) শেষ সময় যা কিছু বলেছিলেন, তা হচ্ছে এই যে, আমাকে ফিরে যেতে দাও, অথবা কোন সীমান্তের দিকে চলে যেতে দাও অথবা ইয়াযীদের নিকট নিয়ে যাও। কিন্তু এর কোন একটিও স্বীকার করা হয়নি এবং পীড়াপীড়ি করা হয় যে, আপনাকে ওবায়দুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (রাঃ) এর (কুফায় গভর্ণর) নিকট যেতে হবে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিজেকে ইবনে যিয়াদের নিকট সোপর্দ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ মুসলিম ইবনে আকীলের সাথে তিনি যে আচরণ করেছেন, তা তাঁর জানা ছিল। অবশেষে তাঁর সাথে যুদ্ধ করা হয়। তাঁর সঙ্গীরা সবাই শহীদ হয়েছেন যুদ্ধের ময়দানে, একা কেবল তিনিই রয়েছেন এমন সময়ও তাঁর ওপর আক্রমন করাকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয়। তিনি আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাঁকে নিহত করা হয়।

সে সময় হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দৃষ্টি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি, প্রাণশক্তি এবং ব্যবস্থার মধ্যে কোনো বিরাট পরিবর্তনের পূর্বাভাস লক্ষ করছিল, এবং এর গতিরোধের জন্যে সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া তাঁর নিকট অত্যাধিক প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। এমনকি এজন্যে প্রয়োজনবোধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াকেও তিনি শুধু বৈধ নয় অবশ্য করনীয় বলে মনে করতেন।

এই পরিবর্তন কি ছিল? বলাবাহুল্য জনসাধারণ তাদের দ্বীনের মধ্যে কোন পরিবর্তন অনেনি। শাসক গোষ্ঠী এবং জনসাধারণ সবাই আল্লাহ, রাসূল এবং কোরআনকে ঠিক সেই ভাবেই মানতেন যেভাবে তারা এর আগে মেনে আসছিলেন। দেশের আইন ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়নি। বনি উমাইয়া শাসনামলে কোরআন এবং সুন্নাহ মোতাবিক সমস্ত ব্যাপারের ফয়সালা হচ্ছিল যেমন তাদের কর্তৃত্ব লাভের পূর্ব থেকে হয়ে যাচ্ছিলো। বরং বলা যেতে পারে খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে দুনিয়ার কোন মুসলিম রাষ্ট্রেও আইন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হয়নি। অনেকে ইয়াযীদের ব্যক্তিগত ভূমিকাকে খুব স্পষ্ট এবং জোরালো ভঙ্গিতে পেশ করে থাকেন, যার ফলে জনসাধারনের মধ্যে এ ভূল ধারনা বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) যে পরিবর্তনের গতিরোধ করতে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তা ছিল শুধু এই কারণে যে একজন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কর্তৃত্বের সমাসীন হয়েছে। কিন্তু ইয়াযীদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের যে নিকৃষ্টতর ধারনা পেশ করা যেতে পারে তার সবটুকু হুবহু মেনে নেয়ার পরও একথা

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার্য নয় যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি নির্ভূল বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে নিছক কোন দুশ্চরিত্র ব্যক্তির শানস ক্ষমতা দখল এমন কোনো ভীতিপ্রদ ব্যাপার ছিল না যে যার ফলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) মতো বিচক্ষণ এবং শরীয়তের গভীর অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি বেসবর হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই এই ব্যক্তিগত ব্যাপারকে সেই আসল পরিবর্তন বলা যেতে পারেনা, যে জন্যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। গভীরভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণের পর যে কথা আমাদের দৃষ্টিসমক্ষে উদ্ভাসিত হয়, তাহলো এই ইয়াযীদের সিংহাসনারোহনের ফলে আসলে যে গলদের সূচনা হচ্ছিল তা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, তার প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যের পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের ফলাফল যদিও তখন পুরোপুরি পরিস্ফুট হয়নি তবুও কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি গভীর দিক পরিবর্তন দেখেই একথা উপলব্ধি করতে পারেন যে, এবার তারপথ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং যে পথে এখন সে অগ্রসর হচ্ছে তা শেষ পর্যন্ত তাকে কোথায় নিয়ে যাবে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেই ইসলামকে তার সঠিক লাইনে পরিচালিত করার জন্যে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দেবার ফয়সালা করেন।

কথাটা নির্ভূলভাবে উপলব্ধি করার জন্যে আমাদের দেখা উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে ৪০ বছর পর্যন্ত যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিশেষত্ব কি ছিল এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ইয়াযীদের কর্তৃত্ব দখলের পর মুসলমানদের মধ্যে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূত্রপাত হলো তার ফলে বনি উমাইয়া এবং বনি আব্বাসদের শাসনকালে কি বিশেষ জিনিসের প্রকাশ ঘটলো? এই তুলনা মূলক আলোচনার পর আমরা একথা অবগত হবো যে, ইসলামী আদর্শ পূর্বে কোন লাইনে অগ্রসর হচ্ছিল এবং দিক পরিবর্তনের পর কোন লাইনে চলতে শুরু করেছে। এছাড়াও আমরা বুঝতে পারবো যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) যাঁকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের উন্নত পরিবেশে যার শিশুকাল থেকে বার্ধক্য এ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছিল, তিনি কেন এই দিক পরিবর্তনের মুখে পৌছেই এই নতুন পরিবর্তনের অগ্রগতি বোধের জন্য পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং কেনইবা তিনি এই তীব্র বেগবান পরিবর্তনের গতিরোধ করে তাকে স্পষ্ট ও নির্ভূল পথে পরিচালনার দরুন যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হবে তার পরিনতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও এই দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট এই ছিল যে, সেখানে শুধু একথা মুখেই উচ্চারণ করা হতো না বরং আন্তরিকভাবে মেনেও নেয়া হতো এবং কর্মের সাহায্যে এই আকিদা ও বিশ্বাসের পূর্ণ প্রমান পেশ করা হতো যে, দেশের মালিক আল্লাহ। জনসাধারণ আল্লাহর প্রজা এবং এই প্রজাপালনের ব্যাপারে রাষ্ট্র পরিচালকদের আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। রাষ্ট্র জনসাধারনের মালিক নয় এবং জনসাধারণও রাষ্ট্রের গোলাম নয়। রাষ্ট্র নায়কদের কাজ হলো সর্ব প্রথম আল্লাহ্র বন্দেগী এবং দাসত্বের শৃঙ্খল গলায় ঝুলিয়ে নেয়া। অতপর আল্লাহ্র প্রজাদের উপর আল্লাহ্র আইন জারি করা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

কিন্তু ইয়াযীদের উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন দখলের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে মানুষের কর্তৃত্ব ভিত্তিক রাজতন্ত্রের সূচনা হলো, তাতে আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্যের ধারনা কেবল মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো। মানবীয় রাজতন্ত্রের চিরাচরিত আদর্শকেই সে কার্যত গ্রহণ করে নিয়েছিল। অর্থাৎ দেশ বাদশাহ এবং শাহী খান্দানের এবং তারাই দেশবাসীদের ধন সম্পদ ইজ্জত আবরু সমস্ত কিছুর মালিক।

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র পৃথিবীতে কেবলমাত্র আল্লাহ্র দেয়া দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যজয় মানুষের উপর কর্তৃত্ব, কর উসুল এবং বিলাসী জীবন যাপন করা ছাড়া রাষ্ট্রের অন্যকোন উদ্দেশ্য রইলোনা। সৎকাজের প্রতিষ্ঠা ও অসৎকাজের প্রতিরোধ এবং দ্বীনের প্রচার ও ইসলামী উলুমের গবেষণা ও সংকলনের ব্যাপারে যারা কাজ করে গেছেন, সরকারী সাহায্যতো দূরের কথা, শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ইসলাম প্রচারের পথে বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। বনি উমাইয়াদের আমলে নও মুসলিমদের উপর জিজিয়া কর ধার্য এর জঘন্যতম প্রকাশ।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি ছিল তাকওয়া এবং আল্লাহভীতি। রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যেই হতো এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মচারী, বিচার পতি এবং সেনাপতিগণ এই প্রাণশক্তিতে ভরপুর হতেন। অতপর সমগ্র সমাজে তারা এই প্রাণশক্তির সয়লাব প্রবাহিত করতেন। কিন্তু রাজতন্ত্রের পথে কদম রাখার সাথে সাথে শাসক সমাজের চরিত্র ও কার্যাবলীতে হারাম ও হালালের কোনো পার্থক্য রইলো না। রাজনীতির সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েই চললো। কারবালার ঘটনার সূত্রপাত থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এর জ্বলন্ত প্রমান। আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে এই শাসক

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ঈমান ও বিবেককে জাগ্রত করার পরিবর্তে বখশিশের লোভ দেখিয়ে তার সওদা শুরু হয়ে গেলো।

এভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদী নীতির মধ্যেও এই পরিবর্তন সূচিত হলো। জনসাধারনের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, এই ছিল ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। সেখানে কোনো ব্যক্তি স্বকীয় প্রচেষ্টায় কর্তৃত্ব হাসিল করে না বরং জনসাধারন সম্মিলিত ভাবে পরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে থেকে উৎকৃষ্টতর ব্যক্তিকে কর্তৃত্ব সোপর্দ করে। খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেকেই এই নীতি মোতাবেক কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। আমীর মুআবিয়ার ব্যাপারে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। এ জন্য সাহাবার বিপুল মর্যাদা সত্ত্বেও তাকে খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে শুমার করা হয়নি। কিন্তু অবশেষে ইয়াযীদের উত্তরাধিকার সূত্রে কর্তৃত্ব দখলের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের ফলে এ নীতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে শাহী তখত দখল করার যে সিলসিলা শুরু হয়, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা দ্বিতীয়বার নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতের দিকে ফিরে যেতে পারেনি।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল রাষ্ট্র শাসিত হবে পরামর্শের ভিত্তিতে আর পরামর্শ নেয়া হবে এমন সব লোকের যাদের তত্ত্ব জ্ঞান, তাকাওয়া, বিশ্বস্ততা এবং নির্ভুল ও ন্যায় নিষ্ঠ মতামতের উপর জনগণের আস্থা রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে জাতির শ্রেষ্টতম ব্যাক্তিরা তাঁদের পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁরা ছিলেন পরিপূর্ণ দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী। নিজেদের জ্ঞান এবং বিবেক অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে তাঁরা নিরপেক্ষ মতামত ব্যাক্ত করতেন। তাঁরা কখনো সরকারকে ভুলপথে পরিচালিত হতে দিবেনা না। গোটাজাতির এ ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা ছিল। এদেরকেই স্বীকার করা হতো সমগ্র মুসলিম উম্মাতের দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে। কিন্তু রাজতন্ত্রের আগমনে এ নীতিরও পরিবর্তন সাধিত হয় ব্যক্তি একনায়কত্ব শূরার স্থান অধিকার করে। শাহজাদা, তোষামোদকারী সভাসদ, প্রশাসনিক গভর্নর এবং সিপাহসালারগন ছিলেন তাদের পরামর্শদাতা। এই পরামর্শদাতাগণ এমন পর্যায়ের লোক ছিলেন তাদের ব্যাপারে যদি জাতির মতামত গ্রহণ করা হতো তাহলে একটি আস্থা ভোটের তুলনায় তারা লাভ করতেন হাজারটি লা'নাতের ভোট। অন্যদিকে সমগ্র জাতি যে সব হক পরস্ত, সত্যবাদী, মহাজ্ঞানী, এবং আল্লাহভীরু লোকের উপর আস্থা স্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলো, বাদশাহদের দৃষ্টিতে তাঁরা কোন প্রকার আস্থালাভের যোগ্যতা রাখতেন না। বরং তাঁরাই ছিলেন লাঞ্চিত। অথবা কমপক্ষে সন্দেহ যুক্ত।

তৃতীয় ধারা ছিল স্বাধীন মতামত প্রকাশের ব্যাপারে জনসাধারনকে পূর্ণ সুযোগ দান। ইসলাম এটাকে কেবল মুসলমানদের অধিকারই নয় বরং ফরয বা অবশ্য কর্তব্য বলে স্থির করে দিয়েছিলা জাতির সচেতন বিবেক, জনগণের বাক স্বাধীনতা, যে কোন অন্যায় কাজে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রকাশ্যে সত্য কথা বলার স্বাধীনতার ওপরই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া নির্ভরশীল ছিল। খিলাফাতে রাশেদার আমলে জনগণের এ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত ছিল। খুলাফায়ে রাশেদীন এ জন্য শুধু অনুমতিই দিতেন না, বরং এ জন্য জনগনকে উৎসাহিতও করতেন। তাঁদের শাসনামলে সত্যভাষীর কণ্ঠরোধ করা হতো না বরং এ জন্য তাঁরা প্রশংসা এবং অভিনন্দন লাভকরতেন। সমালোচকদেরকে দাবিয়ে রাখা হতো না, তাদেরকে যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্ট করা হতো। কিন্তু রাজতন্ত্রের যুগে বিবেকের ওপর তালা লাগান হয়, মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রশংসার জন্য মুখ খোলো অন্যথায় চুপ থাকো এটাই তখন রীতিতে পরিণত হয়। যদি তোমার বিবেক এতই শক্তিশালী হয় যে, সত্য ভাষণ থেকে তুমি নিবৃত্ত থাকতে না পারো, তাহলে কারাবরণ, প্রাণদন্ড ও চাবুকের আঘাতের জন্য প্রস্তুত হও। এ নীতি মুসলমানদেরকে ধীরে ধীরে ভীরু এবং সুবিধাবাদী করে তোলে। বিপদ মাথায় পেতে নিয়ে সত্য কথা বলার লোক হ্রাস পেতে থাকে। তোষামদ এবং বিবেক বিক্রয়ের মূল্য বাজারে বৃদ্ধি পায় এবং সত্যপ্রীতি ও ন্যায়নীতির মূল্যহ্রাস পেতে থাকে। উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন, ঈমানদার এবং বিবেকবান ব্যক্তিরা সরকার থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। জনগণের জন্য দেশ এবং দেশের কাজ কারবারে কোন প্রকার আকর্ষনই আর থাকে না। এক সরকার আসে আর এক সরকার যায়, কিন্তু জনগণ কেবল এ গমনাগমনের রঙ্গমঞ্চে দর্শকে পরিণত হয়।

এই শাসনতন্ত্রের চতুর্থ ধারাটি ছিল তৃতীয় ধারাটির সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। সেটি হলো এইঃ খলীফা এবং তাঁর রাষ্ট্রকে জনসমাজের নিকট জবাবদিহি করতে হবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের দিনে শান্তি এবং রাত্রের আরাম আয়েস হারাম করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে জনসমাজের সম্মুখে জবাবদানের ব্যাপারে বলা যায় যে, তারা সব সময় সব স্থানে নিজেদেরকে জনগণের নিকট জবাব দান করতে হবে বলে মনে করতেন। তাদের সরকারের এ নীতি ছিল না যে কেবল মজলিসে শুরার

Dhaka University Institutional Repository

(পার্লামেন্ট) নোটিস দিয়েই তাদেরকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, বরং তারা প্রতিদিন পাঁচবার নামাযের জামাতে জনসাধারনের মুখোমুখি হতেন। প্রতি সপ্তাহে জুমার নামাযে তারা জনগণের সম্মুখে নিজেদের কথা বলতেন এবং তাদের কথা শুনতেন। তারা কোনো দেহরক্ষী ছাড়াই হাটে বাজারে জনতার ভীড়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের পথ পরিস্কার করে দেবার জন্য কোন পুলিশ বাহিনীও সঙ্গে থাকতোনা। তাঁদের গভর্নমেন্ট হাউসের (অর্থাৎ তাদের কাঁচা বাড়ীর) দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। যে কেউ তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতেন। যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তি তাদের নিকট প্রশ্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও তলব করতে পারতো। এ জবাবদানের ব্যাপারটা মোটেই সীমিতছিল না। সবসময় এবং প্রকাশ্যে খোলাখুলি ভাবে দেয়া হতো, কোন প্রতিনিধির মারফতে নয়। সরাসরি সমগ্র জাতির সম্মুখে জনগণের সমর্থনে তারা কর্তৃত্বের আসনে বসেছিলেন এবং জনগণই আবার তাদেরকে সে আসন থেকে অপসারিত করে অন্য ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচিত করতে পারতো। এজন্যে সাধারণের মুখোমুখি হতে তারা মোটেই ভয় পেতেন না এবং কর্তৃত্ব থেকে বেদখল হওয়া তাদের দৃষ্টিতে কোনো বিপর্যয়ের সূচনা বলে অনুমিত হতো না। তাই তারা এ থেকে নিস্কৃতি লাভের কথা চিন্তাই করতেন না। কিন্তু রাজতন্ত্রের প্রচলনের সাথে সাথেই এই জবাবদানকারী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান ঘটলো। আল্লাহর সম্মুখে জবাবদানকারী ধারনা হয়তো কথার মাধ্যমে ফুটে উঠতে পারে কিন্তু সমগ্র কর্মকান্ডের মধ্যে তার চিহ্ন খুব সামান্যই চোখে পড়বে। রইলো জনগণের সম্মুখে জবাব দান, বলা বাহুল্য কার এতোবড় বুকের পাটা যে, তাদের কাছ থেকে কে জবাব তলব করতে পারে? তারা বল প্রয়োগ করে কর্তৃত্ব লাভ করেছিল। তাদের শ্লোগান ছিল, যার কোমরে বল আছে সে আমাদের কাছ থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিক। এ ধরনের লোকেরা কি কখনো জনগণের মুখোমুখি হয় এবং জনসাধারনই বা তাদের ধারেকাছে কেমন করে ঘেঁষতে পারে? তারা রহিম করিমের সাথে মহল্লার মসজিদে এসে নামায পড়তো না, পড়তো তাদের শাহী মহলের সুরক্ষিত মসজিদের মধ্যে। অথবা বাইরে তাদের একান্ত নির্ভরশীল দেহরক্ষী সৈন্য দলের কঠোর প্রহরাধীনে। তারা যখন ঘোড়া বা হাতীর পিঠে চড়ে বাইরে বেরুতো, তখন তাদের সামনে পেছনে সশস্ত্র বাহিনী থাকতো এবং তাদের চলার পথ পূর্বাহ্নেই পরিস্কার করে দেয়া হতো। জনসাধারণের সাথে কখনো তাদের মুখোমুখি হতে হতো না।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের পঞ্চম ধারাছিল বায়তুলমাল আল্লাহ্র সম্পত্তি এবং মুসলমানদের আমানত। আল্লাহ্র নির্দেশিত পথ ছাড়া অন্য কোন পথ দিয়ে কোনো জিনিস তার মধ্যে প্রবেশ করা

Dhaka University Institutional Repository

উচিত নয় এবং আল্লাহ্‌র পথ ছাড়া অন্য পথে ব্যয়িত হওয়াও উচিত নয়। কোরআনের দৃষ্টিতে এতিমের সম্পত্তিতে তার অভিভাবকের অধিকার যতটুকু বায়তুল মালের সম্পত্তিতে খলীফার অধিকারও ঠিক ততটুকু। অর্থাৎ প্রয়োজন মিটাবার মতো ব্যক্তিগত উপার্জনের উপায় যার আছে এ সম্পত্তি থেকে বেতন গ্রহণ করতে তাকে লাঞ্ছিত হওয়া উচিত এবং যে প্রকৃতই অভাবগ্রস্ত তাকে ঠিক ততোটা বেতন গ্রহণ করা উচিত যা প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মতে ন্যায়সংগত। খলীফাকে বায়তুল মালের আয় ব্যয়ের ব্যাপারে এক এক পয়সারও হিসেব দিতে হবে এবং জনসাধারনও তাঁর থেকে হিসেব তলব করার পূর্ণ অধিকার রাখে। খোলাফায়ে রাশেদীন এ নীতিকেই পরিপূর্ণ দায়িত্ব এবং হক পরস্তির সাথে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। তাঁদের অর্থাগারে শরীয়তের নির্ধারিত পন্থায় অর্থাগম হতো এবং তাঁর নির্দেশিত পথেই তা ব্যয়িত হতো। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিত্তবান ছিলেন তাঁরা এক পয়সাও পারিশ্রমিক না নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে গেছেন। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ নিজের পকেট থেকে জাতির জন্য অর্থ ব্যয়ও করেছেন। আর বিনাবেতনে রাষ্ট্র পরিচালনায় সামর্থ্য যাদের ছিলনা, তাঁরা এই দিবারাত্র পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহের জন্যে যে বেতন গ্রহণ করতেন, তার পরিমান এতোই স্বল্পছিল যে, যে কোন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিই তাকে ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিকের চাইতে কম বলবেন। তাঁদের দুশমনরাও এই পরিমানকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলতে সাহস করতোনা। এ ছাড়াও বায়তুলমালের আয়ব্যায়ের হিসেব যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় তাঁদের কাছ থেকে তলব করতে পারতো এবং তাঁরাও যে কোন ব্যক্তির নিকট জবাব দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এক বিরাট মজলিসে একজন সাধারন লোকও তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারতো যে বায়তুলমালে ইয়ামন থেকে যে চাদর এসেছে তা দৈর্ঘ প্রস্থে এতোখানি নয় যে তা দিয়ে আপনি এতো লম্বা জামা তৈরী করতে পারেন। এই অতিরিক্ত কাপড় আপনি কোথায় পেলেন? কিন্তু যখন খেলাফত রাজতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করলো, তখন বায়তুলমাল আর আল্লাহও মুসলমানদের অধিকারে রইলো না, তা হলো বাদশাহর সম্পত্তি। সম্ভাব্য সকল বৈধ ও অবৈধ উপায়ে তাতে অর্থাগম হতে লাগলো এবং বৈধ ও অবৈধ পথেই তা ব্যয়িত হতে লাগলো। তাদের কাছে এর হিসাব তলব করার সাহস কারুর ছিলনা। সমগ্র দেশটাই ছিল যেন একটা লা-ওয়ারিস সম্পত্তি। আর একজন হরকরা থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সরকারের যাবতীয় কর্মচারী যে যার সুযোগ মতো তার মধ্যে হাত সাফাই করছিলো। এ ধারনাই তাদের মন থেকে উঠে গিয়েছিলো যে, কর্তৃত্ব লাভ এমন কোন পরোয়ানা নয় যার ফলে বেপরোয়া লুট তরাজ

Dhaka University Institutional Repository

চালানো তাদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। আর জনগণের সম্পত্তি মায়ের দুধ নয় যেন তাকে তারা বেমালুম হজম করতে থাকবে। এ ব্যাপারে কারুর সম্মুখে জবাব দান করতে হবে না।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের ষষ্ঠ ধারা ছিল এই যে, দেশে আইনের (আল্লাহ ও রসুলের আইন) রাজত্ব হবে। কারুর সত্তা আইনের উর্ধে থাকবে না। আইনের সীমা পেরিয়ে বাইরে এসে কাজ করার অধিকার কারুর থাকবে না। একজন সাধারণ লোক থেকে নিয়ে রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত সবার ওপর একই আইনের অবাধ রাজত্ব চলবে। ইনসাফ করার ব্যাপারে আদালতগুলোকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেয়া হবে। খোলাফায়ে রাশেদীন এই নীতি অনুসৃতির সর্বোৎকৃষ্ট নজির পেশ করেছিলেন। বাদশাহর তুলনায় অনেক বেশী কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও তাঁরা আল্লাহর আইনের শৃংখলা মুক্ত হননি। তাঁদের বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা আইনের সীমা পেরিয়ে কারুর উপকার করতে পারেনি এবং তাঁদের অসন্তুষ্টি আইনের বিরুদ্ধে কাউকে ক্ষতিগ্রস্থও করেনি। জনসাধারণের মধ্যে থেকে কেউ যদি তাঁদের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতো তাহলে একজন সাধারণ লোকের মতোই তাঁরা আদালতের আশ্রয় নিতেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কারুর কোনো অভিযোগ থাকলে কাজীর নিকট ফরিয়াদ করে তাঁদেরকে আদালতে হাযির করানো যেতো। অনুরূপ ভাবে প্রাদেশিক গভর্ণর ও সিপাহসালারগণকেও তাঁরা আইনের শৃঙ্খলে আটকিয়ে রেখেছিলেন। আদালতের কাজে কাজীর ওপর প্রভাব বিস্তার করার অধিকার কারুর ছিলনা। আইনের গন্ডী পেরিয়ে বিচার মুক্ত হবার ক্ষমতা কারুর ছিলনা। কিন্তু ইসলামী শাসন ব্যবস্থা খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রে পদার্পণ করার সাথে সাথেই এই নীতি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। ইসলামের তুলাদন্ড হলো দুটো একটা দূর্বলের জন্যে অন্যটা শক্তিমানের। আদালতের ওপর শক্তি প্রয়োগ করা হলো ন্যায় বিচারক কাজীদের মৃত্যু ঘনিয়ে এলো এমনকি আল্লাহ ভীরু ফকীহগণ কাজীর পদ গ্রহণ করার তুলনায় বেত্রাঘাত এবং কায়েদের শাস্তি বরণকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। জুলুম ও নির্যাতনের ক্রীড়নক হয়ে আল্লাহর আযাব ভোগ করাকে তারা পছন্দ করলেন না।

অধিকার এবং মর্যাদার দিক দিয়ে পূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠা ইসলামী শাসনতন্ত্রের সপ্তম ধারা ছিল। প্রারম্ভিক ইসলামী রাষ্ট্রে এই নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে দেশ, গোত্র, ভাষা প্রভৃতির পার্থক্য ছিলনা। গোত্র এবং খান্দানের দিক দিয়ে কেউ করোর চাইতে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদার অধিকারী ছিলনা। আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) অনুগতদের অধিকার ও মর্যাদা ছিল সমান। একজন অন্য জনের চাইতে শ্রেষ্ঠ হতেন শুধু চরিত্র, নৈতিকতা,

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্যতা ও জনসেবার কারণে। কিন্তু খেলাফত যখন রাজতন্ত্রে রূপায়িত হলো, তখন সংকীর্ণ বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। সকল দিক থেকে শাহী খান্দান এবং তাদের সমর্থকদের মর্যাদা সব চাইতে বৃদ্ধি পেল। অন্যান্য খান্দানের তুলনায় তাদের খান্দান অধিকতর অধিকার ও মর্যাদা লাভ করলো। আরবী আজমী বিদ্বেষ জাগ্রত হলো এবং স্বর্থপর আরবদের মধ্যে খান্দানে খান্দানে ঘরোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের বীজ উপ্তহলো। এ জিনিসটা ইসলামী সমাজের বিপুল ক্ষতি সাধন করেছে। ইতিহাসই এর জ্বলন্ত সাক্ষ্য।

ইসলামী খিলাফতকে রাজতন্ত্রে রূপায়িত করার ফলে এই পরিবর্তন গুলোয় আত্মপ্রকাশ ঘটলো। ইয়াযীদের উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভের ফলে এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে, এ ঐতিহাসিক সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। আবার একথাও অনাস্বীকার্য যে পরিবর্তনের এই প্রারম্ভিক বিন্দু থেকে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর অল্পদিনের ভেতরেই রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে উপরোল্লেখিত দুর্নীতিগুলো আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণের সময় যদিও এ দুর্নীতিগুলো পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করেনি, তবুও বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই এ পরিনাম অনুভব করতে পারতেন। এ কথা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন ছিলনা যে, এই পরিবর্তনের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যরসথায় ইসলাম যে পরিবর্তন সাধন করেছিল তা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এজন্যেই হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ) বেসরব হয়ে পড়লেন। তিনি ফয়সালা করলেন, একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার যে ভয়ঙ্কর পরিনাম হতে পারে তার সবটুকু বিপদ হাসিমুখে গ্রহণ করেও তাঁকে এই বিপ্লবের প্রতিরোধ করতে হবে। তার প্রচেষ্টার পরিনতি কারোর অজানা নেই। কিন্তু এই বিপদ সাগরে ঝাপিয়ে পড়ে আর বীরের মতো এর সমগ্র পরিনতিকে গ্রহণ করে নিজেই হযরত হুসায়ন (রাঃ) যে কথা প্রমাণ করে গেছেন তা হলো এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতি সংরক্ষণের জন্য মুমিন যদি তার প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়, তার আত্মীয় পরিজনকে কোরবান করে, তবুও তার উদ্দেশ্যের তুলনায় এ বস্তু নেহাত কম মূল্যই রাখে। আর এই নীতিগুলোর সংরক্ষনের জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্যে প্রত্যেক মুমিনকে প্রাণ উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়। কেউ হয়তো তাচ্ছিল্য ভরে একে নিছক একটা রাজনৈতিক কাজ বলতে পারে, কিন্তু হযরত হুসায়ন ইবনে আলী (রাঃ)এর দৃষ্টিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এসেছিল একটি দ্বীনি কর্তব্য। এজন্যে শাহাদাত বরণ করেই তিনি এ কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তার সাথীদের সহ, আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

তঁর শাহাদাতের যৌক্তিকতা ও সার্থকতা। আল্লাহ্ সত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারবালার বীর শহীদানের ত্যাগ, সংগ্রাম, রক্ত আর মৃত্যু আল্লাহ্‌র সেই শ্রেষ্টত্বের নিশানকেই সর্বোগে তুলে ধরেছে চিরকালের জন্য।

ঈমানের তাকিদ হচ্ছে- যার মাঝে ঈমানের নূরের রশ্মি প্রজ্বলিত আছে, সে কোন অন্যায় ও পাপ কাজকে একবিন্দুও সমর্থন করবে না। এবং এর সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ও সংশ্রব রাখবে না, এমনকি পাপীদের সহায়তা ও সাহযোগিতা হয়, এমন কোনো ব্যাপারকেও বরদাশতা করবে না। আর এটাই হচ্ছে মুমিন মুসলমানদের বিপ্লবী চরিত্রের মূর্ত প্রকাশ।

বস্তত কারবালার ঘটনার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীগত বিশ্লেষণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামের অতন্দ্র প্রহরীগণ যদি আরো অধিকতর সতর্ক হয়, ঈমান আকীদা অধিকতর সুদৃঢ় করতে পারে, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে সচেষ্ট হতে পারে, যারা ইসলামের নামেই ইসলামের ক্ষতিকরছে তাদেরকে বিরত রাখতে ভূমিতে এবং সত্য ও ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তবেই এ আলোচনা অর্থবহ হয়ে উঠবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ের উদ্ধৃতি সূচী

---

১ কুক ২৩/৭৬
২ প্রাগুক্ত, ৩/১০৪
৩ তাজ ৫.২৩৫
৪ প্রাগুক্ত, ৫/২৩৭
৫ প্রাগুক্ত
৬ সবু
৭ তাদা ২/৩৯১
৮ কুক ২/১৫৬
৯ মিসু ২/২৪৮
১০ কুক ৪২/২৩
১১ সমু
১২ মিসু ২/২৪৮
১৩ আবেনে ৮/২২০
১৪ কুক ২৬/১৫১-১৫২
১৫ আকু ১/৭৯-৮০
১৬ মুমান পৃ. ১২৫
১৭ শফিআ পৃ. ৮৭
১৮ মুকা পৃ. ১৭৭
১৯ আতা ৪/৩৫২
২০ আবেনে ৮/২০৩
২১ আতা ৩/৩৭২-৭৯, ইআ ৩/৩১০-৩১৩, আবেনে ৮/২১৯-২১
২২ আবেনে ৮/২২৩
২৩ ইআ ৪/১৭০
২৪ আতা ৪/৩৮৩, ইআ ৩/৩১৬, আবেনে ৮/২২৫, তাতা ১১/৩১৭
২৫ ASHS p.- 83.
২৬ TC p. - 308.
২৭ মুকা পৃ, ১৭৭।
২৮ আতা৪/২২৪, ইআ ৩/২৪৯, আবেনে ৮/৭৯
২৯ ইআ ৩/২৫০, আবেনে ৮/৮০
৩০ শফিআ পৃ. ৮৮
৩১ ইইমু
৩২ আবেনে ৮/২২২
৩৩ কুক ৪৭/২২-২৩
৩৪ আবেনে ৮/২২৩
৩৫ তাতা ১১/৩৬১
৩৬ মিসু ২/২৪৯
৩৭ প্রাগুক্ত, ২/২৫২
৩৮ উকা ৬/৬৪৯, ফবা ৬/৬৫
৩৯ ইআ ৩/১৯৭
৪০ আবেনে ৮/২৩০
৪১ হাহা ২/১৯০
৪২ আবেনে ৮/২৩০

Dhaka University Institutional Repository

---

৪৩ ছবু ২/১০৪৬ নং হাঃ
৪৪ ফবা ১৩/৭
৪৫ প্রাগুক্ত
৪৬ প্রাগুক্ত
৪৭ খিমুই পৃ. ১৬৮
৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬
৪৯ প্রাগুক্ত
৫০ মাআ, জাতি
৫১ কুক ৩৩/৩৩
৫২ সবু ৩৭৮২ নং হাঃ
৫৩ কুক ৬৪/১৫
৫৪ জাতি ৫/৬৬০
৫৫ মাআ ২/৫১৩
৫৬ মিশ
৫৭ আবেনে ৮/১৫০
৫৮ প্রাগুক্ত, ৮/২০৩
৫৯ তাতা ২/৩৪৫
৬০ ইত্তিয়াব ১/১৪৫
৬১ আবেনে ৮/১৫০
৬২ সবু, সমু
৬৩ কুক ৯/৯৯
৬৪ প্রাগুক্ত, ৪৮/২৯
৬৫ তাদা ৩/১১৯
৬৬ মাআ ১/২৮৩
৬৭ জাতি ৫/৬৫৭
৬৮ মাআ ৩/২৬৫
৬৯ প্রাগুক্ত, ৬/২৯৪
৭০ মাআ ১/৭৫
৭১ আবেনে ৮/২১৭
৭২ আবেনে ৮/১৭৬, ফইআ ৫/১১৫, আতা ৬/২১৯
৭৩ কার পৃ. ৮৮
৭৪ কার পৃ. ৮৯, আয পৃ. ১৬১
৭৫ কুক ৫৩/৩-৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

কারবালার ঘটনার সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ ও পরবর্তী প্রভাব

৫.১ সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মহররম মাসে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলেও একমাত্র কারবালার ঘটনাটি বিশ্ব মুসলমানের ওপর প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। তাইতো কারবালার ঘটনার শোকের উচ্ছাস স্বাভাবিক নিয়মেতো নয়ই এমনকি সুদীর্ঘ ১৪০০ বছরেও প্রশমিত হয়নি। কস্তুত সাংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কারবালর ঘটনা একটি উপজীব্য বিষয় হিসেবে গড়ে উঠেছে।

বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশে কারবালার ঘটনাকে উপজীব্য করে প্রতিবছর ১০ই মহররম পবিত্র আশুরা পালন করা হয়ে থাকে।

এ হৃদয় বিদারক যে ঘটনা আশুরার দিনে সংঘটিত হয় তা হলো কাবালার মরু প্রান্তরে এ দিনেই হযরত হুসায়ন (রাঃ) সত্যের জন্য সংগ্রাম করে শাহাদাৎ বরণ করেনঃ

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাই তাঁর মহররম কবিতায় ঠিকই বলেছেনঃ

“ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া- ক্রন্দন চাহিনা
উষ্ণীব কোরানের, হাতে তেগ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির-
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা
শমসের হাতে নাও বাঁধো শিরে আমামা।
বেজেসে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তুর্য্য
হুসিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য!
জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হাইদরী হাঁক।
শহীদের খুনে সব লালে লাল হয়ে যাক।”

Dhaka University Institutional Repository

শিয়াগণ ঃ দশই মহররম সম্পর্কে নানারূপ মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। আবার তাদের বিশ্বাস মত নিজস্ব সংস্কৃতি চালু করে দিয়েছে আবার তাদের বিরোধী নাসেব্বীগণ উল্টা সংস্কৃতি চালু করেছে। দু'পক্ষের আচরনও সংস্কৃতিই সঠিক ইসলামের দৃষ্টিতে বাড়াবাড়ি। যেমন শিয়াগণ বলে থাকেন- ১০ ই মহররম হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদতের দিন সূর্য নিভে গিয়েছিল এমনকি দিনের বেলায় তারকা রাজী প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, আর সে দিন যে কোন পাথর উল্টালেই তার নিচে রক্ত দেখা যেত, আকাশ লালে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল, আবার সূর্যকে এমন ভাবে উদিত হতে দেখা গেল যেন তা রক্তের পাত্র আর সমস্ত আসমানকে মাংস পিন্ড বলে মনে হচ্ছিল, আর আকাশ হতে রক্ত বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল, সে দিন আসমান যে রূপ রক্ত বর্ণ ধারন করেছিল ইতিপূর্বে আর কখনো সেরূপ হয়নি। ইবনুল হায্যা কাবিল আল মুয়াফিরি থেকে বর্ণনা করে বলেন- সেদিন সূর্য এমন ভাবে নিভে গিয়েছিল যে দিনের বেলা তারকা রাজি আকাশে জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল। আর হত্যা কারীগণ যখন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাথা মুবারক নিয়ে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করল তখন রাজ প্রাসাদের দেয়াল থেকে রক্তের প্রবাহ বের হতে শুরু করল। আর জমিন তিন দিন পর্যন্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকলো। সেদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের নিচের যে কোন পাথর উল্টালেও সেখানেও রক্ত দেখা যেত আর সে দিন উট বা ছাগলের মাংস যতই রান্না করা হোত তবুও মাংস কাচাই থাকত" হাফিজ ইবনে কাছীর বলেন এগুলো সবই মিথ্যা তথা মওজু হাদিস।[১] এরূপ ভাবে তারা আরো অনেক মিথ্যা ও বানোয়াট উক্তি করে থাকে। তবে হাফিজ ইবনে কাছীর বলেনঃ- কারবালা ঘটনার পরবর্তী সময়ে হত্যাকারীদের উপর যে সমস্ত বিপদাপদ মছিবত আপতিত হওয়ার হাদীছ পাওয়া যায় তার অধিকাংশই সঠিক। এ প্রসঙ্গে ইমাম যুহরী লিখেছেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যা কারীদের মধ্যে একজন ও রক্ষা পায়নি, তাদের প্রত্যেককে দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।ইবনে কাছীর বলেনঃ তাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিছিল না, দুরারোগ্য রোগগ্রস্থ হয়নি, তাদের অধিকাংশই পাগল হয়ে যায়। আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ- এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়, কারন যে অপরাধের দন্ড সবচাইতে দ্রুত অবতীর্ণ হয় বিদ্রোহ ও যুলুমের অপরাধ তন্মধ্যে অগ্রগণ্য। আর হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা আর অত্যাচার মুলক আচরন সবচাইতে বড় বিদ্রোহের শামিল।[২]

শিয়ারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে কতক গুলি আজগুবী হাদিস রচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন তন্মধ্যে একটি হচ্ছে "রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হযরত হুসায়ন (রাঃ) হত্যাকারী একটি আগুনের বাক্সে নিক্ষিপ্ত হবে, সমস্ত দোযখীর শাস্তি সে একাই ভোগ করবে, তার হাত পা আগুনের শিকলে বেঁধে তাকে দোযখে ফেলা হবে আর এ অবস্থায় সে দোযখের তলদেশে পতিত হবে, তার দেহ থেকে এরূপ ভীষণ দুর্গন্ধ নির্গত হবে যে, সমস্ত দোযখ বাসী অতীষ্ট হয়ে উক্ত দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাঁদা কাটি করবে কিন্তু সে এ অবস্থাতেই অনন্ত কাল দোযখে পড়ে থাকবে"। ইমাম ইবনে তাই মিয়া বলেন এ হাদীছটি একেবারেই জাল, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নামে মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করতে যারা লজ্জা ও সংকোচের ধার ধারেনা, তারাই এ হাদীছ তৈরী করেছে। কোথায় একটা দুর্বল মানুষ আর কোথায় গোটা দোযখের অর্ধেক শাস্তি। ফেরাউনের গোষ্টির শাস্তি দস্তর খান ওয়ালাদের গোষ্টির শাস্তি, মুনাফিক আর সমস্ত কাফের দলের শাস্তি, নবীগনের ঘাতক, আর প্রাথমিক মুসলিমদের হত্যাকারীদের শাস্তি এমনকি তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের ঘাতকদের শাস্তি এই শিয়াদের কাছে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যাকারীদের শাস্তির তুলনায় একান্তই অকিঞ্চিৎ কর।[৩]

শিয়াদেরই এক শাখা রাফেজীগণ বুয়াইয়া শাসনামলে আশুরার দিন ঢোল তবলা নিয়ে বাগদাদের রাস্তায় ও বাজারে ধুলা বালি নিক্ষেপ করে মানুষের দোকান সমূহ জোর পূর্বক তালা লাগিয়ে দিয়ে মানুষের মধ্যে দুঃখ আফসোস ও কান্নার রোল সৃষ্টি করে। তখন তারা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পিপাশার্ত অবস্থায় শাহাদত বরন করার কথা স্মরন করে পানি পান করা থেকেও বিরত থাকে। এসব দেখে মাহিলারাও দুঃখ ও কান্না করতে থাকে এমনকি মুখে কপালে ও বুকে আঘাত করতে করতে রাস্তায় বের হয়ে পড়ে। এমনকি তারা এরূপ করতে করতে মানুষের মধ্যে ত্রাসেরও সৃষ্টি করে। যেহেতু উমাইয়া শাসনা মলে তাদেরই এ এলাকায় হযরত হুসায়ন (রাঃ) নির্মম ভাবে শাহাদৎ প্রাপ্ত হন।[৪]

এখনও শিয়াদের মধ্যে বেশ বাড়া বাড়ি দেখা যায়। কোন কোন জায়গায় মাতম ও আহাজারী এমন চরমসীমায় পৌছে যে, সেখানে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে এ দিন বুকে ধারাল ছুরি দ্বারাও আঘাত করতে দেখা যায়। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শোককে জীবন্ত রাখার জন্য হোসেনী দালান বিদ্যমান। এখানে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর একটি কৃত্রিম সমাধিও রয়েছে। সেখানেও এ আশুরার দিনে আহাজরী ও ছুরির আঘাত প্রত্যক্ষ হয়। আর সেখান থেকে প্রতি বছর আশুরার দিনে তাজিয়া মিছিল বের করা হয়। দুনিয়ার অনেক দেশেই শিয়াদের মধ্যে এরূপ তাজিয়া মিছিল বের

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া এক বিশেষ কৃষ্টিতে পরিনত হয়েছে।

শিয়াগণ ছাড়াও কারবালার ঘটনা বিশ্ব মুসলমানের ওপর প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছে এবং ১০ ই মহররামকে এ দুনিয়ার সকল মুসলমানই এক মহা শোকের দিবস বলে গন্য করে। এ ১০ ই মহররমে মুসলিম সমাজের লোকেরা রোজা রাখে ও শিন্নি বিতরণ করে।

চরমপন্থী শিয়াগণ যেরূপ এ ব্যাপারে বাড়া বাড়ি করে অনুরূপ তাদের বিপরীত সিরিয়ার উমাইয়া নাসেবীগণও শিয়া এবং রাফেজীগণের বিপরীত আশুরার দিন রসনা বিলাসী খাবার রান্ন করে, গোছল করে পাক পবিত্র হয়ে শরীরে সুগন্ধি লাগায়, মুল্যবান ও অহংকারী পোষাক পরিধান করে এ দিনটি উদযাপন করে। মূলত এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো শিয়া ও রাফেজীদের বিরোধীতা করা। কিন্তু বর্তমানে এটা তাদের কৃষ্টিতে পরিনত হয়েছে।

প্রকাশথাকে যে, আরবী "নাওয়াসেব" শব্দটি "নাসেব" শব্দ থেকে এসেছে এর অর্থ হলো দুশমনি করা।[৫]

যে কোন বাড়া বাড়ি ও সীমাতিক্রম ইসলাম গ্রহণ করেনা। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর নিহত হওয়ার ঘটনায় ব্যাথিত হওয়া কেননা তিনি ছিলেন, সৌভাগ্যবান মুসলমান বিদ্বান সাহাবা এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর শ্রেষ্ট কন্যার সন্তান এবং বেহেস্তে সুসংবাদ প্রাপ্ত অপর পক্ষে তিনি ছিলেন অধিক ইবাদত গুজারী বীর পুরুষ এবং দাতা। কিন্তু শিয়াগণ বাড়াবাড়ি করে তাঁর শাহাদাতের পরবর্তী কালে যে সব ঘটনার অবতারনা করছে তা ঠিক নয়। তাঁর পিতা তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ট ছিলেন তিনিও মানুষের অস্ত্রের আঘাতে নিহত হন। কিন্তু তাঁর শাহাদাতের ঘটনায় কেউ মতম করেনা। অনুরূপ ভাবে ওমর (রাঃ) উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের ঘটনা কে কেন্দ্র করেও মাতমের কৃষ্টি চালু করা হয়ণি। অপর পক্ষে আবু বকর (রাঃ) এমনকি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর তফাৎ দিবসকেও মাতমের দিবসে পরিণত করা হয়নি এবং এটা করা রাসুলুল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত । অথচ শিয়া ও রাফেজীগন তাই করে থাকে। অনুরপ ভাবে নাসেবী গণও সীমাতিক্রম করছে বাড়াবাড়ী ক্ষেত্রে।

আল্লামা ইবনে কাছীরের সাথে আমরা বলতে পারি এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো যখনই এ মুছিবতের কথা বা অন্য যে কোন মুছিবতের কথা আলোচনায় আসবে তখন

Dhaka University Institutional Repository

আলী বিন হযরত হুসায়েন (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর যে হাদিস বর্ণনা করেছেন সে মতে আমল করা। "রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যখনই কোন মুসলমান কোন প্রকারের মুছিবতে পতিত হবে অথবা পূর্বের কোন মুছিবতের কথা আলোচনা করবে, তখন যদি পূর্বের মুছিবতের কথা স্মরন করে তার থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং ধৈর্য্য ধারনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে তাহলে আল্লাহ তাকে মুছিবতে পতিত হওয়ার দিনে ধৈর্য্য ধারনের সমপরিমান পুরস্কার দিবেন"।[৬]

মরুকারবালা আজ আধুনিক নগরীর আধুনিক অবয়বে পরিস্ফুট। ফুরাত নদী সরে যেতে যোতে এখন কারবালা থেকে বেশ সরে গেছে। আগেকার সেই "দস্তে কারবালা" এখন স্থাপত্য শিল্প, মাজার, গম্বুজ, শহীদ রওয়াজা, হোটেল, দোকান, বাঁধানো রাস্তা, বাস, গাড়ী, জন সমাগম সব মিলে এক জবরদস্ত শহর।

ইরাক সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) সহ অপরাপর শহীদের জন্য মাজার মসজিদ মিনার ও গম্বুজ পূনঃ নির্মান করেছেন এবং এই সাথে নির্মান করেছেন অত্যাধুনিক ভবনাদি। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাজারে শাহী তোরনের সবটাই মূল্যবান কারুকার্য খচিত সোনার পাত দিয়ে মোড়ানো। কোরআনের আয়াত সমূহও সোনার হরফে লেখা। উপরে নীচে মূল্যবান পাথরের সমাবেশ। বিরাট চত্বর, বিশাল রওজা, গুরু গম্ভীর পরিবেশ।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) যে যায়গায় শহীদ হন, সেই স্থানটিকে এই চত্বরের বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। পাথর গুলো এমন ভাবে সাজিয়ে গোটা স্থানটা এরকম শিল্প মন্ডিত উপায়ে বাঁধানো হয়েছে যে, দেখলে মনে হয় যেন এখনো হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শহীদী রক্তের ধারা বয়ে চলেছে। কারবালাতে এখন স্কুল কলেজ প্রভৃতি আধুনিক নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। তবে এখন শিয়া সমাজের লোকেরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) মাজারে উপস্থিত হয়েই নানাভাবে সেজদা আদায় করেন এবং তাদের দেহকে বিক্ষত করেন।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতেও আশুরা ও কারবালা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশে মুগল আমলে শিয়া প্রভাবে আশুরা পালনে বিশেষ বিশেষ আনুষ্ঠানিকতারও উদ্ভব ঘটে। ইমাম বাড়ী গড়ে তোলা, হোসেনী দালান স্থাপন করা, তাজিয়া মিছিল বের করা, এসবই বাংলা দেশে শিয়া প্রভাবের দৃষ্টান্ত হিসেবে আজও রয়েছে। ঢাকাতে সুবে বাংলার রাজধানী ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে। মুগল

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামে ঢাকার নামকরণ হয় জাহাঙ্গীর নগর। তখন এই ঢাকা নগরী শিয়া প্রভাবে প্রভাবিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বেশ কয়েক খানী পুঁথি কারবালার ওপর রচিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (বাংলা ১২৮১ সালে মহররম পর্ব, ১২৯০ সালে উদ্ধার পর্ব, এবং ১২৯৭ সালে এজিদ বধ পর্ব) মীর মশাররফ হোসেন গদ্যে কারবালার ঘটনার উপর বিষাদ সিন্ধু নামে একখানি উপন্যাস রচনা করলে তা শ্রেষ্ট উপন্যাস হিসেবে বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়। বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থখানী পাঠক মনে কারবালার ঘটনার বিষাদময় আবেদন সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেও এতে জংগনামা পুঁথিগুলোর মতই ঐতিহাসিক অনেক তথ্যই সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। এতে কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্র লেখক কর্তৃক সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য এতে কারবালার মূল আবেদন বিঘ্নিত হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে এসব বাংলা কাব্যে মহররম, আশুরা, কারবালা প্রভৃতি নানা আঙ্গিকে বিভিন্ন কবির দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে কবি নজরুল ইসলাম, কবি শাহাদত হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা এবং কবি ফররুফ আহমদ মহররম ও কারবালা বিষয়ক কবিতায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। কবি শাহাদত হোসেন শহীদে কারবালা শীর্ষক কবিতায় লিখেছেন।

ওই শোন ক্রন্দনে বেজে উঠে দুনিয়া, হায় ! হায়! হা হোসেন আসমান চুনিয়া খুন ঝরে প্রান্তরে জান্নাত নিঙারি / কল্লোল কাঁদে নদী সৈকতে আছাড়ি।---------------------------------

মহররম শীর্ষক কবিতায় শাহাদত হোসেন লিখেছেনঃ

এই সেই মহররম যে দিনের গম/ ভুলেছে কি মুসলিম? দ্বীন তব ইসলাম।-------------

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলিষ্ঠ ছন্দ

দ্যোতনা মেখে বাংলা কাব্যে মহররমকে এনেছেন।

তিনি মহররম শীর্ষক একাধিক কবিতা রচনা করেছেন।

তিনি লিখেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ওরে বাংলার মুসলিম, তোরা কাঁদ/এনেছে এজিদী বিদ্বেষপূনঃ মহররমের চাঁদ/এক ধর্ম এক জাতি তবুও ক্ষুধিত সর্বনেশে/তখতের লোভে এসেছে এজিদ কম বখতের বেশে ------------------

কবি নজরুল ইসলাম মহররম মাসকে দেখেছেন।

আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হবার মাস হিসেবে। তিনি লিখেছেনঃ ফিরে এল আজ সেই মহররম মাহিনা / ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।------------------------ তিনি আরো লিখেছেনঃ

জাগো, ওঠো মুসলিম হাকো হায়দারী হাঁক/শহীদের খুনে সব লালে লাল হয়ে থাক।---------------

কবি ফররুখ আহমদ শহীদে কারবালা শীর্ষক কবিতায় লিখেছেনঃ উতারো সামান, দেখ সম্মুকে কারবালা মাঠ ঘোড় সোয়ার জ্বলে ধু-ধু বালু দোযখের মত, নাই সব জার চিহ্ন আর/আকাশে বাতাসে করে হাহাকার।

অতীতে গ্রামে গঞ্জে মহররমের সারা মাসেই লাঠি খেলা হত এবং মহররমের জারি গান গাইতো মেয়েরা। মরমী কবি হাসান রাজার পৃষ্ঠ পোষকতায় হুসায়ন (রাঃ) ঘোড়া তৈরী হত এবং তার এ ঘোড়াগুলোর পাশে দোলনা থাকত। যারা যা চায় তাদের সে দোল নাতে বান্ধা হত। সে সময় সিলেট জেলার প্রত্যেক জমিদার বাড়ীতে এ শোক স্মৃতির স্মারক এসব কাজ করা হত। এগুলো বন্ধ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমগ্র বঙ্গদেশে এবং সিলেটের কোন কোন অঞ্চলে মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী কতৃক এসব শরীয়ত বিরোধী বিষয়াদি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরে।

এই উপমাহদেশে ভারতের দাক্ষিনাত্য ছাড়া মুর্শিদাবাদে, ঢাকাতে হোসেনী দালান নামে প্রাচীন ইমাম বাড়া রয়েছে। এখানে কৃত্রিম ভাবে হুসাইন এর কবর তৈরী করা হয়েছে। যা কালো গেলাফ দিয়ে জড়ানো। যশোর শহরের মুরলীনামক স্থানে পরবর্তী কালে হাজী মুহম্মদ মুহসিন কর্তৃক একটি ইমাম বাড়া স্থাপিত হয়েছিল যা আজও রয়েছে যশোর শহরের খড়কী এলাকায় কারবালা নামক একটি স্থানও রযেছে। কারবালা ঢাকার আজিমপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকাতেও রয়েছে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) নামে বাংলাদেশে শিশুর নামকরন করার রীতি আজও রয়েছে। এমন কি জয়নাল আবেদীন, আলী আসগর, আলী আকবর সকিনা, যয়নাব ইত্যাদি নাম গুলোও কারবালার

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনার সূত্র ধরে আমাদের দেশে এসেছে। আর ইয়াযীদ ও শীমার নামদু'টি এখানে হয়ে উঠেছে পাষন্ডের প্রতীক।

বিশ্বের বহুদেশের সাহিত্য ও ভাষায় এই কারবালার ঘটনার উল্লেখ আছে। মুসলমানরা বহুশতাব্দী ধরে প্রতি মহররম মাসের ১০ তারিখে এই আশুরা পালন করেন- স্মরন করেন সাহিত্য ও কাব্যে সেই করুন গাঁথাকে বেদনার্ত অনুভূতির শিখা দিয়ে চিত্রিত করেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও প্রাচীনকাল থেকে এই শোক উজ্জীবক ঘটনার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

হুসায়ন (রাঃ) এর এই মর্মান্তিক শাহাদাত বরনের কাহিনী অবলম্বনে বাংলাদেশে যে বিরাট পুঁথি সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তার অপর নাম হলো মার্সিয়া সাহিত্য। এমাসিয়া সাহিত্যের আদি লেখক হলেন মোহাম্মদ খান। তিনি সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে তার অমর কাব্য মকতুল হোসেন ফারসীর ভাবানুসারে প্রণয়ন করেন। এ কাব্যে কারবালার কাহিনী অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে মোহাম্মদ এয়াকুব রচিত "ছহি বড় জঙ্গনামা" অতি আদরনীয় গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এখানে তাই 'ছহি বড় জঙ্গনামা থেকে কিছুটা উদ্বৃত করছি। এ জঙ্গনামায় 'সিদুরিয়া মেঘ' শিরোনামে মোহাম্মদ এয়াকুব লিখেন " লোহুভরা দুই হাত এমাম উচা করে/ এমামের লোহু গেল আসমান উপরে/ আসমান উপরে লোহু ছিটি কিয়া লাগিল/ সিদুরিয়া মেঘ হয়ে আসমানে রহিল/ আজিতক সেই মেঘ ওঠে আসমানে / শহীদ হোসেনের লোহু জানে সর্বজনে।

অন্যদিকে মন্ত্রী জনাব আলী তার শহীদে কারবালা, কাব্যে এ জঙ্গনামার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষন করেছেন। তারা কাব্যের এক জায়গায় তিনি লিখেন, মহররমের বুনিয়াদ শিয়া লোক হতে/ বাংলার মুসলমান ভাবিত যে মতে/ জারী ও মার্ষিয়া যত গাহিত সকলে/ সে কথা না পাওয়া যায় হাদীসে দলিলে/সেই মসিয়ার ভারে কোনো শায়েরেতে/ মোকতাল হোসেন লিখে ছিলেন ফারসীতে/ বাঙ্গালার জঙ্গনামা তর্জ্জমা তাহার/দেশে দেশে জারী খুব আছে যে প্রকার/কেননা তাহাতে যত বেদলিল বতে/ নাহি মিলে সত্য কিছু দীনের হালাত।'

এই কারবালার ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের প্রচুর বই লিখিত হয়েছে। ১০ই মহররমের পবিত্র আশুরার ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন না করেই এদেশে শিয়া সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তিমূলক ও বেদাত পূর্ন কার্যকলাপকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। আসলে এদিন শহরময় বিরাট তাজিয়া

Dhaka University Institutional Repository

মিছিল বের করা ও বুক চাপড়িয়ে মাতম করা ইত্যাদি কোন ভাবেই কোরআন হাদীসের দৃষ্টিতে গ্রহণ যোগ্য নয়। অথচ এ পবিত্র দিনে এ ধরনের বেদাতপূর্ণ কাজকে জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে এর পবিত্রতা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে যা খুবই দুঃখ জনক।

মহররম আশুরা এবং কারবালা আমাদের সাংস্কৃতিক বলয়ে এক বিপ্লবী মাত্রা সংযোজন করেছে। আশুরাকে পালন করার জন্য এই রোযা রাখাই সর্বোত্তম পন্থা। আশুরার দিন এবং তার আগের দিন কিংবা পরের দিন যুক্ত করে দুটো রোযা রাখার নির্দেশ প্রিয় নবী (সঃ) প্রদান করেছেন। এছাড়া আমাদের এ দেশে মিলাদ মাহফিল, ইসালে সওয়াব, দান খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমেই আমাদের আশুরা পালন করা হয়। অবশ্য আশুরাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত, কুসংস্কার ও বেদাআতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা বর্জন করে শহীদানের রুহের প্রতি সওয়াব রেসানী করা আশুরা পালনের ক্ষেত্রে বিধিসম্মত পন্থা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ ইসলামী বিপ্লবের চিরন্তন উৎস

সাংস্কৃতিক প্রভাবের পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় বিগত ১৪শ বছর ধরে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার জন্য পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে। মরসীয়া হচ্ছে, মাতমের মজলিস অনুষ্ঠিত হচ্ছে শোক মিছিল বেরুচ্ছে। কিন্তু এ শোক মিছিল আর মরসিয়া কতকাল? এখন চাই সেই জেহাদী প্রেরনা যদ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে হুসায়ন (রাঃ) সত্যের জন্য জেহাদ করেছিলেন।

বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম দীর্ঘতম লংমার্চ সম্পাদনের আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও জিহাদী নায়ক হুসায়ন (রাঃ) কোন বিশেষ আবেগ, উচ্ছাসতাড়িত হয়ে কারবালার আশুরা কান্ড ঘটাননি। নিজের শান শওকাত, মান মর্যাদা ও সুউচ্চ অবস্থান সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ সচেতন এই অবিসংবাদিত হুসায়ন সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত ও সুদূর প্রসারী ইচ্ছা আকাংক্ষা নিয়েই নবী পরিবারের আবাল বৃদ্ধ বনিতাসহ এক অনাকাঙ্খিত সম্রাটের রাজতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে নিঃস্ব ও খালি হাতে জিহাদে নামেন যার আসন্ন পরিনতি সম্পর্কে তাঁর ন্যূনতম অজ্ঞতাও ছিল না। শুধু তিনি কেন , তার এই আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জিহাদে অংশগ্রহণকারী সমস্ত নরনারী, আবালবৃদ্ধ সবাই অবগত ছিলেন। বরং বলা চলে সেকালের সাধারন মানুষও খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন এ যাত্রা ও লংমার্চের কি পরিনতি?

হুসায়ন (রাঃ) তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞাতার আলোকে এবং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ওক্ষমতা বলেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, উমাইয়াদের পারিবারিক রাজতন্ত্র যেভাবে ইসলামী উম্মতের উপর জেঁকে বসে খেলাফতের আসমানী হুকুমতের বদলে রোমীয় খৃস্ট্রীয় রাজতান্ত্রিক বেদআত চালু করেছে এবং সেভাবে নয়া বিশ্ব সভ্যতার গোড়াপত্তনকারী মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্ম অতি দ্রুত অজ্ঞতা দুনিয়া পূজা, ভয়ভীতি, লোভ লালসার নেসায় বুদ হয়ে যাচ্ছে সেখানে নবীজীর প্রিয়তম এই ব্যক্তিত্ব ও তাঁর পবিত্র আহলে বায়েতের খুন ঢেলে না দিলে দ্বীন ইসলাম ও নামাজীর সুন্নহকে বেদীনী কুফরী, শেরেকী, বেদআত, গুমরাহী ও পাপ পঙ্কিলতা থেকে পৃথক করা যাবে না। যাচাই বাছাইয়ের নিক্তি ও মানদন্ড থাকবে না এবং সাধারন মুসলমানদের সম্বিৎ ফিরে আসবে না। মুসলিম উম্মার হৃদয়ের মনিকোঠায় ও কোমলতম তন্ত্রি গুলোতে স্থান দখল করে থাকা নবীজী ও মা ফাতেমার কলিজার টুকরা ও নবীজীর আহলে বায়েতের তরজাতা খুনই কেবল পারে উম্মতের মাঝে তোল পাড় সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করতে, গভীর নিদ্রা থেকে ধাক্কা মেরে জাগাতে এবং উমাইয়াদের নব্য জাহিলিয়াতের জগদ্দল পাথরকে চূর্ণ বিচূর্ন করার ইনকিলাবে রূপান্তরিত করাতে। হক ও ন্যায়েরর উপর প্রতিষ্ঠিত আহলে জান্নাতের হুসায়ন দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে, তার ও তার পরিবারবর্গ এবং সঙ্গী সাথীদের কুরবানী ও খুন সকল সমরাস্ত্রের উপর অবশেষে জয়লাভ করবেই। কারবালার প্রান্তরে তাঁদের হক ফরিয়াদ সারা বিশ্বে ও সকল যুগ যুগান্তরে ধ্বণিত প্রতিধ্বনিত হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হকপন্থীদেরকে বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উৎসাহ উদ্দীপনা ও শক্তি সাহস যোগাবে।

কারবালার বীর শহীদানের পবিত্র মস্তক ছিন্ন করে লাশগুলোর ওপরে এমন ভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় যে, লাশগুলোর চেহারা বিকৃত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কুফা থেকে সুদুর দামেস্ক পর্যন্ত নবী পরিবারের পবিত্র নারী ও শিশুদের বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়। এই মজলুম কাফেলার আগে আগে বর্বার মাথায় ঝুলানো ছিল শহীদানের মস্তক মুবারক। ইয়াযীদ ও উমাইয়া শাসকরা ইসলামের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন সবই মরীচিকায় পরিনত হওয়া শুরু করল কারবালার আশুরার ঘটনার প্রায় সাথে সাথেই।

নবী বংশের নারী পুরুষ ও শিশু বন্দীরা কারবালা আন্দোলনের বানীকে প্রতি মঞ্জিলে মঞ্জিলে পৌছাতে লাগলেন। প্রথমে কুফায় এরপর দীর্ঘ পথের সর্বত্র। দামেস্কে ইয়াযীদ তাঁর রাজদরবারে শহীদদের ছিন্ন মস্তক ও বন্দীদের উপস্থিতিতে যে বিজয় সভার আয়োজন করেছিল তা হুসায়ন ভগ্নী হযরত জয়নাব ও তাঁর পুত্র জয়নাল আবেদীনের বক্তৃতায় মহাশোক সভায় পরিনত হল। ইয়াযীদের স্ত্রী কালো শোক বস্ত্র পরিধান করে ইয়াযীদকে প্রকাশ্য সভায় সর্বসমক্ষে ধিক্কার দিতে লাগলো। পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে উঠায় এবং দামেস্কবাসী আসল ব্যাপার জেনে যাওয়ায় ইয়াযীদ কুফার শাসক ওবায়দুল্লাহ, যিয়াদ, শীমার ও ওমর ইবনে সাদ এর উপর সব দোষ চাপিয়ে নিজেকে আপাতত দোষমুক্ত করার পথ বেছে নিল। বন্দীরা সিরিয়ায় অবস্থান করে জনগনের সামনে ও জুমা নামাযে গিয়ে কারবালার নির্মম কাহিনী বর্ণনা করে হুসায়ন ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা শুরু করলে পরিস্থিতি গণ বিদ্রোহে রূপ নেয়ার উপক্রম হয়। ইয়াযীদ ও তার সাঙ্গ পাঙ্গরা বিষয়টি টের পেয়েই বন্দীদের প্রতি বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাঁদের মদীনায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

এদিকে কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা কুফা ও বসবার ঘরে ঘরে মাতম মর্সিয়ার ঝড় তোলে

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়া শাসন খতম করার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে যার পরিনতি ছিল তাওয়াবিন (তওবাকারীগণ) ও মুখতারের বিদ্রোহ ও রক্তাক্ত যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত মুখতার বিজয় লাভ করে ইবনে যিয়াদসহ কারবালা হত্যাযজ্ঞে যারা জড়িত ছিল তাদের সবাইকে একে একে হত্যা করে।

অন্যদিকে মদীনাবাসী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানবাল গাসিলুল মালায়েকা (রাঃ) এবং পুত্রদের নেতৃত্বে ইয়াযীদি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। অবশ্য ইয়াযীদ এ বিদ্রোহকে কঠোর ও পাশবিক উপায়ে দমন করেন। মদীনার হাজার হাজার আনসার মুহাজির পরিবারকে পাইকারী হত্যা, নারীদের পাইকারী ধর্ষন ও মসজিদে নববীকে ঘোড়ার আস্তাবল (৩ দিনের জন্য) বানানোর মত জঘন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়।

মক্কা শরীফেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করা হলে উমাইয়ারা তা দমনের জন্য কাবাঘরকে মেঞ্জানিক দিয়ে ধ্বংস ও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতেও ছাড়েনি।

হুসায়ন ও তাঁর ৭২ জন সঙ্গী চমকে উঠেছিল এবং পরে দিকে দিকে আহলে বায়েতের কোন না কোন সদস্য বা সদস্য বর্গের নেতৃত্বে কিংবা নিজেরাই উমাইয়া পথভ্রষ্টদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, নাজায়েজ রাজকীয় প্রথা মূলোৎপাটনে বিদ্রোহের দাবানল জ্বালাতে থাকে।

হুসায়নের বৈমাত্রেয় ভাই মুহাম্মদ হানাফিয়া ইবনে আলীর (রাঃ) নামেও বিভিন্ন স্থানে জনগন সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দালনে নামে। হুসায়নের নাতি ইমাম যুবায়েদ ইবনে জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষনা ও সশস্ত্র আন্দোলন করা হয়। নফসে জাকিয়ার আন্দোলনে ইমাম আবু হানিফাও সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন।

আবুমুসলিম খোরাসানীর হুসায়নী রক্তের প্রতিশোধ গ্রহন আন্দোলন শুরু হয় ইরানের খোরাসান হতে। এ আন্দোলনে বনু আব্বাসও যোগদান করে যা শেষ পর্যন্ত উমাইয়াদের মূলোৎপাটনে প্রভূত সাহায্য করে। এ আন্দোলনের প্রকাশ্য শ্লোগানও ছিল হোসাইনী রক্তের বদলা নেয়া। এই আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়ে উমাইয়া শাসন খতম এবং আব্বাসী শাসনের পত্তন করে। বনু আব্বাস ক্ষমতায় এসেই উমাইয়াদের ধরে ধরে এনে কঠিনতম শাস্তি প্রদান করে। এমনকি খৃষ্টীয় কায়দা কৌশলে তৈরী উমাইয়া শাসক শোষক বর্গের কবরস্থানগুলো ভেঙ্গেচুরে ওসব হতে পাওয়া কবরবাসীর হাড়গুলো জমা করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। একমাত্র হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের

Dhaka University Institutional Repository

(রাঃ) মাজারখানি যথা সম্মান পূর্বক সুরক্ষিত থাকে এই কারনে যে, তিনি খলীফা হয়েই হুসায়ন ও আহলে বায়েতের প্রতি মান-সম্মান ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন এবং খুলাফায়ে রাশেদার আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

হযরত মুহম্মদ (দঃ) ও আব্বাসীয়গণের মধ্যে সম্পর্কের বংশ তালিকা

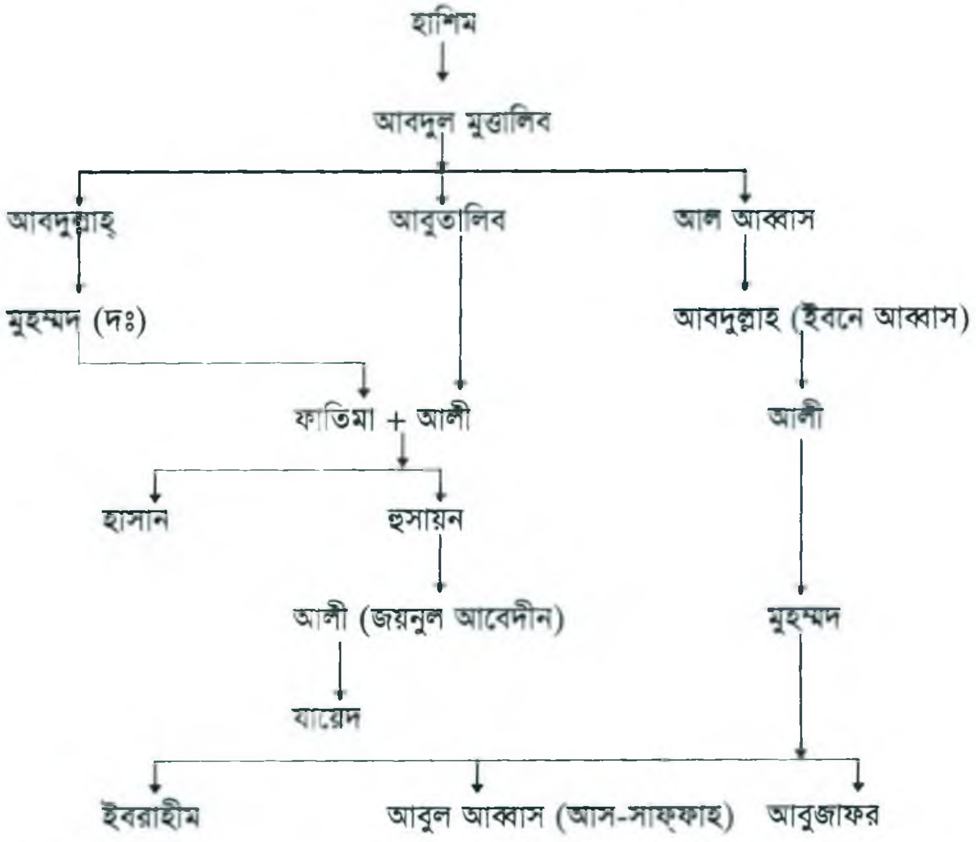

(আলমনসুর)

শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরাও উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হযরত আলী (রাঃ) এর দল সাধারনত শিয়া নামে পরিচিত। সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর পরাজয় এবং পরবর্তীকালের খারিজীদের হাতে তাঁর মৃত্যু ইসলামে দলীয় বিরোধের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয় এবং তাঁর সমর্থকদের যে দল রাজনৈতিক দল হিসাবে গড়ে উঠে ছিল তাঁদের উদ্দেশ্যকে আরও বলিষ্ট করে তুলে, মুআবিয়া সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলে এই দল শিয়া নাম গ্রহন করে। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ও নির্মম জুলুম আলীর সমর্থকদের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত করে কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা শিয়াদের ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টি করল। অধ্যাপক পি.কে হিট্টির উক্তি অনুসারে আল

Dhaka University Institutional Repository

হুসায়নের রক্ত শিয়া মাযহাবের বীজ বলিয়া প্রমানিত হয় এবং ১০ ই মহররম তারিখে শিয়া মতবাদ জন্মলাভ করে। এই ভাবে আল হুসায়নের হত্যার ফলে ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসাবে শিয়া মতবাদের জন্ম হয়।

শিয়ারা ইতিহাসে ফাতেমীয় বলেও পরিচিত। কেননা তারা হাসান ও হুসায়নের মাধ্যমে নিজদেরকে হযরত ফাতেমার (রাঃ) বংশধর বলে দাবি করে। পরবর্তী কালে শিয়ারা বহুদল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই উপ সম্প্রদায়ের মধ্যে যায়েদী দল ইমামী দল, দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী দল, সপ্তম ইমামে বিশ্বাসীইত্যাদি বিশেস উল্লেখযোগ্য

শিয়া ইমামগণোর তালিকা

হযরত মুহম্মদ (দঃ)

ফাতেমা + (১) আলী

(২) হাসান

(৩) হুসায়ন

(৪) আলী (যয়নুল আবেদীন)

যায়েদ

(৫) মুহম্মদ আল বাকের

(৬) জাফর আস সাদেক

ইসমাঈল

মুহাম্মদ আল মাকতুম

(৭) মুসা আল কাযিম

(৮) আলী আল রেজা

(৯) মুহম্মদ আল যায়েদ

(১০) আলী আল হাদী

(১১) হাসান আল আসকারী

(১২) মুহম্মদ আল মুনতাযার

(ইনি ৮৭৮ খৃীঃ অন্তর্নিহিত হন এবং শেষ বিচারের দিন পুনরায় আবির্ভূত হবেন।)

এরা হলেন সপ্তম ইমাম গণ

এরা হলেন দ্বাদশ ইমাম গণ

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী তৃতীয় শতকের শেষভাগে আলাভিগনের একটি শক্তিশালী রাজত্ব পশ্চিম দেশে কায়েম হয়। বনু উমাইয়া এবং বনু আব্বাসিগনের সাম্রাজ্যের পর দৈর্ঘ্য প্রস্থে এই সাম্রাজ্য তৃতীয় স্থানের অধিকারী। এই সাম্রাজ্যের পত্তন হয় মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর দ্বারা যিনি নিজেকে মাহদী বলে দাবি করতেন। তিনি প্রকাশ করতেন যে, রসূলে করীম (সঃ) তাঁর সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন। তিনি ইমাম জাফর ও সাদেক (রাঃ) এর পুত্র ইসমাঈলের বংশধর বলে দাবী করতেন। এই জন্য যে বংশের রাজত্ব তিনি স্থাপন করেন তাকে ওলুভিয়া, ইসমাঈলীয়া এবং ফাতেমীয়া বলা হয়। হযরত আলী ও ফাতেমা (রাঃ) এর বংশধর বলে তাঁরা এতগুলো নামের অধিকারী ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বনু মাহদীও লিখেছেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন। মাহদী হযরত আলী (রাঃ) এর বংশধর নন।

এই খান্দানের রাজত্ব আড়াইশত বৎসরের ও বেশী কাল স্থায়ী ছিল।

এখানেই শেষ নয়, যেখানেই জুলুম অত্যাচার, অন্যায় অসত্য, গুমরাহী বেদআত সীমা লংঘন করতো সেখানেই হুসায়নী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামী উম্মার দায়িত্ব শীল নেতৃবর্গ শাসক শোষক গোষ্ঠীর বিরূদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকেন। হুসায়নী রক্ত যেন কারবালার তপ্ত মরুর বালিকনায় হারিয়ে যায়নি বরং সংগ্রামী, জিহাদী প্রতিবাদী ও হক অন্বেষী নর নারীর শিরা উপশিরায় স্থানকালের গন্ডি পেরিয়ে উত্তপ্ত প্রবাহে অব্যাহত রয়েছে।

এ কারনেই আমরা কারবালার হুসায়নী হাঁক শুনতে পাই বিংশ শতকেও উপমহাদেশের আজাদী সংগ্রমের সিংহপুরুষ মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহরের কণ্ঠেঃ কাতলে হুসাইন আছল মে মর্গে ইয়াযীদ হ্যাঁয়/ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কি বাদ।

সুদানের মাহদাবী আন্দোলন, উত্তর আফ্রিকার ওমর মুখতারের আন্দোলন, ইরান ইরাকে মীর্জা শিরাজীর আন্দোলন, উপমহাদেশের শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর জিহাদ, এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানীর আন্দোলন, আমেরিকার লুই ফারাহ খান, আফগানিস্তানের ওসামা বিন লাদেন এর আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলন হুসায়ন এর আদর্শকে সামনে নিয়েই বিংশ শতাব্দীর ইয়াযীদি শক্তি তথা উপনিবেশবাদীদের বিরূদ্ধে গড়ে উঠে এবং অত্যাচার উৎপীড়নের ও অপশাসণের মসনদে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

জিহাদ যখন একান্ত আল্লাহর জন্য তখন আল্লাহর মদদ হয় সরাসরি। মহান আল্লাহ্ বলেন "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের আযাব দিবেন। তাদের আযাব দিবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন। মুমিনদের অন্তঃকরনকে পঙ্কিলতা মুক্ত করে অনুপম শান্তি প্রদান করবেন এবং তাদের হতোদ্যম ও মনোঙ্গ করে দিবেন।"[৭] জিহাদই বিজয়ের গ্যারান্টি। সেই পথই দেখিয়ে গেছেন হুসায়ন (রাঃ) ও তাঁর সাথীরা। যুগে যুগে ইসলাম বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে মুমিনদের প্রতিটি যুদ্ধে কালে খোদ আফগানিস্তানে। আফগানীরা হুসায়নের জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নিজ ভূমি রক্ষায় উজাড় করে দিয়েছিলেন নিজেদের জানমাল সহায় সম্পত্তি সবকিছু। নিরবচ্ছিন্ন জিহাদ সংগ্রাম চাপিয়ে ছিলেন দীর্ঘ এক যুগেরও বেশী সময় ধরে। শেষাবধি তেষ্টাতে না পেরে সর্বাধুনিক অস্ত্রাধারী শ্বেত ভাল্লুকেরা মাথা হেট করে পালিয়ে ছিলো।

আফগানীরা যদি নতজানু হয়ে শান্তি চুক্তি করতো, রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জানবাজি রেখে জিহাদ ছেড়ে দিয়ে শান্তি প্রক্রিয়ার নামে উড়োজাহাজে ঘুরে বেড়াতো তবে তাদেরও অবস্থা হতো আজকের ফিলিস্তিনীদের মতো। শান্তির মুখ কোন দিনতো দেখতইনা রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও আগ্রাসনে নিপতিত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতো।

ইসলামী উম্মাহ প্রমান করে দেন যে, হুসায়ন ও তাঁর আশুরা আন্দোলন কারবালাতেই শেষ নয় বরং কুল্লে ইয়াউমিন আশুরা/কুল্লে মাকান কারবালা।" অর্থাৎ প্রতিটি দিন ও ক্ষনই আশুরা, প্রতিটি স্থান কারবালা।

আমাদের খোদ বাংলাদেশেও শাহজালাল মুজাররেদী (রহঃ) থেকে শুরু করে ফকীর মজনু শাহ্, তিতুমীর, দুদুমিয়া, বাদশা মিয়া, এব? মওলানা তাসানীর ফারাক্কা লংমার্চ ছিল সত্যিকার অর্থেই হুসায়নী লংমার্চের আধ্যাত্মিক ফসল। আর এটাই সত্যিকার এখলাছ সম্পন্ন আন্দোলনের চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

আর কোন নবী আসবেন না। কিন্তু মানব জাতিকে পথের দিশা দেয়ার জন্য আখেরী নবীজীরই ফসল হুসায়নের আদর্শ অনুসারীদের আগমন ঘটতেই থাকবে ইমাম মাহদীর (আঃ) বিশ্ব আধ্যাত্মিক রাজনৈতিক আন্দোলন পর্যন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ কারবালার সংঘটকদের পরিনতি

ইতিহাসের সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র বিধান অলংঘ্য, প্রযুক্ত তা সর্বকালে সর্বত্র।

স্থূলদৃষ্টিতে এ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয় তাৎক্ষনিক, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তা কিছুটা কাল সাপেক্ষ; কাল সাপেক্ষ কিন্তু আমোঘ।

খোলাফায়ে রাশেদূনের (৬৩১-৬৬১ খৃঃ) পর উমাইয়া খিলাফতের প্রথম খলিফা মুয়াবিয়া (৬৬১-৬৮০ খৃঃ) হযরত হাসানের সথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তি বাস্তবায়ন না করে স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে ৬৭৯ খৃষ্টাব্দে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ৬৮০ খৃষ্টাব্দে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইয়াযীদ খলিফার মসনদে আসীন হন। ইয়াযীদের উত্তরাধিকারকে আরব সমাজ ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) ভিত্তিহীন ও অন্যায় বলে অভিহিত করেন।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে কার্যকর করার জন্য দুরাত্মা ইয়াযীদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে। এর বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় ইয়াযীদের চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধি। পরিনামে সংঘটিত হয় কারবালার ঘটনা।

কারবালা সংঘটনের প্রতিক্রিয়ায় মদীনা, মক্কা ও কুফায় জ্বলে ওঠে বিক্ষোভের আগুন। সেই বিক্ষোভ সরকারী জালেম শক্তির বিরূদ্ধে, মজলুম জনসাধারনের বিক্ষোভ। সরকারের এই মহা ঘৃণিত কাজের জন্য মদীনা শোকে মুহ্যমান। এই ক্ষোভ, শোক থেকেই আরম্ভ হয়ে গেল গণ অভ্যূত্থান প্রথমে মদীনায় পরে মক্কায়। কিন্তু ইয়াযীদের সরকারী বাহিনী তা কঠোর হস্তে দমন করতে থাকে। মদীনায় আরম্ভ হয় নারকীয় বীভৎসতা, নির্বিচার হত্যাভিযান। কথিত আছে ৮০ জন সাহাবা ও ৭০০ জন ক্বারী এই হত্যাভিযানে শহীদ হন।

অতঃপর মক্কায় সিরিয়া অধিপতি ইয়াযীদের বাহিনী তমুল আক্রমন শুরু করে কিন্তু মক্কাবাসী অনমনীয়। ইহা দেখে সিরীয় সৈন্যগন মক্কা ঘিরে ফেলো। বাইরের পর্বতমালা ও উচ্চভূমি হতে তারা নগরের ভিতর প্রস্তরবর্ষণ করতে লাগল। মক্কার গৃহরাজি, এমনকি হারাম শরীফ পর্যন্ত তাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভগ্নশ্রী হয়ে পড়ল। যখন তাতেও নগরী আত্মসমর্পন করল না, তখন তারা হাওয়াই বাজির সাহায্যে মক্কার বস্তিসমূহের ভিতর জ্বলন্ত অগ্নিবলয় নিক্ষেপ করতে লাগল। এতে লোকের বাড়ী ঘর পুড়তে

Dhaka University Institutional Repository

লাগল। অগ্নিনির্বাপন একরকম অশম্ভব হয়ে দাঁড়াল। নাগরিকদের দুঃখের আর সীমা রইল না। মক্কাবাসীগণ অনন্যোপায় হয়ে একান্ত মনে আল্লাহ্‌কে ডাকতে লাগল। যাঁর ঘর তাঁকেই এর রক্ষার দায়িত্ব অর্পন করে তারা বিপদমুক্তির জন্য নামায ও আল্লাহ্‌র যিকির ইত্যাদিতে রত হল। অবশেষে আল্লাহ্‌ দরবারে তাদের আকুল প্রার্থনা মঞ্জুরী হল। আকস্মাৎ একদিন সিরীয় শিবিরে আগুন জলে উঠল। অস্ত্রাগারে কোন এক ব্যক্তির অসাবধানতার ফলে এই আগুন লেগো যায়। অস্ত্রাগার ভস্মীভূত হল এবং সেই সঙ্গে বহু মানুষও পুড়ে মরল। সৈন্যরা এতে ভয় পেয়ে গেল এবং সেনাপতি হাসীনকে বলল আর না, আল্লাহ্‌র ঘরের সাথে বেয়াদবি করতে গিয়ে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এখন চল দামেস্কে ফিরে যাই। হাসীন বললেন তোমরা ধৈর্য্য ধারন কর, আমি দামেস্কে পত্র লিখে ইয়াযীদের নির্দেশ আনয়ন করি। সৈন্যগণ উৎকণ্ঠিতভাবে দিনযাপন কতিে লাগল।"[৮]

কিন্তু ইতিমধ্যে জানা গেল, মৃগয়া থেকে অশ্বারোহনে রাজধানীতে ফেরার পথে খলীফা ইয়াযীদের পথিমধ্যে এক অপ্রত্যাশিত আকস্মিক দুর্ঘটনা, হঠাৎ করেই ধাবমান অশ্বের পদস্খলন এবং সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপৃষ্ট থেকে খলীফা ইয়াযীদের ভূমিতে পতন এবং তারপর শয্যাশায়ী হয়ে কাতরে কাতরে অতি কষ্টে মৃত্যুবরন। অন্যদিকে কারবালার নৃশংস নির্মম ঘটনার পর, মদীনা ও মক্কার মতই কুফায়ও সংঘটিত হয় এক নবরূপী গণ অভ্যুত্থান। এই গণ অভ্যুত্থানকারীদের নামকরণ করা হয় অনুশোচনাকারী বলে। এরাই সেদিন হযরত হুসায়ন (রাঃ)কে দেয়া আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল। কিন্তু কারবালা সাংঘটনে অংশগ্রহণ করেনি। দিন যায় মুখতার নামে এক বিচিত্র শক্তিশালী বিপ্লবী নেতার আবির্ভাব ঘটে সেখানে, যিনি কারবালা সংঘটনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অনুশোচনাকারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন কারবালার নির্মম ঘাতকদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন। এই গণআন্দোলনই ক্রমে সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে মুখতারের নেতৃত্বে রূপ নেয় গণযুদ্ধে। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌ মরহুমের ভাষায় বিষধর সর্পের ডেরা খুঁজিয়া লোকে যেমন উহার সন্ধানলয় এবং মস্তক চূর্ণ করে, মুখতার তেমনি কুফার ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ইমাম হত্যার উদ্দ্যোক্তা ও অংশীদার দিগকে টেনে বের করলেন এবং সবাইকে তরবারির মুখে নিক্ষেপ করলেন।[৯] এই সংঘর্ষে শীমার ওমর সহ প্রান হারাল ঘাতক দলের ২৮৪ জন। এই মহানিধন কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর সরকারের তরফ থেকে দেশে 'কারবালার কসাই' বলে খ্যাত আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নেতৃত্বে পাঠানো হয় এক সেনাবাহিনী। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা হল মুখতার বাহিনীর, মোকাবিলা

Dhaka University Institutional Repository

হল টাইগ্রীস নদীর শাখা নদী জাবের তীরে। মৃত্যু অলক্ষ্যে পশ্চাৎ হইতে আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে অনুসরন কর ছিল। তার পূর্বের রনকৌশল আজ খাঠিল না। অকস্মাৎ অসাধারন সৈনিকের নিক্ষিপ্ত বর্শা তাহার সম্মুখী হইতে পৃষ্ঠ পর্যন্ত বিদ্ধ করিল। আব্দুল্লাহ যিয়াদ অশ্ব হইতে ভূমিতলে গড়িয়ে পড়ল। তার দেহ রক্ষীরা তাকে কুফীদের হস্ত হইতে রক্ষা করবার জন্য দ্রুত ছুটিয়া আসল। কিন্তু কুফীরা তখন জীবন মরনের প্রশ্ন ভূলে গিয়েছিল। শত্রুদের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে তারা ক্ষীপ্র হস্তে তরবারির আঘাতে আঘাতে আব্দুল্লাহ যিয়াদের পাপ মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করল এবং কর্তিত মস্তক বর্শাবিদ্ধ করে মহা উল্লাসে জয় ধ্বনি করতে করতে কুফার পানে ধাবিত হল।[১০]

কী অপূর্ব নিখুঁত আল্লাহ্র সেই অলংঘ্য বিধান। যে আসনে উপবিষ্ট আবদুল্লাহ যিয়াদের সম্মুখে সেদিন শীমার রেখেছিল হযরত হুসায়ন (রাঃ) কর্ত্তিত শির, সেই আসনেই উপবিষ্ট মুখত্যারের সম্মূখে আজ রাখা হল আবদুল্লাহ যিয়াদের কর্তিত শির, ইতিহাস, নির্মম ইতিহাস এমন ভাষাতেই কথা কয়, সর্বকালে সর্বত্র।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ের উদ্ধৃতি সূচী

১ আবেনে ৮/২১৯
২ আবেনে ৮/২২০, মিসু ২/২৫০
৩ মিসু ২/২৫০
৪ আবেনে ৮/২২০
৫ প্রগুক্ত, ৮/২২০
৬ মাআ ১/১২০, ইমা ১/৫১০, আবেনে ৮/২২০
৭ কুক ১০/১৪
৮ কার, পৃ. ১৪৩
৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
১০ প্রগুক্ত, পৃ. ১৬১ - ৬২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইতিহাসে বহু যুদ্ধ ও যুদ্ধে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনা আছে, কিন্তু কারবালার যুদ্ধে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা সব নির্মম হত্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখিত ইনসা নিয়াত মওত কি দরওয়াজে পর এর অনুবাদে এবং ইমাম ইবনে কাছীরের আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া-তে আমরা যখন শত্রু বেষ্ঠিত হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ভগ্নী যয়নব (রাঃ) এর এই আর্তনাদ শুনি- " হায়! আকাশ যদি ভেঙ্গে পড়ত! হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কন্যার দুঃখের কবিতা শুনি" সেদিন তোমরা কি উত্তর দেবে যখন রাসূল রোজ হাশরে জিজ্ঞেস করবেন, হে আমার আখেরী উম্মত! আমার পরিবারের সাথে কি আচরণ করেছিলে তোমরা?

মোট কথা কারবালা শব্দ উচ্চারিত হলেই এখন আমাদের মাঝে ফুটে উঠে অমানবিক অন্যায়ের সীমাহীন জুলুমের মিথ্যাশ্রয়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এবং সর্বোপরি একটি নবগঠিত জাতির জীবনাদর্শ ধ্বংসের নৃশংস নির্মম এক ক্রিয়ার সংঘটন যার আছে আল্লাহরই বিধানে সমভাবে নৃশংস নির্মম এক প্রতিক্রিয়া, এক প্রতি সংঘটন। ইতহাসের সাক্ষ্য আল্লাহর এ বিধান অলংঘ্য, প্রযুক্ত তা সর্বকালে সর্বত্র। স্থুল দৃষ্টিতে এ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয় তাৎক্ষনিক, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তা কিছুটা কাল সাপেক্ষ; কিন্তু অমোঘ। উল্লেখ্য যে, ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে যে সকল শহর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল তন্মধ্যে মক্কার পরেই মদীনা, কুফা ও দামেস্ক অন্যতম কারবালার মর্মান্তিক করুন কাহিনীর সাথে এ তনিটি শহর বিশেষ ভাবে জড়িত। মদনিার পরিচয় অনাবশ্যক, উহা হেজাজ প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এবং মক্কা হতে দু'শত ষাট মাইল উত্তরে। মদনিা হতে প্রায় দু'শত মাইল উত্তর পূর্বে কুফা এক কালে এটা ইরাক প্রদেশের রাজধানী ছিল। ইরাকের পশ্চিমেই সিরীয়া। এর রাজধানী দামেস্ক শহর মদীনা হতে প্রায় সাত শত মাইল উত্তরে এবং কুফা হতে অন্যূন চারশত মাইল পশ্চিমে এই তিনটি শহর যোগ করলে যে ত্রিভূজের সৃষ্টি হবে এর অন্তবর্তী যাবতীয় স্থান মরুভূমি।"

ইসলামের ইতিহাসের এক বিষাদময় ঘটনা কুফার কারবালা নামক মরুময় এলাকা। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনায় কারবালা স্মরণীয় হয়ে আছে। এ ঘটনার নেপথ্য নায়ক ইয়াযীদ হলেও কারবালায় যে বর্বরোচিত ঘটনা সমূহ ঘটেছিল তার প্রধান হোতা ছিল কুফার

Dhaka University Institutional Repository

গভর্ণর উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ও সেনানায়ক শীমার বিন যিল যাওশান। হযরত হুসায়ন (রাঃ) কুফাবাসীর আহ্বানে কুফা অভিমুখে রওয়ানা দিলে ইয়াযীদ কুফার গভর্ণর উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাঁতে কুফায় প্রবেশ করতে বাধা দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। যিয়াদ ও শীমার উভয়েই ছিল আরবের গোত্রীয় জাহেলীয়াত দ্বারা আচ্ছন্ন।

যিয়াদ ও শীমার উভয়েই হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর রক্ত পিপাসু ছিল। শীমার গভর্ণর যিয়াদকে বুঝালো যে সেনাপতি ওমর বিন সা'দ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বিরোধিতার ব্যাপারে গড়িমসি করছে, তাকে সেনাপতির দায়িত্ব দিলে সে এ সমস্যার আশু সমাধান করবে। অবশেষে যিয়াদ ও শীমারের অতূৎসাহী ভূমিকার কারনে, বিবাদ মিমাংসার সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। হযরত হুসায়ন (রাঃ) সহ তাঁর পরিবারের পুরুষ সদস্য ও সহচরগণের সকলকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। শীমারের ঘাতক বাহিনী হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মৃত দেহের উপর ঘোড়া চালিয়ে পাঁজরের হাড় চুর্ণ বিচুর্ণ করে বর্শা ও তলোয়ারের আঘাত করে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে তাঁর কর্তিত শীরের উপর আঘাত করে লাঞ্ছিত করে ও নারকীয় উল্লাস করতে থাকে। এ ভাবে ইয়াযীদের অবৈধ নির্দেশ প্রতিপালন করতে গিয়ে অতূৎসাহী যিয়াদ ও শীমার চরম বর্বরতার মাধ্যমে বিষাদময় কারবালার জন্ম দেয়, নবী (সঃ) পরিবারের এ শোচনীয় পরিনতিতে যারাই জড়িত ছিল দুনিয়াতে তারা সবাই চরম লাঞ্ছিত ও দুঃখ যন্ত্রণার সাথে মৃত্যুবরণ করেছে। পরবর্তী লোকদের জন্য এ থেকে অনেক উপদেশ গ্রহন করার বিষয় রয়েছে।

যুদ্ধ শুরু হবে ঠিক আগ মুহূর্তে দু'দলের মাঝখানে দাড়িয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এক ভাষন দিয়েছিলেন তাতেই তার প্রকৃত আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। ভাষণটা এরূপ "তোমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী কর। আমার একটি মাত্র অপরাধ যে, আমি ইয়াযীদের মত একজন গোমরাহ ও অধার্মিক ব্যক্তিকে মুসলমানদের আমীর বলে স্বীকার করতে পারিনি। আর সে অপরাধে আজ তোমরা আমার রক্ত পান করতে দাঁড়িয়েছ।" হযরত হুসায়ন (রাঃ)এর ভাষণ ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর মনে কোন রেখাপাত করলনা। অবশ্য ইয়াযীদের বাহিনীর এক সেনাপতি হোর তার ৩০ জন সৈন্য সহ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষে যোগদেন। যুদ্ধ শুরু হল। প্রচন্ড বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলেন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বাহিনীর সবাই। যুদ্ধে একে একে সবাই শাহদাত বরণ করলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও তাঁর তাজাখুন ঢেলে দিলেন

Dhaka University Institutional Repository

কারবালার প্রান্তরে। লাল হয়ে উঠলো ফুরাতের তীর। মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে হৃদয় বিদারক শোকাবহ ঘটনাটি ঘটে গেল। তাঁর রক্তের প্রতিটি ফোটা ছড়িয়ে পড়লো ইয়াযীদ বাহিনীর প্রতি ধিক্কার আর ঘৃণা জানিয়ে। আজও সেই রক্তের প্রবাহ বিদ্যমান। অনাগত কাল ধরে তা চলবে। মহানবী (সঃ) এর প্রিয়তম দৌহিত্র হযরত হুসায়ন (রাঃ)। হযরত আলী (রাঃ) এর আদরের দুলাল জান্নাতের যুবকদের নেতা। বংশ, জ্ঞান গরিমা, বীরত্ব, সাহসিকতা, ত্যাগ, কোরবানী তাকওয়া পরহেজগারীতে অতুলনীয়। ব্যক্তিগত লোভ লালসা ক্ষমতার মোহের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে।

তাঁর অপরাধ ছিল তিনি ইয়াযীদের আনুগত্য অস্বীকার করেন। তিনি যালিম শাসক ইয়াযীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ইয়াযীদ সরকারের বিচ্যুতির প্রতিকার চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন "খেলাফত" ব্যবস্থাকে তার সঠিক অবস্থানে নিয়ে আসতে। তিনি চেয়েছিলেন মযলুম মানুষের মুক্তি। তিনি প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন, ক্ষমতাধীন ইয়াযীদের যুলস অত্যাচার অনাচার আর দুর্নীতি। তিনি চেয়েছিরেন ইসলামী "শুরায়ী" ব্যবস্থার ধারাকে সমুন্বত রাখতে রাজতন্ত্রে উত্তরণকে রোধ করতে। তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এমন এক শাসকের বিরুদ্ধে যে জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়নি। যে জনগণের উপর চেপে বলেছিল। তিনি চেয়ে ছিলেন নির্ভেজাল খেলাফত, মানুষের কল্যান, জনগণের অধিকার। আর সে অপরাধেই তাঁকে শহীদ করা হলো। শহীদ করলো ঐ সব লোকেরাই যারা ক্ষমতার লোভে স্বার্থের কারনে, সুবিধার কারনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যারা মহানবী (সঃ) এর আনুগত্য আর প্রেমের চেয়ে ক্ষমতা আর স্বার্থকে বড় করে দেখেছিল। যারা নিজেদের সুবিধার জন্য সত্য ছেড়ে বিচ্যুতির পথ ধরেছিল। হযরত হুসায়ন (রাঃ) শহীদ হলেন তাদেরই হাতে যারা প্রতি বিপ্লবের পথ ধরেছিল। মহানবীর (সঃ) বিপ্লবের পথ পরিহার করে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সংগ্রাম কোন কাফের শাসকের বিরুদ্ধে ছিলনা। তাঁর সাংগ্রাম ছিল একজন মুসলমান নাম ধারী শাসকের বিরুদ্ধে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) একজন মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে দাড়ালেন কেন? হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দৃষ্টিতে ইয়াযীদ মুসলমান হলেও যে মুসলমানের শাসক হওয়ার উপযুক্ত ছিলনা। সে অধিকারও তার ছিলনা। তার শাসন ছিল জোর জবরদস্তির শাসন। তার শাসন ছিল বিচ্যুতির। তার মাধ্যমে যে ধারায় সূচনা হয়েছিল তার ফলাফল ছিল সূদূর প্রসারী, ইয়াযীদের শাসন শুধু একজন মন্দ লোকের শাসনই ছিল না। তার শাসন ছিল ইসলামী খিলাফতের সঠিক ধারনাটি মুছে ফেলার প্রচেষ্টা। তাই হযরত হুসায়ন (রাঃ) রুখে দাড়িয়েছিলেন। তিনি ইয়াযীদ বিচ্যুতিকে ঠেকাতে পারেননি। কিন্তু প্রতিবাদ প্রতিরোধের নজির স্থাপন করে গেছেন। নিজের ও

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার বর্গের চরম পরিনতির কথা জেনেও তিনি মাথা নত করেন নি, আপোষ করেননি। তিনি সত্যের জন্য নীতির জন্য আদর্শের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নিজেরও সন্তানদের তাজা খুন ঢেলে দিয়েছিলেন। মহানবী (সঃ) প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি ব্যবস্থাকে যখন বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তখন মহানবী (সঃ) এর জীবিত বংশধর হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিশ্চেষ্ট থাকবেন? যে মহানবী (সঃ) ও তাঁর পরিবার থেকে দ্বীনের আদর্শ ও চলার পথ নির্দেশিকা পেয়েছে, আজকের এই নাজুক পরিস্থিতিতে উম্মত নবীর বংশধর হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছ থেকে কোন পথ নির্দেশনা পাবেনা? হযরত হুসায়ন (রাঃ) সেই দায়িত্ব অনুভব করতেন। অনাগত কাল পর্যন্ত সমগ্র উম্মাহ কি চায় তা তিনি বুঝতেন। আর এজন্যই তিনি জেনে শুনেই তাঁর ভূমিকা নির্ধারণ করলেন।

এভাবেই হযরত হুসায়ন (রাঃ) স্থাপন করলেন এক উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন তিনি ইতিহাসের এক মহানায়ক। যুদ্ধ বিজয়ী কোন মহানায়ক নন তিনি। কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করে তিনি মহানায়ক হননি। তিনি ত্যাগের মহানায়ক। সত্যের জন্য হাসি মুখে জেনে বুঝে সচেতন ভাবে সবকিছু বিলিয়ে দেয়ার মহানায়ক তিনি। তার তুলনা তিনি নিজেই। ইসলামের ইতিহাসে চির ভাস্বর তিনি আপন মহিমায়। মনবতার ইতিহাসে স্মরনীয় তিনি। যুগে যুগে মযলুম মানুষ সংগ্রামী জনতা প্রেরণা লাভ করেছে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর কাছ থেকে। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যুগিয়েছে হযরত হুসায়ন (রাঃ) ঐতিহ্য। অন্যায় ও মিথ্যা শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শিক্ষা দেয় হুসায়নী ত্যাগ ও কুরবানী, যালেম শাসক গোষ্টির মোকাবেলায় কোন আপোস না করার শিক্ষা দেয় হুসায়নী (রাঃ) এর সংগ্রাম। হুসায়নী ঐতিহ্য আমাদের বলে দেয় এ, প্রকাশ্য কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে আভ্যন্তরীন যালেম মুনাফিক ফাসেক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কম গুরুত্ব পূর্ণ নয়, ক্ষেত্র বিশেষে অনেক বেশী। মুসলিম সমাজের আভ্যন্তরীন সংশোধন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য জেহাদের প্রেরণা ও মুসলিম নামধারী যালেম স্বেরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শিক্ষা দেয় হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদত, বস্তুত ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে দুটো ধারা একটি হুসায়নী ধারা, অপরটি ইয়াযীদি ধারা, হুসায়নী ধারা মানে সত্যের জন্য মিথ্যার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম মযলুমের পক্ষে যালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। হুসায়নী ধারা মানে ত্যাগ, কুরবানীর নজরানা। আর ইয়াযীদি ধারা মানে যুলুম দুর্নীতি লোভ আর পদে পদে নতি স্বীকার। ইয়াযীদি ধারা মানে ধর্মের নামে ভন্ডামী, ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে ক্ষমতা দখল, স্বার্থ

Dhaka University Institutional Repository

আদায়। ইয়াযীদি ধারা মানে গণ বিরোধীতা। স্বেচ্ছাচারিতা, স্বৈরতন্ত্র আর প্রকৃত ইসলামের বিরোধীতা হুসায়নী ধারা ও ইয়াযীদি ধারায় কোন আপোষ হতে পারেনা। কখনো হয়নি।

যদিও ইয়াযীদের আবির্ভাব ঘটে ছিল হিজরী প্রথম শতকে কিন্তু ইয়াযীদি ব্যবস্থা চলছে আজও। যুগে যুগে মুসলিম শাসকদের বিরাট অংশ অনুসরন করেছে ইয়াযীদি পথকে। কিন্তু তাতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর উত্তর সুরিরা দামে যায়নি থেমে যায়নি। তালোয়ারের মোকাবেলায় কুরবানীর হাতিয়ার নিয়ে সত্যের মুজাহিদরা এগিয়ে গেছেন। এ শুধু অতীতের ব্যাপার নয়। আজকের যুগেও এ অবস্থা বিরাজমান। অতীতের চেয়েও পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। এ যুগের ইয়াযিদদের াবস্থা প্রথম যুগের ইয়াযীদদের চেযেও মারাত্নক। সে যুগের ইয়াযীদ নিজের ক্ষমতাকে পাকা পোক্ত করার জন্য আশ্রয় নিয়ে ছিল যুলুম অত্যাচারের তবু কিন্তু তারা বাহ্যত শরীয়ত মেনে চলত। কাজের ভিত্তি হিসেবে কুরআর সুন্নাহর স্বীকৃতি দিত। বিচার ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুসরণ করা হত। কাফের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ জেহাদও করত। তারা মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের সাথে হাত মিলায়নি। তারা মুসলিম সমাজও রাষ্ট্রের বাহ্যিক রূপটা ধসিয়ে দেয়নি। কিন্তু আজকের ইয়াযীদরা রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা থেকে খোদ ইসলামকেই বিতাড়নের ব্যবস্থা করেছে। তারা আজ কুরআন সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসেবে স্বীকার করছেনা। শরীয়ত পরিহার করেই তারা দেশ চালাচ্ছে। এমনকি ইসলামী শরীয়ত যাতে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে। তার জন্য সবধরনের যুলুম ও ঘৃন্য পন্থার আশ্রয় নিচ্ছে। এরা ইসলামী আদর্শের পরিবর্তে ধর্ম নিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্র পুঁজি বাদ ইত্যাদি ব্যবস্থাকে অনুসরন করছে। এরা কোথাও রাজতন্ত্রের নামে কোথাও এক দলীয় ব্যবস্থার নামে চরম স্বৈরতান্ত্রিক এক নায়কত্বমূলক ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এরা কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক আইনের বদলে পশ্চিমা আইন চালু করেছে। এদের অনেকেই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ইহুদীবাদী স্বার্থের অনুকূলে কাজ করছে।

বিশ্ব জুড়ে নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য এরা উল্লেখ যোগ্য ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে আগ্রহী নয়, নয় আন্তরিক। সব চেয়ে বড় কথা এরা মুসলিম বিশ্বে ইসলামের উত্থানের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। এরা পশ্চিমাবাদী চক্রের সাথে হত মিলিয়ে তথাকথিত মৌলবাদ ঠেকানোর নামে ইসলামের জাগরনকে রোধ করতে চাইছে। এক্ষেত্রে তারা সাম্রাজ্য বাদী ইহুদীবাদী শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে। আর এ লক্ষে তারা দেশে দেশে কায়েম করছে কারবালা। এ যুগের হুসায়নী

Dhaka University Institutional Repository

ধারার সংগ্রামীদের স্তব্ধ করে দিতে চালাচ্ছে ঘৃন্যতম অত্যাচার অনাচার। সমস্ত মানবিকতাকে তারা দিচ্ছে বিসর্জন। এরা আজ ইয়াযীদকেও সম্পূর্ন হার মানিয়েছে। ইয়াযীদি ব্যবস্থার চেয়েওনিকৃষ্টতম ব্যবস্থা তারা চালু করেছে। বর্তমান যুগের ইয়াযীদদের হাতে আত্মাহুতি দিচ্ছে অসংখ্য সংগ্রামী মানুষ। জেল-যুলুম হত্যা-খুন আর ফাঁসির মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে নিত্যনতুন কারবালা।

তাই কারবালার ঘটনা দাবী করছে তথা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাত দাবী করছে মাতম নয় মর্সিয়া নয়, দাবী করছে ভিন্ন কিছু, মাতম মর্সিয়ার আড়ালে মহররমের আসল তাৎপর্য হারালে চলবেনা। কারবালার কথা স্মরণ করে কেঁদে কেঁদে কারবালার আজকের প্রেক্ষিতকে ভুলে গেলে চলবেন। কারবালাকে বিশ্লেষণ করতে হবে আজকের মুসলিম বিশ্বের বাস্তব অবস্থা সামনে রেখে। শিক্ষা নিতে হবে। মহান কারবালার ঘটনা হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ভূমিকাকে সামনে রাখলে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো আজ আমাদের জন্য অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে।

(১) **যালেম ও স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামঃ** আজ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যালেম শাসক গোষ্টি ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যে কোন মূল্যেই মুসলিম বিশ্বের স্বৈর শাসক ও যালেম ক্ষমতাসীনদের প্রতিরোধ করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাহলেই মহররম আমাদের জন্য তাৎপর্য পূর্ণ হয়ে উঠবে।

(২) **ইসলামী শাসন ও সরকার প্রতিষ্টা ঃ** মুসলিম বিশ্বে আজ সত্যিকার অর্থে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই। বরং বিভিন্ন পশ্চিমা মতবাদ ও আদর্শ দ্বারা মুসলিম বিশ্ব শাসিত হচ্ছে এ অবস্থার পরিবর্তন প্রযোজন। বর্তমানে ইসলামের স্বার্থে সাংঘর্ষিক বা সংগতিবিহীন শাসন ব্যবস্থার বদলে আজ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা মহররমের অনিবার্য দাবী। আর ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হচ্ছে ইসলামী সরকার প্রতিষ্টা করার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলা। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ত্যাগ এটাই আমাদের কাছে দাবী করছে।

যে ইসলামের জন্য হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিজের জীবন দিয়েছেন। সে ইসলামকে সার্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

(৩) **সর্বস্তরে শুরায়ী ব্যবস্থা চালুকরা ঃ** বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্তা চালু রয়েছে। ক্ষমতালাভ ও শাসন পরিচালনায় জনগণের মতামত ও সম্মতিকে আজ

Dhaka University Institutional Repository

পদদলিত করা হচ্ছে। অথচ ইসলামের অন্যতম রাজনৈতিক মূলনীতি হচ্ছে শুরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা, আজকের মুসলিম দেশ গুলোতে জনগণের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় না। শ্রদ্ধা দেখানো হয় না। জনগনের আশা আকাংখার বিপরীত অনেক কিছুই উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এ অবস্থার অবসান প্রয়োজন। যথার্থ শুরায়ী ব্যবস্থা চালু করতে পারলেই জনগনের সম্মতি মতামত ও অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হবে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য ছিল যথার্থ শুরায়ী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবতীয় স্বৈর ব্যবস্থার অবসান ঘটানো তাই আমাদেরও সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

(৪) আভ্যন্তরীন বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঃ হযরত হুসায়ন (রাঃ) যখন বুঝতে পারলেন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিচ্যুতি অনুপ্রবেশ করছে এবং ইয়াযীদের মাধ্যমে এ বিচ্যুতি মারাত্মক রূপ নিবে- তখন তিনি এসব বিচ্যুতি রোধ কল্পে এগিয়ে আসলেন। ঠিক তেমনি আজকের মুসলিম উম্মাহ যে সমস্ত বিচ্যুতির শিকার যে গুলো দূর করার জন্য যচেষ্ট হতে হবে। মুসলিম জাতির আভ্যন্তরিন বিচ্যুতি রোধ করতে না পারলে তার উত্থান সম্ভব নয়। তাই হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর আদর্শ অনুসরন করে আমাদের যাবতীয় বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এসব বিচ্যুতি প্রতিরোধ করতে হবে।

(৫) দ্বীনের জন্য সর্বাত্মক কুরবানী ঃ আজ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার চরম শফত নিয়ে আত্ম-ত্যাগও কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কুরবানী ছাড়া সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কোন কালে সম্ভব হয়নি। আজও হবেনা। তাই হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর আদর্শ অনুসরন করে সর্বাত্মক কুরবানীর জন্য আমাদের তৈরী হতে হবে। প্রয়োজনে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মত চরম আত্মাহুতি দিতে হবে। তা হলেই তার পথ অনুসরন করা হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

(৬) সুবিধাবাদ নয় আপোষ হীনতা প্রয়োজন ঃ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর আরেকটি বড় শিক্ষা হল এই যে, আপোষের পথ ধরলে সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যাবেনা। যত বাধা বিপত্তিই আসুক, যত চাপই সৃষ্টি করা হোক যত ঝুঁকিই থাকুক আপোষহীনতার পথ ধরেই এগুতে হবে। নীতির প্রশ্নে আদর্শের প্রশ্নে আপোষ করা চলেনা। হযরত হুসায়ন (রাঃ) নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আপোষ করে জীবন বাঁচাতে চাননি। ন্যায় ও সত্যোর পথে ছিলেন তিনি অবিচল দৃঢ় ও আপোষহীন। তাই তিনি আপাত পরাজিত হলেও তিনিই প্রকৃত বিজয়ী যুগ যুগ ধরে তিনি হয়ে আছেন সত্য পথে চলার অনির্বান অনুপ্রেরণার উৎস।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) **পরিস্থিতির নাজুকাতা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যাবে না ঃ** হযরত হুসায়ন (রাঃ) যখন ইয়াযীদের বিরূদ্ধে রুখে দাড়িয়ে ছিলেন। তখন অনেকে এমন ছিলেন। যারা পরিস্থিতির নাজুকতার কারনে কোন সক্রিয় ও প্রতিবাদী ভূমিকা রাখা সমীচীন মনে করেননি। কিন্তু হযরত হুসায়ন (রাঃ) শিখিয়েছেন পরিস্থিতি যাই হোক না কেন চুপ করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা চলবেনা। সাধ্যমত অন্যায় অন্ত্রের বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কেননা নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট থাকার অবস্থার পরিবর্তন চাইলে অবশ্যাই ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। তার প্রচেষ্টা হয়তো তাৎক্ষনিক সফলতা এনে দেয়না। কিন্তু প্রচেষ্টা ছাড়া কোন সফলতাই সম্ভব নয়। সর্বত্র গড়ে তুলতে হবে হুসায়নী ধারার সৈনিক। হুসায়নী আত্মত্যাগ আজ মুসলিম তরুন মনে জাগিয়ে তুলুক বিপ্লবের স্পথ বিদ্রোহের সাথে জাহেলী সমাজ ভাঙ্গার প্রচন্ড প্রত্যয়। নতুন সমাজ বিনির্মনে অদম্য আকুতি।

কারবালার বীর শহীদানের ত্যাগ, সংগ্রাম, রক্ত আর মৃত্যু আল্লাহর শ্রেষ্টত্বের নিশানকেই সর্বোচ্চে তুলে ধরেছে চিরকালের জন্য। কিন্তু আজ কোথায় সেই ত্যাগ। পরস্পর দ্বন্দ্ব আর করহে লিপ্ত মুসলিম বিশ্বের কোথায় সেই প্রানবাদী বিপ্লবের জীবনবাদী চেতনা। আজো আরব বিশ্ব ইসরাইলের কাছে মার খাচ্ছে ঐক্য আর সংহতির অভাবে। মিশর, আলজেরিয়া, তুরস্ক, ইরিত্রিয়া, কাশ্মীর, মিন্দানাও, আরাকান আর বসনিয়া চেচনিয়া, সর্বত্রই মুসলিম মুক্তি সংগ্রামীরা মার খাচ্ছে শুধু সামান্যতম সাহায্য ও সহযোগীতার অভাবে।

ইয়াযীদের দলে সেদিন যে সমস্ত সেনা সামন্ত ছিল তারা যথারীতি নামায পড়ত, কোরআনও পড়ত। সেদিনও নামাযে তারা সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে দরূদ পড়তঃ হে আল্লাহ! তুমি ইব্রাহীম (আঃ) এর বাংশধরদের প্রতি যেমন শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রদান করেছ। সেরূপ শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রদান কর মোহাম্মদা (সঃ) এর বংশধরদের উপরেও। তারা আরবী ভাষাভাষী ছিল। দরূদে কি বলা হচ্ছে তা তারা ভালো করেই জানতো। অথচ এই দরূদ পাঠকারী ইয়াযীদ বাহিনীই তীর নিক্ষেপ করেছিল সেই মোহাম্মদ (সঃ) এরই কলিজার টুকরা প্রিয়তম দৌহিত্র হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বক্ষ লক্ষ্য করেই।

আজও আমাদেরই কেউ কেউ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর নামে বিপ্লব করতে গিয়ে প্রতি পক্ষের শিরচ্ছেদ করাটাকেই ইসলামী বিপ্লব বলে জাহির করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। কেউ কেউ আবার হুজরার ইসলামকেই আসল ইসলাম বলে চালাতে চান। কেউ আবার মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধীদের হাত শক্তিশালী করাটাকেই ইসলামের বড় খিদমত বলে অভিমত

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করেন। মুসলিম দেশ গুলোর অভ্যন্তরে এসব ব্যাপার অনেক। ওদিকে কোন কোন শাসক গোস্টি মনে করেন। রাজতন্ত্র বাদশাহী কিংবা এক নায়ক তন্ত্র ইসলামী আদর্শ কায়েমের ইতিহাসের এসব দোষ ত্রুটি ও দুর্বলতাকে শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ না করে - এসব কিছুকে ইসলামের বিরুদ্ধাচরনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাকে দায়িত্ব পালনের পরাকাষ্ঠা বলে জাহির করতে দ্বিধা করেন না। অথচ এর কোনটা কি ইসলাম? এসব কি ইসলামের নীতি হতে পারে? আমরা জানি কুরআনের বানী মোতাবেক শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায়না, শহীদ যারা তারা কখনো মরেন না। তারা চিরজীব। তাদের ত্যাগ তাদের সাধনা এবং তাদের আদর্শও চির জিন্দা। তাই তো দেখি হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাতের পর মুসলিম বিশ্বের যে জাগরণ এসেছিল সে জাগরনের নেতৃত্ব দিয়েছিল সাধারন মানুষ! সাধারন মুসলমান সাধারন তরুন এবং যুব সম্প্রদায়! বস্তুত মদীনার ইসলাম খুলাফায়ে রাশেদার ইসলাম, হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ইসলাম জরাগ্রস্তের ইসলাম নয়; শুধু তসবীহ আর শুধু মুনাজাতের ইসলাম নয়! এ ইসলাম ত্যাগের ইসলাম, জেহাদের ইসলাম, জীবনের আর তারুন্যের ইসলাম।

এ যুগের তরুন ও যুব সমাজের সামনে আজ যদি শহীদে আজম হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সেই আদর্শকে সার্থক ভাবে তুলে ধরা যায়, আর সেই অগ্নি গর্ভ তরুনেরা যদি একবার সেই আদর্শের আালোকে স্নাত হতে পারে। তাহলে এরাই হয়ে উঠবে সেই সত্যের সৈনিক। আজ যদি আবার হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর আদর্শে যুব সামজের তারুন্য ও প্রেরণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায় তাহলে আদর্শের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে এগিয়ে আসতে এরা এতটুকু দ্বিধা করবেনা। আর বলাই বাহুল্য সে দিনই হবে দশই মহররমের আগমন সুন্দর সার্থক ও কল্যান কর।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

১. আকর গ্রন্থরাজির পর্যালোচনা

"কারবালার ঘটনাঃ ঐতিহাসিক পূণঃ মূল্যায়ন" গবেষণা গ্রন্থ খানির গোটা আলোচনার যে সকল গ্রন্থ থেকে আমি উপরকণ সংগ্রহ করেছি, সে সব গ্রন্থ সম্পর্কে যাতে কোন মহলের সন্দেহের অবকাশ না থাকে সে জন্য উৎস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের ও গ্রন্থকার সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি। যে ধরনের উপকরনের উপর আমার আলোচনা অনেকাংশে নির্ভরশীল সে গুলোর মধ্যে ইবনে কাছীর, তাবারী, ইবনুল আসীর, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ, ইবনে আবদুল বার, আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইবনে কাছীর

ইমাম হাফিজ আল্লামা ইমাদুদদদীন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে ওমর ইবনে কাছীর আল কাছরী আল বুসরী (রঃ) ৭০০ হিঃ মোতাবেক ১৩০০ খ্রীঃ সিরিয়ার বুসরা শহরে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শায়খ আবু হাফ্স শিহাবুদ্দীন ওমর সেখানকার খতীবে আজম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাব (রঃ) সমসাময়িক কালে একজন খ্যাতনামা আলীম, হাদীছ, বেত্তা ও তাফসীর কারক ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র যয়নুদ্দীন ও বদরুদ্দীন সে যুগের প্রখ্যাত হাদীছ বেত্তা ছিলেন। মোট কথা তাঁর গোটা পরিবারই ছিল সে কালের জ্ঞান জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক স্বরূপ।

মুসলিম জাহানের তৎকালীন সেরা মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির ও ফকীহ বৃন্দের নিকট হতে বিপুল অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে সমগ্র মুসলিম জাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমামের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেন। হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ ছাড়াও তিনি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসে অশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এক কথায় উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে সমান পারদর্শিতার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব খুবই বিরল। হাদীছ শাস্ত্রে তো তিনি "হুফফাজুল হাদীছ" এর মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন। তেমনি আরবী ভাষায় তিনি একজন খ্যাতিমান কারীও ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ১৯টি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে "আল-বিদায় ওয়ান নেহায়া অন্যতম। এ ইতিহাস গ্রন্থটি ইমাম ইবনে কাছীরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক অমর সৃষ্টি। এতে সৃষ্টির শুরু হতে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত সংঘটিত সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

মুহাদ্দিছ, মুফাসসির এবং ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর স্থান সমগ্র উম্মতের নিকট স্বীকৃত। তাঁর "আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ইতিহাস গ্রন্থ ইসলামের উৎকৃষ্টতম উৎস বলে পরিগণিত। কাসফুযযনুন-এর রচয়িতার উক্তি অনুযায়ী এর সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য এই যে, "তিনি বিশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য করেন। হাফেজ যাহাবী তাঁর প্রশংসায় বলেন, "তিনি ছিলেন একাধারে ইমাম, মুফতি বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, বিচক্ষণ ফকীহ, বিশ্বস্থ মুহাদ্দিস -মুফাসসির। উক্তি উদ্বৃত করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। দু'টি কারণে আমি তাঁর ইতিহাসের উপর বেশী নির্ভর করেছি। একঃ শীয়া মতবাদের প্রতি আকর্ষণ তো দুরের কথা, বরং তিনি ছিলেন তার কঠোর বিরোধী। শীয়াদের বর্ণনার কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে কারো ওপর যথাসাধ্য আঁচড় লাগতেও দেননি। বিপর্যয় কালের ইতিহাস বর্ণনায় তিনি হযরত মুয়াবিয়ারই নয়, ইয়াযীদেরও সাফাই গাইতে কসুর করেননি। এতদসত্ত্বেও তিনি এতটা ন্যায় পরায়ণ যে ইতিহাস বর্ণনায় কোন বিষয় গোপন করার চেষ্টা করেন নি। দুইঃ কাযী আবুবকর ইবনুল আরাবী এবং ইবনে তায়মিয়া উভয়ের পরবর্তীকালের লোকছিলেন তিনি। কাযী আবুবকরের আল আওয়াসেম মিনাল কাওয়াসেম এবং ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মিনহাজুস সুন্নাহ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি ইবনে তায়মিয়ার কেবল সাগরেদই ছিলেন না, তাঁর ভক্তও ছিলেন। তাই শীয়া বর্ণনা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতে পারেন এমন কথা কল্পনাও করা যায় না।

অধিকন্তু হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ হাদীছের মতন ও রিজাল শাস্ত্রের গঠন ও অধ্যায়নে তিনি অহর্নিশ নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিকতা প্রিয় লোক। জীবদ্দশায়ই তার গ্রন্থরাজী ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গ্রন্থ রচনা, অধ্যাপনা ও ফতুয়া প্রদানের মহান দায়িত্ব তাঁর সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেন।

ইমাম ইবন তায়মিয়া ও তাঁর গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ইবন তায়মিয়া (রাঃ) তকীউদ্দীন আবুল আববাস আহমাদ ইবন শিহাবুদ্দিন আল হাররানী আল হাম্বলী একজন আরবদেশীয় দ্বীনি আলীম এবং ফকীহ ছিলেন। তিনি দামিশকের নিকটে হাররান শহরে ২৩শে জানুয়ারী ১২৬৩ সাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশে ৭/৮ পুরুষ হতে শিক্ষা দীক্ষার ধারা চলে আসছিল, আর তাঁদের সকলেই জ্ঞান ও সাধনায় উল্লেখ যোগ্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ইমাম যাহাবী লিখেছেন, ইমাম ইবন তায়মিয়া (রঃ) পরিনত বয়সের পূর্বেই কুরআন, ফিক্‌হ, মুনাজারা এবং ফতুয়া দানে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন এবং শীর্ষস্থানীয় আলিমদের মধ্যে গন্য ছিলেন, বিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি তাঁর শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং ১২৮২ সনে পিতার ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলে হাম্বলী ফিক্‌হ এর শিক্ষক নিযুক্ত হন।

ইবন তায়মিয়া (রাঃ) ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের (রঃ) অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর অন্ধ অনুসরন করতেন না। তিনি বিদআতের ঘোর শত্রু ছিলেন। তিনি লেখনী এবং বক্তৃতা উভয় পদ্ধতিতে ইসলামী দল যেমন, খারিজী, মুরজিঈ, রাফিজী, কাদরী, মুতাযেলী, জাহমী, কাররামী, আশআরী প্রভৃতির সাথে মুকাবেলা করেন। ইমাম ইবন তায়মিয়া (রঃ) বলেন ইসমত একমাত্র নবীদের জন্য নির্দিষ্ট অন্যথায় তিনি সাহাবীদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাদের উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করতেন।

ইবন তায়মিয়ার দলিল গ্রহণের পদ্ধতি এই ছিল যে, তিনি সর্ব প্রথম কুরআন মজীদ হতে দলীল গ্রহণ করতেন অতঃপর সুন্নাহ এবং হাদীছ দ্বারা প্রমান পেশ করতেন। হাদীছের রাবীদের যাচাই বাছাই করতেন। তিনি সাহাবীদের পদ্ধতি এবং ৪জন ফকীহ সহ অন্যান্য প্রখ্যাত ইমামের মতামত সমূহ আলোচনা ভূক্ত করতেন এবং এ দৃষ্টিকোন হতে তিনি নিজ যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান পর্যালোচনা করেন। ইবন শাকির লিখেন যে, তিনি বড়ই মুত্তাকী এবং শরীয়তের বিধান কঠোর ভাবে পালনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইবনে তায়মিয়া প্রায় ৫০০ গ্রন্থের প্রণেতা বলে উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ৪৮০ টি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডঃ সিরাজুল হক (প্রফেসর ইমিরেটরস) ২৫৬ টি গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে মিহাজুল সুন্নাতুন্নাবাবিয়াহ কি -নফ্‌স এ কালামুশ শি'আ ওয়াল কাদরিয়া আও রাদ্দুন আলার রাওয়াফিজ ওয়াল ইমামিয়্যাহ একটি। এটা সুপ্রসিদ্ধ এবং নির্ভর যোগ্য গ্রন্থ হিসাবে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে।[১]

Dhaka University Institutional Repository

অন্য একটি গ্রন্থ 'রিসালাতু ফি ইয়াযীদ হাল ইয়াছুববু আম-লা' ও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যা আমাদের আলোচনারও বিষয়বস্তু।

ইবনে জারীর আত-তাবারী

মুহাদ্দিন, মুফাসসির ফকীহ এবং ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর মহান মর্যাদা স্বীকৃত। ইলম ও তাকওয়া জ্ঞান এবং আল্লাহ ভীতি হিসেবে তাঁর মযাদা অতি উচ্চে। তাঁকে কাযীর পদ দেয়া হলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অপরাধ দমন বিভাগের কর্তৃত্ব পেশ করা হলে তিনি তাও অস্বীকার করেন। ইমাম ইবনে খোযায়মা তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

"বর্তমান বিশ্বে তাঁর চেয়ে বড় কোন আলেম আছে বলে আমার জানা নেই। ইবনে কাছীর বলেন-"কিতাব সুন্নাহর জ্ঞান এবং তদানুযায়ী আমলের বিচারে তিনি ছিলেন ইসলামের অন্যতম ইমাম। ইবনে হাজার বলেন, "তিনি ছিলেন ইসলামের অন্যতম বড় নির্ভর যোগ্য ইমাম।" খতীব বাগদাদী বলেন, "তিনি ছিলেন আলেম সমাজের ইমাম।" তাঁর উক্তি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তাঁর মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। কারণ জ্ঞান এবং মর্যাদার ব্যাপারে তিনি ছিলেন এর যোগ্যব্যক্তি। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অধিকার এত ব্যাপক ছিল যে, তাঁর সমকালীন অন্য কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। ইবনুল আছীর বলেন, -"ঐতিহাসিকদের মধ্যে আবু জাফর ইবনে জারীর আততাবারী ছিলেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। ইবনুল আসীর আরো বলেন, সাহাবীদের বিরোধের ব্যাপারে অন্যান্য ঐতিহাসিকের তুলনায় তাঁর ওপরই আমি সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছি। কারণ-সত্যই তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ইমাম। জ্ঞান, বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা এবং সত্যাশ্রয়ীতায় তিনি ছিলেন সর্বব্যাপী। সমকালীন ইতিহাসের ব্যাপারে ইবনে কাছীরও তাঁর দিকেই প্রব্যাবর্তন করতেন। ইবনে খালদুন বলেন, "তিনি অত্যন্ত নির্ভর যোগ্য।"

ইবনুল আসীর

তাঁর তারীখুল কামিল এবং উসদুল গাবাহ ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম নির্ভরযোগ্য উৎস বলে পরিগনিত। পরবর্তী কালের এমন কোন লেখক নেই; যিনি তাঁর উপর নির্ভর করেননি। তাঁর সমসাময়িক কাযী ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, "হাদীছ হেফজ করণ, তাঁর জ্ঞান এবং এতদ সংক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়াদিতে তিনি ইমাম ছিলেন। তিনি ছিলেন আধুনিক এবং প্রাচীন ইতিহাসের হাফেজ। আরবদের বংশ পরম্পরা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সুবিদিত ছিলেন। শীয়াদের প্রতি তাঁর সামান্যতম আকর্ষণ সম্পর্কে কেউ সন্দেহও করেনি। তাঁর ইতিহাসের ভূমিকায় তিনি নিজে অতি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, সাহাবীদের মতবিরোধের বর্ণনায় আমি অতি সতর্কতার সাথে দেখে শুনে পা বাড়িয়েছি।

মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ

তাঁর বর্ণনা সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবী রাখে। তাই তাঁর বর্ণনার পরিপন্থি কোন বর্ণনা অপর কোন গ্রন্থ থেকে গ্রহণ না করারও যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। এর কারণ এই যে, তিনি খিলাফতে রাশেদার নিকটতর যুগের লেখক। হিজরী ১৬৮ সালে তাঁর জন্ম আর ২৩০ সালে ইন্তেকাল হয়েছে। তার জ্ঞানের পরিধি ছিল অতি বিস্তৃত। সিয়ার মাগাযীর ব্যাপারে তাঁর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দীসীন, মুফাসসিরীন সকলেই ছিলেন আস্থাবান আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁকে শীয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করেননি। খতীব বাগদাদী বলেন, "আমার মতে মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ ছিলেন ন্যায়পরায়নদের অন্যতম। তাঁর হাদীছই একথার প্রমান বহন করে। কারণ, আপন অধিকাংশ বর্ণনায় তিনি যাচাই - বাছাই করেছেন। হাফেজ ইবনে হাযার বলেন, "তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভর যোগ্য এবং সংযত হাফেজে হাদীছের অন্যতম। ইবনে খাল্লিকান বলেন, "তিনি সত্যভাষী এবং নির্ভরযোগ্য। হাফেয সাখাবী বলেন, "তাঁর ওস্তাদ ওয়াকেদী দুর্বল ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য। ইবনে তাগবী বেরদী বলেন- "ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন ব্যতিত সমস্ত হাফেযে হাদীছই তাকে নির্ভর যোগ্য বলে স্বীকার করেন। ইবনে সা'আদ সম্পর্কে সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই একথা স্বীকার করেন যে, তিনি ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ না করে শিক্ষকদের নিকট থেকে নির্বিচারে সবকিছু উল্লেখ করেননি এবং অনেক যাচাই বাছাই করে তিনি বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

ইবনে আবদুল বার

নাম হাফেজ আবু ওমর ইবনে আবদুল বার। হাফেজ যাহাবী তাযকেরাতুল হোফফায গ্রন্থে তাঁকে শায়খুল ইসলাম বলে উল্লেখ করেছেন। আবদুল ওয়াকীদ আল বাজী বলেনঃ "আন্দালুসে আবু ওমরের সমকক্ষ কোন হাদীছ বিশারদ ছিল না। ইবনে হাযম বলেন ঃ "আমার জানামতে হাদীছ অনুধাবনের ব্যাপারে কথা বলার মতো তাঁর চেয়ে উত্তম দুরের কথা তাঁর সমকক্ষও কেউ ছিলনা।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে হাজার বলেনঃ তাঁর রচিত গ্রন্থরাজির কোন তুলনা নেই। এ সবের অন্যতম হচ্ছে আল ইস্তিয়াব। সাহাবীদের জীবন চরিত সম্পর্কে সবাই আল ইস্তিআব এর উপর নির্ভর করেছে। শীয়াদের প্রতি তাঁর ঝোক ছিল এমন সন্দেহ প্রকাশ করেছে বা তিনি যা তা নকল করতেন- এমন অভিযোগ করার মতো কেহ নেই।

আল-মাসউদী

তিনি অবশ্য শীয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি চরম পন্থী ছিলেন না। তিনি মরুযুয যাহাব-এ হযরত আবুবকর এবং হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তা কোন চরম পন্থী শিয়া লিখত না। তবে শীয়াদের পতি তার আকর্ষণ ছিল। তাই তার বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্যান্য গ্রন্থের সহযোগীতা নেয়া হয়েছে।

আহমদ ইবন ইয়াহইয়া

বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক আবুল হাসান আহমদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন জাবির ইবন দাউদ প্রণীত "ফতুহুল বুলদান" একখানী সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য প্রামান্য ইতিহাস গ্রন্থ। তিনি আল্লামা বালাযুরী হিসেবে অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরুর দিকে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৮৯২ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন। তিনি একাধারে ইতিহাসবেত্তা, কবি, সাহিত্যিক এবং একজন বিশিষ্ট ভূগোলবিদ।

বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সমৃদ্ধ আল্লামা বালাযুরীর ফুতুহুল বুলদান গ্রন্থখানী পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রামান্য গ্রন্থ হিসেবে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

এছাড়াও যাঁদের কাছ থেকে অল্প বিস্তর আনুষঙ্গিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাঁরা হচ্ছেন, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালামী, ইবনে খাল্লিকান, ইবনে খালদুন, আবুবকর আল জাসসাস, মোল্লা আলী কারী মুহেব্বুদ্দীন আত-তাবারী এবং বদরুদ্দীন আইনীর মতো ব্যক্তিত্ব। এঁদের সম্পর্কে সম্ভবত কেউই এমন কথা বলতে সাহস পাবেনা যে, তাঁরা নির্ভরযোগ্য নন; বা শীয়ামতবাদে কলংকিত। কোন কোন ঘটনার প্রমানে আমি বুখারী মুসলিম আবু দাউদ, জামে তিরমিজি ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য বর্ণনারও উল্লেখ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

এসকল ইতিহাস নির্ভরযোগ্য। এগুলো থেকেই মূলত আমার আলোচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছি। সে কালের ইতিহাসের ব্যাপারে এ সব যদি নির্ভরযোগ্য না হত তাহলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আহলে রাসূল্লাহ (সঃ) এর যুগ থেকে ৮ম শতক পর্যন্ত ইসলামের কোন ইতিহাস দুনিয়ায় বর্তমান থাকত না। কারণ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরবর্তী যুগের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস -হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং ওমর ফারুক (রাঃ) এর ইতিহাস সহ এদের মাধ্যমেই আমাদের নিকট পৌছেছে। এগুলো যদি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য না হয়। তাঁহলে তাদের বর্ণিত খিলাফতে রাশেদার ইতিহাস, ইসলামের স্মরনীয় ব্যক্তিদের জীবনেতিহাস এবং তাঁদের কীর্তি গাঁথা সবকিছুই মিথ্যার ভান্ডার, যা কারো সামনেই আমরা তুলে ধরতে পারিনা আস্থার সাথে। বিশ্ব এনীতি কখনো মানতে পারেনা, বিশ্ব কেন, স্বয়ং মুসলমানদের বর্তমান বংশ ধরেরাও একথা কিছুতেই স্বীকার করবেনা যে, আমাদের বুযুর্গদের যে সকল গুনাবলী এ সকল ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে তা সবই সত্য আর এ সকল গ্রন্থে তাদের যে সব দুর্বলতা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই মিথ্যা। কারো যদি এ ধারনা হয়ে থাকে যে শীয়াদের ষড়যন্ত্র এতই শক্তিশালী যে, তাদের প্ররোচনা থেকে আহলে সুন্নাহর এসব লোকেরাও বাঁচতে পারেনি, শীয়াদের বর্ণনা তাঁদের গ্রন্থরাজীতেও প্রবিষ্ট হয়ে সে যুগের গোটা ইতিহাসকেই বিকৃত করে ছেড়েছে। তাহলে বলতে হবে তাদের এ অনুপ্রবেশ থেকে হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর জীবনেতিহাস কি করে সংরক্ষিত রয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. বাংলা সাহিত্যে কারবালা ঘটনার ব্যবহার

গবেষক গবেষণা করেন, সত্যকে উৎঘাটন করেন। গবেষকের কাজ নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ এবং সত্যে উপনীত হওয়া, এক্ষেত্রে পূর্ব ধারনা বা বিশ্বাস কাজ করলে সত্য উৎঘাটিত হয়না। বিচারক বিচার করেন, রায় যে কোন এক পক্ষের অনুকূলে যায়, এক্ষেত্রে অপর পক্ষ অসন্তুষ্ট হলেও যেমন বিচারক প্রশংসা পান গবেষণার ক্ষেত্রেও তাই, ইতিহাস হলো- কালের দর্পন, এ দর্পনে অতিতকে দেখা যায় উপলব্ধি করা যায়-কিন্তু কোন কোন বিষয় এমন হয়ে যায় যা কালক্রমে অন্ধকারে পতিত হয় যাকে অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়-যদিও তা সময় সাপেক্ষ ও শ্রম সাধ্য। কারবালার ঘটনা এমন এক বিষয় যা আমাদের নিকট বিভিন্ন উপখ্যান, উপন্যাস ও আবেগময় কাহিনী রূপে এসেছে কিন্তু ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণের নাম নিয়ে কিছু গ্রন্থ পাওয়া গেলেও তাতেও আবেগ ও পক্ষপাতিত্বের প্রমান পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় রচিত মীর মশারফ হোসেন বিরচিত বিষাদ সিন্ধু ও মোহাম্মদ বরকতুল্লার কারবালা গ্রন্থ খানি উল্লেখ যোগ্য।

বিষাদ সিন্ধুর ঐতিহাসিকতা নিয়ে নানা জনের নানা উক্তি থাকলেও এটা যে ইতিহাসগ্রন্থ নয় তা সহজেই বলা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ-

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাচর্চায় যে কয়জন মুসলিম সাহিত্য সাধক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন নিঃসন্দেহে সর্বাধিক খ্যাতিমান "বিষাদ সিন্ধু" তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। ছোট বড় প্রায় ৪২ খানা গ্রন্থের রচনাকার মীর সাহেবের শ্রেষ্ট সাহিত্য কীর্তি কোনটি এ প্রশ্নে মতভেদ থাকলেও তাঁর খ্যাতি যে প্রধানত বিষাদ সিন্ধুর জন্যই একথা সর্বজন বিদিত। বিষাদ সিন্ধুর সংবেদনশীল কাহিনী আর বিস্ময়কর রচনা শৈলী বাঙ্গালী পাঠক সমাজে তাঁকে অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা দান করেছে এবং সুদীর্ঘকাল তা অম্লান রয়েছে। মোট কথা "বিষাদ সিন্ধু" মশাররফ হোসেনকে কালজয়ী করেছে।

'বিষাদ সিন্ধু'র সাহিত্যিক মান ও শৈল্পিকমান নিয়ে এযাবৎকাল অসংখ্য আলোচনা-পর্যালোচনা এবং গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এর মাঝে নিহিত ঐতিহাসিকত্ব আজ পর্যন্ত কেউই স্বচ্ছ ও সুষ্ঠভাবে পরিমাপ করেননি। পাঠক সমাজে গ্রন্থটি পাঠকালে এর কাহিনীতে নিহিত ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার সাথে বর্ণিত বিপুল অলৌকিক ও অনৈতিহাসিক বিষয়াবলী দ্বারা ধর্মীয় ও মানবিক ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করে থাকে। সাহিত্যের পরিমন্ডলে তা স্বাভাবিক হলেও ধর্ম ও

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের মাপকাঠিতে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আবার সমালোচকবৃন্দ এর মাঝে ঐতিহাসিক অংশ আর অনৈতিহাসিক অংশের উপর ঢালাও ভাবে মন্তব্য করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের তুলাদণ্ডে এটিকে সঠিকভাবে যাচাই করবার অবকাশ পাননি। বিষাদ সিন্ধুর এ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিকটিও উন্মোচন হওয়া দরকার।

বিষাদসিন্ধুর বিস্ময়কর যাদুকরী রচনাগুনই এর ইর্ষনীয় জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বের কারণ। এ গ্রন্থে হৃদয় বিদারক বিষাদময় ঘটনার সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কারবোধ ইত্যাদি সংযোজিত হওয়ায় পাঠকদের হৃদয় আবেগায়িত করে তোলে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) জামাতা হযরত আলী (রাঃ) এর প্রাণ প্রিয় দু-দৌহিত্র হযরত হাসান -হুসায়ন (রাঃ) এর নাম বিজড়িত বিষাদ সিন্ধুর সামগ্রীক করুন কাহিনী তৎকালীন অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আবেগের সাথে মিলে গেছে। সমসাময়িক কালের পত্র পত্রিকা সমূহে এমনকি হিন্দু সমাজেও "বিষাদ সিন্ধুর" উচ্ছাসিত প্রশংসা হয়েছে। সময়ের প্রেক্ষাপটে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' মন্তব্য করে "মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ মহররমের আমূল বৃত্তান্ত 'বিষাদ সিন্ধুর' গর্ভপূর্ণ হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুন রসে পূর্ণ যে পাঠকালে চক্ষে পানি রাখা যায় না"[২]

চারুবার্তার মতে, "এ গ্রন্থের লেখকের লিপিশক্তি অতি মনোহর। তাঁর লিখার গুনে একবারও মনে হয়নি যে কোন অপরিচিত বৈদেশিক ঘটনা ও আচার ব্যবহারের কথা এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের উপসংহার ভাগা এমন করুন রসে পূর্ণ যে পাঠকরা কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারবেন না। এর ভাষা বিশুদ্ধ, লালিত্যপূর্ণ।[৩] ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বেঙ্গল লাইব্রেরীর বার্ষিক রিপোর্টে লাইব্রেরীয়ান হরপ্রসাধ শাস্ত্রী 'বিষাদ সিন্ধুর' উদ্ধার পর্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ

'Mir Mosharraf Hossain Bishad Sindhu, based on the events befor and other the great battle of Karbala is one of the best works in the bengali language. The earthness and pathos of the works its elevated moral tone and dignified diction, rais eit to a high level and mark a distinet departure, both in matter and in manner from the current example of imaginative writing in bengali'.[৪]

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবাসী বলেন, যেরূপ সুললিত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় গ্রন্থখানী রচিত তাহাতে হোসেন সাহেবকে বাহাদুর বলিতে হয়।[৫] 'ভারতী' মন্তব্য করেন, "ইতি পূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটি বাঙ্গালা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না"[৬]

প্রায় সকল সমালোচক একমত যে, মুসলমান হয়েও মশাররফ হোসেন বাংলাভাষায় যেরূপ অনবদ্য অধিকার লাভ করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংশনীয়। এটি বিশুদ্ধ ও সুরুচিপূর্ণ বাংলাগ্রন্থ। বিষাদসিন্ধুর ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট এর সঙ্গীত ময়তা। গদ্য ভাষার অন্তর্লীন সঙ্গীত প্রবাহ গ্রন্থটিকে কাব্য সৌন্দযদান করেছে। গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার আর একটি মানবিক কারণ এই যে, এর কাহিনীতে জয়নাবের রূপে বিমোহিত ইয়াযীদ এবং এ রূপতৃষ্ণার পরিনামে বহু মানুষের বিপর্যয় ও ধ্বংসের যে কথকতা বর্ণিত হয়েছে তা গ্রন্থটিকে সার্বজনীন করে তুলেছে।

বিষাদ সিন্ধুর কাহিনী

বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট "বিষাদ সিন্ধুর" জনপ্রিয়তার একটি বিশেষ কারণ গ্রন্থটির কাহিনী গত দিক। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র হাসান-হুসায়ন বিষাদময় মৃত্যু কাহিনী স্বভাবতই মুসলমানদের অন্তরকে গভীর ভাবে শোকাভিভুত করে তোলে। এ জন্যই বাংলাদেশে এক সময়ে জঙ্গনামা শ্রেনীর মর্সিয়া সাহিত্য শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মশাররফ হোসেন এ কাহিনীর সর্ববিস্তারী আবেদন সৃষ্টির সামর্থ্য সম্পর্কে একে বারেই সজাগ ছিলেন। আর তাই তিনি গ্রন্থের একটি বিজ্ঞাপনে পাঠক সমাজের উদ্দেশ্যেই বলেছেন "আজ সেইদিন-ওহে আজ সেই দিন, মুসলমান জগতের সেই চিরস্মরনীয় দিন। কারবালা প্রান্তরে যে হৃদয় বিদারক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়া মুসলমান জগতের নরনারীর চোখে জল ঝরাইয়াছে, অদ্যও ঝরিতেছে। চারিদিক হইতে কানে আসিতেছে হায় হোসেন! হায় হোসেন! সেই মহরমের ১০ তারিখে "বিষাদসিন্ধু" আপনাদের হাতে অর্পণ করিলাম।"

বিষাদসিন্ধু-র কাহিনী তিন দফায় প্রকাশিত। প্রকাশ কাল যথাক্রমে ১০লা মে, ১৮৮৫খ্রিঃ (প্রথম খন্ড-মহররম পর্ব) ১৪ই আগষ্ট, ১৮৮৭ খ্রিঃ (দ্বিতীয় খন্ড-উদ্ধার পর্ব) ও ১০ই মার্চ, ১৮৯১খ্রিঃ (তৃতীয় খন্ড-এজিদ বধ পর্ব)। মহররম পর্বে ছাব্বিশ প্রবাহ, উদ্ধার পর্বে ত্রিশ প্রবাহ এবং এজিদ বধ পর্বে পাঁচটি প্রবাহ আর উপক্রমিনিকা ও উপসংহার মিলে সর্বমোট তেষট্টি অধ্যায় দীর্ঘ সাত বছর ধরে রচিত ও পর্যায় ক্রমে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণটি লেখক উৎসর্গ করেছিলেন দেলদুয়ারের

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার শ্রীমতি করিমুন্নেছা খাতুন সমীপে। এর প্রথম থেকে অষ্টম সংস্করনের মধ্যে তিনি গ্রন্থের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন।[৭]

(১) গ্রন্থের উপক্রমনিকায় একটি দৈববাণী ঘোষিত হয় যা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর শিষ্য মুয়াবিয়া (রাঃ) কে বিচলিত করেছিল। ফিরিশতা জিব্রাইল (আঃ) মহানবীকে বলে যান যে তাঁর প্রিয় শিষ্য মুয়াবিয়ার পুত্র কর্তৃক তাঁর প্রিয় দৌহিত্র দ্বয় নিহত হবে। সকলের সাথে মুয়াবিয়া বিষন্ন হয়ে পড়েন। তদবধি অবিবাহিত মুয়াবিয়া দারপরিগ্রহ না করার প্রতিজ্ঞা করলেও দৈবচক্রে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। তাঁর সন্তান ইয়াযীদ পরবর্তীকালে হযরতের দৌহিত্রদ্বয়কে হত্যা করে।

(২) পরবর্তী সংস্করনে উপক্রমিনিকা ভিন্নরূপে রচিত। একদা ঈদের দিনে হযরতের দুই দৌহিত্র হাসান সবুজ রঙের পোষাক আর হুসায়ন লাল রঙের পোষাক পছন্দ করলে তৎক্ষনাৎ জিব্রাইল উপস্থিত হয়ে দৈববানী করেন- যে হাসান বিষক্রিয়ায় এবং হুসায়ন হযরতের এক শিষ্যের সন্তান কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হবে। মুয়াবিয়া হাসান-হুসায়নের সাথে ইয়াযীদ নিদারুন হৃদয় বিদারক ঘটনা এড়াবার জন্য সুদূর দামেস্ক নগরে বসবাস করতে থাকেন। এদিকে নবীজী তাঁর কন্যা বিবি ফাতেমা, জামাতা মহাবীর আলী একে একে হাসান হুসায়নকে রেখে পরপারে বিদায় নিয়ে যান। দামেস্ক নগরে ইয়াযীদ বয় প্রাপ্ত হলে ঘটনা শুরু হয়ে যায়।

মহররম পর্বের প্রথম প্রবাহ থেকে বর্ণিত হয় যে, দামেস্ক অধিপতি মুয়াবিয়া একমাত্র পুত্র ইয়াযীদ জয়নাব নাম্নী জনৈক বিবাহিতা মহিলার প্রেমে উন্মাদ হয়ে পড়ে। ইয়াযীদ মাতার সমর্থনে মন্ত্রী মারোয়ানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে জয়নাবের স্বামী আব্দুল জব্বারকে মিথ্যা প্রলভন দেখিয়ে স্ত্রী পরিত্যাগে বাধ্য করেন। কিন্তু জয়নাব এবার হাসানকে পতিত্বে বরণ করেণ। ইয়াযীদ দারুণ ক্রদ্ধ হয়ে হাসানকে নিমূল করার প্রতিজ্ঞা করেন। মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইয়াযীদ দামেস্কের সিংহাসনে আরোহন করে মদীনার খলীফা হাসানকে বশ্যতা স্বীকারের দাবী জানায়। কুটনীতি এবং যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে তিনি ভিন্ন কৌশল অবলম্বনে তৎপর হন। ইয়াযীদ মন্ত্রী মারোয়ান মায়মুনা নাম্নী এক কুটনী বৃদ্ধা মহিলাকে কার্যসিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করেন। এ মহিলার প্ররোচনায় হাসানের দ্বিতীয়া স্ত্রী জায়েদা বিষ প্রয়োগে হাসানকে হত্যা করে। সবার অলক্ষ্যে যায়েদা ইয়াযীদের রাজ-দরবারে পুরস্কারের আশায় গিয়ে মৃত্যুদন্ড লাভ করে। হাসানের মৃত্যুর পর ইয়াযীদের পরবর্তী কাজ হলো হুসায়নকে

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা করা। উনবিংশ প্রবাহ থেকে তাই বিবৃত হয়। ছদ্মবেশী মারোয়ানের সলাপরামর্শে হুসায়ন হযরতের সমাধি স্থল মদীনা পরিত্যাগ করেন। কুফার শাসন কর্তা আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদের আমন্ত্রনক্রমে তিনি কুফা অভিমুখে রওয়ানা হন। পূর্বাহ্নে হুসায়ন মুসলিম নামক তাঁর এক চাচাতো ভাইকে দূত হিসেবে কুফায় প্রেরণ করেন। মুসলিম তাঁর দু-নাবালক পুত্র-সন্তানকে নিয়ে কুফা যান এবং সেখানকার অনুকূল পরিস্থিতির সংবাদ অবহিত করে হোসেনকে কুফায় আগমনের জন্য পত্র লেখেন। ইতি মধ্যে হুসায়ন কুফার লোকদের বিশ্বাস ঘাতকতায় মুসলিমকে হত্যা এবং তার দু-পুত্রের করুন পরিণতির বিবরণে ত্রয়োবিংশ প্রবাহ সমাপ্ত হলো। এ প্রবাহে হারেস নামক এক কুফাবাসী নরপিশাচ কিভাবে কুফাধিপতির পাঁচ হাজার মোহর পুরস্কার লাভের আমায় মুসলিমের নাবালক পুত্রের শিরোচ্ছেদে বাধা প্রদানের কারণে প্রথমে নিজের দুপুত্র পরে স্ত্রীকে হত্যা করে, তারপর ছেলে দুটির শিরোচ্ছেদ করে কুফার রাজদরবারে উপস্থিত হলে কুফার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদ নৃশংস লোভী হারেসের প্রাণদন্ড দেয়।

মুসলিমের পত্র পেয়ে হুসায়ন সপরিবারে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হন, কিন্তু ভূলক্রমে অনুচরবর্গসহ কারবালায় পৌছেন। সেখানে ইয়াযীদের সৈন্য বাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। এরা হুসায়ন শিবিরে ফুরাত নদীর পানি সরবরাহও বন্ধ করে দেয়। শেষ পরিনতির কথা ভেবে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ যুদ্ধক্ষেত্রেই হুসায়ন কন্যা সকিনাকে হাসানের পুত্র কাসেমের নিকট বিবাহ দেয়া হয়। ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে হুসায়নের সঙ্গীরা পরাজিত হন এবং একমাত্র অসুস্থ পুত্র যয়নুল আবেদীন ব্যতিরেকে কাসেমসহ সকল পুরুষ বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করে নিহত হন। হুসায়নের শিশু পুত্র আসগর পানির পিপাসায় ছটফট করতে থাকলে হুসায়ন তাকে কোলে করে পানির আশায় এগিয়ে যান; কিন্তু তার বক্ষে শর বিদীর্ণ হলে রক্তাক্ত লাশ এনে স্ত্রী শহরবানুর কোলে দেন। সর্বস্বান্ত হুসায়ন শেষ পর্যন্ত নিজেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং অসংখ্য শত্রু নিধন করে শেষ পর্যন্ত শীমার কর্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হন। হযরত হুসায়নের খন্ডিত মস্তক নিয়ে শীমার উর্ধ্ব শ্বাসে দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা হয়। আর এখানেই মহররম পর্ব সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় খন্ড বা উদ্ধার পর্বে হুসায়ন পরিবারের অন্যান্য লোকজন কিভাবে রক্ষা পায় এবং হানিফা কর্তৃক কিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হলো তারই বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম প্রবাহ লেখক মাবওয়ানের অপবিত্র হাতের স্পর্শ হতে রেহাই পাবার জন্য শোকাচ্ছন্ন হুসায়ন দুহিতা সকিনা কাসেমের শবদেহের কটিদেশ থেকে খঞ্জর খুলে নিয়ে নিজ বুকে বিদ্ধ করে আত্মবিসর্জনের করুণ চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় প্রবাহ শীমার হুসায়ন খন্ডিত শির নিয়ে আজর নামে এক অমুসলমান ব্যক্তির বাড়িতে রাত্রি যাপনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। আজর হুসায়নের শির তার হাতে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে এবং একে একে দু-পুত্র এবং সে নিজে আত্মবিসর্জন দেয়। আজরের স্ত্রীও হুসায়নের মস্তক রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আত্মবিসর্জন করলেন। শীমার হুসায়ন মস্তক নিয়ে দামেস্ক গমন করে। হোসেনের অসহায় পরিবার পরিজনদেরকেও বন্দি করে দামেস্কে নেওয়া হয়। ইয়াযীদ এ খন্ডিত মস্তক নিয়ে হাসানের বিধবা স্ত্রী, সেই যয়নাব আর রুগ্ন ছেলে জয়নাল আবেদীনসহ বন্দি অসহায় পুর-নারীদের নানাবিধ বিদ্রুপ করতে থাকলে অলৌকিক ভাবে উপরের দিকে উঠে মস্তকটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এদিকে কারবালা প্রান্তরে হযরত হুসায়নসহ শহীদদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটি দৃশ্যে লেখক ফেরেশতা জিব্রাইল, স্বীয় পত্নী ফাতেমাসহ শেরে খোদা আলী মোর্তজা এবং নবী রাসুলগণকে এনে উপস্থিত করেন।

অতঃপর ইয়াযীদ যয়নাল আবেদীনকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার চেষ্টা চালান। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে ইয়াযীদ তাঁকে বন্দী করে রাখেন। হুসায়নের বৈমাত্রের ভ্রাতা মোহাম্মদ হানিফা ছিলেন আম্মাজের অধিপতি। তিনি মদীনা বাসীদেরকে সাথে নিযে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। শীমার ওতবে ওলীদ মারোয়ানসহ একে একে ইয়াযীদের সেনাপতিরা মৃত্যুবরন করতে লাগল। হানিফা দামেস্ক আক্রমণ করলে যয়নাল আবেদীন বন্দিখানায় থেকে মুক্ত হয়ে হানিফার সাথে মিলিত হলেন। হানিফার ভয়ে ইয়াযীদ পলায়ন করে। উদ্ধার পর্বের কাহিনী এ পর্যন্তই।

বিষাদসিন্ধুর তৃতীয় খন্ড হচ্ছে ইয়াযীদ বধ পর্ব। এতে বন্দিশালায় বন্দিদের দুর্দশা চিত্রিত হয়েছে। হানিফা দামেস্ক নগরে উপনীত হলে বিজয় ডঙ্কার তালে তালে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকে। প্রহরীরা পলায়ন করে। পাইকারী হত্যাকান্ডের মাঝে বহু নিরপরাধ ব্যক্তিকেও হত্যা করা হয়। বন্দিদেরকে উদ্ধার করা হয়। হানিফা ইয়াযীকে ধরার নিমিত্তে পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে এক পর্যায়ে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে অলৌকিক ভাবে প্রাচীর বেষ্টিত হয়ে আবদ্ধ রইলেন এবং রোজকেয়ামত পর্যন্ত দুল দুল সাথে রণবেশে তথায় বন্দি হয়ে অবস্থান করবেন। আর ইয়াযীদও ভূগর্ভস্থ এক প্রকোষ্টে দৈবাগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকবে। উপসংহারে লেখকের মন্তব্য এই যে, এভাবেই পরিণামে পাপীদের শাস্তি হয়। ইয়াযীদের সমস্ত অহমিকা ধুলিসাৎ হয়ে যয়নাল আবেদীন রাজ্য লাভ করেন। আর এভাবেই ইনসাফের জয় ঘোষিত হয়।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা বিশ্লেষণ

সাধারণ পাঠক সমাজ কেউ কেউ 'বিষাদসিন্ধু'কে ইতিহাস আবার কেউ কেউ ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত গবেষকও এ গ্রন্থকে ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কিন্তু তা কতটুকু সত্য তা গবেষণার বিষয়। প্রফেসর সুফিয়া আহমেদ তার Muslim Community in Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "Biashad Sindu or the Ocean of Grief is the title of a Book published in Bangali by the corinthion press, the author is Meer Mosharraf Hossain, an Honarary Magistrate. In this book the author has undertaken to write a history of the Mohurrum, being nothing more than the recital of the tragic event of the massacre of Hussain of the plains of karbala --The main facts are taken from various persian and Arabic works, and the author has endeavoured to given a faittful and detailed account of the tragedy.[৯]

প্রফেসর সুফিয়া আহমেদ গ্রন্থকারের একটি বিবৃতির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়। মীর সাহেব "বিষাদ সিন্ধুর" মুখবন্ধে বলেছেন, 'পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মুল ঘটনার সারাংশ লইয়া বিষাদ সিন্ধু বিরচিত হইল।" কিন্তু সমালোচক[১০] একথা অবিশ্বস্য বলে মনে করেন। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মীর সাহেব সে সব গ্রন্থ গুলোর নাম কোথাও উল্লেখ করেননি। মশাররফ হোসেনের আরবী ফারসীতে পর্যাপ্ত দখল ছিল বলে জানা যায়না। একারণে মনে হয় যে গ্রন্থটির কাহিনী কেন্দ্র মিশ্র ভাষা রীতির পুথি সাহিত্য। কাজী আব্দুল ওদুদ বলেন, "পুথি সাহিত্যের লেখকদের সাথে বিষাদসিন্ধু লেখকের বড় মিল"।[১১] অপর একজন সমালোচক মনে করেন, বিষাদসিন্ধুর কাহিনীর উৎস জঙ্গনামা শ্রেণীর পুথি।[১২] এ প্রসংঙ্গে কায়কোবাদ স্পষ্ট করে বলেন, মীর সাহেবের দোষ, তিনি কারবালার সেই হৃদয় বিদারক ঘটনা সম্বন্ধে পারসী ও আরবী গ্রন্থ আলোচনা ও যথার্থ অনুসন্ধান ও উপযুক্তরূপ গবেষনা না করিয়াই কেবল সেই সব উর্দু ও বাঙ্গালা গ্রন্থকারদের পদাংক অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তার বিষাদসিন্ধু উর্দু আসাসেরাম শাহাদাতায়েন, বাঙ্গালা জঙ্গনামা শহীদে কারবালা ও মোক্তাল হোসেন প্রভৃতি পুথি গুলির অনুসরণ ও সাধু ভাষায় নতুন সংস্করণ মাত্র।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাসের একটি গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায় খলীফা হযরত আলীর পুত্রদ্বয় হাসান ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) সংঙ্গে উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইয়াযীদের দ্বন্দ্ব, কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং হযরত হাসান - হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর করুন মৃত্যু কাহিনী বিষাদসিন্ধু গন্থে বর্ণিত মূল বিষয়। এ বিরোধ রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মাত্র, একথা ঐতিহাসিক সত্য। অবশ্য এ মূল ঘটনার সঙ্গে গ্রন্থটিতে সত্যিকার ইতিহাসের অনুসরন করা হয়নি। ফলে গ্রন্থে অনেক অনৈতিহাসিক ও গ্রন্থকারের চরিত্র এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমারোহ লক্ষ করা যায়। ডক্টর ওয়াকিল আহমদ বলেন, কল্পনার যথেষ্ট আশ্রয় থাকলেও এটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত। মধুসূদন যেমন পৌরানিক কাহিনীকে আধুনিক চিন্তার বাহন করেছেলেন, মশাররফ তেমনি দোভাষী পুথি প্রভাবিত পৌরানিক ঐতিহাসিক কাহিনীকে নতুন চিন্তার বাহন করেছিলেন।[১৪]

একদিকে 'বিষাদসিন্ধু'তে বর্ণিত কাহিনী অপরদিকে কারবালা যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি সহ যে বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে দুটোর সাথে তুলনা করলেই পাঠক কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রাণ প্রিয় দৌহিত্র হযরত হাসান হযরত হুসায়ন (রাঃ) আর উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া তনয় ইয়াযীদ সম্পর্কিত রাজনৈতিক ইতিহাস টুকুর সাথে আরো কিছু অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণে মীর মশাররফ হোসেন বিষাদসিন্ধু রচনা করেন।

গ্রন্থের উপক্রমনিকায় বর্ণিত হাসান- হযরত হুসায়ন (রাঃ) করুন মৃত্যু কাহিনী সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবানী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর শিষ্য মুয়াবিয়া (রাঃ) কে বিচলিত করেছিল তা এবং ইয়াযীদের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কিত অনুরূপ বর্ণনা কোন ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায়না। মহররম পর্বের প্রথম থেকে ইয়াযীদ যয়নাব নাম্নী এক বিবাহিতা মহিলার প্রেমে উন্মত্ত হওয়ার কাহিনী, যয়নবের স্বামী আব্দুল জব্বারকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে স্ত্রী পরিত্যাগে বাধ্য করা, কিন্তু যয়নাব কর্তৃক হযরত হাসানকে পতিত্বে বরণ, যয়নাবের রূপ তৃষ্ণাই ইয়াযীদের হাসানকে নির্মূল করার সংকল্পের কারণ, হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে স্ত্রী যায়েদার পুরস্কারের আশায় দামেস্কে ইয়াযীদের দরবারে গিয়ে মৃত্যুদন্ড লাভ, এসবই অনৈতিহাসিক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম খন্ড বা মহররম পর্বের ঊনবিংশ প্রবাহ থেকে কারবালার হত্যা সম্পর্কিত অধিকাংশ তথ্যই ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে চরিত্রগুলোর মধ্যে ইয়াযীদের মন্ত্রী মারোয়ান, কুফার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ জেয়াদ (ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ) দৈত্য কার্যে কুফায় প্রেরিত মুসলিম, কারবালা যুদ্ধে ইয়াযীদ পক্ষীয় সেনাপতি ওমর বিন সা'দ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর ঘাতক শীমার[১৫] হাসানের পুত্র কাসেম, হযরত হুসায়ন (রাঃ) -কন্যা সকিনা (সুকায়না),[১৬] হযরত হুসায়ন (রাঃ) শিশুপুত্র শরাঘাতে নিহত আলী আসগর, অসুস্থ এবং এক মাত্র জীবিত পুত্র যয়নুল আবেদীন, দ্বিতীয় খন্ড বা উদ্ধার পর্বে হানিফা (হযরত আলীর এক পুত্র মুহম্মদ হানাফিয়া)[১৭] প্রমুখ ঐতিহসিক চরিত্র। এদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া গেলেও সমস্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যেমন, মুসলিম বিন আকীলের দৈত্যকার্যে প্রেরণ ইতিহাসে সর্বজন স্বীকৃত হলেও মুসলিমের দু-নাবালক পুত্রকে সঙ্গে নেয়া, মুসলিমের হত্যার পর হারেস নামক জনৈক কুফাবাসী পাঁচ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কারের লোভে মুসলিমের নাবালক পুত্রদ্বয়ের শিরোচ্ছেদ করতে চাইলে বাধা দানের কারণে হারেস স্বীয় দু-পুত্র এবং শেষে স্ত্রীকেও হত্যা করে। মুসলিমের ছেলে দুটির শিরোচ্ছেদ করে শির নিয়ে কুফার রাজদরবারে পুরস্কারের জন্য উপস্থিত হয়ে মৃত্যুদন্ড লাভ করার কাহিনী সম্ভবত কোন কাব্য সাহিত্য থেকে গ্রহন করা হয়েছে। যে অবস্থায় মুসলিম গোপনে দৌত্য কার্য্য করতে গিয়েছিলেন তাতে দু'জন নাবালক পুত্রকে সঙ্গে নেয়া অযৌক্তিক। খুব সম্ভব মহাররমের শোকাবহ কাহিনীকে অধিকতর করুণ রসে সিক্ত করার জন্য কাব্যে গল্পকার গণ দ্বারা এটি কল্পিত হয়েছিল। হাসানের পুত্র কাসেম হযরত হুসায়ন (রাঃ) কন্যা সুকায়নাকে বিবাহ করেছিলন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। সে বিবাহ যে কারবালার রণ ক্ষেত্রে হয়েছিল তার কোন প্রমান নেই। আবার কাসেমের মৃত্যুর পর মারোয়ানের অপবিত্র হাতের স্পর্শ থেকে রেহাই পাবার জন্য কাসেমের শবদেহের কটিদেশ থেকে খঞ্জর তুলে নিয়ে বুকে বিদ্ধ করে সখিনার আত্মবিসর্জনের যে চিত্র বিষাদসিন্ধুতে অঙ্কিত হয়েছে তাও সঠিক নয়। সকিনা পরবর্তী কালে আরবের প্রসিদ্ধ কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। শীমার নামক সৈনিক হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যা কারী ঠিকই, হযরত হুসায়ন (রাঃ) শির প্রথমে কুফায় পরে দামেস্কে নীত হয়েছিল তাও ঠিক। কিন্তু হযরত হুসায়ন (রাঃ) শির নিয়ে আজর নামক অমুসলিমের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহন, শির রক্ষার নিমিত্ত আজরের স্বীয় দু-পুত্র ও নিজের আত্ম বিসর্জন দেওয়া এবং শেষে আজরের স্ত্রীও শীমারের হাতে নিহত হওয়া এসব কাহিনী উদ্ভট এবং অবাস্তব। এ পর্বে ইয়াযীদ কর্তৃক হযরত হুসায়ন (রাঃ) খন্ডিত মস্তক নিয়ে তাঁর অসহায় ও বন্দি

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার পরিজনদেরকে বিদ্রুপ করার যে বিবরণ রয়েছে তাও সত্য নয়। আরো উদ্ভট হলো শিরটি আলৌকিক ভাবে উপরের দিকে উঠে অদ্রশ্য হয়ে যাওয়ার গল্পটি। অন্তোষ্টিক্রিয়ার দৃশ্যে ফেরেস্তা জিব্রাইল, নবী রসূলগন এবং আলী ও ফাতেমার উপস্থিতি সীমাহীন কল্পনার ফসল ব্যতিত আর কিছু নয়। তবে একথা সত্য যে ইবনে যিয়াদের ঘৃণিত কার্যকলাপের জন্য ইয়াযীদ তাঁকে ভৎর্সনা করেন এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) শোচনীয় মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ। তবে ইয়াযীদের এরূপ ভৎর্সনা ও দুঃখ প্রকাশের পিছনে ইমানী তাকিদের চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রবল ছিল। হযরত হুসায়ন (রাঃ) শির তার বোন এবং পুত্রের নিকট ফেরত দেয়া হয় এবং পর কারবালার শবদেহের সাথে সমাধিস্থ করা হয়। ঐতিহাসিক এস. খুদা বখ্‌শ কারবালার হত্যা কান্ডের ব্যাপারে ইয়াযীদকে নির্দোষ বলে প্রমান করেছেন। তাঁর মতে একটি সাধারণ হত্যাকান্ড কে পরবর্তী কালের লোকেরা একটি যুগান্তকারী হত্যাকান্ড বলে রূপ দিয়েছেন।[১৮] কিন্তু খুদা বক্‌শ এর একথা গ্রহণ যোগ্য নয়।

বিষাদসিন্ধুর তৃতীয় খন্ড বা ইয়াযীদ বধ পর্বের সমস্ত কাহিনীই কল্পনা প্রসূত। এ পর্বে বন্দিদের দুর্দশার চিত্র। হানিফা কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণ, বন্দিদেরকে উদ্ধার, অপরাধী এবং নিরাপরাধ নির্বিশেষে পাইকারী হত্যাযজ্ঞ, অশ্ব পৃষ্টে ইয়াযীদের পশ্চাদ্বাবন করে হানিফার অলৌকিক ভাবে প্রাচীর বেষ্ঠিতা হয়ে আবদ্ধ হওয়া, ইয়াযীদের ভূ-গর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে ইয়াযীদের আশ্রয় নেওয়াসহ যাবতীয় কাহিনীই সাজানো। ইতিহাসে প্রমান রয়েছে যে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল মুখতার কর্তৃক ও বায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে হত্যা করার মাধ্যমে।[১৯] প্রকৃত পক্ষে ইয়াযীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব হয়নি। অতএব সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে মহরম পর্বের কাহিনীতে কারবালার নৃশংসা হত্যাকান্ড সম্পর্কিত কিছু চরিত্র ও ঘটনা ব্যতিরেকে গ্রন্থের উপক্রমনিকা উদ্ধার পর্ব ও ইয়াযীদ বধ পর্বের প্রায় সম্পূর্ণটাই অনৈতিহাসিক।

বিষাদসিন্ধু তাহলে কি এটাই আমাদের নির্ণয় হওয়া প্রয়োজন। ভুল দৃষ্টিতে বিষাদসিন্ধুকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীদের উপস্থিত করা হয়। ব্যক্তি হিসেবে এ সমস্ত চরিত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু এদের জীবন সম্পর্কে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাবলীর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া চলেনা। অর্থাৎ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে কিছু কল্পনা মিশ্রিত থাকতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস নয়। কিন্তু ইতিহাস থেকেই এর জন্ম। এ প্রসঙ্গে Travelyan এর উক্তি প্রণিধান যোগ্য : "Historycal

Dhaka University Institutional Repository

fiction is not a history, but it springs from history and recacts upon it. Historical novels even the gretest of them can not do the specific work of history. Historical fiction has done much do make history popular and given it value, for it has stimulated the historical imaginations." Quoted by Jonathan Nield in his book; A guide to the Best Historical Novels and tals fith ed. Int XVIII উদ্ধৃত[২০]। এ গ্রন্থে উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ এবং মানব জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা, হিংসা-বিদ্বেষ সবই চিত্রিত হয়েছে। আবার ইতিহাসের পটভূমিকায় সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম রক্তপাত হত্যাকান্ড সবই আছে। ইতিহাসের চরিত্র, লক্ষণ এ সমস্ত মিলিয়ে একে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এতে এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে সেগুলোকে ইতিহাসের আলোকে বিচার করা চলে না। এমনকি বাস্তব জীবনেও সেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা চলে। যেমন, অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ঘটনা। এসব অতি-প্রাকৃত ঘটনা কোন উপন্যাসের উপজীব্য হতে পারে না। এখানে কারবালার যুদ্ধের মূল উৎস প্রেম। তাই বিষাদসিন্ধু'কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভূক্ত করা যায় না।

কারবালার ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত বলে সাধারণ দৃষ্টিতে 'বিষাদসিন্ধু'কে একটি ধর্মীয় গ্রন্থ বলে মনে করা যেতে পারে। গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান এটিকে ধর্মীয় অর্থেই মর্যাদা দিয়ে থাকেন। আবার 'বিষাদ সিন্ধু' ধর্মীয় কাহিনীর আবরণে আবৃত বটে, অথচ প্রকৃতপক্ষে ধর্মগ্রন্থ নয়। অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত মুসলমান 'বিষাদসিন্ধু' পাঠে একপ্রকার ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতির পরিতৃপ্তি লাভ করলেও কোরান শরীফ বা হাদীছ শরীফ যে অর্থে ধর্মীয় গ্রন্থ তার কোন চিহ্ন এতে নেই। এর কিছু চরিত্র ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কয়েকজন বংশধর তাঁরা অত্যন্ত ত্রুটি বিচ্যুতিহীন সৎ ও মহৎ ব্যক্তি এবং তাঁরা বিধাতাকে, নিয়তিকে একান্তভাবে বিশ্বাস করেন। তাঁরা জনগণের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কিন্তু ঐতিহাসিকরা তাঁদেরকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, মশাররফ হোসেন সাহেব তাদেরকে সেভাবে চিত্রিত করেননি। এ প্রসঙ্গে ডঃ আনিসুজ্জামানের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, মশাররফ হোসেন কিন্তু ধর্মবুদ্ধি দ্বারা প্ররোচিত হয়ে উপন্যাস রচনা করতে বসেননি, ঐতিহাসিক চেতনার দ্বারা প্রনোদিত হয়েতো নায়ই। ধর্ম নিরপেক্ষ প্রবল মানবিক চেতনাই মশাররফ হোসনকে বিষাদসিন্ধু রচানয় উদ্বুদ্ধ করেছে।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

হরনাথ পালা অতি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বলেছেন, বিষাদ সিন্ধু ঐতিহাসিক বলে, ইতিহাস নয়, সাহিত্য, এতে ধর্ম প্রানতা আছে, সুধীজনের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা আছে কিন্তু নেই স্বর্গ প্রাপ্তির প্রালোভন।[২২] কাহিনী বিশ্লেষণে লেখক ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তে মানবিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন। এখানেই মীর মশাররফ হোসেনের অনন্যতা। অতএব দেখা গেল যে "বিসাদসিন্ধু" ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস গ্রন্থ কোনটাই নয়। একে ঐতিহাসিক উপন্যাসও পুরোপরি বলা যায় না তাহলে 'বিষাদ সিন্ধু' কি? আসলে এটি ইতিহাস, ধর্মীয় কাহিনী, উপন্যাস সৃষ্টি ধর্মী রচনা, মহাকাব্য, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ববির্ধ অংশের সংমিশ্রণে রোমান্টিক আবেগ মাখানো এক সংকর সৃষ্টি। 'বিষাদসিন্ধু'কে একটি প্রেম, ভালবাসা আবেগ, হিংসা বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের কাহিনী বলে মনে করা যায়। সাহিত্যিক মূল্য যতই থাকুকনা কেন, এ গ্রন্থকে ইতিহাস পদ বাচ্যে অভিষিক্ত করা যায়না।

কারবালা ও নবী বংশের ইতিবিত্ত গ্রন্থে মোহাম্মদ বরকতুউল্লাহ কারবালার ঘটনা সঠিক চিত্র তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এবং অনেকটা সত্যের কাছাকাছি উপনীত হয়েছেন। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে মূল আরবী ইতিহাস গ্রন্থের সাহায্যে না নেওয়ার কারণে প্রকৃত সত্য উপনীত হতে পারেনি। মোহাম্মদ বরকতুউল্লাহ তাঁর গ্রন্থের পটভূমিকায় বলেন-

কারবালার ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস উপলব্ধি করতে হলে দু'প্রতিপক্ষ আর খলীফা ইয়াযীদের পূর্ব পুরুষগণের মধ্যকার প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে চলে আসা বিরোধের একটি ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরা একান্ত আবশ্যক। এ পটভূমিসহ কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরার যে কয়খানি প্রামান্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করা হয়েছে সেগুলো হলো সৈয়দ আমীর আলী প্রণীত-

A short History of the Seracens, London, 1949, সৈয়দ খোদা বক্সের A History of Islamic Peoples, C.U. 1914, পি.কে, হিট্রির রচিত, A History of the Arabs, London 1951, মুইর প্রণীত The Caliphate and its fall, London, 1891, আর, এ নিকলসনের A Literary History of the Arabs, C.U. 1930, এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রচিত 'ইনসানিয়াত মউতকে দরওয়াজে পর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ (নুরুদ্দীন আহমদ 'মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা' সংশোধিত সংস্করন, ১৯৭৬, ঢাকা)। মুইর, তাবারী ও বালাজুরীর ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছেন। ফলে আলোচ্য ঘটনার বিবরণে এ দু-প্রসিদ্ধ আরব ঐতিহাসিকের প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ নিজে কোন মূল আরবী গ্রন্থের থেকে লিখেননি। তাই

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিক কারণেই প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হওয়ার ব্যাপারে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। কারণ ঘটনাটি ঘটেছিল আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে। মুইর আরবী গ্রন্থের সঠিক অনুবাদ করেছেন বলেও প্রতীয়মান হয়না-এর প্রমাণ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচিত কারবালা গ্রন্থটি, কারণ এ গ্রন্থে বাস্তবের চেয়ে আবেগকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এবং সাহাবীদের মানের খেলাফ শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন তাদের শানে তিনি বিদ্রোহী, ধুরন্ধর, চতুর, কুটকৌশল, প্ররোচনা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। বুঝার সুবিধার জন্য তাঁর লেখার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো।

"কারবালার নৃশংস ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস ভালোভাবে বুঝার সুবিধার্থে এবং ঐতিহাসিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত ধারণা একান্ত আবশ্যক। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জন্মের পূর্ব থেকেই কুরাইশ বংশের আবদ মানাফ শাখার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বনী হাশিম ও বনী উমাইয়া গোত্রের মধ্যে বিদ্বেষের বহ্নিশিখা বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত হয়ে তাদের জীবন ধারাকে অশান্তিময় করে তুলেছিল। উমাইয়া ছিলেন হাশিমের ভাই আবদ শাম্‌সের পুত্র। হাশিমের অত্যাধিক প্রভাব প্রতিপত্তি ভ্রাতুস্পুত্র উমাইয়াকে খুবই পীড়া দিত। উমাইয়া সর্বদা পিতৃব্য হাশিমকে হেয় করবার প্রচেষ্টা চালাতেন। একদা স্বীয় শ্রেষ্টত্ব প্রমানের জন্য তিনি তৎকালিন আরবের প্রথানুযায়ী এক প্রকাশ্য সভা আহবান করেন। শর্তারোপ হলো যে প্রতিযোগিতার পণ হবে পঞ্চাশটি কৃষ্ণচক্ষুবিশিষ্ট উট এবং মক্কা ভূমি থেকে দশ বৎসরের জন্য নির্বাসন। প্রতিযোগিতায় বিচারক মন্ডলী হাসিমকে শ্রেষ্ট বলে ঘোষনা করলে ক্রুদ্ধ উমাইয়া দশ বৎসরের জন্য সিরিয়ায় চলে গেলেন। তাঁর প্রদত্ত পঞ্চাশটি উট জবাই করে হাশিম মক্কাবাসীদিগকে বিরাট জিয়াফতে পরিতুষ্ট করলেন। এতে নির্বাসিত উমাইয়ার ক্রোধের জ্বালা আরো বেড়ে গেল। এব এ নির্বাসনের সুবাদে সিরিয়ার সাথে তাঁর বংশের যোগ সুত্র স্থাপিত হল।

উমাইয়ার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র হারব উক্ত সুত্রে পিতার প্রতিহিংসা আয়ত্ব করলেন এবং হাশিম পুত্র আবদুল মুত্তালিবের সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করতে লাগলেন। আবদুল মুত্তালিব পিতার সদগুনরাজির অধিকারী হয়েছিলেন। হাশিমের ন্যায় তিনিও রাজোচিত উদারতা ও সমারোহের সাথে তীর্থকারীদের সেবা করতেন। হারব মুত্তালিবের সাথে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে মুত্তালিব গোত্রের সংশ্রব বর্জন করলেন। এভাবে জ্ঞাতি বিদ্বেষের বিষাক্ত ধারা বংশানুক্রমে উমাইয়াদের সন্তান সন্ততির ভেতর সংক্রামিত হয়। ৫৭০ খ্রিঃ ২৯শে আগষ্ট হাশিমের পুত্র আব্দুল মুত্তালিবের কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র উরসে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতা ও পিতামহের ইন্তিকালের পর অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তাঁর লালল পালনের দায়িত্ব পালন করেন পিতৃব্য আবু তালিব। হযরতের

Dhaka University Institutional Repository

নবুয়তের পর পৌত্তলিক আরববাসীদের নিকট ইসলাম প্রচারকালে তীব্র বাধা ও নির্যাতনের মাঝে আবু তালিব নিজে ইসলাম গ্রহণ না করলেও তাঁর পুত্র আলী কৈশরেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরতের নিত্যসহচর হিসেবে নবী ও ইসলামের সেবায় নিজেকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাবে নিয়োজিত করেন। হযরত আলী ইসলামের ঘোর দুর্দিনে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেন এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে একজন আদর্শবান পুরুষ হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেন। মহানবী তাঁর প্রিয়তমা দুহিতা ফাতিমাকে হজরত আলীর সাথে বিয়ে দেন। আলীও ফাতিমার দুই পুত্র হাসান ও হুসায়ন নবীর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর কোলে পিঠে স্নেহের পরশে বড় হয়ে উঠেন। তারা ব্যতিরেকে মহানবীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁর বংশধারা অব্যাহত রাখার আর কেউ বেঁচে ছিলেন না। এমনি অবস্থায় মদীনায় ইসলামকে একটি বিপ্লবী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে মুহাম্মদ (সঃ) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে ৮ই জুন (হিজরী ১১সালের ১২ই রবিউল আউয়াল) সোমবার ওফাত লাভ করেন।

হজরতের ইসলাম প্রচার কালে কুরাইশ বংশের অপর শাখা শত্রুতাবশত নবী ও ইসলামের তীব্র বিরোধিতা করেন। বস্তুত, তারাই ইসলাম বিরোধিতায় সমগ্র পৌত্তলিক আরবের নেতৃত্ব দিয়েছিল। একমাত্র হযরত উসমান বিন আফফান ছাড়া আর কোন নাম করা উমাইয়া গোত্রীয় ব্যক্তি হযরতের মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। উমাইয়া বংশের প্রথম খলীফা মুয়াবিয়া পিতা আবু সুফিয়ান ওহুদের যুদ্ধে কাফিরদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তার স্ত্রী হিন্দা সেই যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এ চাচা হামজা (রাঃ) শহীদ হলে তাঁর লাশ নিয়ে এক পৈশাচিক দৃশ্যের অবতারণা করে। আবু সুফিয়ান ও হিন্দা তাঁদের সন্তান মুয়াবিয়াকে নিয়ে মক্কাবিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। হযরতের বিশাল নেতৃত্বের গুনে চির শত্রু বনী হাশিম আর বনী উমাইয়া সাময়িক ভাবে নিজেদের শত্রুতা ভুলে গিয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। মুয়াবিয়া নিজেই হযরতের প্রিয় সাহাবী হিসেবে কাতেবে ওহীর মর্যাদা লাভ করেন।

মহানবীর ওফাতের পর তাঁর উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয়। তিনি কাকেও খলীফা মনোনীত করে যাননি। নানা-রকম বাক-বিতন্ডার নিরসন করে মুহাজিরদের মধ্যে ওমর এবং আনসারদের মধ্যে আবু উবাইদা কুরাইশদের মধ্যে প্রবীণ ও বিজ্ঞ আবুবকরের হস্তে বায়আ'ত হন। সকল দল সন্তুষ্ট না হলেও গৃহবিবাদ বন্ধ হল। রাসূলের প্রিয় জামাতা হযরত আলী (রাঃ) নির্বাচন স্থলে উপস্থিত ছিলেন না। মাত্র আড়াই বছর সাফল্যের সাথে ইসলামের খিদমত করে হযরত আবুবকর (রাঃ) ২৩শে আগষ্ট ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে (১৩হিঃ ২২শে

Dhaka University Institutional Repository

জমাদিউস সানী) ইন্তেকাল করেন এবং চিরবিদায়ের আগে তিনি প্রধান প্রধান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সম্মতি এবং পরামর্শ গ্রহন করে হজরত উমরের স্কন্ধে খিলাফতের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কঠোর কর্তব্যপরায়নতা, সুক্ষ বিচারবুদ্ধি এবং অসীম ক্ষমতার সাথে দশ বছর পাঁচ মাস খিলাফতের গুরুদায়িত্ব বহন করে তৎকালীন পরিচিত দুনিয়ার অর্ধেকেরও বেশি পরিমানে ইসলামের বিস্তার সাধন করে হযরত ওমর এক আত-তায়ীর হস্তে নিহত হন (৬৪৪খ্রিঃ) মৃত্যুর পূর্বে তিনি হযরত উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ এবং আবদুর রহমান এ ছয় জন প্রবীণ ও নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তির উপর তাদের মধ্য থেকে একজনকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পন করে যান। কয়েক দিন ধরে দরবার ও বাক বিতন্ডার পর উসমান তৃতীয় খলীফা পদে নির্বাচিত হন।

জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি হওয়া সত্তেও সহজ সরল বয়োঃবৃদ্ধ জুন্নরাইন* উসমানের খিলাফতামলে তুলানমূলক ভাবে বৈষয়িক স্বার্থ পূজারী উমাইয়ারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠির হাতের ক্রীড়ানক হয়ে পড়েন। প্রশাসনের গুরুত্ব পূর্ণ পদ সমূহ উমাইয়াদের দখলে চলে যায়। খলীফার খুল্লতাত ভ্রাতা মারোয়ান খলিফার সচিব নিযুক্ত হন। তাঁর ষড়যন্ত্র ও কুটনীতির ফলে খলীফা বার বার ভুল করতে লাগলেন। কালক্রমে সারাদেশ ব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। রাসুলের ব্যক্তিত্ব প্রভাবে বনী হাশিম ও বনী উমাইয়াদের ভুলে যাওয়া সুপ্ত শত্রুতা উসমানের সহযোগীদের ষড়যন্ত্র ও কুশাসনে আবর মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। কিন্তু মহানুভব ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আলী খলীফাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। উসমান (রাঃ) দুর্বলতার সুযোগ লাভ করে আশতার নাখরী নামক জনৈক অনারব এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা (ইবন সওদা নামক ইহুদী) নামক নওমুসলিম কুফা, বসরা এবং মিশরে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হন। ইবন সাবা হযরত আলী ও আহল-ই-বয়তের দরদী সেজে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং খিলাফতে নবীর বৈধ উত্তরাধিকার প্রচার করতে থাকে। বহু মুসলমান তার মতানুসারী হয়। এবং খলীফা উসমানকে উচ্ছেদ করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়। এদিকে নবনিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের দুঃশাসনে অবস্থা এমন শোচনীয় রূপ ধারন করল যে মালিক উশতুরের নেতৃত্বে এক বিদ্রোহী প্রতিনিধি দল মদীনায় পৌছে খলীফার নিকট প্রাদেশিক গর্ভর্ণরদের কুশাসনের প্রতিকার দাবী করল। তারা খলীফার দুরসম্পর্কীয় ভ্রাতা মিশরের অত্যাচারী শাসক আবদুল্লাহ ইবন আবি সাবাহকে অনতিবিলম্বে অপসারণ করে তদস্থলে মুহম্মদ ইবনে আবুবকরকে

* রাসুলুল্লাহ (সঃ) র কন্যা রুকাইয়া ও কুলসুমকে তিনি পরপর বিবাহ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন বলে তাঁকে জুনুরাইন বলা হত।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগদান করার জন্য চাপ দিলে খলীফা তাদের দাবী মেনে নিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুহম্মদ ইবন আবুবকর এবং তার সহচরগন মারোয়ানের জালকরা খলীফার সীলমোহরকৃত একখানি চিঠি পথের মধ্যে ধরে ফেললেন যাতে তাদের মৃত্যু আজ্ঞা লেখা ছিল। প্রতিনিধিদল ক্রুদ্ধ হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে খলীফার নিকট কৈফিয়ত তলব করেন এবং প্রমাণিত হলো যে, কূটবুদ্ধি মারোয়ান চিঠি জাল করেছেন, বিদ্রোহীদল মারোয়ানকে তাদের হস্তে সম্পর্নের দাবী জানালে খলীফা তা প্রত্যাখান করেন। তারা খলিফার বাসভবন অবরোধ করে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। উসমান (রাঃ) এ বিপদে আলী তাঁর পুত্রগণ এবং অন্যান্য রক্ষক সাহসের সাথে বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু সমস্ত প্রতিরোধ উপেক্ষা করে বিদ্রোহীরা কুরআন পাঠরত অবস্থায় বৃদ্ধ খলীফাকে তরবারীর আঘাতে নিহত করে (১৮ই জুলহিজ্জ ৩৪হিঃ ১৭ই জুন, ৬৫৬খ্রিঃ)। তাঁর পত্নী বিবি নায়লা স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে শত্রুদের তরবারী আঘাতে হাতের কয়েকটি আঙ্গুল হারিয়ে মারাত্মক ভাবে জখম হন। এভাবে ইসলামের ইতিহাসে সুদূর প্রসারী বিপর্যয়কর কলঙ্কজনক হত্যাকান্ড সংঘটিত হলো এবং হাশিমী উমাইয়া শত্রুতার অনলে ঘৃতাহূতি প্রদান করা হল। ইসলামের তৃতীয় খলীফা হজরত উসমান (রাঃ) এরূপ নৃশংশ হত্যাকান্ডের পর মদীনাসহ সমগ্র মুসলিম জাহানে চরম বিশৃংখল সৃষ্টি হয়। তাঁর গোত্রীয় লোকজন প্রতিশোধের অগ্নিতে জ্বলে উঠে। জনৈক ব্যক্তি বিবি নায়লার কর্তিত রক্ত রঞ্জিত আঙ্গলগুলো উসমান (রাঃ) রক্তসিক্ত জামায় জড়িয়ে দামেস্কে মুয়াবিয়ার নিকট নিয়ে যায়। এদিকে মদীনায় উসমান (রাঃ) পর কেউ খিলাফত গ্রহনে সাহসী হলেন না। ছয়দিন অতিবাহিত হওয়ার পর জনতার অনুরোধে খলীফা শুন্য মুসলিম জাহানের কথা ভেবে হযরত আলী দায়িত্ব গ্রহণে রাজি হন। তালহা ও যুবায়র প্রথমেই বায়আ'ত গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু পরিনামে ঘরে-বাইরে সর্বত্র বিশৃংখল অবস্থায় তারা খলীফা আলীকে কোন প্রকার সাহায্য তো করলেনইনা, বরং তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। বনী উমাইয়াগন সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে। আলী (রাঃ) খিলাফতের সুশাসনের ব্রত নিয়ে সিরিয়ার শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান শাসনকর্তা মুয়াবিয়াসহ আরো কতিপয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বরখাস্তের আদেশ দিলেন। কেউ ইচ্ছায় কেউ অনিচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করলেও মুয়াবিয়া (রাঃ) সহ কয়েকজন খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তারা উসমান হত্যাকান্ডের বিচারের দাবী তুললেন। মুয়াবিয়া সিরিয়ার এক বিরাট শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করলেন। তার এরূপ কর্ম কান্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল খিলাফত দখল।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে তালহাও যুবায়ের যথাক্রমে কুফা ও বসরার গভর্নরের পদ প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা মঞ্জুর না হওয়ায় তাঁরা খলিফার শত্রু হয়ে দাঁড়ান। রাসুলুল্লাহ বিধবা পত্নী বিবি আয়াশাও তাঁদের প্ররোচনায় বিদ্রোহীদের কাতারে শামিল হলেন। প্রথমে মক্কা ও পরে বসরায় তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার এক বিরাট সৈন্যদল গঠিত হয়। তাঁরা বসরার খলীফার অনুগত শাসন কর্তা উসমান ইবন আবি হানিফাকে প্রথমে কারারুদ্ধ ও পরে বিতাড়িত করেন। হযরত আলী এসব সংবাদ অবহিত হয়ে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলেন এবং বিদ্রোহ দমন করার জন্য সসৈন্যে বসরার দিকে অগ্রসর হলেন। খোবারা নামক স্থানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে হযরত আলী রক্তপাত এড়াবার আপষ মিমাংসার আহবান জানালে তালহা যুবায়ের ও হযরত আয়শা সম্মত হন। কিন্তু আলীর দলে অবস্থান কারী উসামন হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা মালিক উশতুরের নেতৃত্বে খলিফার অজান্তে রাতের আধারে অতর্কিতে যুবায়েরী সৈন্যদের উপর আক্রমন করে বসে, ফলে উভয় পক্ষের সৈন্য ঘোরতর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং পরস্পরকে প্রতারনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। যুদ্ধে তালহা ও যবায়ের সহ অসংখ্য মুসলমান নিহত হলেন এবং বিবি আয়শা ধৃত হলে হযরত আলী তাঁকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। বিবি আয়শা একটি উষ্টের পিঠে আরোহন করে যুদ্ধ করছিলেন বলে ইসলামের ইতিহাসে এ প্রথম গৃহযুদ্ধ "উষ্টের যুদ্ধ" বা "জঙ্গে জমল" নামে খ্যাত।

জমলের যুদ্ধের পর খলীফা আলী কিছু সুবিধা বিবেচনা করে খিলাফতের রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু একাজে শেষ পর্যন্ত তাঁর মঙ্গলের চাইতে অমঙ্গলই বেশী হয়েছিল। মুয়াবিয়া ক্রমান্বয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেন। কুটনীতি গুনে তিনি আলীর বিশ্বস্ত সেনানায়ক মিসরের শক্তিশালী শাসনকর্তা কয়সকে অপসারন করান এবং অমর ইবন আসের মত জাঁদরেল কুটনীতিককে স্বপক্ষে লাভ করেন। আলী এবং মুয়াবিয়ার সৈন্য বাহিনী রনসাজে সজ্জিত হয়ে ফুরাত নদীর তীরে সিফফিনের প্রান্তরে মুখোমুখী হন।

এবারও হযরত আলী রক্তপাত এরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। উভয় পক্ষে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী লড়াই সংঘটিত হয়। এটিই ইসলামের ইতিহাসে "সিফফিনের যুদ্ধ" (৬৫৭ খ্রিঃ) নামে খ্যাত। তিন দিন যুদ্ধের পর পরাজয়ের দ্বার প্রান্তে মুয়াবিয়ার সৈন্যরা আমরের পরামর্শে পতাকা ও বর্শার অগ্রভাবে কুরআন শরীফ ঝুলিয়ে মীমাংসা কামনা করলেন। আলী শত্রুদের ছলচাতুরী বুঝতে পেরে নিজ বাহিনীকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আপ্রাণ চেস্টা করেও ব্যর্থ হলেন। তাঁর কুফী বাহিনী আর যুদ্ধ না করে কুরআনের মিমাংসা মেনে নেওয়ার জন্য তাঁকে চাপ দিলেন। অগত্যা বিজয়লাভের

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব মুহূর্তে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন। মুয়াবিয়ার পক্ষে চতুর আমর আর আলীর পক্ষে বৃদ্ধ ও সরল আবু মুসা আশারী শালিশ মনোনীত হলেন। আমর আবু মুসাকে বুঝালেন যে, রাষ্ট্রের অশান্তির জন্য আলী ও মুয়াবিয়া উভয়ই দায়ী। কাজেই উভয়কে পদচ্যুত করে অন্য একজনকে খলীফা নিযুক্ত করলে রাষ্ট্রের মঙ্গল হবে। প্রতিনিধিদ্বয়-শলা পরামর্শ করে সভাস্থলে এসে প্রথমে বয়োজষ্ঠ হিসেবে আবু মুসা আশারী বললেন, তিনি শান্তির খাতিরে আলী প্রতিনির্ধি হিসেবে আলীর খিলাফতের দাবী রদ করছেন। অতঃপর ধুরন্ধর আমর বললেন যে, আবু মুসা আলীকে খিলাফতের আসন থেকে পদচ্যুত করেছেন তদস্থলে তিনি (আমর) মুয়াবিয়াকে নতুন খলিফা মনোনীত করছেন। আমরের এ ঘোষনায় আলীর লোকজন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হল এবং পরস্পর বিরুদ্ধ দু'টি দল প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বলাবলি করতে করতে স্থান ত্যাগ করল। প্রবঞ্চনাপূর্ণ শালিশী দ্বারা বিবাদের মিমাংসা হলোনা। মুয়াবিয়া কিছুতেই আলীর বশ্যতা স্বীকার করলেননা এদিকে সিফফিনের শালিশের প্রতিবাদে সৃষ্ট খরিজীদেরকে হজরত আলী একাধিক বার পরাজিত ও পাইকারী হত্যার পরও নিঃশেষ করতে পারলেন না। অবশেষে খারিজীরা মুসলিম জাহানের অশান্তির মূল কারণ বলে আখ্যা দিয়ে আলী মুয়াবিয়া আর আমরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সৌভাগ্যক্রমে মুয়াবিয়া ও আমর রক্ষা পেলেও খারিজী আব্দুর রহমান ইবনে মুলযমের অব্যর্থ আঘাতে কুফার মসজিদে হযরত আলী দেহ ও মাথায় গুরুতর ভাবে আহত হন। ফলে ইসলামের ভবিষ্যৎ আরও তমসাবৃত করে ১০ হিজরীর ১৭ই রমজান (৬৬১ খ্রিঃ ২৭শে জানুয়ারী) ৬৩ বৎসর বয়সে হযরত আলী পরলোক গমন করেন। তারই সাথে ইসলামের খুলাফায়ে রাশেদুনের যবনিকাপাত ঘটে"।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর বর্ণনার সাথে ইমাম ইবনে কাছীরের নিম্নের এ বর্ণনার বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে। ইবনে কাছীর তার আলবেদায় লিখেছেন "বৃদ্ধ বয়সে খলীফা মুয়াবিয়া বসরার শাসনকর্তা মুযিরার পরামর্শে, ইরাকের শাসনকর্তা যিয়াদ ইবনে আবিহির সমর্থন নিয়ে হযরত হাসানের সঙ্গে আবদ্ধ চুক্তি ভঙ্গ করে পুত্র ইয়াযীদকে খিলাফতে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সিরিয়াবাসীগণতো আগেই তাঁর মতানুসারী। আর মক্কা ও মদীনা গমন করে সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা চালালে বিশিষ্ট চারজন ব্যতিরেকে আর সকলেরই সমর্থন লাভ করেন। এ ৪ জন (হুসায়ন ইবেন আলী, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর) সকলেই সমর্থন জানাতে অস্বীকৃতি জানালেন। এরূপ অবস্থায় ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (৬০হিঃ) প্রায় ৭৫ বছর বয়সে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পরতাঁর ইন্দ্রিয় পরায়ন পুত্র ইয়াযীদ দামেস্কের সিংহাসনে

Dhaka University Institutional Repository

আরোহন করেন। মৃত্যুর পূর্বে মুয়াবিয়া পুত্রকে হুসায়ন ইবনে আলীর সাথে হৃদ্যতা পূর্ণ আচরন করবার পরামর্শ দেন। বিচক্ষণ প্রশাসনিক কলাকৌশল এবং বিভিন্ন প্রদেশের শাসনসংক্রান্ত নীতি সম্পর্কেও তিনি পুত্রকে উপদেশ দিয়ে যান। খিলাফত গ্রহণ করেই ইয়াযীদ শাসনকার্যে মনেনিবেশ করতেই যে কয়জন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেনি তাঁদের প্রতি মনোযোগ দেন। মদীনার শাসনকর্তা ওলিদ ইবনে ওতবার নিকট পত্র প্রেরণ করা হলো উপরোক্ত ব্যক্তিদের বশ্যতার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। ওলিদের কার্যকলাপে হযরত হুসায়ন এবং ইবনে যুবায়ের মদীনা ত্যাগ করে মক্কা গমন করেন। কুফাবাসীরা হযরত আলী এবং হযরত হাসানের সাথে কপট আচরণ করলেও কুফীদের অন্তরে বরাবরই আহল-ই-বায়তের প্রতি একটা টান যে ছিল তা অস্বীকার করা যাবেনা। কাজেই হযরত হুসায়ন সমর্থকগণ ইমামকে কুফা আগমনের জন্য বহু চিঠি পত্র ও দেখা সাক্ষাতের মাধ্যমে অনুরোধ জানালো এবং তাঁকে খলীফা হিসেবে বরণ করে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিল। তিনি ইয়াযীদির দুঃশাসন হতে মুসলিম জাহানকে উদ্ধার এবং নিজেকে রাসুলুল্লাহ্‌র একজন উত্তরাধিকারী মনে করে কুফার বিশ্বাসঘাতক শীয়াদের আমন্ত্রন গ্রহণ করলেন। অবশ্য তিনি শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শ মত পিতৃব্যপুত্র মুসলিম ইবনে আকীলকে যথার্থ সংবাদের জন্য কুফার দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। মুসলিম কুফা পৌছে দেখেন যে, কুফার জনমত হুসায়নের অনুকূলে। কাজেই কুফার শাসনকর্তা নো'মান ইবনে বশীরসহ সকলের সমর্থনের কথা জানিয়ে মুসলিম হযরত হুসাযনকে কুফা আগমনের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। পত্র পেয়েই হুসায়ন (রাঃ) কাল বিলম্ব না করে কিছু সংখ্যক আত্মীয় বন্ধুসহ সপরিবারে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। দূর্ভাগ্য ক্রমে মক্কা থেকে নিক্রান্ত হবার পর পরই কুফার রাজনৈতিক অবস্থার পট পরিবর্তন ঘটে। নোমানের ঔদাসীন্য এবং হুসায়সনের পক্ষে জনমতের সংবাদ জ্ঞাত হয়ে খলীফা ইয়াযীদ তৎক্ষনাৎ নোমানকে পদচ্যুত করে বসরার শাসনকর্তা নিষ্ঠুর উবায়দুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। উবায়দুল্লাহ্ কুফা গমন করে সর্ববিধ বিষয় অবগত হয়ে অনুসন্ধান করতঃ হানী নামক আহল-ই-বায়েতের জনৈক ভক্তের গৃহ থেকে মুসলিম ইবনে আকীলকে বের করে হানী ও মুসলিম উভয়ের শিরচ্ছেদ করেন। তিনি ছলে বলে কৌশলে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করে বশে আনতে সমর্থ হন কুফার সকলে আবার ইয়াযীদের পক্ষে যোগদান করে। এদিকে হযরত হুসায়ন (রাঃ)-এর শুভাকাঙ্খীদের বারন অগ্রাহ্য করে এক ক্ষুদ্র কাফেলা সঙ্গে নিয়ে কুফা অভিমুখে এগিয়ে আসেন। মরুভূমির প্রচন্ড উত্তাপ আর নানাবিধ সমস্যার মাঝে তিনি কাদেসিয়া নামক স্থানে এসে মুসলিমের

Dhaka University Institutional Repository

নিধনসংবাদসহ কুফায় সমস্ত খবরাখবর অবগত হলেন। তাঁর কাফেলায় নিরপরাধ শিশু, মহিলা, আর কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর ছাড়া আর কেউ ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি নিরীহ ব্যক্তিগনের প্রাণ বাঁচাবার নিমিত্ত ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু মুসলিমের সন্তানগণ আর আত্মীয়স্বজন প্রতিবাদ করে জানালেন যে, তাঁরা মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে কিছুতেই ফিরবেননা। অগত্যা হযরত হুসায়ন (রাঃ) মন্ত্র মুগ্ধের মত সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলেন। পথিমধ্যে কবি ফারাসদাকের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে কুফার খবর জিজ্ঞাসা করেন। কবি জবাব দেন যে, কুফার মানুষের অন্তঃকরন আপনার (হুসায়নের) সঙ্গে, কিন্তু তাদের হাত ও অস্ত্র ইয়াযীদের পক্ষে। সমূহ বিপদাশঙ্কায় মক্কা থেকে আগত কিছু বেদুইন তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে দলত্যাগ করে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত তাঁর দলে মাত্র ৩০ জন অশ্বারোহী এবং ৪২ জন পদাতিক সৈন্য রইল। কাফেলা কাদেসিয়া পার হলে হুসায়ন (রাঃ) দেখতে পেলেন যে, হোর নামক ইয়াযীদের জনৈক সেনাপতি সহস্রাধিক সৈন্যসহ তাঁকে অনুসরন করছে। হোর উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের আদেশে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে অনুসরন করলেও আহল-ই-বায়আ'তের প্রতি তাঁর টান ছিল বলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) সাথে পত্র বিনিময় করেন এবং কুফার সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানিয়ে দেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) কুফীগনের বিশ্বাসঘাতকতা ও মত পরিবর্তনের সংবাদ জেনে মর্মপীড়িত হলেন। অবশেষে পথশ্রান্ত ঘর্মাক্ত কলেবর ক্ষুদ্র কাফেলা ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরবর্তী কারবালা প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করলেন (২রা মহররম, ৬১হি.)। উবায়দুল্লাহ কর্তৃক ওমর ইবনে সা'দের নেতৃত্বে চার হাজার উমাইয়া সৈন্য এ ক্ষুদ্র কাফেলাকে অবরোধ করল। উবায়দুল্লাহর নির্দেশ ছিল ফুরাত নদীর উপকূল ভাগ ঘিরে রেখে হযরত হুসায়ন (রাঃ) শিবিরে পানি সংগ্রহের পথ বন্ধ করে কষ্ট প্রদান পূর্বক ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা। ওমরের সৈন্যরা তাই করল। একেতো মরুভূমির প্রচন্ড উত্তাপ তদুপরি সকলে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত ও অবসন্ন। পানির অভাবে সকলে হাহাকার করে উঠল। হযরত হুসায়ন (রাঃ) অনন্যোপায় হয়ে ওমর ইবনে সাদের নিকট তিনটি সম্মানজনক প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব তিনটি হলঃ প্রথমত, হযরত হুসায়ন (রাঃ) যেখান থেকে এসেছেন (মক্কা) সেখানে ফিরে যাবেন। দ্বিতীয়তঃ দামেস্কে খলীফা ইয়াযীদের নিকট বোঝাপড়া করার নিমিত্ত তাঁকে যেতে দেওয়া হউক। তৃতীয়ত, ধর্ম প্রচারের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য তাঁকে কোন দূরবর্তী এলাকায় প্রেরণ করা হউক। ওমর প্রস্তাব তিনটি উবায়দুল্লাহর কাছে পেশ করলে নিষ্ঠুর উবায়দুল্লাহ্ সেটা নাকচ করে দেন। উবায়দুল্লাহ বলে পাঠালেন যে, তাঁকে (হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে) বিনা শর্তে ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করো,

Dhaka University Institutional Repository

নচেৎ তাঁর সাথে যুদ্ধ করে তাঁর শিরচ্ছেদ কর এবং শির কুফায় প্রেরণ কর। হযরত হুসায়ন (রাঃ) উবায়দুল্লাহ্‌র কঠোর আদেশ গ্রহণপূর্বক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দুষ্কর্মশীল ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকার অপেক্ষা প্রকৃত ধর্মবীরের ন্যায় সম্মুখ যুদ্ধে জীবন বিসর্জন দেওয়া উত্তম। ওমর হযরত হুসায়ন (রাঃ) পরামর্শ দিলেন যে, খলীফা ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকার করলে তাঁর কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নেই। কিন্তুহযরত হুসায়ন (রাঃ) তা না করে জানালেন যে, শুধু তাঁর (হযরত হুসায়ন (রাঃ) জীবন নিয়ে নিরপরাধ পরিবার পরিজন ও অনুচরদের নির্বিঘ্নে স্থানত্যাগ করতে অনুমতি দেওয়া হোক। কিন্তু ওমর তাতে কর্ণপাত করলেন না। হযরত হুসায়ন (রাঃ) বিপদের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে বন্ধুবান্ধব ও অনুচরদেরকে সময়মত আত্মরক্ষা করার জন্য কারবালা পরিত্যাগ করবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু ভক্ত অনুচরগণ তাঁকে ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। কার্য সম্পাদনে বিলম্ব হচ্ছে দেখে উবায়দুল্লাহ শিমার ইবনে যিলযোশান নামক এক দুর্বৃত্তকে মৌখিক আদেশ দিয়ে কারবালায় পাঠালেন এই বলে যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে অনতিবিলম্বে জীবিত কিংবা মৃত যে কোন অবস্থায় কুফায় প্রেরণ করো। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন যে, যদি ওমর তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ না করে তাহলে শিমার যেন তাঁকে পদচ্যুত করে প্রধান সৈনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করে। হযরত হুসায়ন (রাঃ) তখনও পবিত্র কুরআন শত্রুদের নিকট প্রদর্শন করে সন্ধি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তা অগ্রাহ্য হল। ৬১ হিজরী সনের (৬৮০খ্রিঃ) ১০ই মহররম তারিখের প্রাতঃকালে উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। এ সময় ইয়াযীদ বাহিনীর ৩৭জন সৈন্যসহ হোর নামক জনৈক সেনাপতি ইয়াযীদ ব্যূহ হতে নির্গত হয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দলে যোগদান করলেন, হযরত হুসায়ন (রাঃ) মাত্র ৭২ জন পিপাসা কাতর সৈন্যগণ এক এক করে শত্রুদের সাথে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে মারা যেতে থাকলেন। মল্লযুদ্ধে পিপাসা কাতর অভূক্ত অর্ধভুক্ত মাদানী সৈন্যদের অমিত তেজ দেখে শত্রুরা তাদের সামনে আসতে সাহস করল না। দূর যেকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। এ ক্ষুদ্র বাহিনী শত্রুদের সামনে বেশীক্ষণ টিকতে পারলনা। অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুদের সাথে তাঁরপুত্র ও ভ্রাতুস্পুত্রগন যুদ্ধ করে তাঁর সম্মুখেই শহীদ হলেন। তাঁবুর মধ্যে তাঁর হস্তের উপর তাঁর শিশু পুত্র তীরের আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করলেন। পুরুষগণের মধ্যে (একমাত্র রুগ্ন পুত্র যয়নুল আবেদীন ব্যতীত একে একে প্রায় সকলেই শাহাদাৎ বরণ করলে হযরত হুসায়ন (রাঃ) স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করলেন। অনেক্ষণ পর্যন্ত কেউই তাঁর নিকটবর্তী হতে সাহস পায়নি। মহাবীর হযরত হুসায়ন (রাঃ) প্রাণপণে যুদ্ধ করে ক্ষুৎপিপাসা ও ক্লান্তিতে কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁর সমস্ত শরীর তীর ও অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হল। প্রচুর রক্তক্ষরণে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

দূর্বলদেহে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। শত্রুগণ তাঁকে চতুর্দিক হতে ঘিরে ফেলে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করল এবং তার শির দেহচ্যুত করল। কর্তিত শির বর্শাগ্রে গেঁথে তুলে নিল। অতঃপর তাঁর দেহ অশ্বপদ তলে দলিত করে তারা চরম নৃশংশতা প্রদর্শন করল। এ নৃশংশতম ঘটনাই ইসলামরে ইতিহাসে 'কারবালার হত্যাকান্ড' নামে পরিচিত। হযরত হুসায়ন (রাঃ) পুত্র আলী (যয়নুল আবেদীন) রোগাক্রান্ত অবস্থায় শিবিরের মধ্যে পড়েছিলেন। মহিলাদের ক্রন্দন ও করুন বিলাপে কারবালা রন প্রান্তর ভারাক্রান্ত হল। অতঃপর যয়নুল আবেদীন সহ তাঁদের সকলকে কুফার উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট প্রেরণ করা হল। এ যুদ্ধে হযরত হুসায়ন (রাঃ) পক্ষীয় ৭২ জন আর ইয়াযীদ পক্ষীয় ৮৮ জন সৈন্য নিহত হয়"। এ মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে আল ফাখরী নামক জনৈক আরব ঐতিহাসকি লিখেছেন,

"This is Catastrophe where of I care not to speak at lenth as it is too grivous and horrible. For, verily it was a catastrophe than which naught more shameful hath happened in Islam"

Al Fakhri, বলেন "ইহা এমন একটি শোচনীয় ঘটনা যার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে আমার মন সরেনা, কেননা ইহা একটি চরম দুঃখদায়ক এবং লোহহর্ষক ব্যাপার। নিশ্চয় ইহা এমন একটি বেদনাকর ঘটনা যার চাইতে অধিক লজ্জাজনক আর কিছু ইসলামে ঘটে নাই।[২৩]

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মস্তক কারবালা থেকে কুফার শাসনকর্তা উবায়দুল্লাহর কাছে হাযির করা হলে তিনি ছিন্ন মস্তকের মুখমন্ডলের উপর একখানা যষ্টি দ্বারা আঘাত করলেন। এ অমানুষিক দৃশ্য অবলোকন করে জনৈক শশ্রুমন্ডিত মুসলমান চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, হায়! এ ওষ্ট দুটির উপর আমি আল্লাহর রাসুলের ওষ্ঠ দুটি স্থাপিত হতে দেখেছি।" অতঃপর উবায়দুল্লাহ হযরত হুসায়সন (রাঃ) এর রুগ্ন ও একমাত্র জীবিত পুত্র আলীর সাথে পরিবারের মেয়েদের পাঠিয়ে দিলেন দামেস্কে খলীফা ইয়াযীদের নিকট। তাঁদের পাহারাদার সৈন্যরা হযরত হুসায়ন (রাঃ) শির বয়ে নিয়ে গেল। শিমার সগর্বে পুরস্কার ও প্রশংসার আশায় শির ইয়াযিদের সামনে স্থাপিত করলে তিনি চমকে উঠলেন। পুরস্কার দূরে থাকুক, তার প্রতি নিদারুন তিরস্কার ও ঘৃণা প্রকাশ করলেন। অসহায় বন্দিনীদের মাতম এবং ক্রন্দনে রাসুল ভক্ত মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করল। তাঁদের শোকময় কান্নায় ইয়াযীদ ভয় পেয়ে গেলেন। জনমত বিস্ফোরণ ঘটার আশঙ্কায় ইবনে যিয়াদের ঘৃণিত কার্যের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য তাকেও কঠোর ভাষায় ভৎর্সনা করলেন এবং তাদেরকে দ্রুত সম্মান জনক ভাবে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) শির তাঁদের হাতে হস্তান্তর করা হয়। তারা তা কারবালায় নিয়ে গিয়ে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শবদেহের সাথে দাফন করেন। অন্য বিবরণে দেখা যায় রাত্রির অন্ধকারে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শির গোপনে দামেস্ক হতে বাইরে প্রেরণ করা হয় এবং সিরিয়ায় উত্তর পুর্বাঞ্চলে আসকালান নামক স্থানে গোর দেয়া হয়।[২৪] এ পর্যন্ত বরকতুল্লাহ সাহেবের লেখার সাথে আরবী গ্রন্থ সমূহের লেখার মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

'মাসিক অগ্রপথিক' এর মহররম সংখ্যা ১৯৯৬ ইং-তে বিভিন্ন আরবী ইতিহাস গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সাথে হযরত হাসান (রাঃ) এর সন্ধি এবং সন্ধি পরবর্তী ঘটনার বাস্তব রূপ তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে হযরত হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কর্তৃক হযরত হাসান (রাঃ) এর সাথে প্রদত্ত সন্ধি শর্ত ভঙ্গ যা কারবালার বেদনা দায়ক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত এবং হাসান (রাঃ) মৃত্যের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। অগ্রপথিকে লিখা হয়েছে, "হজরত আলী (রাঃ) এর শাহাদাতের পর হযরত হাসান কুফার খলীফা নির্বাচিত হন। ঐদিকে সিরিয়ার মুয়াবিয়া নিজেকে সমগ্র মুসলিম জাহানের খলীফা বলে ঘোষণা করলেন। কুফায় অস্থির মতি জনগন আলীর ন্যায় হযরত হাসানের জন্যও বিপর্যকর পরিস্থিতের সৃষ্টি করে। কুফার বিশৃংখলার সুযোগে মুয়াবিয়া ইরাক তথা ইমাম হাসানকে আক্রমন করে বসেন। হাসান বিচক্ষণ সেনাপতি কায়েসকে বহু সৈন্যসহ মুয়াবিয়ার গতিরোধ করতে পাঠালেন এবং স্বয়ং মাদাইন অভিমুখে অগ্রসর হলেন। কিন্তু দুভাগ্য বশত ইরাকী সৈন্যদলের বিশ্বাস ঘাতকতায় হযরত হাসান অত্যন্ত বিব্রত হয়ে কুফার প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি মুয়াবিয়ার সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তার স্বপক্ষে খিলাফতের দাবী পরিত্যাগ করেন।

দায়েরাতুল মারুফ আল ইসলামী গ্রন্থে বলা হয়েছে ৪০ হিজরীর রমযান মাসে ইবনে মুলযিম (খারিজী) আলী (রাঃ) এর কে মরণ আঘাত হানে। এরপর তিনি তিন দিন জীবিত ছিলেন। এ সময় লোকেরা হযরত হাসান (রাঃ) পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ) এর পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে হুকমও দিবনা আবার নিষেধও করব না। হযরত আলী (রাঃ) এর কাফন দাফনের পর কুফার জামে মসজিদে মানুষেরা হযরত হাসান (রাঃ) এর হাতে খিলাফতের বায়আ'ত গ্রহণ করে, (মাসউদীর মতে হযরত আলী (রাঃ) এর ইন্তিকালের দুদিন পর)। বায়আ'ত গ্রহণ কারী লোকের সংখ্যা বিশ হাজারের উপরে ছিল।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

বায়আ'ত গ্রহনের মাত্র চার মাস পরে হযরত হাসান (রাঃ) এর সাথে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সংঘর্ষ বাঁধে। হাসান (রাঃ) ইরাক বাসীদের সাথে নিয়ে এবং মুয়াবিয়া শামবাসীদের সাথে নিয়ে মাসকান নামক স্থানে মুখোমুখি হন। এটা একটা জেলার নাম যা আনবার নামক স্থানের নিকটবর্তী, এটা দজলা থেকে ফুরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে পরবর্তীতে বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জেলাকে দুজাইলও বলা হয়।[২৬] এসময় হযরত হাসান (রাঃ) মনে করলেন দু'পক্ষের সৈন্যগনেরই এমন প্রস্তুতি যে, এক পক্ষ পুরোপুরি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ থামবার নয়। এ জন্য তিনি অযথা রক্তা রক্তির পথ পরিহার করে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন।[২৭] এজন্য তিনি আমর ইবনে সালমা আরহাবীকে মুয়াবিয়ার কাছে পাঠালেন। অপর পক্ষে মুয়াবিয়া আঃ রহমান ইবনে সামরা এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমীরকে হাসান (রাঃ) এর কাছে পাঠালেন। দু'জনই হাসান (রাঃ) এর শর্ত সমূহ মেনে নিলেন, এরপর হাসান (রাঃ) কুফার কসর নামক স্থানে আর মুয়াবিয়া নুখায়লা নামক স্থানে অবস্থান নিলেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনা এই যে, হাসান (রাঃ) এর সৈন্যগণকে মুয়াবিয়ার নিকট পাহাড়ের মত বিশাল ও ভয়ানক মনে হচ্ছিল। তখন আমর ইবনে আস হযরত মুয়াবিয়াকে বললেন, আমর কাছে ঐ সৈন্যগণকে এমন মনে হচেছ যে তারা আপনার সকল সৈন্য কতল না করা পর্যন্ত থামবেনা। তখন মুয়াবিয়া (রাঃ) বললেন, যদি এমনই হয় তাহলে এ সমস্ত লোকের স্ত্রীও সন্তানদের জিম্মাদার কে হবে? আর তখনই তিনি আঃ রহমান বিন সামরা এবং উবাইদুল্লাহ বিন আমিরকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হাসান (রাঃ) এর কাছে প্রেরণ করলেন।

হাসান (রাঃ) সন্ধির এ শর্ত সমূহ দিলেন ঃ

১. শুধু মাত্র হিংসা বিদ্বেষের কারণে কোন ইরাকীকে পাকড়াও করা যাবেনা।

২. সকলকে বিনা শর্তে নিরাপত্তা দিতে হবে।

৩. সুবা-আহওয়াজের সমস্ত রাজস্ব হাসান (রাঃ) এর জন্য নির্ধারন করতে হবে।

৪. আলাদা ভাবে হাসান (রাঃ) এর জন্য বাৎসরিক দু'লক্ষ দিরহাম দিতে হবে।

৫. আনুগত্য দান দক্ষিনার ক্ষেত্রে বনি হাশিম এবং বনি উমাইয়ার উপর প্রাধান্য দিতে হবে।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

মুয়াবিয়া পরবর্তী খলীফা হাসানকে করার প্রস্তাব করে। হাসান (রাঃ) তাঁর প্রস্তাব কে এ বলে প্রত্যাখান করলেন পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত হবে শুরার (পরামর্শের) মাধ্যমে মুয়াবিয়া (রাঃ) একক ভাবে কোন খলীফা নিযুক্ত করতে পারবেননা।[২৯] আখবারুল আতওয়াল গ্রন্থে এটাও বর্ণিত আছে যে, হাসান (রাঃ) এ শর্ত সমূহ আবদুল্লাহ ইবনে আমির এর মারফত পেশ করেন। মুয়াবিয়া সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে তাতে বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের স্বাক্ষর গ্রহণ পূর্বক হাসান (রাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন। ইবনে আসীর এর মতে ঘটনার বিবরণ এরূপ, হাসান (রাঃ) শর্ত নামা-মুয়াবিয়া (রাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, অপরপক্ষে মুয়াবিয়া (রাঃ) সাদা কাগজে সীল লাগায়ে বাহকের কাছে বলে দেন হাসান (রাঃ) যে শর্ত ইচ্ছা লিখে নিতে পারেন, আমি সব মেনে নিব। তারাবীতেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইস্তিয়াবে বর্ণিত আছে হাসান (রাঃ) এর শর্ত সমূহ মুয়াবিয়ার নিকট পৌছলে তিনি সাথে সাথে একথাও বলেন যে, দশ ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দিব না। হাসান (রাঃ) এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি কসম করেছি যে কায়েস ইবন সাদকে হাতের মুঠোয় পেলে তার হাত এবং জিহবা কেটে দিব। তখন হাসান (রাঃ) বললেন, আমি এ অবস্থায় কখনো সন্ধি করবনা। তাই বাধ্য হয়ে ম্যুবিয়া (রাঃ) হাসান (রাঃ) এর শর্ত মেনে নিলেন। মুহাম্মদ বরকত উল্লাহ কারবালা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন-চুক্তি অনুযায়ী মুয়াবিয়া আজিবন খলীফা থাকবেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হযরত হুসায়ন মুয়াবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হবেন, কিন্তু ইতিহাস গবেষণার প্রেক্ষিতে বলা যায় একথাটি ঠিক নয় বরং মুয়াবিয়া তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসেবে হাসান (রাঃ) এর নাম উচ্চারন করলেও তাও তিনি এ বলে অস্বীকার করেন যে, পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত হবে-শুরার (পরামর্শের) ভিত্তিতে। মুয়াবিয়া নিজে কাউকে খলীফা নিযুক্ত করতে পারেন না। মুয়াবিয়া এ শর্ত মেনে নিলেও পরবর্তীতে তিনি এ শর্ত পালন না করে নিজপুত্র ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করেন। মূলত এটাই কারবালার নৃশংস ঘটনার নৃপথ্য কারণ।

সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর কুফায় প্রবেশ করে হাসান (রাঃ) মুয়াবিয়া (রাঃ) এর বায়আ'ত হলেন। এ সময় আমর ইবনে আস মুয়াবিয়াকে বললেন, আমার পরামর্শ হলো আপনি জনসমক্ষে হাসান (রাঃ) কে বায়আতের ব্যাপারে ইলান করতে বলুন যাতে মানুষ এটা বুঝে এবং কোন প্রকার ভুল বুঝাবুঝি না থকে। মুয়াবিয়া (রাঃ) হাসান (রাঃ) এর কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করলে তিনি কুফাবাসীরেদ উদ্দেশ্যে ভাষনে বলেন- "ভাইসব, আল্লাহ তায়ালা আমাদের পূর্ববর্তীদের উসিলায় তোমাদেরকে হেফায়েত দান করেছেন আর পরবর্তীদের উছিলায় তোমাদের খুন খারাবী বন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

করছেন। হে মানুষ! সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে যে মুত্তাকী, আর গন্ডমুর্খ সে যে পাপাচারী। খিলাফতের দায়ীত্ব আমি স্ব-ইচ্ছায় মুয়াবিয়ার প্রতি ন্যস্ত করেছি। বাস্তবে তিনি এর হকদার হয়ে থাকলে তাঁর হক তাঁকে দেয়া হয়েছে, আর আমার হক হয়ে থাকলে মুসলিম উম্মার কল্যাণ, নিরাপত্তা রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে এবং আল্লাহ পাকের রেজামন্দির উদ্দেশ্যে আমার হককে ছেড়ে দিয়েছি।[৩০]

অতঃপর হাসান (রাঃ) ইরাকের মাদাইন মসজিদে ইরাকবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "ভাইসব, তোমরা আমার হাতে এ কথার উপর বায়আ'ত হয়েছিলে যে আমি যার সাথে সন্ধি করব, তোমরাও করবে, আর যার সাথে লড়বো, তোমারাও লড়বে। তোমরাও তাঁর অনুগত হও এবং তাঁর আদেশাবলী মেনে লও, এ উদ্দেশ্যে বনু হাশিমীয়দের সাথেও পরামর্শ জরুরী ছিল, তাই তিনি সবচেয়ে প্রভাবশালী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন জাফর ইবন আবি তালিবের নিকট বললেন, আমি সিদ্ধান্ত করেছি, আমি মদীনায় গিয়ে অবস্থান করব আর খিলাফত মুয়াবিয়াকে দিয়ে দিব। এ জন্য যে ফিতনা অনেক হয়েছে, রক্তপাত ঘটানোর চেয়ে এ পথ বন্ধ হওয়াই বেশী দরকার। তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উম্মতে মুহাম্মদির পক্ষ থেকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর নিকট এ খেয়াল পেশ করলে তিনি বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এরূপ করবেন না। কিন্তু হাসান (রাঃ) তাঁকেও রাজি করালেন। আর এভাবে রাসূল (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হলো যে "আমার এ সন্তান (হাসান) সর্দার হবে আর তার উসিলায় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের নিকট বড় দুটি দলের মধ্যে সন্ধি করাবেন।" এ বছর মুসলমানদের নিকট "আমুল - জামাআত" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারণ মুসলমানগন পার্থক্য ভূলে গিয়ে এ বছর এক জামায়াতে পরিণত হল। সন্ধি করার কারণে কুফাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর প্রতি দোষারোপ করলেও তিনি ধৈর্য ধারন করেন এবং নিজের সিদ্ধান্তের উপর কায়েম থাকেন।[৩১]

সন্ধি স্থাপনের পর হাসান (রাঃ) মদীনাতে চলে গেলে মদীনাবাসী তাদের ধর্মীয় জীবনে তাঁকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করলেন। মুয়াবিয়া এবার সমগ্র মুসলিম জাহানের খলীফা হিসেবে জনসাধারনের স্বীকৃতি লাভ করলেন। তিনি দামেস্ককেই সমগ্র মুসলিম জগতের রাজধানী করলেন। খুলাফায়ে রাশেদুনের আদর্শ হতে বিচ্যুৎ হলেও কঠোর প্রকৃতি আর মুয়াবিয়ার সুদক্ষ পরিচালনায় সুবিস্তৃত রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা ফিরে আসে। সিংহাসন নিষ্কন্টক করবার জন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বিষপ্রয়োগে অথবা গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করতে কুণ্ঠিত হতেননা। হযরত আলী (রাঃ)

Dhaka University Institutional Repository

এর বিখ্যাত সেনাপতি মালিক বিন উসতুরকে তিনি বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন, এবং ইমাম হাসান কে তিনি একই ভাবে পৃথিবী হতে অপসারিত করেন।[৩২] ঐতিহাসিক মাসউদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম হাসানের এক স্ত্রী কর্তৃক তিনি বিষ প্রয়োগে নিহত হন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না বলে নাম বলতে অস্বীকার করেন।[৩৩] বর্তমান শিয়া সম্প্রদায়ের মতে মৃত্যুর কারণ আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়ার ইঙ্গিতে স্বীয় পত্নী জাআদা বিনতে আশআসের মাধ্যমে বিষ প্রয়োগ। কিন্তু এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। মুয়াবিয়া (রাঃ)রবিষ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিলনা। কারণ হাসান (রাঃ) এর খিলাফত ত্যাগ করে দশ বছর অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সাথে এমন কোন তিক্ত সম্পর্ক হয়নি। যার ফলে তিনি এরূপ কাজ করতে পারেন। আসবা এবং আখবার গ্রন্থ মুতাবিক হাসান (রাঃ) এর মৃত্যু বিষের কারণে নয় বরং কোন বিশেষ রোগের কারণে হয়েছে"।[৩৪]

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচিত "কারবালা" গ্রন্থটি কারবালার ঘটনা জানার ক্ষেত্রে অনেকটা সত্যের কাছা কাছি। কিন্তু তাঁর এ গ্রন্থ রচনার মূল উৎস হিসেবে মূলত তিনি সৈয়দ আমীর আলীর A Short History of the Seraccns এবং ঐতিহাসিক অধ্যাপক হিট্টির History of the Arabs. এ ছাড়া আরো কিছু ইংরেজী উর্দু ও বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু মূল আরবী ইতিহাস গ্রন্থ থেকে নিজে কোন তথ্য সংগ্রহ করেন নি, অপর পক্ষে তাঁর বর্ণনায় ঘটনার সময় উপস্থিত কোন ব্যক্তির উক্তিও উপস্থাপিত হয়নি। তাছাড়া তাঁর বর্ণনায় গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ প্রমান পত্র পেশ করা হয়নি। তাই তার গ্রন্থ খানা যদিও অনেকটা গবেষণা মূলক এবং অনেক পরিশ্রমের ফসল এবং এযাবৎ কালের যতগুলো কারবালার ঘটনা কেন্দ্রিক বই প্রকাশিত হয়েছে সে সবের মধ্যে বেশী গ্রহণ যোগ্য হলেও সত্যিকার ভাবে তিনি সত্যে উপনীত হতে তিনি পারেন নি। তার গ্রন্থ সম্পর্কে তৎকালিন সুধী সমাজে অনেক উচ্চ প্রশংসা মূলক বক্তব্য পত্র পত্রিকার প্রকাশিতে হয়েছিল। বরকতুল্লাহ সাহেব নিজেও দাবী করেছেন-তিনি পক্ষপাতে শুন্য গবেষণার মাধ্যমে সত্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। আর এ শ্রম সাধ্য কাজ করতে তার পনেরো বৎসর সময় লেগেছিল কিন্তু দুঃকের বিষয় তার এ গবেষণাও ভাবাবেগ বিবর্জিত হয়নি। অপর পক্ষে সৈয়দ আমীর আলীর A short History of the Seracens এর উপর বেশী নির্ভর করার কারনে তার গবেষণায় ইয়াযীদের উপর বেশী দোষারোপ এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষ বলম্বন পরিলক্ষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁর গ্রন্থের নাম দেন "কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত" এটা তাঁর তৃতীয় সংস্করন। তিনি দাবী করেছেন এটি একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। কিচ্ছা থেকে ইতিহাসকে পৃথক করার উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থটি রচিত। কারবালার বিষাদময় ইতিহাসের ভিত্তিতে আমাদের দেশে সেই মধ্যযুগ থেকেই অসংখ্য কিচ্ছ কাহিনী রচিত হয়েছে। তিনি বলেন এসব রচনায় যতটা ভাবাবেগ ও মানবিক সংবেদনার প্রকাশ ঘটেছে, ইতিহাসের দিকে ততটা খেয়াল রাখা হয়নি। এমনকি উবিংশ শতকে মীর মশাররফ হোসেন রচিত সুবিখ্যাত ও অতি জনপ্রিয় বিষাদসিন্ধু গ্রন্থও গতানুগতিক ধারার অনুসরনে রচিত। সেদিক থেকে বরকতুল্লাহর গ্রন্থটি কিছুটা ব্যাতিক্রম। লেখক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেনঃ

"কারবালার কাহিনী সম্পর্কে একটা কথা উল্লেক না করিয়া পারা যায় না। কারবালার যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিকে ঘটনা। কিন্তু ভক্তদের লিখনিতে উহার অনেক অতিরঞ্জন ঘটিয়াছে দীর্ঘ তেরশত বছর ধরিয়া করি সাহিত্যিকরা উহার উপর তুলিকা চালইতে চালাইতে উহাকে উপকথার পর্যায়ে দাঁড় করাইয়াছেন। নানা কাল্পনিক গল্পের অবতারনা দ্বারা মূল কাহিনীকে যথা সাধ্য মর্মস্পর্শী করার চেষ্টা চলিয়াছে। নারী ঘটিত প্রণয় কাহিনীও উহাতে সংযোজিত হইয়াছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে আব্দুল জব্বার ও তৎপত্নী য়য়নাব সংক্রান্ত কাহিনী নিতান্তই কাল্পনিক। মুহম্মদ হানাফিয়ার যুদ্ধে গমন ও ইয়াযীদের পশ্চাদ্ধাবন ইত্যাদি কিচ্ছারও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। হযরত হুসায়েনের কুফা গমনের পূর্বে মুসলিম বিন আকিল কুফায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, গোপনীয় দৌত্য কার্যে সেক্ষেত্রে মুসলিমের দুইটি নাবালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া অস্বাভাবিক। অথচ তাঁহার দুই সুকুমার পুত্রের নিষ্ঠুর হত্যার এক করুন চিত্র সযত্নে অংকিত করা হইয়াছে পাঠকদের চক্ষুতে অশ্রু আনয়নের জন্য। এই ধরনের বাহু অমূলক কিচ্ছা মূল ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ফলে এখন আসল নকল পৃথক করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য মূল ইতিহাস হইতে মাল মসলা সংগ্রহ করিতে আমাকে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে"।

গ্রন্থের প্রথম দিকে লেখকের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা অতঃপর কারবালা যুদ্ধের পটভূমিকা, পূর্ব ইতিহাস ও খোলাফায়ে রাশেদুনের আমল, এসব শিরোনামে লেখক ইমাম বংশ ও কারবালার যুদ্ধের পট ভূমি তথ্য ও ইতিহাস নির্ভর (মূল তথা আরবী ইতিহাস গ্রন্থ বাদে) আলোচনার পর মোট ১৭টি অধ্যায়ে কারবালা যুদ্ধের বিশাদ বর্ণনা ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সত্যনিষ্ট ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। লেখক এখানে নির্লিপ্ত থাকার সাধনা করেছেন। কিন্তু ভক্তের আবেগ

Dhaka University Institutional Repository

উচ্ছলতা মাঝে মধ্যে তাঁর বর্ণনাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর করে তুলেছে। কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

"পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসে কারবালার যুদ্ধ একটি সামান্য ঘটনা। কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে উহার গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। উহা শুধু মদীনা মক্কা ও কুফায় বিপ্লব আনে নাই। দামেস্কের উমাইয়া রাজবংশের পতনেরও উহার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়া ছিল। --------------------------

আব্বাসীয় বংশের শাসন আমলেও ইমাম বংশের উপর কম অত্যাচার সাধিত হয় নাই। ইমাম হাসানের প্রপৌত্র ইমাম মুহাম্মদ (নাফসে জাকিয়া) ও ইব্রাহীমের নিধন, হুসায়েন বংশীয় ইমাম মুস্যা আল কাযিম এবং তার বংশধরকে মদীনা হইতে নির্বাসন ও বন্দি শিবিরে তাহাদের প্রাণ ত্যাগ ইত্যাদি বহু শোকবাহ ঘটনা কারবালার বিষাদময় কাহিনীর সহিত এক সূত্রে গাঁথা। এই সব কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনি করুন"।[৩৫] এজন্য কারবালা কাহিনীর সাথে এ সব ঘটনার বিবৃতিও তিনি সংযোজন করেছেন। মহানবীর ও ফাতের পরবর্তী "দ্বাদশ ইমামের" কথাও তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করছেন। "দুই শতাব্দীরও অধিক কাল দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার পর ইমাম বংশ কিভাবে আব্বাসীয় খলীফাদের সর্তক দৃষ্টি সত্ত্বেও ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে এবং পরিশেষে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয় সম্রাজ্য ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়, সেই বিস্ময়কর কাহিনীর বিবৃতির দ্বারা তিনি গ্রন্থের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। উপসংহারে আব্বাসীয় শাসনের কিতাবে অবসান হয় এবং বিভিন্ন যুগে খিলাফত কিভাবে এক বংশ হইতে অন্য বংশে হস্তান্তরিত হয় তার একটি ধারাবাহিক বিবরণীও তিনি তুলে ধরেছেন। 'কারবালা গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখক তাঁর ভূমিকায় মোটামুটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। লেখক অত্যন্ত নিষ্টার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম সহকারে ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যও উপাও সংগ্রহ করে গ্রন্থের কাহিনী পরস্পর সাজিয়েছেন। শুধু কারবালার বিষাদময় ঘটনার বিবরন প্রদানই লেখকের উদ্দেশ্য নয়, কারবালার পটভূমি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চরিত্র ঘটনার প্রতিক্রিয়া, পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনাবলী, এমনকি এর পরবর্তীতে দু'শো বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাস অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক নির্লিপ্ততার সাথে তিনি বিবৃত করেছেন। তাঁর ভাষা ও বর্ণনার মাধূর্য সবকিছু মিলিয়ে গ্রন্থটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এর উপর যে আলোচনা সমালোচন প্রকাশিত হয় তা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে দু একটি উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

"যে বয়সে অন্য মানুষ বিশ্রাম ও নৈরাগ্যের কথা ভাবে, অর্জিত সিদ্ধি ও যশের মূলধনেই জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দিতে চায়, সেই বয়সে জনাব বরকতুল্লার এই অভিযান দুর্সাহসিক. এতে কোন সন্দেহ নেই। উল্লেখিত কারবালা গন্থে মননশীল লেখক কল্পনার প্রলেপে রহস্যময় কারবালার যুদ্ধ ও নবীর বংশের ইতিবৃত্তের সঠিক সত্য ও তথ্য নিরূপনে সচেষ্ট হয়েছেন এবং এতে সাফল্য লাভ করেছেন বলেই আমার বিশ্বাস।-------------------------এ ব্যাপারে তিনি সৈয়দ আমীর আলী, অধ্যাপক হিট্রি; অথ্যাপক এস, খোদাবক্স, স্যার উইলিয়াম মুর, নিকলসন, খাজা হাসান নেজামী, অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইসহাক প্রমুখের ইংরেজী, উর্দু ও বাংলা 'ইসলামের ইতিহাস' পর্যালোচনায় এর মধ্য থেকে কল্পনা বিবর্জিত ভাবে সঠিক ঘটনাকে তুলে ধরেছেন।

"জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ সুবিখ্যাত দার্শনিক লেখক। তাঁর সারা জীবনের সাহিত্য সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য হইল সত্য নিষ্টা ভাবের গভীরতা আর ভাষার ওর্জস্বিতা। উল্লেখিত গ্রন্থের [illegible] নিপুন বিশ্লেষনী শক্তি তার স্বকীয়তাকেই প্রমান করেছে"। তোফাজ্জল হোসেন/দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা আগস্ট, ১৯৫৮।

"মোসলেম ইতিহাসের করুনতম কাহিনী কারবালায় ইমাম হোসাইনের শাহাদৎ বরনের সত্য ঐতিহাসিক বিবরন আলোচ্য 'কারবারা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে কারবালার করুন কাহিনী অবলম্বনে এ যাবৎ যত বই প্রকাশিত হইয়াছে, সে সবের একখানাতেও সম্ভবত আলোচ্য বইয়ের মতো সত্য ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশের চেষ্টা হয় নাই। "কারবালা এদিক দিয়া ব্যতিক্রম এবং একক। -----------শুধু কারবালা কাহিনী নয়, এ কাহিনীর সাথে সে সময়কার আরবের ইতিহাসও ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। হাশেমী ও উমাইয়া গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিহিংসা এর প্রাথমিক ইতিহাস কারবালয় এই শোচনীয়তম পরিনতি এসব সুন্দর সাবলীল, ভাষায় এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ---------------বিষয়বস্তু যেমন শোকাবহ, লেখকের ভাষাও তেমনি বলিষ্ট ও সাবলীল ফলে 'কারবালা' পড়িতে উপাখ্যানের মতোই পাঠককে টানিয়া লইয়া যায়। লেখক বইয়ের পরিশিষ্টে কারবালার ঘটননার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে মি. খোদাবক্স ও মিঃ মুইরের দুইটি দীর্ঘ মন্তব্য উদ্বৃত করিয়্যাছেন। ইহাতে বইয়ের মুল্য বাড়িয়াছে"। নূরী / দৈনিক আজাদ, ২৭ জুলাই, ১৯৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

কারবালা প্রান্তরের শোচনীয় ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের এক 'বিষাদময় অধ্যায়"। কারবালার সেই বিষাদময় কাহিনী নিয়ে বাংলাদেশেও অসংখ্য গান গল্পের অভাব নেই। একদিকে যেমন মোক্তার হোসেন, জঙ্গনামা প্রভৃতি মহাকাব্য, খন্ডকাব্য পর্যায়ের বহু পুঁথি কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি 'বিষাদসিন্ধুর' মতো বৃহৎ কাব্যোপন্যাসেরও জন্ম নিয়েছে। ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সাহিত্যিক তথ্যের সংমিশ্র নেই কারবালা কাহিনীকে ভিত্তি করে বাংলাদেশে এক বৃহৎ সাহিত্য গড়ে উঠেছে।----------------আলোচ্য কারবালা গ্রন্থে লেখক ঐতিহাসিক ও গবেষকের দৃষ্টিতে ইসলামের ইতিহাসের সেই বিষাদময় অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন। বরকতুল্লাহ সাহেবের সমগ্র সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রতি তাকালে দেখা যায় তার পিছনে একটি দীর্ঘ অধ্যয়ন ও নীরব সাধনা রয়েছে। তাঁর বিদগ্ধতা, দার্শনিকতা গভীর জ্ঞান সাধনা, ভাষার শানিত দীপ্তি এবং সর্বোপরি তাঁর মনীষী দৃপ্ত প্রতিভার স্পর্শ পাঠক শ্রেনীকে মুগ্ধ করে। আর তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাধানার তুলনায় তা কত অকিঞ্চিৎকর, তবে এ অল্প কটি গ্রন্থ থেকেই সাহিত্যিক পরিমাপ এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন নির্ধারন করতে অসুবিধা হয় না।" আল ইসলাহ, পৌষ চৈত্র ১৩৬৪। "জনাব বরকতুল্লাহ সাহেব চাকুরি জীবনে ন্যায়নিষ্ঠ ও সুবিচারকের খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁর এই নতুন "কারবালা" পুস্তকে ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্বলিত খিলাফত লাভের দ্বন্দ্ব ও কোন্দলের এবং ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের যে সত্যিকার ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ ঐতিহাসিক ও প্রামান্য আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। ------------। আব্দুস সালাম/দৈনিক পুর্ব পাকিস্তান, ১৬ই জুলাই, ১৯৫৮।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন এবং তৎকালিন "মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি তার সাথে জড়িত ছিলেন। গদ্য শিল্পের যাদুকর ছিলেন। তাঁর লিখনি শক্তি ছিল প্রবল। আজীবন জ্ঞানের সাধক ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি কারবালার ঘটনার বস্তুনিষ্ট ও ঐতিহাসিক প্রমান উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় পরিশ্রম করেছেন- কিন্তু তার পরিশ্রম তখনই পূর্ন রুপে সার্থকতা লাভ করত যদি তিনি কারবালার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যে সময়ে যে পরিবেশে এবং যে ভাষাভাষী লোকদের মাঝে তাদের লিখিত কোন গবেষণা লব্ধ ইতিহাস গ্রন্থ এবং প্রমান পুস্তক থেকে। বস্তু নিষ্ঠ আলোচনা করতেন। বরকতুল্লাহ সাহেব এ দিকটা পুরো পুরি উপেক্ষা করেছেন বরং তিনি পরবর্তী কালের সেকেন্ডারী বই পুস্তকের সাহায্যে তার লিখার কাজ শুরু করেছিলেন- যে সমস্ত গ্রন্থ সমূহে ঘটনা কালীন সময়ে, উপস্থিত কোন ব্যক্তির বর্ণনা উপস্থাপন করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। বিশেষ করে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর বিভিন্ন ভাষণ এবং উপদেশাবলী হুবহু উপস্থাপন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আরো যে সমস্ত বাংলা সাহিত্যে কারবালা ঘটনার ব্যবহার হয়েছে তন্মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলো অন্যতম ঃ

১. ডঃ গোলাম সাকলায়েন রচিত 'বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য' এটা সাকলায়েন সাহেবের পি.এইচ.ডি গবেষণার অভিসন্দর্ভ। এতে বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ করে কারবালার ঘটনার উপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্যের ব্যাপক তথ্য উদঘাটন।

২. শাহ মোহাম্মদ গরীবুল্লাহর 'জঙ্গনাম'। এটা ফারসী গ্রন্থ মোক্তাল হুসায়ন থেকে অনুদিত। বাংলায় অনুবাদ করেন মুহাম্মদ আঃ জলিল। এতে মূলতঃ শিয়া দর্শনই ফুটে উঠেছে।

৩. আব্দুল গফুর সিদ্দিকির 'জঙ্গানামা'। এটা মূলতঃ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।

৪. 'মহানবী (সঃ) ও তাঁর আহলে বায়েত'। সংকলন করেন মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ। এতে সংক্ষিপ্ত আকারে কারবালার কাহিনীই শুধু বর্ণিত হয়েছে।

৫. 'শহীদে কারবালা ও ইমাম হাসান ও হোসাইন' লিখেন মাওলানা এক.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী তিনি এটা সংক্ষেপে মুল ঘটনার সাথে সংগতি রেখে লেখার চেষ্টা করেছেন।

৬. 'আশুরা সংস্কৃতির লালন ভূমিতে' রচনা করেছেন আব্দুল মুকীত চৌধুরী। এতে কারবালার ঘটনা সম্পর্কে কিছু আলোক পাত করা হয়েছে মাত্র।

৭. স্যার সৈয়দ আলীর 'A Short History of the Saracens' গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন হাবীব আহসান। এ গ্রন্থে সৈয়দ আমীর আলীর, শিয়া দর্শনই পরিস্ফুট হয়েছে মাত্র, যদিও তা মূল ঘটনার সাথে সংঘাত পূর্ন নয়। কিন্তু এতে তিনি হুসায়ন (রাঃ) এর পক্ষে বলতে গিয়ে অতিশয়োক্তি করেছেন এবং ইয়াযীদ পক্ষের প্রতি দোষারোপের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

৮. 'আশুরা সংকলন' এতে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর আন্দোলনের দর্শন ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লিখেছেন আশুরা উদযাপন কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

৯. 'ফুরাত কুলে ইমাম হোসাইন' লিখেছেন মাওলানা মোঃ ছামির উদ্দীন গাজী পুরী। এটা অনেকটা মর্সিয়া সাহিত্যের রসে সিক্ত। তবে মুল ঘটনার সাথে মিল রাখার যথেষ্ট চেষ্টা তাতে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১০. 'নবী বংশ পরিচিতি ও মহান কুরবানী' সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক আল হুসাইনী এটা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেছেন। এতে নবী বংশ তথা আহলে বায়েতের পরিচয় এবং কারবালার ঘটনার সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখেছেন।

১১. 'কারবালা থোকে বালাকোট' মুল লেখক মোহাম্মদ সোলায়মান ফররুখ আবাদী। অনুবাদ করেছেন আব্দুল কাদের। কারবালার ঘটনার সময় থেকে বালাকোটের যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন ঘটনার ঐতিহাসিক বিবরণ দেয়া হয়েছে।

১২. 'ইমাম হোসাইন (রাঃ) কাল জয়ী বিপ্লব' লিখেছেন আঃ কুদ্দুস, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তজা মোতাহারী সংকলনে। এতে হুসায়ন (রাঃ) এর ইসলামী আদর্শের বিপ্লবী দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ঢাকা কেন্দ্রের বিশেষ প্রকাশনা "মহররমের শিক্ষা ও তাৎপর্য"।

তবে একথা সর্বজন স্বীকৃত যে কোন গবেষণা কর্ম আর গ্রন্থ সংকলন এক কথা নয়। আবার উদ্দেশ্যের ভিন্নতায় তা বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করে কিন্তু মূল ঘটনার কারন বিশ্লেষনের প্রচেষ্টা ও সে লক্ষ্য নিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে কাজ না করলে প্রকৃত কারন জানা সম্ভব হয় না।

তাই এ ক্ষেত্রে সার্থক গবেষণায় উপনীত হতে হলে তৎকালীন আরবী ভাষার প্রমান্য ইতিহাস গ্রন্থ ও প্রামান্য পুস্তকের সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন। যা ইতি পূর্বে করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আহলে বায়েতের সাজরা শরীফ

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইবনে আব্দুল্লাহ

১. হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে মুহাম্মাদ (সঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) ইবনে আবিতালেব

২. হযরত হাসান (রাঃ) ইবনে আলী (রাঃ)

৩. হযরত হুসায়ন(রাঃ) ইবনে আলী (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মেঝনাতী এবং কারবালার প্রধান আকর্ষন

৪. আব্বাস ইবনে আলী। হুসায়ন (রাঃ) এর বৈমাত্রেয় ভাই, হুসায়নী বাহিনীর পতাকাবাহী এবং বাচ্চাদের দেখা শুনাকারী

৫. আলী আকবর। হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর মেঝ ছেলে, যার বয়স ছিল আনুমানিক ১৮ বৎসর যার চেহারাও আকৃতি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মত ছিল।

৬. আলী আসগর। হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর ছোট ছেলে। যার বয়স কারবালার ঘটনার সময় ৬ মাস থেকে দেড় বছরের মধ্যে ছিল। যিনি হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর কোলে থাকা অবস্থায় শত্রুদের তীরে শাহাদত প্রাপ্ত হন।

৭. কাসিম ইবনে হাসান। হযরত হাসান (রাঃ) এর বড় ছেলে, হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর ভাতিজা।

৮ ও ৯. আওন এবং মুহাম্মদ! হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর বোন হযরত যয়নব (রাঃ) নয় বছর বয়সের জমজ পুত্রদ্বয়। যারা আশুরার দিন মামার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন।

১০. ইমাম যয়নুল আবেদীন। যাকে অতি মহিমান্বিত, ইবাদত ও জার এবং কারবালার পীড়িত উপাধিতে সম্বোধন করা হয়। হযরত হুসায়ন(রাঃ) বড় ছেলে, ৪র্থ ইমাম, যিনি কারবালার ঘটনার সময় মারাত্মক রোগে অসুস্থ ছিলেন, এজন্য তিনি আশুরার দিনে যুদ্ধ ময়দানে যেতে পারেন নি। আর এ ভবেই তিনি শত্রুর কয়েদখানার বন্দি হন।

১১. হযরত যয়নব (রাঃ) যিনি কারবালার ঘটনার সময় মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১২. উম্মে কুলসুম হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর ছোট বোন। তার কোন সন্তানাদি ছিল না। যিনি হযরত হুসায়ন(রাঃ)কে সফলতার দিকে নিতে সদা সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁবুর রক্ষণা বেক্ষণে সব সময় নিয়োজিত ছিলেন।

১৩. ফাতেমা কুবরা। হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর বড় (সাহেব জাদী) মেয়ে।

১৪. ফাতেমা সুগরা, হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর মেঝ মেয়ে। যিনি অসুস্থতার কারনে মদীনায় থাকতে বাধ্য হন।

১৫. সকিনা। হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর ৪ বছর বয়সের মেয়ে।

১৬. শহরবানু তিনি ইরান বাদশার মেয়ে ছিলেন। ইরান বিজয়ের পর যাঁকে মদীনায় আনা হয়। হযরত আলী (রাঃ) হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর সাথে তার বিবাহ দেন।[৩৬]

উম্মূল বানীন (হযরত আব্বাস রা এর মাতা) এবং আব্বাস (রাঃ) এর স্ত্রী ঃ- দুনিয়া জুড়া সৎমা সৎভাই ভাবীদের বদনাম রয়েছে, ভারত বর্ষে এ কথার প্রচলন আরো বেশী। এমন কি সৎ সম্পর্কের কথা আসলেই শত্রুতার কথা সাথে সাথে স্মরণে আসে। কিন্তু এখানে ঘটনাটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সৎমা সৎ ভাবী কিভাবে কিভাবে সৎ ছেলে সৎ ভাসুর এর জন্য নিজেদের সন্তান, স্বামীদের উৎসর্গ করলেন, দুনিয়ার মানুষ তা কারবালার ঘটনায় তাদের কুরবানীর মাধ্যমে জানতে পেরেছে।

কারবালায় হযরত উম্মুল বানীন (রাঃ) এর চার ছেলে শাহাদত প্রাপ্ত হন। তাদের মধ্যে বড় ছিলেন হযরত আব্বাস (রাঃ)। তাঁর ছেলে মেয়েরাও তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর আলী (রাঃ) উম্মুল বানীন (রাঃ) কে বিবাহ করেন। উম্মুল বানীন এর অর্থ হলো পুত্রদের মা। হযরত আব্বাস (রাঃ) এর পরে তাঁর গর্ভে আরো তিনটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তাঁকে এ বিশেষ নামে সম্বোধন করা হয়। উম্মুল বানীন এর গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক ইয়াযীদের বাহিনীতে ছিল। তাঁরা হযরত আব্বাস (রাঃ) কে তাদের দলে ভিড়ানোর জন্য চেষ্টিত ছিল। তারা বললো যদি আপনি হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর দল ত্যাগ করে আমাদের দলে আসেন তাহলে আপনাকে সিপাহসালার করা হবেই। কিন্তু আব্বাস (রাঃ) এ স্ত্রীর জয্বা এমন পর্যায়ে ছিল যে তিনি তাদের এ কথায় কর্ণপাত করতে বারন করে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে নিজের প্রিয়তমের জীবন উৎসর্গ করাতে উদ্বুদ্ধ করেন। এসময় হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর বাহিনীতে পতাকা বাহী আব্বাস আলী আকবর এবং হযরত হুসায়ন(রাঃ) ছাড়া কোন পুরুষ সক্ষম সদস্য জীবিত ছিলেন না।

Dhaka University Institutional Repository

কারবালার শোক গাথা কিতাব সমূহে হযরত আব্বাস (রাঃ) এর মাতা উম্মুল বানীন এর মান কদাচিৎ পরিলক্ষিত হলেও মূলতঃ তিনি এমন এক মহৎ হৃদয় মা ছিলেন যিনি নারী জাতির এক মহান আদর্শ স্থাপন করেছেন, তাঁর হৃদয় এতই প্রশস্থ ছিল যে, সৎ পুত্রের কল্যানের জন্য নিজের পুত্রকে সন্তুষ্ট চিত্তে উৎসর্গ করেন। এবং নিজের ইমান ও আকীদায় দুনিয়ার সবচেয়ে মহব্বতের বস্তু নিজ সন্তানের মায়া ত্যাগ করেন এবং যুদ্ধ করতে সন্তান কে উৎসাহিত করেন।

শুধু তিনি তার পুত্র বধু আব্বাস (রাঃ) এর স্ত্রী কোন কোন বর্ণনায় যার নাম জাকিয়া উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু জাওজায়ে আব্বাস হিসেবে সমাধিক পরিচিত তিনিও স্বামীকে উৎসর্গ করে মহত্তের পরিচয় দেন। এবং ইমান ও আকীদার জন্য নিজের হাদী হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর জন্য যুদ্ধ করার জন্য প্রিয় স্বামীকে উৎসাহ দেন।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

শ্বাশুড়ী ও পুত্র বধু উম্মে ফারাহ এবং ফাতেমায়ে কুবরা

এক বর্ণনায় পাওয়া যায় আশুরার রাত্রে হযরত হুসায়ন(রাঃ) এর কন্যা ফাতেমায়ে কুবরার সাথে হযরত হাসান (রাঃ) এর বড় পুত্র কাসেমের বিবাহ হয়। এজন্য যে, হযরত হাসান (রাঃ) অসিয়ত করেছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টি কোন থেকে এ বর্ণনায় সত্যতার ব্যাপারে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক বর্ণনায় এর যথার্থতা স্বীকার করা হয় কিন্তু অন্যসব বর্ণনায় এটাকে নিছক কাল্পনিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিবাহ হওয়া সম্পর্কিত ব্যাপারে বিশিষ্ট এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ আলোচনা ও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারত বর্ষে শীয়াগণ ছাড়াও সকল মুসলমান এমনকি হিন্দুদের মধ্যেও মহররম পালনের ক্ষেত্রে কাসেমের আত্ব-ত্যাগের কথা বিশেষ ভাবে সাড়া জাগায়।

মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁর কারবালা গ্রন্থে লিখেছেনঃ- "অতঃপর ইমাম বংশের কিশোর ও যুবকগণ ব্যতীত যুদ্ধে যাইবার আর কেহ অবশিষ্ট ছিলনা। ইমামের ইচ্ছা ছিলনা যে, বংশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল এই সন্তানেরা যুদ্ধে গিয়া প্রাণ হারায়। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র মহাবীর কাসিম তাঁহার এই সংকল্প ব্যর্থ করিয়া দিল। কুড়ি বাইশ বছরের এই যুবক রণ সাজে সজ্জিত অবস্থায় চাচার নিকট আসিয়া দাড়াইল যুদ্ধ গমনে তাঁহার অনুমতির জন্য। অল্প দিন আগে মদীনায় কাসেমের বিবাহ হইয়াছিল হুসায়নের পরমা সুন্দরী নাবালিকা কন্যা সুকায়নার সহিত। মৃত্যু কালে হাসান এই বিবাহরে জন্য আকাংখা প্রকাশ করিয়া যান। হোসায়েন দেশ ত্যাগের পূর্বে মৃত ভ্রাতার সেই আকাংখা পূরণ করেন। তখন কে মনে করিয়াছিল যে, এই দম্পতির অভিশপ্ত জীবনে বিধাতা দাম্পত্য সুখ মঞ্জুর করেন নাই। সুকায়না (সকিনা) ছিল শিক্ষিতা এবং সুকবি। মদনির বীর শ্রেষ্ট কাসেমকে স্বামীরূপে পাইয়া সে নিজেকে ধন্য মনে করিয়া ছিল। শাজেদা কাসেমের দীর্ঘ তনু প্রশস্ত ললাট উন্নত নাসা ও বিশাল বক্ষ যুবক সমাজে তাঁহাকে অবশ্য লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছিল। কত রমনীই না এই সৌম্য দর্শন যুবকের বাহু পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য কামনা করিয়া ছিল। বিরহ-শর-বিদ্ধা সেই সকল বিহঙ্গিনীর বঞ্চিত হৃদয়ের তপ্তস্বাস সুকায়নার কপাল পোড়াইয়া দিয়াছিল। কাসেমকে যুদ্ধে যাইতে হুসায়েন কত বারন করিলেন, যাও বাবা, আগে তোমার দুঃখিনী মাতার অনুমতি লইয়া আইস, সে অনুমতি আগেই লওয়া ছিল। কিন্তু মাতার পাশেই ছিল সুকায়না। চাচার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া কাসেম খীমার ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং মায়ের কদম বুছি করিলেন। আরব রমনীরা বংশানুক্রমে

Dhaka University Institutional Repository

বীর জায়া ও বীর জননী। মাতা কিছু মাত্র দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। মমতায় তাঁহার আঁখিরপাতা ভিজিয়া উঠিল। তিনি হৃদয় দৃঢ় করিলেন এবং পুত্রের মস্তকে হাত রাখিয়া তাঁহার স্নেহ স্পর্শ বুলাইলেন। মায়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অভাগিনী সুকায়না অপলক নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া ছিল। এ জীবনের মত সে প্রিয়তমকে দেখিয়া লইতে ছিল। শুষ্ক পদ্মের মত তাহার কচি-মুখ মুষড়াইয়া গিয়াছিল। ছল আঁখির সজল পল্লব তাহার অশ্রু ধারকে রুখিয়া দিয়াছিল, পাছে পিশাচ মরুর তপ্ত শ্বাস সে পবিত্র বারি শুষিয়া লয়। সুকায়নার বুক ফাটা ক্রন্দন ভাষাহারা মৌনীতে তাহার চোখের তারকায় আত্ম গোপন করিয়াছিল। স্বামী-স্ত্রী দৃষ্টি বিনিময়ে সেই রুদ্ধ আবেগ পরম করুনায় ছলমল করিয়া উঠিল। তাহাদের চোখের তারায় তারায় কি কথা হইল শুধু তাহারাই জানিল, আর জানিয়াছিল হয়তঃ তাহাদের অন্তর্য্যামী। কাশেম যেন সম্বিত হারাইলেন। কিন্তু সে নিমিষের জন্য। তারপর স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া দীর্ণ প্রাণ কাশেম তাহার শেষ আশীষ ও প্রণয় পরশ জানাইয়া দ্রুত বেগে শিবির হইতে নিষক্রান্ত হইলেন; পাছে না দুনিয়ার মায়া তাহার মরণ কামী চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া বসে। কাসেম বিদায় লইল; ইহ জীবনের জন্য সে বিদায় লইল। খীমার ক্ষুব্ধ বাতাস তার মুখে অর্দ্ধ স্ফুট বিদায় বানী কুড়াইয়া আনিয়া নিস্পন্দ সুকায়নার কানে দিল, চিন্তা কি সুকায়না আবার দেখা হবে; সে মিলনের পর আর বিচ্ছেদ নাই বিরহও নাই"।[৩৮]

কিন্তু সালেহা আবিদ হুসাইন তাঁর খাওয়াতীনে কারবালা গ্রন্থে সুকায়নার স্থলে হুসায়ন (রাঃ) এর বড় কন্যা ফাতিমা কুবরার সাথে বিবাহ হয়েছিল বলে লিখেছেন। আর গবেষণায় ফাতিমার সাথে বিবাহ হওয়াকেই প্রমান করা যায়। কারন বড় কন্যা ঘরে থাকতে ছোট কন্যা বিয়ে দেয়ার কোন যুক্তি নেই। অপর পক্ষে সুকায়নার তখন বয়স ছিল মাত্র ৪ বছর। এত অল্প বয়সে স্বামী বিরহের দুঃখ যাতনা তাকে কাতর করতে পারে না। মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থে বলা হয়েছে এ বিবাহ হয়েছিল আশুরার রাতে। এ কথাও মেনে নেয়া যায় না। বরং হুসায়ন (রাঃ) মদীনা থেকে রওনা হওয়ার পূর্বেই বড় ভাই হাসান (রাঃ) অছিয়ত পালন করার জন্য তাদের দু'জনের বিয়ে দিয়েছিলেন।

হাসান (রাঃ) এর স্ত্রী কাসেমের মাতা উম্মে ফারাওয়াহ এর ত্যাগও সামান্য নয়। কারণ উম্মে ফারাওয়াহ অল্প বয়সেই বিধবা হন। সে সময় তার এ বাচ্চা খুবই ছোট ছিল, তিনি একাই তাকে আদর যত্ন দিয়ে বড় করে তুলেন, তাই কাসেমের প্রতি তার মহববত ছিল অত্যাধিক। কিন্তু আশুরার দিন আহলে বায়েতের মহিলাগন ত্যাগের যে নমুনা পেশ করেন। তিনি তাদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

না। তিনি তার দুই পুত্রকে নিজের দেবর হাদী এবং ইমাম এর জন্য উৎসর্গ করেন।[৩৯] নিজের নব পুত্র বধুর শোকও তার নিকট কঠিন ভাবে আঘাত করল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তার কঠিন ও মহান সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা হলো না।

ফাতিমা সুগরা

কারবালার ইতিহাসে হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর তিন কন্যার বর্ণনা পাওয়া। বড় ফাতিমা কুবরা, মেঝ ফাতিমা সুগরা, আর সব চেয়ে ছোট মেয়ে সকিনার কথা।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) মদীনা থেকে কারবালার এ সফরে আসার সময় তাঁর এ মেঝ মেয়ে ফাতিমা সুগরা খুবই অসুস্থ ছিল। এ জন্য বাধ্য হয়েই তাকে ঘরে রেখে আসতে হয়। মহিয়সী মহিলাদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) মাতা উম্মুল বানীন এবং উম্মল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)র তত্ত্বাবধানে থাকল। কারবালার ঘটনায় হুসায়ন (রাঃ) এর বড় কন্যা বিধবা হন। ছোট কন্যা ইয়াতিম হয়ে পড়ে। আর মেঝ কন্যা পিতা মাতার বিরহ ব্যাথায় কাতর হয়ে পড়ে।

পীড়িত অবস্থায় পিতা, মাতার স্নেহের চেয়ে আর কি আকাংখার বস্ত হতে পারে? অপর পক্ষে হুসায়ন (রাঃ) তাঁর এ মেঝ মেয়েকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন তাই এ অবস্থায় তাকে ছেড়ে যাওয়া। তাঁর জন্য বড়ই কষ্টের কারণ ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্য সকল আবেগ ও স্নেহ ভালোবাসার উপর বিজয়ী হলো।

মদীনা থেকে মক্কা এবং সেখান থেকে কুফার পথে রওয়ানা হয়ে রাস্তায় হুসায়ন (রাঃ) ইয়াযীদী সৈন্যের মুখামুখী হলেন। কারবালার হক ও বাতিলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। হুসায়ন (রাঃ) আশুরার দিন বাহাত্তর জন সংগী সাথী সহ শাহাদাত প্রাপ্ত হলেন। আহলে বায়েতকে ইয়াযীদী সৈন্যরা কয়েদ করে কুফা হতে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল, কিন্তু পীড়িত ফাতেমা সুগরা এ সকল ঘটনা থেকে গাফেল থাকলো। এদিকে তাদের অনুপস্থিতি তার রোগকে আরো জটিল ও দুর্বল করে ফেলে। পিতার স্মৃতি ভাই বোনদের ত্যাগ, মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন, খালি ঘর, মায়া মমতা, আর শোক দুঃখে একেবারে সে জিন্দা মরা হয়ে পড়ে।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

নিষ্পাপ শিশু কন্যা সকিনা

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সর্ব কনিষ্ট কন্যার নাম উমায়মাহ। কিন্তু পিতা মাতা স্নেহের অতিশায্যে তাকে সকিনা বলে ডাকতেন। সকিনা অর্থ হৃদয়ের শান্তি। কারবালার ঘটনার সময় তার বয়স আনুমানিক চার বছর ধরা হয়ে থাকে।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর দুগ্ধ পোষ্য শিশু আলী আসগর, যে জালেমদের তীরে শাহদাত প্রাপ্ত হয় যা কারবালার ঘটনার এমন একটি স্পর্শ কাতর বিষয় যা শুধু প্রাচ্য দেশীয় মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যেই নয় বরং পশ্চিমা দেশীয় কঠিন হৃদয় সম্পূর্ণ মানুষ ও সাহিত্যিকদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

সকিনাই ছিল বাড়ীর সবচেয়ে ছোট মেয়ে, বাপ-চাচাদের কলিজার টুকরা। ভাই বোনদের অতি আদরের, মা এবং ফুফুদের অন্তরের শান্তনা। হযরত মা ফাতিমা (রাঃ) এর রূপ ও আকৃতির সাথে তার যথেষ্ট মিল ছিল।

পরিবারের সবার নিকটই সকিনা ছিল অতি আদরের, কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিল তার পিতার নিকট। অবশ্য এটা মানুষের স্বভাবজনিত বিষয় যে, পিতা কন্যাকে আর মাতা পুত্র সন্তানকে বেশী ভালো বাসে। অপর পক্ষে সকিনা পিতার সর্ব কনিষ্ট কন্যা হওয়ার কারণে এ মহবত ছিল অত্যাধিক। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সর্ব কনিষ্ট কন্যা মা ফাতিমাকে অত্যাধিক ভালোবাসতেন, এটা নবী পরিবারের এক বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল। হযরত আলী (রাঃ) বড় কন্যা যয়নব ফাতিমা কুবরাকে সীমাহীন ভালো বাসতেন তা সত্ত্বেও ছোট কন্যার প্রতি ভালো বাসার বৃষ্টি বর্ষিত হত। হুসায়ন (রাঃ) এ জন্যই এ মেয়ের নাম রাখেন উমাইমাহ অর্থ সকিনা, বাংলা অর্থ হৃদয়ের শান্তি। সকিনাও বাপের প্রতি আসক্ত ছিল। আদর স্নেহ ভালোবাসায় এ চার বছরের মেয়ে জান্নাতী সুখ অনুভব করে। এরপরই মছিবতের পালা শুরু হয়, যা সকিনার উপর দিয়েও চলতে থাকে, দেশ ছাড়ার কষ্ট, মরুপথের মধ্যে বিরাট দুরত্বের রাস্তায় চলার কষ্ট। তা সত্ত্বেও রাত্রে পিতার কোলে ঘুমিয়ে শান্তিই পেত।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু আশুরার রাত্রে সকিনা ঘুমায়না। কারো কোলে নীরব থাকেনা, এ ভাবেই সকাল হয়ে গেল। হুসায়ন (রাঃ) সকিনার অবস্থা জানতে চাইলে যয়নব বললেন- একে থামানো যাচ্ছেনা, পিতা ছাড়া সে কাউকে চাচ্ছেনা।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো-দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে লাগল আর সকিনাও বিপদের নতুন নতুন বিষয়ের সাথে পরিচিত হতে লাগল। পিতা সংগী সাথীদের নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে গেলেন-তারপর তার নিকট যোদ্ধাদের শাহাদাত প্রাপ্তীর খবর আসতে লাগলো- তারপর তাদের মৃতদেহ আসতে থাকলো। চাচা শহীদ হলেন- চাচাতো ভাই শহীদ হলেন- ফুফুর ছেলে শহীদ হলেন-নিজের যুবক ভাই শহীদ হয়ে লাশ হয়ে আসলো-ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর সকিনা সর্বশেষে পিতাকেও একাকী যুদ্ধের ময়দানে যেতে দেখলো। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুবেষ্টিত হতে দেখে সকিনা পিতার দিকে দৌড়াতে লাগলো- মা- ফুফু আটকাতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না সে একেবারে সেনাপতি ওমর বিন সা'দের সম্মুখে আছড়িয়ে পড়লো, আর বলতে লাগলো আমার পিতাকে মেরোনা। তিন দিনের ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত সকিনা এতদসত্ত্বেও নিজের সামনে পিতাকে শহীদ হতে দেখলো।[৪১]

শহরবানূ

শহরবানূ হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর প্রথমা স্ত্রী। যিনি ইরান বাদশাহর কন্যা ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এর সময় ইরান বিজিত হলে যে সমস্ত নারী ও বালক বালিকারা যুদ্ধ বন্দি হিসেবে মুসলমানদের হাতে আসে শহরবানূ তাদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে আযাদ করে নিজ পুত্র হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সাথে বিয়ে দেন। বর্ণিত আছে যে, বন্দি হয়ে আসার অনেক পূর্বেই শহরবানূ স্বপ্নে হযরত ফাতিমা (রাঃ) সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম কবুল করেন। আর রাসূল কন্যা তাঁকে আপন পুত্র বধু বানান। তখন থেকেই তিনি ইসলামের প্রতি আসক্ত ছিলেন। অতঃপর বন্দি হয়ে মদিনায় আসার পর তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে পরিনত হয়। কথা প্রসঙ্গে শহরবানূ একদিন হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর নিকট এ স্বপ্নের কথা প্রকাশ করেন।

হযরত হুসায়ন (রাঃ) ও শহরবানূর মধ্যে পূর্ণ দাম্পত্য সুখ ও ভালোবাসা এবং একে অপরের প্রতি সত্যিকারের দয়া বিদ্যমান ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

কারবালার ঘটনার সময় শহরবানু জীবিত ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে কেহ কেহ দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু জীবিত ছিলেন বলেই প্রমাণ মিলে। অবশ্য হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর আরো দুই জন স্ত্রী ছিলেন, একজনের নাম রিবাব এবং অপর জনের নাম 'উম্মে লাইলী'। উম্মে লাইলী আলী আকবরের এবং রিবার সকীনা এবং আলী আসগররে মাতা ছিলেন। সালেহা আবিদ হোসাইন তার খাওয়াতীনে কারবালায় উল্লেখ করেন শহরবানূ এ সময় জীবিত ছিলেন এবং কারবালায় অংশ গ্রহণ করেন। আর এ জন্যই তাঁকে সকল সন্তানের মাতা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে, যদিও তিনি হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর সকল সন্তানের মাতা নন। তিনি আশুরার দিন সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত তার সকল সামর্থ ও সমর্থন আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেন। আলী আকবর যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মা এবং ফুফুর ইযাযত প্রার্থনা করলে তারা দুজনেই সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁদের প্রিয় পুত্রকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেন, আর এর কিছুক্ষণ পরেই এ পুত্র লাশ হয়ে ফিরে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কুফা-বসরার আঞ্চলিক ভৌগোলিক অবস্থান পর্যালোচনা

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে যে সব শহর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তার মধ্যে মক্কার পরেই মদীনা, কুফা ও দামেস্ক অন্যতম। কারবালার ঘটনার সঙ্গে এই ৩টি শহর বিশেষভাবে জড়িত। তাই মূল ঘটনায় যাওয়ার পূর্বে এ স্থান গুলো সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হল।

আরবদেশ ইসলামের জন্মভূমি। আরবের হিজায ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জন্ম ও কর্মস্থল মক্কা মু'য়াজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারার পূন্য স্মৃতি বহন করছে। আরবের সীমানা ছাড়িয়ে পশ্চিমে নীলনদ থেকে পূর্বে অক্ষু নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ মুসলিম সভ্যতার প্রাথমিক লালনভূমি।

ইরাক উত্তর পশ্চিম এশিয়ার একটি দেশ। দেশটির উত্তরে তুরস্ক, পূর্বে ইরান, দক্ষিণ পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে কুয়েত ও সৌদিআরব এবং পশ্চিমে জর্দান ও সিরিয়া অবস্থিত। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে যে সব শহর সবচেয়ে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তার মধ্যে মক্কার পরেই মদীনা কুফা ও দামেস্ক অন্যতম। এক কালে কুফা ইরাকের রাজধানী ছিল।

মদীনা হতে কুফার দূরত্ব উত্তর পূর্ব দিকে ছয় শত মাইলের উপর। সিরিয়া বা শাম দেশের রাজধানী দামেস্ক মদীনা হতে উত্তর পশ্চিমে অন্যূন সাতশত মাইল দূরে। দামেস্ক থেকে কুফা পূর্বদিকে। দূরত্ব প্রায় সাড়ে চারশত মাইল। এই তিনটি শহর যোগ করলে যে ত্রিভুজটির সৃষ্টি হবে এর পূর্ব শৃঙ্গ কুফা ইরাকের সমতল ভূমিতে অবস্থিত। এর উত্তর পূর্ব দিক দিয়ে সুপ্রসিদ্ধ ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদী প্রবাহিত হয়েছে। বিখ্যাত সেনাপতি সা'দ পারস্য বিজয়ের পর কুফায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং এখান থেকে ইরাক ও পারস্য দেশ শাসন করতেন। ত্রিভুজের পশ্চিম শৃঙ্গ দামেস্ক সিরিয়ার পার্বত্য ও মরু অঞ্চলে সন্ধিস্থলে বিরাজিত। পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত ক্ষুদ্র এক পার্বত্য নদী। পশ্চিমে পর্বতাকীর্ণ উন্নত মালভূমি ক্রমশঃ ঢালু হয়ে ভূমধ্যসাগরে অবতরণ করেছে। পূর্বে নিম্নতর সমতলে মরুভূমির পর মরুভূমি ধূ ধূ করছে। মরু শ্রেণীর পূর্ব সীমা গিয়ে ঠেকেছে সুদূর ইরাকের ফুরাত নদীর পশ্চিমকূলে। এই ফুরাত তীরেই কারবালার সেই ভয়াবহ প্রান্তর, যার নামে আজও মানুষ শিহরিয়ে ওঠে। কুফা থেকে এটা প্রায় ৪০ মাইল উত্তর পশ্চিমে। বহু সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের সাক্ষী ফুরাত নদী ইরাকের বুক চীরে দক্ষিন পূর্বদিকে ধাবিত হয়েছে এবং অবশেষে পারস্য উপসাগরে

Dhaka University Institutional Repository

বিলীন হয়েছে। সাগর মোহানা হতে ৭০ মাইল উত্তরে ফুরাত ও তাইগ্রীসের সঙ্গমস্থলে সুপ্রসিদ্ধ বসরা নগরী। খলীফা ওমর এই বন্দরের প্রতিষ্ঠা করেন পারস্য ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ সমূহের সাথে নৌ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য।

কুফা ঃ কুফা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইরাকে বসরার সাথে স্থাপিত দু'টি শহরের অন্যতম। মেসোপটেমিয়াতে আরবদের স্থায়ী সামরিক ঘাটি। এ কুফা হতেই সমগ্র ইরাকী সাওয়াদ (কৃষি ভূমি) নিয়ন্ত্রণ করা হত। ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রসারে এর গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং ১ম হতে ৭ম শতকের সমগ্র কাল ব্যাপী এটা গুরুত্ব পূর্ণ সব রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র স্থান ছিল। বসরার মত এখানেও প্রায় তিন শতাব্দী কাল ব্যাপী ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছিল। অতঃপর কুফার অবনতি হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে এর ধ্বংস ঘটে। বর্তমানে অতীতের সামান্য কিছু বিন্দু মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে, সে গুলির প্রায়ই আবার পরবর্তী কালের বা সংস্কারকৃত।

৬৩৮ সালে আল-কাদিসিয়ার যুদ্ধে বিজরী মার্দ ইবনে আবি ওয়াককাস (রাঃ) কুফা নগরীর প্রতিষ্টা করেন।

কুফা শহর ঃ কুফা শহর একেবারে নূতন স্থানে নূতন করে নির্মান করা হয়। আরব স্তেপ ভূমির এক প্রান্তে কিন্তু মধ্য ফুরাত নদীর প্রধান ধারার পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল বলে এটা বাবিলের পথ এবং সেখান হতে আল-হীরার কয়েক মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত টেসিফনের সড়ক রক্ষা করত। যোগাযোগের জন্যও এর অবস্থান ছিল চমৎকার, দুই স্রোতের মাঝামাঝি স্থানে, এবং আল -কাদিসিয়া অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে আরব সৈনিকদের কাছে এটা ইহা কতকটা পরিচিতই ছিল। ফুরাত নদীর ডান তীরে নূড়ি পাথর মিশ্রিত শুস্ক, মেটে বালুকা ভূমির বর্ধিত প্রান্তে অবস্থিত কুফা পানির সমতল হতে সামান্য উঁচুতে অবস্থিত ছিল। এখানে বন্যা হতনা পানি সরবরাহ ভালো ছিল এবং আবহাওয়াও স্বাস্থ্য কর ছিল।

কুফা শব্দটির উৎপত্তি কোথা হতে হয়েছে তা সঠিক ভাবে জানা যায়না। আরব ঐতিহাসিক গণ ও ভৌগোলিকগণ তাঁদের অভ্যাস অনুযায়ী 'কূফা' শব্দটিকে স্থান বা নাম বাচক সাধারন বিশেষ্য রূপে ব্যবহার করতেন এবং যে কোন গোলাকার বালুকাময় স্থানকেই তাঁরা কূফা বলতেন। ম্যাসিগনন একে সিরীয় আকূলা নাম হতে গৃহীত রূপ বলে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কূফায় বসতি স্থাপনের নমূনা ছিল এরূপ প্রথমে একটি সর্ব সাধারনের এলাকা চিহ্নিত করে দেয়া হয়, মসজিদ এবং গভর্ণরের প্রাসাদ অবশ্যই এর অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং উহাই ছিল নগরীর কেন্দ্র স্থল বাদ বাকি সকল বসতির স্থান এখান হতে সম্প্রসারিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় এলাকা হতে পনেরটি বড় সড়ক প্রতিটি চল্লিশ হাত প্রশস্ত নির্গত হয়ে বিভিন্ন দিকে গিয়েছিল, এগুলি দ্বারা গোত্রীয় এলাকা সমূহ আলাদা আলাদা ভাবে বিভক্ত ছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলেন- কূফার সকল দূরবর্তী স্থান সমূহের মুহাজিরগণকে বসবাস করানো হত এবং অন্যান্য স্থান অপেক্ষা হিযায হতে আগত গণকে বাস স্থান দেয়া হতো বেশী।

খাঁটি ইয়ামেনীগণের সংখ্যা ছিল এখানে সবচেয়ে বেশী। একথা সত্য যে, এ ইয়ামেনী অধিবাসীগণই কূফার রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারন করেছিল এবং এখানকার সভ্যতারও রূপদান করেছিল। ম্যাসিগণনের মতে ইয়ামেনীগনের প্রভাবের ফলেই কূফার আরব গোত্রীয় গনের স্থায়ী বসতি স্থাপন সম্ভবপর হয়েছি, কারন তারা বহু পূর্ব হতেই শহর বাসী লোক ছিল। আর সে কারনেই একেবারে প্রথম হতেই এ শহরের প্রথম শ্রেনীর নগরায়ন ও সভ্যতা গুরুর কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়ে থাকে।

কূফার মোট জন সংখ্যা কত ছিল সে সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। শহর গড়ে উঠার একে বারে প্রথম দিকে এ শহরের জন সংখ্যা ২০,০০০ হতে ৩০,০০০ জন।[৪২] হযরত আলী (রাঃ) এর সময়ে এখানকার লোক সংখ্যা ছিল ৫৭,০০০ তন্মধ্যে ৪০ হাজার প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ১৭ হাজার কিশোর। যিয়াদ ইবনে আবী সুফিয়ানের সময়ে (৬৭০ খৃীঃ) এখানে ১লক্ষ ৪০ হাজার আরব অধিবাসীর আদম শুমারী করা হয়েছিল।[৪৩]

খলীফা ওমর (রাঃ) এর সময়ে ৬৩৮ খৃীঃ আল-কাদিসিয়ার যুদ্ধবিজয়ী সাদ ইবনে আবী ওককাস (রাঃ) কূফা নগরীর প্রতিষ্টা করে সাসানীদের নিকট হতে সমগ্র ইরাক অধিকার করে নেন, বিশেষ করে এ সময় মাদাইন ও টেসিফন অধিকৃত হয় কিন্তু সে স্থানের আবহাওয়া আরবদের সহ্য হয়নি অবশ্য একথাও স্মরণ যোগ্য যে, আরবগণকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী দেশান্তর গমন ও বসতি স্থাপনে অনুমতি দেয়া হলে হযরত ওমর (রাঃ) একদা এটা প্রকাশ করেন যে, বিজিত দেশে আরবরা যেখানেই বসতি স্থাপন করুক তারা সকলে যেন একত্রে থাকে এবং স্থানীয় অধিবাসীগণ হতে স্বাতন্ত্র রক্ষা করে- যাতে স্থানগত ভাবে আরবের সাথে তাদের সম্পর্ক বজায় থাকে। এবং এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এ মূল ধারনাগুলো খুব দ্রুত প্রচার করা হয়। যা দ্বারা বিজেতা ও বিজিতগণের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক সম্পর্কে স্থিরাকৃত হয়। কৃষি বসতির কোন বিস্তৃতি বা বিতরণ করা হতো না। আক্রমনের জন্য সদা প্রস্তুত সেনাবাহিনী প্রতি পালন করা হত নূতুন উদ্ভূত একটি অর্থ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, যাতে আরবদের উপর সরাসরি করারোপ না করে ইরাকের অঞ্চলসমূহ হতে রাজস্ব আদায় করা হত। এ সবমূল আরব ভূমির অনুরুপ আরব গোত্র সমূহের পারস্পরিক সহ-অবস্থানের উপর নির্ভর করত। শাসন ক্ষমতা হিসেবে এবং ঐক্য স্থাপনকারী নীতি হিসেবে নূতন রাষ্ট্র এবং নূতন ধর্মের ভূমিকাও বোধগম্য ভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই যে, হযরত ওমর (রাঃ) একে তাঁর পদ্ধতির পরীক্ষার একটি অবস্থারুপেই দেখতে চেয়েছিলেন ৬৪০-৪৩ সালের মধ্যে দীওয়ান প্রতিষ্ঠা দ্বারা তিনি একে যথার্থ রুপদান করেন। হযরত ওমর (রাঃ) এর সময়ে কূফা ছিল সামরিক ঘাঁটি জ্যামিতিক খোলা মেলা যথেষ্ট বাতাস এ রকম যুদ্ধের জন্য অভিযানের খাটানো তাঁবু সমূহ সারিবদ্ধভাবে স্থাপিত হত। যিয়াদের শাসনামলে (৬৭০-৭৩) মেসোপটেমীয় পোড়ানো ইটের ব্যবহার শুরু হয়। সেই ইট প্রথমে জমি মসজিদ এবং এর সংলগ্ন দক্ষিণে অবস্থিত গর্ভনরের প্রাসাদ নির্মানের জন্য ব্যবহৃত হয়। পরে অবশ্যই অভিজাত শ্রেনীর বাড়ী নির্মানের জন্যও ব্যবহৃত হতে থাকে। উমাইয়্যা আমলে কূফা নগরী প্রাচীর বেষ্টিত ছিল না। ধরে নেওয়া যায় সে সময় নগরীর চতুঃসীমা দুই কিলো মিটার অতিক্রম করে নাই।

কূফার রাজনীতি ও মতাদর্শ ঃ ৭ম শতাব্দীতে কূফা উচ্চতম মানের রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে ভবিষ্যতে ইসলামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ের সূতি কাগার ছিল। ৮ম শতাব্দীতে বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্টার পরে এবং ইসলামী সম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর হতে রাজনীতির এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কূফা হতে ভিন্ন স্থানে আবর্তিত হয়। কিন্তু অপর পক্ষে কূফার তামাদ্দুনিক কর্মকান্ড ব্যাপক হয়ে উঠে এবং অতি উচ্চমান অর্জন করে (আনুমানিক ৭৬০ হতে ৮৬০ সাল সময়ের মধ্যে)। তখন গড়ে শুরু করে কূফার তিনটি অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায় ঃ রাজনৈতিক কূফা (১৫০ হিজরী পর্যন্ত); মতাদর্শের কূফা (২৫০ -৩৫০ হিজরী পর্যন্ত) যখন এটা শীআ মতাদর্শের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠে! এবং তামাদ্দুনিক কূফা (১৭-১৫০ হিজরী) এবং ১৫০ হিজরী হতে ২৫০ হিজরী প্রাথমিক আমলের কূফার রাজনৈতিক কর্ম কান্ডের মধ্যে প্রধান প্রধান ঘটনা হচ্ছে হযরত উসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ (৩৪-৩৫ হিঃ) ইসলামের আন্ত কলহজাত বড় দুই যুদ্ধে আল-জামাল (৩৬ হিঃ) ও সিফফিন (৩৬ হিঃ) এর যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) এর প্রতি সমর্থন প্রদান, কূফা শহরের বুকে খারিজী আন্দোলনের উদ্ভব; হুজর ইবন আদী আল-কিনদী (রাঃ)-র কার্যকলাপের শুরু (৫১হিঃ) তার সংগে

Dhaka University Institutional Repository

সংগেই রাজনৈতিক শীয়াবাদের কার্যকলাপ শুরু হয়, যা দমন করা হয়েছিল। এর পর শীয়া পন্থী বিদ্রোহ একের পর এক ঘটতে থাকে এবং সে গুলো আবার একর পর এক দমন ও করা হয়। তখন কার ঘটনাবলী মুসলিম ইবনে আকীলের ঘটনা এবং কারবালার শোকাবহ ঘটনা (৬০-৬১ হিঃ) তাওয়াবুন এর যুদ্ধ যাত্রা (৬৫ হিঃ) আল-মুখতারের বিদ্রোহ যায়দ ইবনে আলীর বিদ্রোহ (১২২ হিঃ) এবং আব্দুল্লাহ ইবন আলীর বিদ্রোহ। আবার এ কূফাই ছিল আববাসী আলববী দাওয়ার মূল পরিচালনা শক্তি। এ কূফাতে অগনিত খারিজি আক্রমনও পরিচালিত হয়।

অগনিত বিদ্রোহাত্মক উত্থান রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যাবলী ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কারনে কূফা এটি বিক্ষুব্ধ উত্তেজনাময়, উচ্চাকাংখী শহরে পরিনত হয় এবং পরবর্তী কালের শীয়া সচেতনতার জন্য এটি একটি শহীদী নগরী নামে পরিচিত হয়।

বস্তুত হিজরী প্রথম শতকের এই যে, ক্রমাগত রাজনৈতিক ভাবোচ্ছাস এটি খোদ কূফার গঠন হতেই উৎসারিত হয়েছিল, আর তা ছিল ঐতিহাসিক বিবর্তনেরও ধারা। কূফা সাওয়াদের সম্পদের প্রধান অংশটি ভাগ করত এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়কগন প্রাচীন রাজকীয় অধিকার ভূক্ত এলাকাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করত যা পরবর্তী কালে মত পার্থক্য ও বিভেদের মূল কারন হয়ে দাঁড়ায়। হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফত কালে সকলের মধ্যে সমতা বজায় রাখা হয়েছিল তখন কূফার কোন বাহিনী পারস্য বিজয়ে ব্যস্ত ছিল। হযরত উসমান (রাঃ) এর খেলাফত কালে অভ্যন্তরীন কোন্দল দেখা দিতে শুরু করে। হযরত ওমর (রাঃ) যে আরব ইসলামী আভিজাত্য সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন পর্যায় ক্রমে তারা স্থানীয় পুরুষানুক্রমিক গোত্র প্রধান গণের কাছে অবনমিত হন। হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যা কান্ডে এদের মধ্যকার কয়েকজন জড়িত ছিল; তার ঘটনার পরিণতিতে বাধ্য হয়ে তারা হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষ গ্রহণ করে। প্রকাশ থাকে যে, যদিও হযরত আলী (রাঃ) কিছু সুবিধার কথা চিন্তা করে তার খিলাফতের কেন্দ্র স্থল হিসেবে কূফাকে গ্রহণ করেন কিন্তু [illegible] আগমন আরবের উপরে আনসার এর আধিপত্যকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে [illegible] রাজনৈতিক ভাগ্যের চূড়ান্ত সীমা নির্দেশ করে। চার বৎসর কাল পর্যন্ত কূফা সম্রাজের রাজধানী না হলেও খিলাফতের কেন্দ্র স্থল ছিল এবং এখান হতেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়িত করা হত। আর সুবিধাজনক বিষয়ের কারনে কূফা তার ভবিষ্যৎ দাবী উত্থাপন করে। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) এর প্রতি এবং তার পরিবার বর্গের প্রতি কূফাবাসীগণের আনুগত্য কখনো ক্ষুন্ন হয়নি। হযরত আলী

Dhaka University Institutional Repository

(রাঃ) এবং তাঁর পরিবার বর্গ বিশেষ করে হযরত হাসান এবং হুসায়ন (সঃ) তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তবে একথা সত্য যে একেবারে শুরু থেকেই তাদের এ আনুগত্য ও বিশ্বস্তা তার কোন ঐক্য ছিলনা। আশরাফগণ বা পুরুষানুক্রমিক গোত্রীয় প্রধানগণ সকলেই কাদিসিয়ার যুদ্ধে যোগদান করে ছিলেন গোত্রীয় প্রধান এবং সাধারণ জনসাধারনের হযরত আলী (রাঃ) এর প্রতি সমর্থন ছিল। কিন্তু এদেরই এক ছোট অংশ অপেক্ষাকৃত অনমনীয় এবং আনুগত্য হীন ছিল। অল্প দিনের মধ্যে তারা তাঁর প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে উঠে মীমাংসা প্রচেষ্টার পরে মনে হচ্ছিল যেন, হযরত আলী (রাঃ) তাঁর নিজস্ব সমর্থনকারীগণ ব্যতিত অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাষায় তাঁর শীয়াগণ ব্যতীত আর কারও বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। আপোস বিরোধী সদস্য গণ খারিজী হয়ে যায় আর গোড়া পন্থীগণ তাঁকে পরিত্যাগ করে। আর সেখান হতেই আলী (রাঃ) এর গঠিত মিত্র বাহিনীর বিভেদ শুরু হয়, সেখান হতেই পরবর্তী এক শতাব্দীকাল যাবৎ শীয়াগনের সংখ্যা লঘুচরিত্র এবং শক্তি হীনতার সুত্রপাত হয়। বস্তুত উমাইয়্যা গণ আশরাফগনের সমর্থন লাভ করেই শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। যদিও আশরাফগণ উমাইয়্যা গণকে পছন্দ করতেন না; কিন্তু তাদের একটা নীতি ছিল যে, এরা নিজেদের ক্রমবর্ধমান সামাজিক প্রভাব লাভ করেই সন্তুষ্ট হয়। আর উমাইয়া শাসকগন সেই প্রভাব বৃদ্ধির সমর্থন দান করেন। এতেই ব্যাখ্যা খুজে পাওয়া যায় যতবারই শীয়া বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তত বারই কেন আশরাফগণ ক্ষমতাসীন শক্তিকে সমর্থন প্রদান করেছে। আর কেন সে ক্ষমতাসীন শক্তি শীয়া সৈন্য দিগকে নিরস্ত্র করার সময়ও আশরাফগণের সহযোগিতা লাভ করেছে; আর এজন্যই তারা ৬৮০ খিষ্টাব্দে তথা ৬১ হিঃ তে হযরত হুসায়ন (রাঃ) কে হত্যা করার ঘৃণ্য কাজের সাথেও জড়িত ছিল। আল-মুখতার এদের সুযোগ সুবিধা খর্ব করতে চাইলে এরা তাঁর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। এবং যায়দ ইবনে আলীর কার্য ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে এরা গভর্ণরের সাথে পুনরায় মিলিত হয়। ৭০১-২ সালের বড় বিদ্রোহ ছিল বিশেষ ভাবে একটি ইরাকী বিদ্রোহ যা পরিচালিত হয়েছিল আহলুস শামের প্রভাবআধিক্যের বিরুদ্ধে গভর্ণর আল-হাজ্জাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, আর এ কারনেই খলীফা ইরাকীদের সামরিক ক্ষমতা খর্ব করায় সেখানে ব্যাপক ভাবে সিরীয় সৈন্য পাঠানো হয় যেন এটা কোন একটি বিজিত রাজ্য। কূফার ইয়ামেনী বংশোদ্ভূতগণ শীআ মতবাদীদের সমর্থন করেছিল কারন আরব শহরে তারা কোন ঠাসা অবস্থায় ছিল, সামাজিক এবং সাংস্কৃতি উভয় ভাবেই। তাছাড়া আহলে বায়েতগণের অধিকার রক্ষার ডাকে অতীতের ইয়ামেনী সচেতনতা কিছুটা প্রতি ধ্বনি করেছিল। আর এটা হতেই আল-মুখতারের জনপ্রিয়-প্রকৃতির ব্যাখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়। আর এটাই ছিল সম্ভবতঃ ৭ম শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শীআ বিদ্রোহ। বিদ্রোহীরা কিছু কালের জন্য কূফার ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হয়; সর্বোপরি একটি গুড় শক্তি ভাষা প্রচার এবং কতকটা মতবাদ প্রদান দ্বারা তারা শীয়াঃ সচেতনতা জাগ্রত করে তোলে। তাছাড়াও এদের থেকে উদ্ভূত কার সানিয়্যাগণ আবু হাশিম এর মাধ্যমে, আহলে বায়েতের দাওয়াতের কাজ করেছিল।

কূফার গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনেই সম সামরিক ইসলামের প্রজ্ঞাগত সচেতনতার কূফার ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারাটি যা সহজেই স্মরনে আসে, যার জন্য এটা প্রধানত বিখ্যাত তা হলো এখনকার আরবী ব্যকরনের শিক্ষায়তন এবং শীয়া মত বাদের উদ্ভব স্থল রূপে এর ভূমিকা। সম্ভবত। একারনেই শীয়া মত যাদের ক্ষেত্রে ইহার টিকিয়া থাকার ভিত্তিটিও নির্মিত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ইসলামের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বিষয়ে নূতন উৎসাহ সৃষ্টি হতে এবং নুতন সচেতনতারও সৃষ্টি হয়ে যে আরবদের স্থানান্তরে আগমন এবং বসতি স্তাপনের সময়ে এর গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইসলামের ইতিহাসের বিরাট ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সময়ে এর ভূমিকা ছিল বিরাট এবং বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট আরব শহর রূপে বসরার সাথে এক যোগে এটা ইসলামের তামাদুনিক পরিকল্পনার ভিত্তি এবং সত্যিকারের রূপটি প্রতিষ্টিত করেছিল।[৪৪]

আল বাসরা/বসরা ঃ নিম্ন ইরাক বা মেসেপটেমিয়াতে শাতিল আরব নদীর তীরের শহর বাগদাদ হতে ৪২০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। ইতিহাসের ধারায় এ শহরের অবস্থান কতকটা পরিবর্তিত হয়েছে এবং পুরাতন ও নূতন বসরার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। পুরাতন বসরা যেখানে ছিল সেটাই বর্তমানের যুবায়র গ্রাম! এর নুতন বসরার শহর স্থাপিত হয় ১৮শ শতকে সুপ্রাচীন আল-উযুল্লার কাছে এবং এটি হতেই আধুনিক বসরা শহরের সূত্রপাতও হয়। পরে যুবায়রের পশ্চিমে তৈলখানি আবিস্কৃত হলে শহরটি অতিদ্রুত সম্প্রসারিত হয় ও সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে।

এ শহরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাসূল (সঃ)-এর সাহাবী হযরত ওতবা ইবন গাযওয়ান (রাঃ)। ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আরবরা যাকে আল-খুরায়বা (ক্ষুদ্র ধ্বংস বিশেষ) বলত। এই প্রাচীন পারশিক ঘাটিতে এসে তিনি ছাউনি ফেলেন, স্থানটি তাঁর পছন্দ হয়। তখন খলীফা ওমর (রাঃ) এর কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে তিনি সেখানে সামরিক ঘাটি নির্মান করেন। এটা থেকেই ক্রমে বসরা নগরটি গড়ে উঠে। বসরা নামটি সম্ভবতঃ সেখানকার জমিনের প্রকৃতি হতে গৃহীত। শাত্তিল আরব নগরী তীর হতে আনুমানিক ১৫ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত এ ঘাঁটি হতে পারস্য উপ-সাগরের পথ ইরাকের পথ ও

Dhaka University Institutional Repository

পারস্যের পথ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল এবং এখান হতে দিজলা ও ফুরাত নদীর পূর্ব দিকে অভিযান পরিচালনার জন্য ইহাই ছিল সুবিধা জনক রওয়ানা হওয়ার স্থান। সে সাথে ইবনে বেদুইনদের বসরাদের স্থান রূপেও ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রথম দিকে বসবাসের ঘরগুলো সাদা সিধা কুটির মাত্র ছিল, এগুলো তৈরী করা হতো নিকটবর্তী বাতাইহ নামক স্থান হতে সংগৃহীত শুকনো খাল দিয়ে পরবর্তী কালে নীচু দেওয়াল দিয়ে সেই কুটির গুলোকে আরও মজবুত করা হয়। যিয়াদ ইবন আবী সুফিয়ানের আমলে পুড়ানো ইটের তৈরী দালান কোঠা তৈরী করা হয়। আর তখন হতেই বসরা একটি সত্যিকারের শহরের রূপ লাভ করতে থাকে তখন নূতন একটি বড় মসজিদ এবং আরব গভর্ণরের জন্য একটি বাস ভবন নির্মিত হয়। নগর প্রাচীর ও এর চারিদিকের খন্দক গুলো ৭৭১-২ সালের পূর্বে নির্মিত হয়নি - সব সময়েই বসরাতে খাবার পানি সরবরাহ করাটা ছিল এক বড় সমস্যার বিষয় এবং বিভিন্ন খাল খনন দ্বারা প্রাচীন প্যালাকোপায় নদীর স্রোত ধারা ব্যবহার করে এ শহরের জন্য একটি নদী বন্দর নির্মান করা হলেও অধিবাসীগণ সেইদুরের দিজলা নদী হতে পানি আনার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত।

এ অসুবিধা এবং কঠোর আবহাওয়ার কারনে এ সামরিক ঘাটিটি হয়ত কোন দিনই এত বড় শহরের রূপ লাভ করত না। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও মানসিক কারন গুলো যথেষ্ট শক্তিশালী বলে বসরাবাসী গণ শহরেই বসবাস করত এবং একে গড়ে তোলে। প্রথম দিকে বসরার লোকেরাই আরব বাহিনীতে যোগ দিয়ে একের পর এক দেশ জয় করে। বসরার লোকেরাই নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে (৬৪২ খৃীঃ) এবং ইসতাখার, ফারস, খুরাসান ও সিজিস্থান বিজয়ে (৬৫০ কাল) অংশ গ্রহণ করে ছিল। সে পর্যয়ে সামরিক ঘাঁটি হিসেবেই এর স্বাভাবিক ভূমিকা ছিল। অতঃপর যুদ্ধ জয়ের মালামাল ও সম্পদ যখন আসতে শুরু করে তখন হতে বসরাবাসীগণ নিজেদের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে। এর পর হতে শহরটির উন্নতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘটনাবলীও দ্রুত ঘটতে থাকে এবং এখানে যে রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরী হয় তাতেই মুসলিমগণ প্রথম সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এখানে ৬৫৬ সালে জঙ্গে জামাল সাংঘটিত হয়। যুদ্ধ শুরুর আগে শহর বাসী গণ তাদের নিজ নিজ আনুগত্য অনুসারে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধে আলী (রাঃ) জয়লাভ করলেও তাতে জনগণের মধ্যেকার বিশৃংখলা শুধু বৃদ্ধিই পায় কিন্তু সামগ্রিকভাবে জন সাধারন তখন ও পরবর্তী কালেও কুফার আলী পন্থীদের তুলনায় শীয়া অপেক্ষা সুন্নীই বেশী থেকে যায়। সেরকম পরের বৎসর (৬৫৭ সালে) বসরার লোকেরা হযরত আলী (রাঃ) এর দল ভূক্ত হয়ে সিফফীন যুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

অংশ গ্রহণ করে কিন্তু সেই একই সময়ে আবার এ বসরা হতেই যথেষ্ট সংখ্যক লোক খারিজী দল ভূক্ত হয়। ৬৬২ সালে মুআবিয়া (রাঃ) এ শহরের উপর উমাইয়্যা প্রভাব বিস্তার করেন, অতঃপর ৬৬৫ সালে শাসক রূপে এখানে যিয়াদকে প্রেরন করেন। এ যিয়াদকেই এক অর্থে এ শহরটির সমৃদ্ধি আনয়নকারী বলা যায়।

প্রকাশ থাকে যে আধুনিক বসরা শহর আদি বসরা শহর হতে ৮মাইল দুরে অবস্থিত। ইহা আধুনিক ইরাকের ২য় বৃহত্তম শহর ও বন্দর। বসরা গভর্ণর শাসিত প্রদেশের রাজধানী শহর ব্যতীত বসরা প্রদেশের আয়তন ১৯০৭০ বর্গ কিঃ মিঃ ইরাকের দুই বিখ্যাত নদী দিজলা ও ফুরাত যেখানে একত্রে মিলিত হয়ে শাতিল আরব নাম নিয়েছে সেই সংগম স্থলে শহরটি অবস্থিত পারস্য উপসাগর হতে ৭৫ মাইল উত্তরে বাগদাদ হতে ২৮০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। নদীর তীরবর্তী বলে এলাকাটি অত্যন্ত উর্বর কৃষি অঞ্চল, চতুর্দিকে বহু বিখ্যাত খেজুর বাগান রয়েছে। তা ছাড়া ধান, গম, যব, ভূট্রা বাজরা ইত্যাদ উৎপাদিত হয়। অধিবাসীগণ প্রধানত আরব কিছু কিছু য়াহুদী, আর্মানী ইরানী ও ভারত বর্ষীয় লোকও বাস কের। ৯৫% জন মুসলমান তন্মধ্যে অর্ধেকের বেশী সূন্নী। মাটির গুনে বসরাতে বড়, সুন্দর ও খোশবু যুক্ত গোলাপ ফুল জন্মে দুনিয়া জোড়া তা বসরাই গোলপ নামে পরিচিত।

আদি কাল হতেই বসরা ছিল ইরাকের প্রধান বহির্গমনের নৌ বা সমুদ্র বন্দর। এখান দিয়েই দেশের সকল কৃষি জাত ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি সমুদ্র পথে বিদেশে রফতানী হত।

বর্তমানে এ শহর ও বন্দরটির বিরাট ও ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে নিকটবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি তৈল খনি আবিস্কৃত হওয়ার ফলে সর্বাংগীন উন্নয়ন ও আধুনিকী করন অতি দ্রুত গতিতে হতে থাকে। বর্তমানে ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলের তৈল উত্তোলন পরিচালনা এখান থেকে করা হয়। বিখ্যাত বাগদাদ রেলপথ দক্ষিনে বসরা পর্যন্ত সম্প্রসারন করা হয়েছে। ফলে এ শহর ও বন্দর রেলপথের মাধ্যমে সমগ্র মধ্য প্রাচ্য তুরস্ক ও য়ূরোপের সাথে যুক্ত। বসরা বর্তমানে ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্ত জাতিক বিমান বন্দর। শহরটি একদিকে কুয়েত সীমান্ত এবং অপর দিকে ইরান সীমান্তের কাছে অবস্থিত। এ দিক দিয়েও এর গুরুত্ব অনেক। বাগদাদের মহাড়ক বসরা হয়ে কুয়েত সীমান্তে গিয়েছে। অপর একটি সুপ্রশস্ত ও অত্যাধুনিক এক্সপ্রেস মহাসড়ক বাগদাদ হতে বসরা হয়ে সিরিয়া জর্দান ও কুয়েতকে যুক্ত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বসরা ইরাকের প্রধান বন্দর। তৈল ব্যতীত দেশের সামগ্রীক রফতানীর প্রায় ৯০% এখান হতে বিদেশে যায়। এখানে একসাথে ১২টি সামুদ্রিক জাহাজ ভিড়িতে পারে। বন্দরে তৈলের জন্য ২টি বার্থ সারের জন্য একটি বার্থ এবং একটি বিশ্ব গুদাম রয়েছে। সী-প্লেন নামবারও আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। এ বন্দর দিয়ে পশম সূতা কাপড়, গালিচা, গবাদি পশু, চামড়া, তৈল, আঠা ও খেজুর রফতানী হয়। বসরা অভ্যন্তরীন নৌ-চলাচলেরও বড় কেন্দ্র। আর এসব গুরুত্বের কারনেই বর্তমানের মত অতিতেও এর আকর্ষণ ছিল।[৪৫]

কারবালা ঃ কারবালা ইরাকের এক প্রসিদ্ধ শহর যা, হযরত হযরত হুসায়ন (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ), হুর (রাঃ), ইবন ইয়াযিদ আরবিয়াহী এবং হাবীব ইবন মুজাহির এর মাযার সমূহ এবং আশুরার ঘটনার দরুন যিয়ারত স্থল এবং বিশেষ ভাবে শীয়া সম্প্রদায়ের সম্মান জনক কেন্দ্রে পরিনত।

প্রাচীন ইতিহাসঃ প্রাচীন ইতিহাসে কারবালাকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন, গাদিরিয়াহ, নীনাওয়াহ, আম্মুরা, শাডিউল ফুরাত, তাফফুল ফুরাত, তাফফু মাবিয়া নাওয়াবীস সাফফুরা, হাইর।

পুরাকীর্তি বিশেষজ্ঞগণ বিগত হাজার বছরের ইতিহাস এবং নাম ও নমুনার উপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন (১) কারবালা হলো কুরবাবিল অর্থাৎ বাবিল এর একটি গ্রাম (২) কারবালা হলো আশুরীদের প্রদত্ত একটি নাম, যা 'কারব' ঈলাা-র সমন্বয়ে গঠিত এবং উহার অর্থ হলো হাররামাল্লাহ (৩) কারবালা পূর্ব দিক হতে দক্ষিনে বিস্তৃত ছোট পাহাড় শ্রেনীর নাম এবং এ সুবাদে এ জনপদকে কারবালা বলা হয়।

অভিধান প্রনেতা গণ এবং জনসাধারনের বর্ণনানুযায়ী এর নাম করনের কারন হলো (১) কারবালা শব্দের অর্থ নম্রপদচারনা এই ভূমি যেহেতু নরম এবং প্রশস্ত ছিল। সে জন্য এটা কারবালা নাম ধারন করেছে। (২) কুরবিলাতিল হিনতা, গম চালনি দ্বারা পরিস্কৃত, যেহেতু এ ভূমি পাথর যুক্ত, এজন্য একে কারবালা বলা হয় (৩) কারবালা জঙ্গলের এক তিক্ত ঘাসের নাম যা এ জমিতেই জন্মাত। কেউ মনে করেন এটা এক আশুরী নাম। তাওফীক ওয়াহাবীর মতে আশুরী ভাষায় কার এর অর্থ হলো দূর্গ কিংবা চার দেয়াল পরিবেষ্টিত গ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

ফুরাত নদীর তীরবর্তী এলাকার উর্বরতার দরুন শতাব্দী কাল হতে এ অঞ্চল জন বসতি হিসেবে চলে আসছিলো। ইরাকের প্রাচীন ইতিহাসে কালদানী, তানুখী, লাখমী এবং মানাযিরা রাজ্য সমূহ প্রসিদ্ধ ছিল। সেই যুগে হীরা ছিল রাজ্যের প্রধান শহর এবং আয়নূত তামূর ছিল এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র কারবালা এই দুইটি শহরের মধ্য ভাগে অবস্থিত ছিল।

আরব বংশীয় গোত্র সমূহের মধ্যে বানূ ফারাম ইয়াদ এবং অন্যান্য কয়েকটি আরব বংশ প্রাচীন যুগ হতে অত্র এলাকা সমূহে বসবাস করে আসছে। বর্তমান কারবালা শহরের দুই পার্শ্বে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উচ্চ ভূমি খৃষ্ট পূর্ব দুই হাজার শতাব্দীর প্রাচীন বিধ্বস্ত শহর সমূহের স্বাক্ষর বহন করে। এই মালভূমির মাটির নীচে আশুরী, বাবিলী সাসানী, উমাবী এবং গাযনবী যুগের তাহযীব তামাদ্দুন চাপা পড়ে আছে।

ফুরাত নদীর তীরবর্তী হওয়া সত্বেও কারবালার ময়দান ফুরাত নদীর পানির দুস্প্রাপ্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ কারনে প্রাচীন বাদশাহগণ খাল খনন করেছিলেন। সাবুর যুল আকতাফ (৩০৯-৩৭৯ খৃঃ) বহুখাল খনন করে ছিলেন, যে গুলোর চিহ্নাবলী এখন পর্যন্ত দৃষ্ট হয়।

ইসলামী যুগে কারবালা

হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর শাহাদাতের ঘটনা হযরত নবী (সঃ) এর কারবালা পরিদর্শন এবং উহার মাটির ঘ্রান গ্রহণ এবং কারবালার মাটি উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রাঃ) কে আমানত স্বরূপ প্রদান করার কথা বিভিন্ন শীয়ায়ী উৎসে উল্লেখ আছে।[৪৬] ৩৯ হিজরীতে হযরত আলী (রাঃ) সিফফিন যুদ্ধ কালে এদিকে আগমন করলে কারবালার নাম শ্রবন করে ক্রন্দন করতে থাকেন। লোকেরা এরূপ ক্রন্দনের কারন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন "একদিন আমি মহানবী (সঃ) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন জিব্রীল (আঃ) আমাকে জানিয়েছেন যে, হুসায়ন ফুরাত নদীর তীরে কারবালা নামক স্থানে শহীদ হবে। তিনি এক মুষ্ঠি কারবালার মাটি নিয়ে আমাকে ঘ্রাণ নিতে দিয়েছিলেন, এ কারনে আমার কান্না এসে যায়"।[৪৭] এ বর্ণনানুযায়ী হযরত আলী (রাঃ) কারবালার ময়দান অতিক্রম কালে এক স্থানে থেমে সালাত আদায় করেন এবং বলেন,

"এইখানে তাহাদরে উষ্ট্র বসিয়া পড়িবে
এইখানে তাহাদের হাওদা সমূহ রাখা হইবে
এইখানেই তাহাদের রক্তপাত ঘটানো হইবে

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ (সঃ) এর বংশের কিছু বীর পুরুস এইখানে নিহত হইবে
এবং তাহাদের জন্য আকাশ বাতাস ক্রন্দন করিবে"।[৪৮]

৬১ হিঃ ২৭ মুহররম হযরত হুসায়ন (রাঃ) কারবালাতে তাঁবু স্থাপন করেন। তিনি এখানে জমি ক্রয় করেন এবং ১০ মুহাররম, ৬১ হিঃ তিনি উক্ত ভুমিতে নিজের স্থায়ী ঘর নির্মান করেন।[৪৯] এখানে এক উঁচু ভূমিতে তাঁর কবর ছিল যার চতুর্দিকে কিছু উঁচু টিলা ছিল এ জন্য এ স্থানকে প্রথম দিকে আল- হাইর বলা হত।[৫০]

সফর ৬২/৬৮২ সনে হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) কারবালা আগমন করেছিলেন এবং আহল বায়েতও সিরিয়া হতে মুক্তি লাভের পর এখানে আসেন।[৫১] এখানে সাক্ষাতের কারনে আজও ২০মে সফর কারবালাতে বিশেষ দিন পালন করা হয়ে থাকে। ৬৫ হিজরীতে আবু ইসহাক মুখতার ইবন আবী উবায়দ আসছাকাফী বানূ উমায়্যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং সে যুগে হযরত হুসারন (রাঃ) এর মাযারের উপর একটি ছোট সৌধ নির্মান করেন। এরপর থেকে বহুবার বহু শাসক এ মাযার ও গম্বুজের নির্মান ও সৌন্দর্য্য বর্ধনের কাজ করেন। মাযারের গোটা ঘর সবুজে ভরা, পরিস্কার পরিছন্ন। হযরত হুসায়ন (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ) এর রওজাদ্বয়কে খুবই জাক জমক করা হয়েছে। ২০ শে সফর প্রতি বছর বিভিন্ন দেশের যিয়ারত কারীগণ একত্র হন এবং দিনরাত বিলাপ চলতে থাকে। এ দিবসকে আর বাঈন-এর মাখসূসী বলা হয়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ ৯ই জিলহজ্জ অনষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া রজব, শাবান ও মহররমের দশ দিন কারবালা অপরূপ দৃশ্য ধারন করে। ভারত উপমহাদেশের সুলতান, শাসক ব্যবসায়ী এবং ভক্ত লোকেরা শতাব্দী ধরে এ সকল রওজা যিয়ারত করে আসছেন।

কারবালা ইরাক প্রজাতন্ত্রের এ নামেরই একটি প্রদেশের প্রধান শহর ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে এ শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষ্যের অধিক ছিল। শহরের অর্ধেক বাসিন্দা ইরানী বংশোদ্ভূত। এ ভারত উপমহাদেশের বহু পরিবারও এখানে বংশ পরম্পরায় বসবাস করছে। রাগদাদ হতে কারবালা পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। কয়েক মাইল দূর হতে শূন্যে চারটি উজ্জল সোনালী মীনার এবং দুটি স্বর্ণ নির্মিত গম্বুজ দৃষ্টিগোচর হয়। এ নব নির্মিত সুন্দর শহরে হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত হুসায়ন (রাঃ) এর মাযার কারুকার্য ও স্থাপত্য শিল্পের এক উত্তম নিদর্শন। এখানে দিনরাত্র হাজার হাজার দর্শককে সালাত কুরআন তিলাওয়াত এবং দোয়ায় রত থাকতে দেখা যায়।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টের উদ্ধৃতি সূচী

১ IITHPR পৃ. ১৮৪-৯৮

২ সসচম ১/১৬

৩ রথেঅ পৃ. ৬৬-৬৭

৪ বেলাক্যা পৃ. ৩-৪

৫ ববা

৬ ভাফাচৈ পৃ. ২৬৭

৭ মরস ২/৫

৮ বিসি

৯ MCB P. 354.

১০ মীমা পৃ. ৪৬

১১ শ্বাব পৃ. ১২৪

১২ মুবাসা পৃ. ৪৩

১৩ মশআবিকা পৃ. ২

১৪ ১৯ শবামুচিচেধা ১/৭৪

১৫ এঅই ১/২৮৮

১৬ TC P. 310.

১৭ এঅই ৩/৩০৭

১৮ TTKFL ২/১৪৭

১৯ AHA p. 198.

২০ মীমগর পৃ. ৬৮-৬৯

২১ মুমাবাসা পৃ. ২০৬

২২ মীমোহোশববিসি পৃ.১১

২৩ কার পৃ. ৭২

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

২৫ দামাই পৃ. ২৫২

২৬ দামাই পৃ. ২৫২

২৭ ইত্তিয়াব ১/১৪০

২৮ দামাই

Dhaka University Institutional Repository

---

২৯ হাকিম ১৭৫/২, মুসান্নাফা ১৫২/১১

৩০ উগা, মুত্তা ১৭৫/৩

৩১ ইসাবা পৃঃ ৩৩০

৩২ এশহিঅদিসা পৃ. -৭১-৭২

৩৩ মুযা ৫/২-৩

৩৪ দামাই ২৫৫

৩৫ কার

৩৬ খাকা পৃঃ ২০

৩৭ প্রাগুক্ত

৩৮ কার পৃ. ১৩২

৩৯ খাকা পৃঃ ৮৩

৪০ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪

৪১ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮

৪২ ফুবু পৃ. ৭৬

৪৩ প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪৫

৪৪ ইবি ৯/২৪৫-২৪৮

৪৫ প্রাগুক্ত ১৬/১ম ভাগ

৪৬ আসামুফা পৃঃ ১১৫

৪৭ আযাসিআনু ৩০/১৯৪-১৯৫

৪৮ আসামু পৃঃ ১৯২, ফাওতানিতে পৃঃ ৫৩৩, কিসি পৃঃ ১৪০ -১৪২

৪৯ মাহ্ পৃঃ ২৩৫

৫০ মাই পৃঃ ১২৬

৫১ মাহ্ পৃঃ ৪৬৭

৫২ ই বি ৭/২৪৩-২৪৬

Dhaka University Institutional Repository

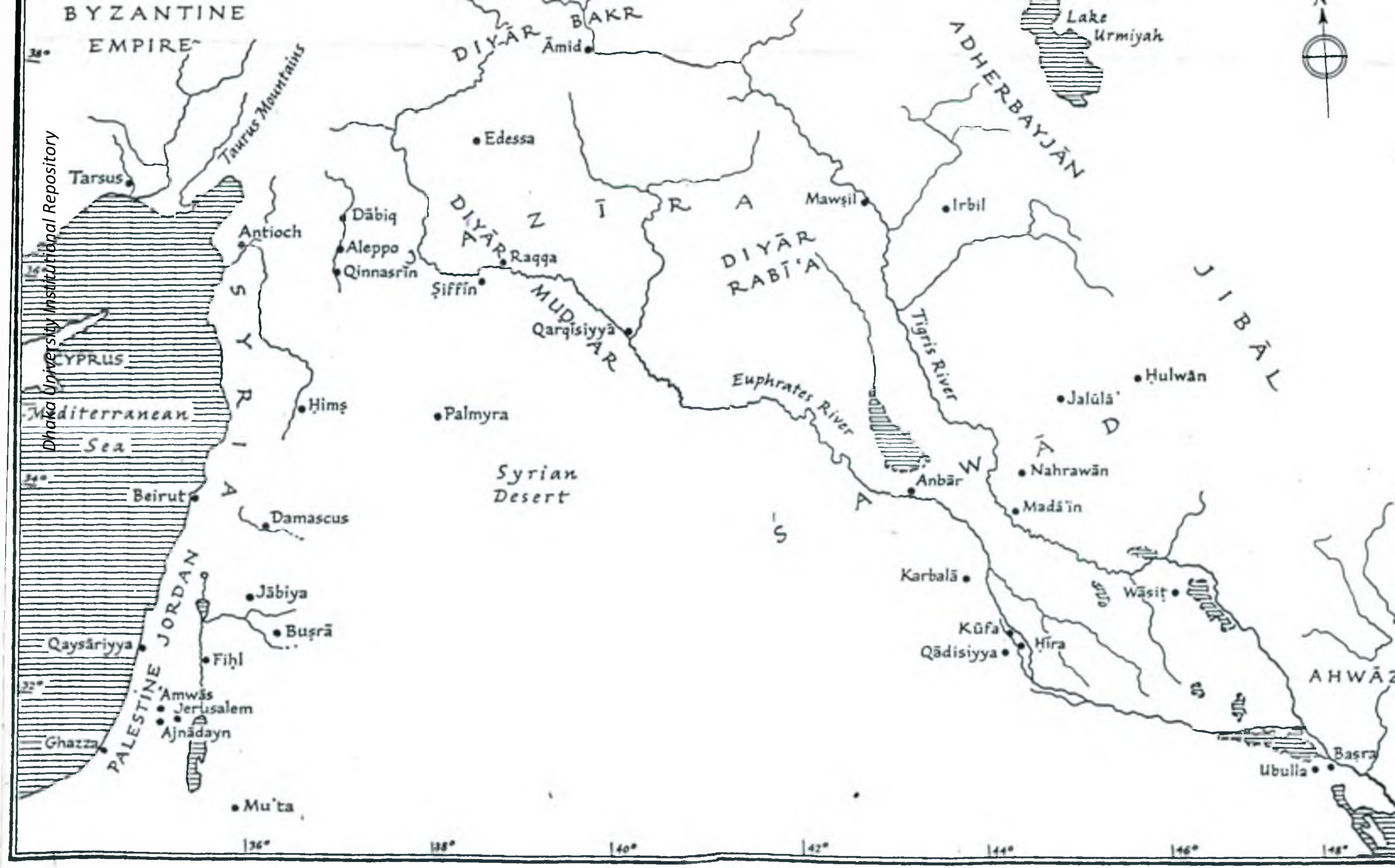

2 Syria, Jazira and Sawād

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ইমাম হাফিজ আল্লামা ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাছীর, মাতবাআতুস সাআদাহ মিসর-১৯৩২ খৃীঃ।

২. আস, সাওয়াইকুল মুহরিকা, ক্বাসাসুদ্দীন ওয়া তামামুন নিমা তেহরান, সংকলন ১৩৮৫ হিঃ, পৃ. ১৯২।

৩. আল-ইস্তিআব লি মারিফাতিল আসহাব, হাফেজ আবু ওমর ইবনে আব্দিল বার, দায়েরাতুল মারুফ হায়দারাবাদ, দাক্ষিনাত্য-১৩৩৬ হিঃ।

৪. আল-কামিল ফিত তারীখ, ইবনুল আছীর, ইদারাতুত তিবআতিল মুনীরায়্যা মিসর ১৩৫৬ হিঃ এবং দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা- বৈরুত, লেবানন, ১৪০৭ হিঃ ১৯৭১ খৃীঃ।

৫. আল ইসাবা ফি তামইয়াযিস সাহাবা, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, মাতবাআতুল মোস্তফা মোহাম্মদ, মিসর, ১৯৩৯ খ্রীঃ, মাতবাআতুস সা'আদাহ মিসর ১৩২৮ হিঃ এবং কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ১৮৮৬ খৃীঃ।

৬. আল আমালী, ইমাম মুহাম্মদ শাইয়ানী, দায়েরাতুল মারুফ দাক্ষিনাত্য, হায়দারাবাদ ১৩৪০ হিঃ।

৭. আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, ইবনে কুতায়বা আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম, ১৩৩১ হিঃ।

৮. আর রিয়াজুন নায়েরা ফি মানাকিবিল আশারা, হোসাইনিয়া প্রেস, মিসর ১৩২৭ হিঃ।

৯. আল বায়ান ওয়াত তাবায়ান, আল জাহেয, মাতবাআতুল ফুতুহিল আদাবিয়্যাহ, মিসর-১৩৩২ হিঃ।

১০. আল ইকদুল ফরীদ, ইবনে আবদু রাব্বিহী, লাজনাতু আলাফ ওয়াত তারজামাহ, কায়রো-১৯৪০ খৃীঃ।

১১. আহকামুল কুরআন, আবু বকর আল জাস্সাস, আল মাতবাআতুল বাহিয়্যা, মিসর ১৩৮৬ হিঃ।

১২. আশুরা সংস্কৃতির লালন ভূমিতে, আব্দুল মুকীত চৌধুরী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের

সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ ১৯৯৭।

১৩. আশুরা সংকলন, ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর আন্দোলনের দর্শন ও শিক্ষা, আশুরা উৎযাপন কমিটি ঢাকা-১৯৯৬।

১৪. আত-তাবারী, ইবনে জারীর আত-তাবারী, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, আত-মাতবাআতুল ইস্তিকামা, কায়রো ১৯৩৯ খৃীঃ।

১৫. ইবনুল আছীর, ইদারাতুত তিব-আতুল মুনীরিয়্যা, মিসর-১৩৫৬ হিঃ।

১৬. ইজহারুল হক, ইবন খলীলুর রহমান, মুতিয়াতুল খাইরিয়্যাহ, মিসর ১৩০৯ হিঃ।

১৭. ইস্তিদাদুল মামালিক, জুরজী যায়দান, মাতবাআতুল হিলাল, মিসর, ১৯০৮ খৃীঃ।

১৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

১৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯৯৫, উদ্ধৃত আস, সাওয়াইকুল মুহরিকা সং ১৩৮৫ হিঃ পৃ. ১৯২। ফাসাসুদ্দীন ওয়া তামামুন নিমা তেহরাণ ১৩৯১, কিতুবুস সিফফীন।

২০. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, উদ্ধৃত- মাকতালুল হুসায়ন, আল মুকাররম।

২১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, উদ্ধৃত- সিয়ার-আলামিন নুবালা, আয যাহাবী।

২২. ইমাম হোসাইন (রাঃ) কালজয়ী বিপ্লব, শহীদ আয়াতুল্লাহ মূর্তজা মোতাহারী, সংকলনে আব্দুল কুদ্দুস, কারবালা প্রকাশনী, চৌকস-১৩১, D.I.T Extention Road Dhaka, 100-1996.

২৩. ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়াহ, ইবনে তায়মিয়া, ইবনে তায়ামিয়া একাডেমী করাচী।

২৪. উসদুল গাবা ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ইবনুল আছীর, দারুল হাইয়্যা আর রাস-উল আরাবী, বৈরুত, মাতবাকাহ আল ওহাবীয়্যাহ-১২৮০ খৃীঃ।

২৫. উমদাতুল কারী, বদরুদ্দীন আইনী, ইদারাতুত তিবাআতিল মুনিরিয়া, মিশর।

২৬. ১৯ শতকে বাঙালী-মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, ডঃ ওয়াকীল আহমেদ, ঢাকা ১৯৮৩।

২৭. এ শট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসিনস, স্যার সৈয়দ আমীর আলী, অনুবাদ হাবীব আহসান ৫৫ কলেজস্ট্রীট, কলিকাতা-১৯৯২।

২৮. এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম।

২৯. কুরআনুল করিম।

৩০. কানযুল উম্মাল, শায়খ আলী মুত্তাকী, দায়েরাতুল মারুফ হায়দারাবাদ- ১৯৫৫ খৃীঃ।

৩১. কিতাবুল ফুতুহ, আল্লামা আবী মুহাম্মদ আহমদ ইবন আছম, আলকুফী, দায়েরাতুল মারুফ উছমানিয়া, হায়দারাবাদ দাক্ষিনাত্য, ১৩৯২ হিঃ ১৯৭২ খৃীঃ।

৩২. কিতাবুস সুনানুল কুবরা, ইমাম হাফেজ আবুবকর আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আলী বাখহাকী, দারুল মারেফা, বৈরুত, লেবানন ৬৫৮হিঃ।

৩৩. কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, বাংলা উন্নয়ন প্রেস, ১৭নং কৈলাস ঘোষ লেন, ঢাকা- ১৯৬৫ সন।

৩৪. কারবালা থেকে বালাকোর্ট-মোহাম্মদ সোলায়মান ফররুখআবাদী, অনুবাদ আব্দুল কাদের, প্রতিতী প্রকাশন জিগাতলা, ঢাকা, ১৯৮৭।

৩৫. খিলাফতের ইতিহাস, মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী।

৩৬. গাইয়্যাতুল উসুল, আবু ইয়াহইয়া জাকারিয়্যা, মুস্তফা আলবাবী, মিসর -১৩৩০ হিঃ।

৩৭. জামে তিরমিজি, ইমাম আবু ঈসা মোহাম্মদ তিরমিজি, লক্ষ্ণৌ, ১৯১৭ খৃীঃ।

৩৮. জঙ্গনামা, শাহ মুহাম্মদ গরীবুল্লাহ, ফারসী কেতাব মোক্তাল হোসেন থেকে অনুবাদ মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১ খৃীঃ।

৩৯. জঙ্গনামা, আব্দুল গফুর সিদ্দিকি, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা -১৩২৪ সন।

৪০. তারীখে তামাদ্দনুল ইসলামী, জুরজী যায়দান, দারুল হেলাল, কায়রো-১৯১০ খৃীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

৪১. তারীখুর রসূল ওয়াল মুলুক, আবুজাফর মোহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী।

৪২. তাবকাতে ইবনে সা'দ, মোহাম্মদ ইবনে সা'দ, দারুসাদের বৈরুত, ১৯৫৭ খৃীঃ।

৪৩. তারীখে ইবনে খালদুন, আল মাতবাআতুল কুবরা, মিসর -১২৮৪ হিঃ।

৪৪. তারিখে দামিস্ক, লি ইবনে আসাকির।

৪৫. তাকমেলা (পরিশিষ্ট) তারিখে ইবনে খালদুন, আলমাতবাতুল কুবরা, মিশর ১২৮৪ হিঃ।

৪৬. তরজমানুস সুন্নাহ, মওঃ বদরে আলম মিরাঠী, ইদারাতুল ইসলামিয়া, আনারকলি, লাহোর।

৪৭. তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, আততাবারী, আল মাতবা'আতুল ইস্তিকামা, কায়রো ১৯৩৯।

৪৮. তাহযীবুত তাহযীব, ইবন হাজার আসকালানী, হায়দারাবাদ, দায়েরাতুল মারুফ ১৩২৬ খৃীঃ।

৪৯. তরজুমাতু রায়হানাতু রাসূলুল্লাহ ইমাম হুসায়ন ইবনে আলী (রাঃ), ইবনে আসাকীর, মুয়াসসাসাতু মাহমুদিয়্যা, বৈরুত-১৯৭৮ খৃীঃ।

৫০. তারিখে দামিস্ক, লি ইবন আসাকির।

৫১. নবী বংশ পরিচিতি ও মহান কোরবানী, সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক আলহোসাইনী টুডে কম্পিউটার লাকি সেন্টার, মতিঝিল, ঢাকা-১৯৯১।

৫২. ফুতুহুল বুলদান, আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহইয়া, ইবন জাবির আল বাগদাদী বালাযুরী (রঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ-১৯৯৮।

৫৩. ফতহুল বারী, শরহে সহীহ বুখারী, ইবন হাজার আসকালানী, আল মাতবাআতুল খাইরিয়্যাহ, কায়রো, ১৩২৫ হিঃ।

৫৪. ফিহ্‌রিস্ত আল আগানী, আবুল ফারাজ ইসপাহানী, মাতবাআতুল জমহুরিয়্যা, মিসর - ১৯০৫ খৃীঃ।

৫৫. ফুরাতকুলে ইমাম হোসাইন, মাওঃ মোঃ ছামিরউদ্দিন গাজীপুরী দ্বীনে হক প্রকাশনী, গাজীপুর -১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. ব্যাঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৮৮৭ খৃীঃ বার্ষিক রিপোর্ট।

৫৭. বঙ্গবাসী ২৭শে বৈশাখ ১২৯২ সাল।

৫৮. ভারতী, ফাল্গুন ও চৈত্র ১২৯৩ উদ্ধৃত, ডঃ ওয়াকীল আহ্মদ।

৫৯. মাসনাদ আহমাদ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, বৈরুত, মাকতাবুল ইসলামী-(খন্ড-১-৬)।

৬০. মৃত্যুর দুয়ারে, মানবতা, নুরু উদ্দীন, আহমদ, ঢাকা-১৯৯৬, (মাওলানা আবুল কালাম রচিত ইনসনিয়ত মউতকে দরওয়াজে পর, এর অনুবাদ।)

৬১. মহররমের শিক্ষা ও তাৎপর্য, ইসলামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮৪।

৬২. মিনহাজুসসুন্নাতিন নবাবিয়া, ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, তকীউদ্দিন, মিসর, মাতবাতুল কুবরা -১৩২২ হিঃ।

৬৩. মুরুযুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার, আবীল হাসান আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী আল মাসউদী, মাতবাআতুল কাহিরা, মিশর-১২৪৬ হিঃ।

৬৪. মহানবী (সঃ) ও তার আহলে বায়েত, সংকলনে মোহাম্মদ মামুনুররশীদ ইসলামী প্রজাতন্ত্র, ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ ১৯৯৭।

৬৫. মুকাদ্দমা, তারীখে ইবনে খালদুন, ইবনে খালদুন, মাতাবাআতুল হুমায়দিয়্যা, লাহোর, ১৯০৯ খৃীঃ।

৬৬. মশাররফ রচনা সম্ভার দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা ১৯৮০, কাজী আব্দুল মান্নান সম্পাদিত।

৬৭. মীর মানস, মুনীর চৌধুরী - ১৯৬৫।

৬৮. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মোস্তফা নুরুল ইসলাম, ১৯৬৮ রাজশাহী।

৬৯. মহররম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য, ভূমিকা, কৈফিয়ত অংশ, কায়কোবাদ, ২য় সংস্করণ ১৩৬৫ ঢাকা।

৭০. মীর মশাররফ এর গদ্য রচনা, মোঃ আব্দুল আউয়াল, ১৯৭৫, ঢাকা।

৭১. মুরুযুয যাহাব, আল-মাসউদী, আল-মাতবাতুল বাহিয়্যা, মিসর ১২৪৬ হিঃ।

৭২. ভারতী, ফালগুন ও চৈত্র ১২৯৩, ডঃ ওয়াকিল আহমদ

৭৩. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীনা, সমকালীন সমালোচকের দৃষ্টিতে মীর মোশাররফ হোসেন, উদ্ধৃত চারুবার্তা, আব্দুল কাইয়ুম, ২৩শে জৈষ্ঠ ১২৯২।

৭৪. রুহুল মা'আনী, আলুসী, ইদারাতুত তাবায়াতিল মুনীরায়্যা, মিসর ১৩৪৫ হিঃ।

৭৫. সহীহ বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ্, বৈরুত দারুল ফিক্র -১৯৮৬ খৃীঃ।

৭৬. সুনানে আবূ দাউদ, মিসর, মাতবাআতুল ওহাবিয়াহ, ১২৯১হিঃ।

৭৭. সহীহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম, মাতবাআতু আশরাফিয়া দেওবন্দ।

৭৮. সাহিত্য সাধক চরিত মালা-১ম খন্ড উদ্ধৃত গ্রামবাংলা প্রকাশিকা, জৈষ্ঠ্য ১২৯২ ব্রজেন্দ বন্দোপাধ্যায়।

৭৯. শাশ্বত বঙ্গ, কাজী আব্দুল ওদুদ, দ্বিতীয়, সংস্করন, ১৯৮৩ ঢাকা ।

৮০. শারহুল ফিকহিল আযহার, আল মাগনিসাবী দায়রাতুল মা'আরেফ, হায়দারাবাদ, দক্ষিনাত্য, ১৩২১ হিঃ।

৮১. শারহুল ফিকহিল আকবার, মোল্লা আলী কারী, মাতবাআ'মুসতাবাঈ', দিল্লী, ১৩৪৮ হিঃ।

৮২. শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন, মাওঃ একে এম ফজলুর রহমান মুন্সী, বাংলাদেশ তাজকোম্পানী, ৮/প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ১৯৮৫।

৮৩. A Short history of the Seracens, Ameer Ali, Macmillan & Co. London, 1951, A.D.

৮৪. A Literary History of the Arabs, S. Khuda Bakhsh C.U. 1930.

৮৫. A History of the Islamic people. London, Pautledg & Kegam Paul-1980.

৮৬. History of the Arabs. P.K. Hitti. 10 ed. London, Macmillan 1972.

৮৭. Imam Ibn Taimiya and his Projects of Reform, Dr. Sirajul Haque (Professor Emaretors, Dhaka University.

৮৮. Islamic History, A new Interpritation. M.A. shaban., Cambridge University Press-1992.

৮৯. Muslim Community in Bangal 1889, Distributed by Oxford University Press DHAKA. Sufia Ahmed.

৯০. A litarary History of the Arabs 1930, London, R. A. Nicholson.

৯১. The Arab Kingdom & its fall, Josef well Housen Beirut, Khayat - 1963.

৯২. The tragedy of Karbala facts and legends by S. Khuda Baksh, statemen, dated 29th May 1931, উদ্ধৃত গোলাম সাকলাইন, বাংলা মর্সিয়া সাহিত্য, ২য় সংস্করণ ১৯৬৯ ঢাকা।

৯৩. The Caliphate and its fall, W. Muir, London, 1891.